শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা

"exquisite book"

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিঃ
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৬০

চার টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এই পুস্তকের সমুদয় স্বত্ব বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টিদিগকে বিনাসর্ত্তে অর্পণ করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ হইতে এই পুস্তক 'উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী'-ভুক্ত হইল।

দোলপূর্ণিমা
১৩৬০

প্রকাশক

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন	...	...	(৫)
ভূমিকা	...	...	১
কুলপরিচয়	...	...	৭
কলিকাতায় আগমন	...	...	১৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব	...	...	১৯
দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের প্রথম দর্শন		...	২৯
ব্যাকুলতা ও সেবাস্পৃহা	...	...	৪১
দক্ষিণেশ্বরে	...	...	৫২
শিক্ষা	...	...	৬০
সেবা	...	...	৭৪
দীক্ষা ও শিক্ষা	...	...	৮০
সেবক-জীবন	...	...	৯১
তাপস-জীবন	...	...	১৭২
সাধক-জীবন	...	...	২০৮
ঠাকুরের মহাসমাধি	...	...	২৩২
বৃন্দাবনে	...	...	২৬৭
সন্ন্যাস ও তপস্যা	...	...	২৭২
স্বামীজীর সহিত ভ্রমণ	...	...	২৯৭
গঙ্গাতীরে তপস্যা	...	...	৩২২
বেলুড় মঠে ও ভক্তগৃহে	...	..	৩৩৮
বলরাম মন্দিরে	...	...	৩৭১
কাশীধামে মহাপ্রস্থান	...	...	৪৪২
পরিশিষ্ট	...	...	৪৯১

গ্রন্থকারের নিবেদন

যে সময়ে তাপস লাটু মহারাজ কলিকাতাস্থ বাগবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পরমভক্ত শ্রীযুত বলরাম বাবুর ভবনে 'আপন মনে আপন ধ্যানে' কালাতিপাত করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য আমি তথায় নিত্যই যাইতাম। এইখানে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কয়েক বৎসর মেলামেশা করিবার সুযোগ আমার জীবনে ঘটে। তিনি যে আমাদের কে ছিলেন, কি ছিলেন, তাহা বলা অসম্ভব। কেন না আমরা তাঁহার নিঃস্বার্থ স্নেহের স্নিগ্ধধারায় গলিয়া যাইতাম, ভুলিয়া যাইতাম কোন্ মানুষটির পায়ের কাছে বসিয়া আছি!

এই তেজোদীপ্ত সাধুর আকৃতি ও প্রকৃতিতে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার প্রভাব অনেকেই এড়াইতে পারিতেন না। বহু শিক্ষিত, অশিক্ষিত, যুবা ও বৃদ্ধ তাঁহার কাছে যাইতেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও স্নেহাদরে তৃপ্তিলাভ করিতেন। ভক্তগণের সঙ্গে কথোপকথন-কালে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত। কখনো কখনো হাসি ও আনন্দের ভিতর দিয়া তিনি অনেক কথাই বলিয়া যাইতেন, তাহাতে সার্ব্বজনীন উদারভাব পরিস্ফুট হইত। সেই-সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কথা ও কাহিনীর কিয়দংশ আমার নিকট সঞ্চিত হইতে থাকে।

৺কাশীধামে শ্রীলাটু মহারাজের অবস্থানকালে আমি মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতাম। যতটুকু সময় তাঁহার পদপ্রান্তে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তৎকালে যে-সমস্ত সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত স্মৃতিতেই নিহিত ছিল। সেই দেবদুর্লভ সঙ্গকালে একদিন জনৈক ভক্তের সঙ্গে মহারাজের সদালাপ-

শ্রবণে উল্লসিত হইয়া আমি কিছু 'নোট' রাখিবার অভিলাষে যেমনি কাগজ-পেন্সিলের জন্য উৎসুক হইয়াছি, অমনি অন্তর্দর্শী মহারাজ আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রসন্নহাস্যে বলিলেন, "এখন এ-সব কথা লিখবার কুছু দরকার নেই। যখন চিত্তশুদ্ধি হবে, এ-সব কথা আপনা আপনি ফুটবে। এখন এই-সব কথার জাবর কাটতে থাক, পরে রস্‌কস্ পাবে। জানো! পবিত্র জীবনই আসল, তাই সাধুর পবিত্র জীবন দেখতে হয়।"

দেখিতে দেখিতে বিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সেবক লাটু মহারাজ ঠাকুরের লীলার আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু আজিও তাঁহার তাপসজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৌরভ আমাদের ঘ্রাণে সুমিষ্টতা বহন করিয়া আনে, সেই সুবাসে প্রাণ পুলকিত ও মধুর করিয়া তোলে। তাঁহার কথাই আমাদের জপমালা, নিরাশ প্রাণে ভরসা, অশান্ত প্রাণে শান্তি।

যদিও শ্রীলাটু মহারাজ কোনো দিন তাঁহার জীবনচরিত অঙ্কিত করিতে আমাকে বলেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্নেহাশিস স্মরণ করিয়া নিজের অযোগ্যতা ভুলিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উপাসনাকল্পে তাঁহারই জীবনকথার মালা গাঁথিবার সাধ আমার প্রাণে জাগিত। সেই সূত্রই তাঁহার জীবনীর পুষ্পচয়নে আমাদের প্রণোদিত করিয়াছে। তাই এই স্মৃতিকথার অবতারণা।

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'-প্রণয়নে আমার অবলম্বন :

প্রথম— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট গৃহি-শিষ্যগণ-কথিত বিবরণ।

দ্বিতীয়—যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন নাই অথচ পরবর্ত্তী কালে

শ্রীলাটু মহারাজের সঙ্গ করিয়াছিলেন, এমন অনেক সাধু ও ভক্তগণের বিবৃতি ও লিখিত রচনাসংগ্রহ।

তৃতীয়—শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী এবং শ্রীলাটু মহারাজের সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ও 'পত্রিকার' প্রবন্ধনিচয় হইতে সঞ্চয়ন।

এই প্রকার মাধুকরীবৃত্তি-অবলম্বনে আমি লাটু মহারাজের সাধন-জীবনের অনেক কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে-সকল গ্রন্থ হইতে অল্পাধিক সাহায্যলাভ করিয়াছি, সেই-সকল গ্রন্থকারের নিকট এবং মঠের প্রবীণ সাধু-মহাত্মাগণের ও গৃহি-ভক্তগণের নিকট আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। এই গ্রন্থমধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ-অবতারণার স্থলে তাঁহাদের নামে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং বাহুল্যভয়ে এখানে প্রত্যেকের নাম পুনরায় উল্লেখ করা হইল না, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নের সাত বৎসর কালের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যেক প্রসঙ্গটি যাচাই করিয়া লইয়াছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথোপকথনগুলি তাঁহাদের সমক্ষেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং লিখিত বিষয়টি তাঁহাদের নিকট পুনঃ সমর্থিত করিয়া লইয়াছি। আমার বন্ধু স্বর্গীয় শশধর গাঙ্গুলী ('মালদহে' মাষ্টার) এবং রায় বাহাদুর বিহারীলাল সরকারের কথোপকথনগুলির অধিকাংশই এইভাবে লিখিত এবং শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথাগুলিও তাঁহার 'ডায়েরী' হইতে এইভাবে সংগৃহীত। অতএব, এই সঙ্কলনের ভাষা-ভাব অধিকাংশই লাটু মহারাজের। ইহার অনেকস্থলে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর ঝঙ্কার জীবন্ত-গ্রামোফোনের মত প্রতিধ্বনিত হয়।

উপরি-উক্ত নির্ভরযোগ্য উপকরণ হইতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লইয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি রচিত হইয়াছে। আমার অনেক বন্ধু

এই পাণ্ডুলিপিখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন ও আবশ্যকমত সংযোজন করিয়া রচনার সৌষ্ঠবসাধনে বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। এই 'স্মৃতিকথা'র সম্পাদনে তিনি হাস্যাননে যেরূপ সহায়তা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অজস্র আশিসবর্ষণ ভিন্ন তাহার প্রতিদান নাই। এই উদারমতি বন্ধুর প্রতি আমাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরপুর রহিল।

● ● ● ●

এই গ্রন্থ বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রম ও যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই, তথাপি ইহার স্থানে স্থানে যে-সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেণ্ট পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। এই চিরস্নেহানুগত জনের উপর তিনি যে আশীর্ব্বাণী প্রয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

● ● ● ●

এই গ্রন্থপ্রকাশার্থে নিম্নলিখিত সহৃদয় বন্ধুগণ আমাকে অর্থ-সাহায্যদানে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি:—শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা, শ্রীঅক্ষয়কুমার শীল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ও রায় সাহেব নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসতীশচন্দ্র লাহা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন, ডাক্তার শ্রীঅনুরূপকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীহরিচরণ শীল, বি-এল, শ্রীচুনিয়ালাল শীল, শ্রীমতী ফুলকুমারী দত্ত।

পূজ্যপাদ শ্রীলাটু মহারাজের আশ্রিত সেবক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সাহা

এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণের প্রকাশক হইয়া এবং ইহার প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

● ● ● ●

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণপারিপাট্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ইহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকমুদ্রণকালে অবশিষ্ট যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইল।

আত্মগোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষের অমূল্য উপদেশরাশির কিয়দংশ লইয়া এই গ্রন্থ। তাঁহার তপোময় জীবনের কতটুকুই বা আমরা জানি! তত্ত্বদর্শী সাধুগণের শ্রীমুখনিঃসৃত কথার মধ্যে তাঁহাদের জীবনের মর্ম্মকথা ধরা পড়িয়া যায়। যাঁহারা রসগ্রাহী, তাঁহারা ভাষা-খোশা ত্যাগ করিয়া যদি এই মহাত্মার কথাগুলির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন, ইহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হন, তবেই এই পুস্তকপ্রচার সার্থক হইবে। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাধীন— তাঁহার শ্রীচরণে প্রণামপুরঃসর নিবেদনমিতি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৭
মহালয়া স্মৃতিতর্পণ দিবস

বিনীত
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের এই মনোজ্ঞ জীবনকাহিনীটি পড়িয়া আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এই মহাপুরুষের অধিকাংশ জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃসঙ্গভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক চরিত্রের ধারাবাহিক কথা প্রায়শঃই ভক্তগণের নিকট অবিদিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কয়েক বর্ষ ধরিয়া লাটু মহারাজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার মধুর স্মৃতির কতকাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক অন্যান্য নানাসূত্র হইতে অবশিষ্ট কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এমন অনেক ঘটনা ইহাতে উল্লিখিত আছে, যাহা মঠের প্রাচীন সাধুসন্ন্যাসিগণও জানেন না। গ্রন্থে প্রকাশিত না হইলে সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে লাটু মহারাজ নানাদিক দিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বরাহনগর এবং আলমবাজার মঠে একত্র থাকাকালীন তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য এবং একান্ত ধ্যানশীলতা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বাহির হইতে প্রথম প্রথম অনেক সময়ে তাঁহাকে অচেষ্ট, রুক্ষ ও কেমন একরকমের বলিয়া মনে হইত, কিন্তু একটু নিবিষ্টভাবে তাঁহার জীবনধারা

লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে কি অসাধারণ সংসার-নির্ব্বেদ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি তাঁহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া রহিয়াছে। বৃথা তর্ক ও কথাবার্ত্তা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। হয়তো উঠিয়া গিয়া কোন নিরিবিলি স্থানে বসিয়া থাকিতেন বা পায়চারী করিতেন। অনেক পরবর্ত্তীকালে বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে এবং অন্যান্য স্থানে থাকিবার সময় ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সহিত অনেকটা মেলামেশার ভাব তাঁহাতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেও নিজের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য এবং একান্তভাব তিনি সম্পূর্ণই বজায় রাখিয়াছিলেন। রঙ্গতামাসা, উচ্চ হাস্যপরিহাস তাঁহার ধাতে ছিল না, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নীরস ও বিষণ্ণ ছিলেন না। তাঁহার জীবন বরাবরই খুব কঠোর ছিল। খাওয়া-পরা বা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কোনদিনই মনোযোগ দিতে পারিতেন না। সংসারের সর্ব্ববিধ সংস্কার তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোলাহলের মধ্যে থাকিলেও তিনি সর্ব্বদাই যেন অন্য কোন সুদূর অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে নির্ব্বিণ্ণ বাহিরের এই পৌরুষ-ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে একটি অতি কোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয় যে বাস করিত তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। যাঁহারা একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিতেন, তাঁহারা উহা সহজেই ধরিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার বালকের

ন্যায় অনাড়ম্বর সরলতাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল। ভব্য সভ্য সাজানো চালচলন লাটু মহারাজের কখনো দেখি নাই। যে বিষয়ে এবং যাহার সম্বন্ধে যখন যাহা মনে উঠিত তাহা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বাহিরে প্রকাশ করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার এইরূপ স্পষ্টকথা হয়তো অনেকের রুচিকর হইত না, কিন্তু যাহারা তাঁহার অন্তর জানিত তাহারা তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ বা রুষ্ট হইত না।

এই দৃঢ়-বৈরাগ্যবান স্বভাব-সরল বালক-প্রকৃতি সাধুকে তাঁহার গুরুভ্রাতারা অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন এবং পাশ্চাত্ত্য শিষ্যমণ্ডলীর সহিত উত্তর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত তাঁহার কি অগাধ ভাল-বাসার সম্বন্ধই না দেখিয়াছি!

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও এবং তাঁহার জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেমদীপ্ত দিব্যচরিত্র এই সঙ্ঘের সাধু ও ভক্তগণের আধ্যাত্মিক জীবন পরিপুষ্ট করিতে বহুভাবে সহায়তা করিলেও সাক্ষাৎভাবে তিনি বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেবাব্রতে কখনও যোগদান করেন নাই। রজস্তমো-বিরহিত শুদ্ধ ভগবদ্‌ভজন লইয়া আপনভাবে সমগ্র জীবন কাটাইয়া গেলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গুরু-ভ্রাতৃগণের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তথায় রাত্রিবাস করিতে তিনি

কখনও স্বীকৃত হইতেন না। বলিতেন—"হাম্‌রা সাধু, হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, ঐশ্বর্য্য এসব কি ? বাবা ! এসব বৈভবের ভেতর হামি থাকবে না।" ইহাই তাঁহার নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাব ছিল—যেমন অপরাপর শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণেরও প্রত্যেকের মধ্যে অন্যান্য এক একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় সেইরূপ। এক একজন পার্ষদকে অবলম্বন করিয়া অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের এক একটি ভাব বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও সব ভাবগুলির ভিতর একটা নিবিড় সামঞ্জস্য ও একতানতা আছে। সবগুলি মিলিয়া যে এক অনুপম আধ্যাত্মিক ভাব-সমষ্টির প্রকাশ এযুগে জীবন্তভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা জগতে সত্যই এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ! শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়াও সেই সমন্বিত মহাভাবরাশির বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহাদের কথা যত আলোচিত হয়, ততই জগতের মঙ্গল—ততই ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অনন্ত ভাবসমুদ্রকে কথঞ্চিৎ ধরিবার, ছুঁইবার পথ সুগম হইবে।

ছোট বড় বহু ঘটনার পরিবেশে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজকে অন্তরঙ্গভাবে অনেকবারই দেখিয়াছি। সেইসকল ঘটনার কতকগুলি আজ স্মৃতির তলদেশে চাপা পড়িয়াছে, আবার অনেকগুলি হয়তো সাধারণের কাছে প্রকাশযোগ্যই নয়, কিন্তু তবুও সবগুলিরই মধ্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক মহিমোজ্জ্বল যে

অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছিলাম, তাহারই কথা আজ বার বার মনে পড়িতেছে।

প্রাঞ্জল সুললিত ভাষায় লিখিত এই 'স্মৃতি-কথাটি' প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বাংলার ধর্ম্মপিপাসু—বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দানুরাগী পাঠকপাঠিকাগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের অলোক-সামান্য ভাগবত জীবনের ভাস্বররূপ অতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার ভাবুক ও চিন্তাশীল। যৌবনকাল হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণের সঙ্গ ও কৃপালাভ করিয়াছেন। ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবতা এই মহাপুরুষের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপ এই 'স্মৃতিকথা' সাধারণে প্রচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি নিজকে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের জীবনী ও উপদেশ অনুধ্যান করিয়া সুধীজন বিমল ভগবদানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হউন, ইহাই আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বিরজানন্দ

কুল-পরিচয়

স্মৃতিকথার আবশ্যকতা, সংগ্রহের অসম্পূর্ণতা, কুলপরিচয় এবং গ্রাম্য জীবন

যাঁহার স্মৃতিকথা আলোচনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন সেবক, শিষ্য ও অন্তরঙ্গ। নাট্যসম্রাট গিরিশ বাবু তাঁহাকে 'বেদাগ সাধু' বলিয়াই অভিহিত করিতেন এবং কথাশিল্পী শরৎবাবু তাঁহারই মুখশ্রীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উজ্জ্বল তারকা; তাঁহার তপস্যার প্রভায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গৌরবান্বিত। সাধু সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত 'সৎকথায়' তাঁহারই উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে সাধুর উপদেশবাণী এমনই সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, তাঁহার জীবনকথা জানিবার আগ্রহ কার না হয়! সেই আগ্রহের স্বাভাবিক প্রেরণা হইতেই আমরা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সাধুসন্তদিগের অকৃত্রিম কৃপাকণা অহরহঃ বর্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের পুণ্য-পবিত্র-করা চরণরেণুতে ভারতভূমি ধন্য। তাঁহাদের অমিয়বর্ষী উপদেশবাণীতে বিশ্ব মুগ্ধ। তাঁহাদের অলৌকিক কৃতকীর্ত্তিতে মর্ত্তালোকের নরনারী বিস্ময়ে অভিভূত। তাঁহারা জ্ঞানে বিদ্যায় অনুশীলনে জগৎমান্য, শক্তি-সামর্থ্য-সার্থকতায় বিশ্ববরেণ্য এবং প্রেম-ভক্তি-ভালবাসায় অতুলনীয়। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের লাটু মহারাজ অনন্যসুলভ সাধনগৌরবে গৌরবান্বিত।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম 'অদ্ভুতানন্দ স্বামী'। এই নামে তাঁহার পরিচয় অধিকদূর বিস্তৃত হয় নাই। সাধারণে তাঁহাকে লাটু মহারাজ বলিয়াই জানেন। বাল্যকালে লাটু মহারাজের নাম ছিল 'রাখ্‌তুরাম'।

বিহার প্রদেশের ছাপ্‌রা জিলায় তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তত্রস্থ এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এক অজ্ঞাত মেষপালকের গৃহে যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেদিন কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে এই শিশুটি স্বনামধন্য লাটু মহারাজ হইবেন। যদি কেহ এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ এই শিশুটির জন্মস্থান, জন্মসময়, সন, তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু লিপিলেখা রাখিয়া যাইতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁহার শৈশবগাথা হইতে বঞ্চিত হইলাম। জগতে যাঁহারা আপন সাধনায় বড় হন, সেই সাধনার গোপন বীজটুকু তাঁহাদের শৈশবকালেই অন্তর্নিহিত থাকিতে দেখা যায়। যাঁহার শৈশবকথা অজ্ঞাত, তাঁহার অনেক কথাই অজানার গর্ভে নিহিত। সেইজন্য আমাদের লাটু মহারাজের সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই জানি না। আমাদের নিকট তিনি যেদিন ধরা দিলেন, সেদিন তাঁহার শৈশবকাল প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে—সেদিন তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস-আশ্রমের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী তিনি পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে নির্ব্বাক উদাসীনতা রক্ষা করিতেন। যদি কোন দিন কোন গুরুভ্রাতা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে তাহার উত্তরে লাটু মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি—"আরে! ঈশ্বোরতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তোরা কি হামার কথা নিয়ে সময় কাটাবি। হামার কথা জান্‌বার কী দরকার আছে। তোরা হামাকে ঝুট্‌মুট্‌ দিক্‌ করিস্‌ নি।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইতেন; সেই গাম্ভীর্য্য

ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বপ্রসঙ্গটি পুনরুত্থাপন করিতে গুরুভ্রাতাগণও সাহস করিতেন না।

একবার 'সাধু নাগ মহাশয়'-প্রণেতা শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লাটু মহারাজের জীবন-কথা প্রকাশ করিতে আগ্রহান্বিত হন। তাহাতে লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "দেখুন শরোট (লাটু মহারাজ 'ত'কে 'ট' বলিয়া উচ্চারণ করিতেন) বাবু! আপুনি ঐসব ইচ্ছা কোর্‌বেন না—আপুনি হামার বিষয় লিখ্‌বেন না। হামার কথা কি লিখ্‌তে আছে? ঠাকুর-স্বামীজীর কথা লিখ্‌বেন—তাতে লোকের কল্যাণ হবে। হামার সম্বন্ধে কুছু লিখ্‌তে নাই বুঝ্‌লেন।" সেইদিন হইতে লাটু মহারাজ সম্বন্ধে শরৎ বাবুর লেখনী বন্ধ হইয়া যায়।

যে সাধু নিজেকে এত গোপন রাখিতে চাহিতেন, যিনি আপনার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে অনভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করা কত যে কষ্টসাধ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই কারণ আমাদের এই স্মৃতিকথাখানিতে অসম্পূর্ণতার ছাপ থাকিয়া যাইবে। আমাদের চেষ্টার পঙ্গুত্ব জানিয়াও আমরা যে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা শুধু তাঁহার গুরুভ্রাতাদের ও স্নেহপাত্রদের অহেতুকী কৃপার ও আশীর্ব্বাদের ফলে। তাঁহারা লাটু মহারাজ সম্বন্ধে যেটুকু বলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

কোন ব্যক্তির জীবনকথা আরম্ভ করিতে হইলে তাঁহার কুলপরিচয় দিয়া শুরু করার প্রথা প্রচলিত আছে। আমরা কিন্তু যাঁহার কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কুলপাবনের কুলপরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহার পিতামাতার নাম-ধাম জানিতে পারি নাই। মাত্র এইটুকু শুনিয়াছি যে, তাঁহার পিতা

মেষপালনাদির কার্য্য করিতেন। তাঁহারা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দৈনন্দিন দুইবেলা তাঁহাদের পর্য্যাপ্তপরিমাণ আহার জুটিত না। কায়ক্লেশে কোনক্রমে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। অন্নবস্ত্রের অসচ্ছলতা ঘুচাইবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। ফলে অল্পবয়সেই তাঁহারা উভয়েই গতায়ুঃ হন। শিশু রাখ্‌তুরামের বয়স যখন পঞ্চমবর্ষেও পদার্পণ করে নাই, সেইকালেই বালক পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

পিতৃমাতৃহীন রাখ্‌তুরাম নিঃসন্তান পিতৃব্যের সংসারে আসিয়া পড়েন। স্নেহবুভুক্ষু পিতৃব্যহৃদয়ের অগাধ বাৎসল্য-সমুদ্রে রাখ্‌তুরামের শৈশব-তরণী ভাসিয়া যাইতে থাকে। এ-হেন পিতৃব্যের নামধাম পর্য্যন্ত আমরা অবগত নই। পিতৃব্যের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু শুনি নাই। (শুনিয়াছি যে পরবর্ত্তী কালে তিনি কলিকাতার আশেপাশে একটি ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান করিতেন) তবে এইটুকু শুনিয়াছি যে, তৎকালীন তাঁহার পিতৃব্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল; তাঁহার আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের চেয়েও অধিক ছিল। কিন্তু পিতৃব্যের একটি মহান দোষ ছিল—অমিতব্যয়িতা, যাহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে মহাজন নামক একশ্রেণীর লোকের নিকট যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া গ্রামত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রাখ্‌তুরাম যতদিন পিতৃব্যের গৃহে ছিলেন ততদিন তাঁহার কোন কষ্ট ছিল না। তিনি নিজের খেয়ালমত গ্রামের গোঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কখনো বা গো-মেষাদির পশ্চাতে ধাবমান হইতেন, কখনো বা সঙ্গীদের সাথে আপনমনে খেলা করিতেন। সুযোগ পাইলেই বালক অতি দূরে চলিয়া যাইতেন—অনুসন্ধানতৎপর হইয়া তাঁহার পিতৃব্যকে কতদিনই না

দূরদূরান্তর গ্রামে যাইতে হইত। এইজন্য পিতৃব্য তাঁহাকে কত ভৎ'সনা করিতেন। কিন্তু বালককে ভৎ'সনা করা যে বৃথা, তাহা দুর্ভাবনাক্লিষ্ট স্নেহবৎসল হৃদয়কে বোঝাইবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

"হামি ত রাখালদের সঙ্গে থাকৃতাম—জানো···! তারা ভারী সরল, তাদের মত সরল না হোলে আনন্দ মিলে না"—কথাপ্রসঙ্গে একদিন ইহা বাহির হইয়া পড়ে। আমরা এই সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তাঁহার বাল্য-জীবনের ছবিটুকু অঙ্কিত করিতে ভরসা পাইতেছি। তিনি তাঁহার পুষ্ট খর্ব্বাকৃতি লইয়া রাখালদের সহিত প্রকৃতির পাঠশালায় চলিয়াছেন। শত বর্ষণেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না, প্রখর রৌদ্রেও তাঁহার ভয় ছিল না, প্রচণ্ড শীতকেও তাঁহার গ্রাহ্য ছিল না। পথিমধ্যস্থ অসমতল কণ্টকাকীর্ণ অসংস্কৃত ক্ষেত্রের প্রতি তাঁহার সবিশেষ মনোযোগ থাকিত না। অনন্যমনা হইয়া তিনি খেলিয়া চলিয়াছেন বন্য দৃশ্যপটের স্বভাবসুন্দর রূপরসগন্ধের মাঝে। এই খেলাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাল্য অন্তর্হিত হইতে থাকে। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য না হওয়ায় উন্মুক্ত আকাশতলই শিক্ষার প্রাঙ্গণে পরিণত হইয়াছিল। সেই শিক্ষালয়ে না ছিল পাঠ্যপুস্তক, না অধ্যাপক, না অধ্যাপনা—ছিল শুধু প্রত্যক্ষ পাঠ, যে-পাঠে জীবনযুদ্ধের উপযোগী ঘটনার বাস্তব সমাবেশ থাকে, যে-পাঠে জীবনে জয়ী হইবার গোপন সঙ্কেত থাকে, আর থাকে প্রকৃতির সহিত মাখামাখি ভাব, তার সাথে অন্তরঙ্গতা, যে-অন্তরঙ্গতার ফলে হৃদয়মথিত সঙ্গীতধ্বনি কল্লোলিত হইয়া উঠিতে পারে—"মনুয়ারে, সীতরাম-ভজন কর লিজিয়ে।"

আমরা এই গানের কথা জানিয়াছিলাম দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে—যেথানে তিনি নির্জনে প্রাণের আবেগে তন্ময় হইয়া ঐ কলিটাতে সুরযোজনা

করিয়াছিলেন। অদূরে পরমহংসদেব দণ্ডায়মান। মৌন মুগ্ধ স্তব্ধতা লইয়া ভক্তের জীবনসঙ্গীত শুনিয়া সস্নেহে তিনি বলিয়াছিলেন—"ওরে! তোর এতেই হবে।"

এই ভাবেই তাঁহার বাল্যজীবন কাটিতেছিল। সহসা সেই স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল—পিতৃব্যের অবস্থাবিপর্য্যয়ে। মহাজনের ঋণজালে জড়িত হইয়া যেদিন তাঁহার পিতৃব্য বাস্তুশূন্য হইলেন, সেইদিন কে জানিত যে এই বিপদের মধ্যে মহান সৌভাগ্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? পিতৃব্যের বিপদ রাথ্‌তুরামের ভাগ্যকে সাহায্য করিয়াছিল—কি ভাবে এবং কোথায় তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিকাতায় আগমন

অলক্ষ্য ইঙ্গিত, পরিব্রাজকগণের নির্দ্দেশ, পিতৃব্যচরিত্র, গ্রামত্যাগ, কলিকাতার পথে, চাকুরীর সন্ধানে, শ্রীরামচন্দ্র দত্তের আশ্রয়ে, শ্রীরামচন্দ্র দত্তের সামান্ত পরিচয়, লালটুর গৃহকর্ম্ম, হামি নোকর আছে, চোর না আছে—লালটুর স্পষ্টবাদিতা, লালটুর প্রতিবাদভঙ্গি এবং লালটুর বৈশিষ্ট্য

মানবজীবনের অনেকটাই এইরূপ অলক্ষ্য ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যে-সময় তাঁহার পিতৃব্য অতিরিক্ত চিন্তিত, ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের গ্রামের উপান্তে কয়েকজন পরিব্রাজকের সমাগম হয়। গ্রাম্যসংস্কারবশতঃ পরিব্রাজকগণের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া রাখ্‌তুরামের পিতৃব্য কলিকাতা-গমনের নির্দ্দেশ পাইলেন। কিন্তু সেই নির্দ্দেশকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় বহু বাধা উপস্থিত হইল। গ্রামবাসিগণ রাখ্‌তুরামের পিতৃব্যকে স্বগ্রামে রাখিতে চাহিলেন—অনেকে এমন কি মহাজনের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া রাখ্‌তুরামের পিতৃব্যের দখলীকৃত ক্ষেত্রগুলিতে চাষ-আবাদের সুবিধা করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা বিফল হইল। কেহই রাখ্‌তুরামের পিতৃব্যকে স্বগ্রামবাসী করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

রাখ্‌তুরামের পিতৃব্যচরিত্রে তেজস্বিতার অভাব ছিল না। তিনি কাহারও অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। ঋণজালে জড়িত হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এইবার তাঁহার পিতৃব্যের উন্নত মস্তক মহাজনের নিকট আনুগত্যের নতি স্বীকার করিবে, কিন্তু সেইরূপ নতিস্বীকার করিবার মত দীনতা তিনি দেখাইলেন

না ; পরন্তু আপনার যথাসর্ব্বস্ব মহাজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় পিতৃব্যের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বালক রাখ্‌তুরামের চোখে জল আসিয়াছিল—একথা বহুদিন পরে সমব্যথাতুর এক স্নেহাকাঙ্ক্ষীর নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন—"ওরে! দেশ ছেড়ে চলে আসতে কি মন চায়! হামার ত কান্না লেগেছিল। তোদের আত্মীয়-স্বোজন সব রয়েছে, তাদের ছাড়তে পার্‌বি কেনে? হামার ত কেউ ছিল না, হামি তবু পারে না।"

যাহা হউক, বহুদিনের পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে রাখ্‌তুরাম ও তাঁহার পিতৃব্য ছাপরা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অধিক বিপদে পড়িলেন। আসিবার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা নগরীকে যাহা ভাবিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে কলিকাতা নগরী তাহা নয়। এখানে অজানা অপরিচিতের অর্থসাচ্ছল্য না থাকিলে অনাহারেও দিন কাটে। গ্রামে অন্নাভাবে কাহারও মরণ হয় না জানিতেন। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে এত প্রাচুর্য্যের মাঝে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকের অভাব নাই দেখিয়া তিনি অকূল সমুদ্রে পড়িলেন। তিনি জানিতেন না যে, অপরিচিত অজানা অসহায় লোকের পক্ষে কলিকাতা নগরী অতীব নিষ্ঠুর, অতিশয় নির্ম্মম। এখানে কেহ কাহারও খোঁজ লয় না—পথিক ভুক্ত কি অভুক্ত এ সংবাদও কেহ রাখে না। অতিথিমাত্রেই ভিক্ষুক—এই হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া রাখ্‌তুরাম ও তাঁহার পিতৃব্য কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া কয়েকদিন যাবৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি মহাজনের আনুগত্য স্বীকার করিতে দ্বিধা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বিমূঢ়তা কয়দিনই বা আশ্রয় করিতে পারে? অবিলম্বে

আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া রাখ্‌তুরামের পিতৃব্য কলিকাতাস্থ স্বগ্রামবাসীদের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। অনুসন্ধানের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ফুলচাঁদ নামক স্বগ্রামবাসীর আশ্রয়ে উপস্থিত হন।

ফুলচাঁদ তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের আরদালি ছিল। মনিবকে বলিয়া কহিয়া ফুলচাঁদ বালক রাখ্‌তুরামের একটি চাকুরী করিয়া দিল।

মহানুভব রাম দত্তের আশ্রয়ে বালক রাখতুরামকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া তাঁহার পিতৃব্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সেইখানে বালকের সহিত তাঁহার পিতৃব্যের ছাড়াছাড়ি হয়।

আশ্রিতবৎসল রাম দত্তের গৃহেই বালক-ভৃত্যটি আপন চরিত্রগঠনের উপযুক্ত আবহাওয়া পাইয়াছিল। চরিত্রনিষ্ঠায় শ্রীরামচন্দ্র দত্তের সুনাম ছিল—তৎকালে অনেকেই তাঁহাকে আদর্শ চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ তৎপরতার সহিত ঊর্দ্ধতন গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণের আদেশ পালন করিতেন, অপরের নিকট হইতে সেইরূপ আজ্ঞা-পালনস্পৃহা আশা করিতেন। নব্য শিক্ষিতগণের মধ্যে তৎকালীন যে অভ্যাসটি বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল, তাহার তিনি নিন্দাই করিতেন। নানা প্রশ্নের দ্বারা কোন আদেশ বা উপদেশকে বিশ্লেষিত করিয়া দেখিবার আগ্রহকে তিনি যথাযথ উৎসাহ দান করিতেন বটে, কিন্তু বিশ্লেষণের পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকাকে তিনি শুধু নিন্দা করিতেন না, সৎসাহসের অভাব বলিয়াই গণ্য করিতেন। তিনি বাচনিক বিনয় ও নম্রতাকে আমল দিতেন না; কিন্তু যেখানে দেখিতেন যে, হৃদয়ের আবেগজনিত শ্রদ্ধা ও স্নেহ সুপরিস্ফুট হইয়াছে, সেইখানে তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিতেন। যথার্থ নির্লোভ থাকায় সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত। এ-হেন মনিবের

আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বালক রাখ্‌তুরাম অল্পদিনেই কর্ম্মঠ, আদেশতৎপর, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভৃত্যের এই কয়েকটি গুণ ক্রমে ক্রমে সকলের চোখে পড়িল এবং সকলেই আদর করিয়া তাঁহাকে 'লালটু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। (আমরাও এখন হইতে তাঁহাকে লালটু বলিয়া লিখিয়া যাইব)।

মনিবগৃহে লালটুর কাজ ছিল বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফাইফরমাস খাটা, আর মনিব রাম দত্তের টিফিন নিয়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে দোকানের তাগাদায় বেরোনো—এইসব কাজ লালটু অতি তৎপরতার সহিত করিয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের সখ মত প্রত্যহ কুস্তী ও কসরৎ করার অভ্যাস ছিল। ভৃত্যের কুস্তী করার সখকে গৃহস্থের কেহ কেহ সমর্থন করিত না, কিন্তু উদারনৈতিক রামচন্দ্র কোন দিনই লালটুকে নিষেধ করেন নাই।

একদিন রাম বাবুর কোন এক বন্ধু জানান যে, কুস্তীগীর লোককে চাকর রাখতে নেই। তদুত্তরে রামবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ত বোঝো না যে, কুস্তী করলে কাম কমে যায়, আপনাআপনি বীর্য্যরক্ষা হয়ে যায়।" এই কথা শুনিয়া বন্ধুটি খরচ-খরচার কথা তুলেন। তাহাতে রাম বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিজেরা যেমন দুর্ব্বল, সেইরূপ দুর্ব্বল চাকরই চাও—চাকরটাকে পেটপুরে খেতেও কি দেবে না? চাকর বলে কি তাকে এতটাই হেনস্তা দেখাবে? সেও ত মানুষ একটা—কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার করা তার সঙ্গে কি চলে? কুকুরটাকেও পেটপুরে খেতে দাও—চাকরটাকে সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করবার মতলব কর। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ এরকম হওয়া উচিত নয়।" এই কথা কয়টি শুনিয়া বন্ধুটি চুপ করিয়া যায়।

পুনশ্চ আর একদিন আর একটি বন্ধুর সন্দেহ হয় যে, রাম বাবুর বালকভৃত্যটি বাজারের পয়সা চুরি করে। বন্ধুবরের উপকারমানসে সেই বন্ধুটি একদিন নিভৃতে লালটুকে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁরে ছোঁড়া! ঠিক কোরে বল দিকিনি আজ কটা পয়সা রাখলি।" মনিববন্ধুটির এইরূপ প্রশ্ন বালক লালটু বরদাস্ত করিতে পারিল না। তেজের সহিত বলিল—"জান্‌বেন বাবু! হামি নোকর আছে, চোর না আছে।" বালকভৃত্যের এই সদম্ভ উক্তিকে ক্ষমা করিতে না পারিয়া বন্ধুটি রাম বাবুকে সেই কথা জানাইলেন। সব শুনিবার পর রাম বাবু বন্ধুটিকে বলিয়াছিলেন—"দেখুন···! লালটু আমার চোর-জোচ্চর নয়; ওর যখন যা' দরকার হয়, ওর মার কাছ থেকে চেয়ে নেয়।" ভৃত্য হইয়া মনিবের নিকট হইতে এরূপ অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া আধুনিক কালে দুর্লভ।

মনিবগৃহে কাজ করিবার সময় স্পষ্টবক্তা হিসাবে লালটুর ভারী দুর্নাম বা সুনাম ছিল। অনেক সময় তাঁহার সরল গ্রাম্যদোষদুষ্ট স্পষ্টবাদিতা অপ্রিয় বাক্যের সামিল হইয়া পড়িত। কিন্তু লালটুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রাম বাবুর বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই এই স্পষ্টবক্তা ভৃত্যের রূঢ়তায় বিরক্ত হইয়া উঠিত। রাম বাবু জানিতেন, লালটু কখন কখন গ্রাম্য রূঢ়তার সহিত স্পষ্টবাদী হইয়া উঠিতে চায়। ন্যায় ও মর্য্যাদার খাতিরে সেই সেই ক্ষেত্রে স্পষ্টবক্তা না হইলে আত্ম-অবমাননা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এ কথাও রাম বাবু জানিতেন; এইজন্যই তাঁহার মত চরিত্রবান ব্যক্তি বন্ধুবর্গের কথাতেও ন্যায়ভ্রষ্ট হইতে চাহিতেন না। যেখানে যেখানে সত্যের অমর্য্যাদা দেখিতে পাইতেন, সেইখানে সেইখানে লালটু স্পষ্টবক্তা; যেখানে যেখানে বন্ধুবর্গ মনিব রাম দত্তের নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থাদি

লইবার অছিলা দেখাইত, সেইখানে সেইখানে লালটুর স্পষ্টবাদিতা আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িত।

সেইকালে তাঁহার মুর্ত্তির যে বিবরণ আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা আপনাদের সমক্ষে ধরিতেছি—"তাঁর প্রতিবাদভঙ্গীর মধ্যে পালোয়ানি ভাব ফুটে বেরুতো। তাঁর বক্র গ্রীবা, ঈষদুন্নত চিবুক, প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল নেত্র এবং নাসিকারন্ধ্রের ঈষৎ স্ফীতি, তাঁর মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গভঙ্গী এবং আধা-হিন্দীর তোত্‌লামি—সবগুলি মিলিয়া প্রতিপক্ষকে নির্ব্বাক কোরে দিতো।"

পরবর্ত্তীকালে লালটুর জীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মিঠে কথার তিনি (তখন লাটু মহারাজ) বড় ভক্ত ছিলেন ; কিন্তু যেখানে অবিনয়ের ঔদ্ধত্য দেখিতেন (তা গুরুভ্রাতাদের মধ্যেই হউক বা সমাজনেতাদের মধ্যেই হউক) সেইখানেই রূঢ় প্রতিবাদ করিতেন। কপট ভক্তিকে তিনি ঘৃণা দেখাইতেন অথচ সরল মাতলামিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই কথায় আসিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব

যুগসন্ধিতে নানা ভাবতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সমাজরক্ষার্থে ভারতীয় সনাতনী মূর্ত্তির আবির্ভাব, সাধকের ধী ও প্রজ্ঞা-শক্তিতে ভারতে নব অধ্যাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনোদ্ভাসিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচারে বিজ্ঞান-বাদের সম্পূর্ণতার প্রতি সন্দেহ, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের অন্তর্বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন এবং লালটুর উপর রামবাবুর প্রভাব

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-জগতের দিক হইতে তাহাকে সন্ধিক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সবেমাত্র কোম্পানীর রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে—সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতের জনগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতের যা-কিছু কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার কষ্টিপাথরে যাচাই হইতে চলিয়াছে। সে-হেন যুগসন্ধিতে নানা আদর্শের সংঘাতে ও নানা আন্দোলনের মাঝে বাঙ্গলার তথা ভারতের হিন্দু-সমাজ লক্ষ্যহারা হইতে বসিয়াছিল। তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অধিকাংশেরই মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল—তাঁহারা যে-পথে চলিয়াছেন, যে-ধারায় জীবনযাপন করিতেছেন, তাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সার্থকতা আছে কি-না। তাহাতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে কি-না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় তাঁহারা ঐ একই প্রশ্নের সমাধানে বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশ দিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, সমাজ-তরণীখানিকে ভারতীয় আদর্শবন্দর হইতে নোঙরমুক্ত করা হউক; কেহ কেহ বলিলেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারার মধ্যে যে-গুলি ভাল ও গ্রহণীয়

তাহাই ভারতীয় সমাজের মধ্যে প্রচলিত করা হউক; আবার কেহ কেহ নির্দ্দেশ দিলেন, যা-কিছু পাশ্চাত্ত্য তাহাই ত্যাজ্য এবং যা-কিছু ভারতীয় তাহাই রক্ষণীয়। এইরূপ নানা লোকের নানা মতে ও বিভিন্ন বিধানে সমাজের ক্ষীণ প্রাণশক্তির উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ হইয়া গেল। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করিতে, কিন্তু একই কালে সমাজদেহের উপর সকলের চিকিৎসাবিধান চালু হওয়ায় সমাজের ব্যাধি দূর হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে অধিকতর জটিলতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিধানের ফলে সমাজস্তরে তিনটি বিভিন্ন দল, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ হইয়াছিল। একদল প্রাচীন নিথর সমাজকেই প্রাণবন্ত বলিয়া চালু করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা পুরাণবাদকে আঁকড়াইয়া রহিলেন, অদৃষ্টকে জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক বলিয়া রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ে আপনাদের পুরুষকারহীন অনুদ্যমকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পারলৌকিক সুখভোগকে তাঁহারা কবিত্বময় করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিলেন এবং ইহলৌকিক দুঃখদুর্দ্দশাগুলিকে পরীক্ষার মানদণ্ডহিসাবে গণ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা সামাজিক বিধিগুলির অপেক্ষা নিষেধগুলির উপর জোর দিতে চাহিলেন এবং যে-কেহ নিষেধাত্মক কর্ম্মগুলির সম্পাদনে দুঃসাহস দেখাইলেন, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া শাস্তিপ্রদান করিলেন। তৎকালীন প্রচলিত কৌলিন্য ও ছুঁৎমার্গকে তাঁহারা ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া তুলিলেন এবং দেশাচারে লোকাচারে (কুসংস্কার প্রচলিত থাকিলেও) রক্ষণশীল হওয়াকেই গৌরবের ও পৌরুষের বিষয় বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই দলের মধ্যে তৎকালে শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং আড়ম্বর ও গড্ডলিকাই সম্মানজনক স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদেরই দূরদৃষ্টির অভাবে

দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল এবং সেই ভাঙ্গনে অপর দুটি দল নিজেদের পুষ্ট করিয়া লইতেছিল।

অপর দুটি দলের মধ্যে একটি ছিল পাশ্চাত্ত্য-আদর্শমুগ্ধ শিক্ষিতসমাজ। এই দলের অধিকাংশ ব্যক্তিই হিন্দুয়ানীতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণায় ভারতীয় যা-কিছু তাহাই নিকৃষ্ট, আর পাশ্চাত্ত্য যা-কিছু তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে গ্রহণ করিয়া পার্থিব ভোগবাদকে জীবনের কাম্য জ্ঞান করিতেন। ভোগপরিপন্থী ত্যাগ ও সন্ন্যাসবাদকে অশ্রদ্ধেয় গণ্য করিয়া আচারহীন উচ্ছৃঙ্খল তৃপ্তিকে তাঁহারা পরমারাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐহিক সার্থকতাই তাঁহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। তৃতীয় দলটি পাশ্চাত্ত্য-আদর্শমুগ্ধ হইলেও সনাতন হিন্দুভাবধারাতে আস্থাহীন হন নাই, যদিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার এবং এই অপরাধে তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজ যাঁহাদের বর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অন্তরে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রতি সাধারণকে সচেতন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই প্রচারের ফলে সমাজের মধ্যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় দলের প্রচারে সমাজে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা আসিয়াছিল, কিন্তু এই তৃতীয় দলের প্রচারে সমাজের মধ্যে বিপ্লব মাথা তুলিতেছিল।

এ-হেন সঙ্কটকালে সকলেই একজন সুচতুর কাণ্ডারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। যিনি তৎকালীন জীর্ণ সমাজনৌকাকে বাক্‌বিতণ্ডার

ঝড় হইতে বাঁচাইয়া, সঙ্কীর্ণতা-মলিন অভিমান-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইতে রক্ষা করিয়া, মোহসমুদ্রের অগাধ গভীরতা হইতে উদ্ধার করিয়া, ভারতীয় আদর্শধারার ও জীবনবিধানের সনাতন আলোকস্তম্ভকে দেখাইয়া দিতে পারেন; যিনি ভগ্নতরীকে সংস্কারমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মসাগরগামী করিয়া তুলিতে পারিবেন; যাঁহার স্পর্শে মুমূর্ষু সমাজ নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধীরেসুস্থে সরল ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারিবে, সে-হেন কাণ্ডারী কে? তৎকালীন অনেকেই জানিতে বা অনুমান করিতে পারেন নাই যে, তিনি আসিয়াছেন।

যেদিন তিনি প্রচারিত হইলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দিব্য প্রতিভায়, সেদিন হইতে তাঁহারই হাতে সমাজের নেতৃত্বভার আসিয়া পড়িল। এতদিন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ সুচিকিৎসকের সন্ধান না পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়াছিল, এখন সেই সিদ্ধ ধন্বন্তরীর আবিষ্কারে সমাজপ্রাণ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারই বিধান নতমস্তকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। তিনি যে একজন শক্তিমান, মোহমুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ নেতা—তাঁহার নেতৃত্বকে অস্বীকার করিবার মত শক্তি তৎকালীন কাহারও ছিল না। তাঁহার দিব্য শান্ত উদার বাণী, তাঁহার সত্য সরল প্রিয় ভাষণ, তাঁহার অমায়িক অনিন্দ্য ব্যবহার, তাঁহার সরস মধুর অহেতুকী প্রীতি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই সহজে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারই আশেপাশে একে একে আসিলেন তৎকালীন চিন্তাশীল মনীষিগণ—তিনি তাঁহাদিগকে বাহন করিয়া সমাজের মোড় ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সেই পরিবর্ত্তনধারায় বিপ্লব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না; এমন কি, যাঁহারা সমাজের মধ্যে অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহাদের মনে অনুশোচনার আবির্ভাবে উক্ত গর্ব্ববোধের তৃপ্তি অন্তর্হিত হইতেছিল।

ইহা যে কেমনভাবে সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কিন্তু তাঁহারই আবির্ভাবের পরে আমরা সমাজের মধ্যে খানিকটা শান্তির আবহাওয়া পাইয়াছিলাম এবং এখনো পাইতেছি।

সেই যুগতরঙ্গের শীর্ষদেশে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধকসিদ্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁহারই দেহবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের সনাতনী প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহারই বাণী নানা মনীষীকে আশ্রয় করিয়া নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিজ্ঞানবাদ, স্বভাববাদ, অনীশ্বরবাদ প্রভৃতি মানবমন-প্রসূত জ্ঞানবাদ-গুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহারই প্রজ্ঞাশক্তির শাশ্বত জ্যোতিতে ধর্ম্মের চিরন্তন সত্যের সুন্দর ও শিব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বোপলব্ধির মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—"যত মত, তত পথ—ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ—সব পথেই তাঁকে পাওয়া যায়—আন্তরিক হোলে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাঁকে পাওয়া যায়।··· তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। আবার এ ছাড়া কত কি তা' কে জানে? ভক্তের জন্য তিনি সাকার আর জ্ঞানীর পক্ষে নিরাকার।··· তিনি আর জীব তত্ত্বতঃ এক বটে—একই আত্মা পূর্ণ ও অংশ, যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ।···যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।···জীবে ও শিবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ।" তাঁহার সাধনায় সাংখ্য ও যোগের, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের, ভক্তি ও শক্তি-বাদের বিরোধের সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তিনি নিজে ভাগবতজীবন যাপন করিয়া তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র আমিত্বের অহঙ্কারকে স্বীকার করিয়া জীবনপথে চলার চেয়েও ভগবানের যন্ত্র হইয়া নিরহঙ্কার ও নিরভিমানের

মন্ত্র লইয়া জীবনযাপনে সুখ শান্তি এবং তৃপ্তি অধিক। তাঁহারই সাধনাদ্বারা তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মানবকুলকে দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাত্মশক্তিসমূহ মানবদেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া সাধককে যুগপৎ ত্যাগে, প্রেমে, বৈরাগ্যে, ঐশ্বর্য্যে, কর্ম্মে, জ্ঞানে ভরপূর করিয়া রাখিতে পারে। তিনি আরও দেখাইয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম-নেতার মধ্যে মাৎসর্য্যের স্থান নাই, সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই, কুসংস্কারের স্থান নাই, ন্যাকামির ও ভণ্ডামির স্থান নাই। ধর্ম্ম-নেতার জীবন সমন্বয়ের জীবন, সামঞ্জস্যের জীবন, নিত্যসংযুক্তের জীবন। সেখানে প্রেম, পবিত্রতা, সত্য ও সরলতাই সাধ্য এবং তাহাই সাধন। তাঁহারই শিক্ষায় সাধারণে বুঝিতে পারিয়াছিল—ত্যাগে ও ভোগে, গৃহস্থে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কোথায়। তিনি ভোগকেও নিন্দা করেন নাই, গৃহস্থকেও ঘৃণা করেন নাই, গৃহস্থ-আশ্রমকে তিনি ভগবৎ-সেবার আশ্রম বলিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস-আশ্রমকে অনাসক্ত সেবাশ্রমরূপে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারই আবির্ভাবে তৎকালে আসল ও মেকীর পার্থক্য সকলের নিকট ধরা পড়িয়াছিল। অথচ তিনি কখনো কাহারও দোষ দেখাইতেন না বা নিন্দা করিতেন না।

এই যুগনেতার আবির্ভাবে ভারতের চিরন্তনী অনুসন্ধিৎসা পুনরায় ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। যে-সব পরধর্ম্মানুকরণ-প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় সুসংযত করিয়া যথাযথ পথে চালিত করিবার অনুপ্রেরণা তিনি আমাদেরই মধ্যে জাগরিত করিয়াছিলেন; ফলে তৎকালীন যে-সব ভিন্নমুখী শিক্ষা ও সংস্কার আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলিকে অভিভূত করিয়াছিল—যাহার আবর্ত্তে পড়িয়া তাহারা সংসার-মুখী চিন্তাধারায় নিজেদের রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং স্বতঃ-স্ফুরিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে ঘুমন্ত রাখিতে

পারিয়াছিল—সে-সব শিক্ষা ও সংস্কারকে তিনি পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় ভগবৎমুখী করিয়া তুলিলেন।

তাঁহারই প্রজ্ঞাশক্তির স্পর্শে তৎকালে নানা চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল—"সত্যই কি স্বভাবে সকলই হয়, যায়, রয়? এই প্রকার সিদ্ধান্তই কি নির্ভুল? ··· স্বভাবের পিছনে কি কোন শক্তি নাই, কোন শক্তিমান পুরুষ নাই?" বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির অবচেতন ভূমিতে এইরূপ সংশয়ই উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সকলেরই লেখনীতে ও বক্তৃতায় এইরূপ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, অধ্যাপক মজুমদার, আচার্য্য শিবনাথ ও সাধক বিজয়কৃষ্ণের প্রাণেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। সকলেরই জিজ্ঞাস্য ছিল—(শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের ভাষায় বর্ণিত হইতেছে) "তবে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুধু কথার বুনুনীর মধ্যে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হইবে? এর কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই?"

চিন্তাশীল অন্তরের এই স্ফুটমান সংশয়কে সঞ্জীবিত রাখিয়া তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের নিকট জানাইলেন—"মা, ইখানকার লোকেদের পাঠিয়ে দে।" তাঁহারই আহ্বানে একে একে তাঁহারা তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলেরই প্রশ্নের ধারা একরূপ—"ভগবানকে দেখা যায় কি? পাওয়া যায় কি? ঈশ্বর আছেন কি? তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনি শিব না বিষ্ণু, দুর্গা না কালী, না জগদ্ধাত্রী? তিনি মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী? তিনি বাবা না মা?"

বিজ্ঞানবিদ্ স্বভাববাদী ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার মর্ম্মান্তিক সংশয় নিবেদন করেন। সত্যদ্রষ্টার স্মিতহাস্যে নিমেষে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের সংশয়ের সমাধান হইয়া যায়। রাম বাবুর জীবনীপুস্তকে আমরা যে-কথা দেখিতে পাই, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখামাত্রই তিনি আস্তিক্যবোধে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্যদ্রষ্টার স্বভাবই এই—শাস্ত্রে বলে, যিনি সত্যবস্তুকে প্রাপ্ত হন, তিনি সকলের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া তুলেন।

প্রথম দর্শনেই স্বভাববাদী ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের মরুহৃদয়ে আস্তিক্যের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ধীরে ধীরে তাঁহাকে রস-মাধুর্য্যের পথে টানিয়া আনিতে লাগিল। এ পরিবর্ত্তন যে-সে পরিবর্ত্তন নয়; এ যেন হৃদয়ের আমূল সংস্করণ—যেখানে চিত্ত ও মন আপন ঊষরতা ও অনুর্ব্বরতাকে কাটাইয়া ফুলে ফলে নিজেকে পরিশোভিত করিয়া তুলিতে যত্নবান হয়। মাধুর্য্যের স্ফুরণ এমনি অনিবার্য্য! শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত কয়েক মুহূর্ত্তের সঙ্গ রাম দত্তের হৃদয়কে এমনি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, যদিও তিনি গুরু-করণের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন তথাপি তাঁহাকেই গুরুরূপে পাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল। এইজন্য বার বার তিনি তাঁহাকে অনুরোধ জানান। অবশেষে একদিন অলক্ষ্যে শ্রীরামচন্দ্র দত্তের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়।

দীক্ষিত রামচন্দ্রের উৎকট তপস্যার ছোঁয়াচ ক্রমে ক্রমে পরিবারবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের সংসারভুক্ত বালক-ভৃত্যটিও সেই সংক্রামক উদ্দীপনার হাত এড়াইতে পারিল না। শিক্ষা ও সংস্কারহীন বালক ব্রহ্মবস্তুর বিরাটত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া আপনার প্রিয় রামজীকেই তদ্বৎ কল্পনা করিয়া অহর্নিশি তাঁহারই নামে আপন উদ্দীপনা ব্যক্ত করিতে লাগিল।

মনিব রামচন্দ্র দত্তের গৃহমন্দিরে এক সন্ধিক্ষণে বালক শুনিয়াছিল—"ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না।··· যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর প্রকাশ হন।··· সরল ও অকপট হোয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, আন্তরিক ব্যাকুল হোয়ে তাঁকে ডাকতে না পারলে তিনি দেখা দেন না।··· নির্জনে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়, তবে ত তাঁর দয়া হয়।" নিরক্ষর কিশোরমনের উপর ঠাকুরের এই কথাগুলি এমনি দাগ ফেলিয়াছিল যে, পরবর্ত্তীকালে তিনি মনিব রামচন্দ্রের মুখ হইতে যে-ভাবে শুনিয়াছিলেন ঠিক সেই ভঙ্গীতে, সেইরূপ যতি ও ছন্দ বজায় রাখিয়া বলিয়া যাইতে পারিতেন। আমরা যে এ কথা কতবার তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু প্রতিবারই আমাদের মনে হইয়াছে এই কথাগুলি বুঝি এইমাত্র আমরা শুনিলাম—এমনই আন্তরিকতার সহিত তাঁহার বর্ণনাধারা প্রকাশ পাইত!

কিশোরবয়স্ক লালটুর সাধনার বীজ এই কথা কয়টিতে অন্তর্নিহিত ছিল। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না—পরে অবধূত নিত্যগোপালের মুখ হইতে এই সংবাদ জানিতে পারি।

যে-সময় লালটু রাম বাবুর গৃহে গৃহভৃত্য থাকিয়াও সাধনরত, সে-সময় অবধূত নিত্যগোপাল রাম বাবুর গৃহেই বসবাস করিতেন। অবধূত সদাসর্ব্বদা ধ্যানে বিভোর থাকিতেন এবং কখনো কখনো রাম বাবুর সান্ধ্য মজলিসে পরতত্ত্বের আলাপ-আলোচনাদি করিতেন। কদাচিৎ কীর্ত্তনভজনাদিতে যোগ দিতেন। তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত এই সংবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ

করি। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র দত্তের জীবিতা মধ্যমা কন্যার নিকট আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করি। তাহার নিকট যেটুকু শুনিয়াছি তাহাই তাহার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি—"লালটুকে আমরা আমাদের বৈঠকখানায় দুপুর বেলায় গায়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখতাম। মাঝে মাঝে তার চোখদুটো ভিজে উঠতো আর অমনি সে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখ মুছে ফেলতো। আমরা ভাবতুম যে, বোধ হয় তার খুড়োর জন্য মন কেমন করছে—তাই মা মাঝে মাঝে তাকে কত বুঝাতেন। সে চুপটি মেরে থাকতো—কোন কথা বল্‌তো না।" এই চোখের জল যে কাহার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইত কে জানে?

দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের প্রথম দর্শন

লালটুর সহিত পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ, বালকের ক্রন্দন ও শ্রীরামচন্দ্র দত্তের প্রার্থনা, দক্ষিণেশ্বরগমনে লালটুর আনন্দ, গৃহকর্ম্মের প্রতি তাহার মনোভাব, ঠাকুরের অদর্শনে লালটুর মানসিক অবস্থা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাম বাবুর গৃহে লালটুর মানস-সাধনা শুরু হইয়াছিল। মানস-সাধনার অদ্ভুত শক্তি; উহার দ্বারা সাধক নিজের মধ্যে আস্পৃহার তীব্রবেগ উৎপাদন করিতে পারে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাবব্যঞ্জক গল্পগুলি শুনিয়া তাঁহার উপর লালটুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগিতে থাকে এবং তাঁহাকে দেখার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। উৎকণ্ঠা নানা প্রশ্নের জন্মদাতা; সেই প্রশ্নগুলি তাহাকে মানসিক চঞ্চল করিয়া তুলিল।—"তাইতো এ পরমহংস কে? এত মিঠে যাঁর কথা, সেই সাধুটি থাকেন কুথায়? দক্ষিণেশ্বর, সে কতদূর? মনিবকে ধরিলে তিনি কি হামাকে সেখানে একদিন লিয়ে যাবেন না?" এইরূপ বহু প্রশ্নের দ্বারা উৎকণ্ঠিত হইয়া লালটু সাহসভরে এক রবিবারে মনিব রামবাবুকে বলিয়া বসিল—"আপুনি আজ উথানকে যাবেন; হামায় লিয়ে চলুন। হামি আপুনাদের পরমহংসকে দেখবে। তাঁকে দেখাবেন?" লালটুর এই স্নেহের আবদার মনিব রামচন্দ্রের নিকট অন্যায় মনে হয় নাই এবং সেই রবিবারেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখি যে, লালটুর সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে ঢাকার সুবোধ বাবু লিখিয়াছেন—১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে লালটুর সহিত ঠাকুরের

প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। অথচ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। আমরা শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের মধ্যমা কন্যার নিকট হইতে যে-সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, রামবাবু যে-বৎসর পরমহংসদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই বৎসরই লালটুর সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফরাসী মনীষী রোঁমা রোঁলা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভক্তমণ্ডলীর সহায়তায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে জীবনীখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দীক্ষিত চারি জন মাত্র ভক্তের মধ্যে রাম বাবু ও লালটু উভয়েরই নাম দিয়াছেন। মায়াবতী হইতে যে গ্রন্থখানি বাহির হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঠাকুরের সহিত লালটুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এতগুলি বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে যদিও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উভয়ের দেখাসাক্ষাতের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি এ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে সুবোধ বাবুকেই সমর্থন করিয়াছেন এবং শ্রীদুর্গাপদ মিত্র মহাশয়ও (যিনি 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখিতেছেন) শেষোক্তমতাবলম্বী হইয়াছেন।

সন-খ্রীষ্টাব্দ লইয়া বিশেষ ঐতিহাসিক গবেষণা বন্ধ করিয়া আমরা আমাদের বিশ্বাসমত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দকেই প্রথম সাক্ষাতের কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং তদনুযায়ী যে-সব প্রমাণ পাইয়াছি তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং অপরগুলি যথাসময়ে যথাস্থানে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সন-খ্রীষ্টাব্দের পর আমরা আর একটি সন্দেহের নিরসন করিতে

চাহি। কেহ কেহ—তন্মধ্যে সুবোধ বাবু, বৈকুণ্ঠ বাবু ও দুর্গাপদ বাবু প্রধান—বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে লাটুর সঙ্গে অন্য কেহ ছিল না। প্রথম সাক্ষাৎকালের বিবরণ আমরা দুই ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, প্রথমে তাহাই আপনাদের নিকট পরিবেশন করিতেছি :

"একদিন দেখি রাম বাবু সঙ্গে করে এক ছোঁড়া-চাকর এনেছেন। ছোঁড়াটা দেখতে গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান বলেই মনে হোল। তখন আমি তার নাম জানতেম না। এই যে পশ্চিমের বারাণ্ডা দেখছো, এইখানে ছোঁড়া-চাকরটা দাঁড়িয়েছিলো, তখন ঘরের ভিতর রাম বাবু ঠাকুরের অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন বাহিরে ছিলেন। রাধিকার কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইলেন—'তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে', তাহাতে আখর দিতেছিলেন, 'কথা কইতে পেলুম না', 'আমার বধূর সনে কথা হোলো না', 'দাদা বলাই ছিল সাথে, তাঁই কথা হোলো না' ইত্যাদি। বারাণ্ডায় ঠাকুরের সঙ্গে লাটুর দেখা হয়, সেই সময়ে রাম বাবুও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠাকুর রাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছো? রাম! একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।' এই কথা বলিতে বলিতে রাম বাবু ও পরমহংসদেব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। লাটু তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রইল; আমি বললুম—যাও না ভেতরে। আমার কথা শুনে বালক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে কি-না ভাবতে লাগলো। ঠাকুর তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন। আমি আর ঘরের মধ্যে যাই নি।"

ঘরের মধ্যে কি কথা হইয়াছিল তাহা জানিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল স্বয়ং রাম বাবুর নিকট হইতে। ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে *বলিতে বলিতে তিনি লালটুর প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই আপনাদের জানাইতেছি :*

"আমাকে এক বেশভূষাহীন সাধুর পায়ে প্রণাম করতে দেখে লেটোটা কি ভাব্‌লে জানি না। আমার পরই দেখি সে ঠাকুরের পায়ে ধরে প্রণাম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঠাকুর আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা আরম্ভ করে দিলেন, ততক্ষণ দেখি লেটোটা চুপ কোরে হাতজোড় কোরে ওনার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাগুলো শুনছে। আর ঠাকুর মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন আর বলছেন—'বোস্‌নারে বোস্‌'। এমন সময় আমাদের কথার মধ্যে এসে গেলো—সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধের কথা। ঠাকুর বললেন—'যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হোয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোঁয়ারা। মিস্ত্রী এখান-সেখান ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোঁয়ারার মুখ থেকে ফর্‌ ফর্‌ কোরে জল বেরুতে থাকে।' এই কথা কয়টি বলিয়া ঠাকুর সহসা লালটুকে ছুঁয়ে দিলেন। ঠাকুরের স্পর্শে লেটোর ভাব যেন উথলে উঠলো। তার হুঁশটুশ সব চলে গেল—মনে হোলো সে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে বাস করছে। সহসা তার লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো, কণ্ঠস্বর গদগদ হোয়ে পড়লো, দরদরধারে অশ্রু পড়তে লাগলো আর ঠোঁট দুটো কি জোরে জোরে কাঁপতে লাগলো! ঠাকুরের স্পর্শে লেটোর এমন ভাববিহ্বল অবস্থা দেখে আমার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকলো। লেটোকে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে দেখলাম। এক ঘণ্টার বেশী হোয়ে

গেলো, তবু কান্না থামল না। শেষে বাধ্য হয়ে ঠাকুরকে অনুরোধ কোরে বসলুম—'তাতো বুঝলুম। এখন এই ছেলেটা কি সারাক্ষণ কাঁদতে থাকবে?' আমার কথায় ঠাকুর পুনরায় লালটুকে ছুঁয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে লালটুর ফোঁপানি কমে গেল। তবু তোমরা ঠাকুরের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবে না! ঠাকুর যে অবতার একথা তবু তোমরা মানতে চাইবে না!"

এইখানেই রাম বাবুর প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আমরা তৎপরবর্ত্তী ঘটনাগুলিকে বিবৃত করিতেছি। বালকের উদ্‌গত উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে ঠাকুর রামলালকে কিছু প্রসাদ আনিতে বলিলেন। প্রসাদ পাইয়া লাল্টু প্রকৃতিস্থ হইলে ঠাকুর তাহাকে মন্দিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর প্রথম দর্শনেই ছাপরা জেলার এই নিরক্ষর হিন্দুস্থানী ভৃত্যটিকে শুদ্ধ ও পবিত্র দেখিয়াছিলেন এবং সাধনশক্তির প্রয়োগে যে একদিন এই বালক অধ্যাত্মজগতের সন্ধান পাইবে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সেদিন যখন বালককে লইয়া রাম বাবু কলিকাতায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সস্নেহে ভক্ত রাম দত্তকে বলিয়াছিলেন—"ওরে! ইখানে ওকে মাঝে মাঝে পাঠাবি।" আর লালটুকে বলিয়াছিলেন—"ওরে! আসিস্, এখানে মাঝে মাঝে আসবি। জানিস।"

দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া লাল্টু যেন কেমন আনমনা হইয়া রহিল। কোন কিছুরই প্রতি তাহার বিশেষ আকর্ষণ রহিল না, কোন কিছুতেই তাহার তৃপ্তি আসিল না অথচ সবকিছু ছাড়িয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইতেও পারিল না। এই যে সব কিছুতেই অতৃপ্তির বেদনা—এ যে কত বড় অস্বস্তিকর, কত বড় নিরানন্দ অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন

বুঝিতে পারিবে না। সেই সময়কার লালটুকে যে দেখিয়াছিল তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"লালটু যেন দম দেওয়া কল—প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র। পাথরের নুড়ির উপর দিয়া যেমন স্রোত চলে যায়, তেমনি করে যেন দৈনন্দিন কার্য্যের স্রোত তাহার জড় দেহ ও মনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। স্রোতমুখে নুড়িগুলি যেমন স্থানভ্রষ্ট হয়, লালটুর দেহ ও মন তেমনি ভাবে এধার ওধার চলাফেরা করিত বটে কিন্তু তাহাতে চিত্তের সারা জাগিত না।" দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পূর্ব্বে যে-বালক রামচন্দ্রের গৃহকে সদা শব্দমণ্ডিত করিয়া রাখিত, সহসা সেই বালকের মধ্য হইতে কলরব অন্তর্হিত হওয়ায় গৃহগুলি নিঃশব্দের সুষুপ্তিতে ভরিয়া থাকিত। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে যে-বালক অদম্য উৎসাহে গৃহকর্ম্মগুলি সারিয়া প্রাণভরিয়া স্বদেশবাসীদের সহিত গল্পগুজব করিত—সেই বালককে সহসা যেন নিরুৎসাহের আক্রমণে জর্জ্জরিত বোধ হইয়াছিল। গৃহস্থের সকলেই লালটুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল। না জানি, আরো কতদিন কাটিত! সহসা দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা শুনিয়া লালটুর আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। সেই লালটুর মুখে কথা ফুটিয়াছিল—"হামাকে দিবেন, হামি আপুনার সব উথান্‌কে লিয়ে যাবে। হাম্‌নে সব ঠিক পছন্‌ লিবে।" এইদিন লালটু একা দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিল। সেই সময়টি ছিল বসন্তকাল, ফেব্রুয়ারী মাস ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। একাকী দীর্ঘ ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। পথে নানা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বেলা প্রায় এগারটার সময় বালক মনিবপ্রদত্ত ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল। দূর হইতে মন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখিয়া এবং সুমধুর রোশনচৌকির আলাপ

শুনিয়া বালক অতিশয় পুলকিত হইয়াছিল। নানা পুষ্পলতা-শোভিত অপূর্ব্ব উদ্যানপথে যাইতে যাইতে বালক মুগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা সেই উদ্যানপথে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালক আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম জানাইল। দীর্ঘ প্রণাম শেষ হইলে নানাবিধ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে মন্দিরের দিকে যাইলেন।

মন্দিরে মায়ের আরতি দেখিয়া বালকের চোখে জল আসিয়াছিল। বিষ্ণু-মন্দিরের আরতি দেখিয়া তাহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে সেইখানেই "জয় রাম জয় রাম" ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।*

আরতি শেষ হইবার পর ঠাকুর লালটুকে সেইখানেই প্রসাদ পাইতে বলিলেন। বিহারদেশীয় আচারনিষ্ঠার প্রবল সংস্কারবশতঃ কালীবাড়ীর আমিষ প্রসাদ গ্রহণে তাহার কুণ্ঠা জাগিয়াছিল। সেই কথা বুঝিয়া অন্তর্য্যামী ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"ওরে! এখানে মা কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ হয়—সব গঙ্গাজলে রান্না, তোকে কার প্রসাদ নিতে বলবো, প্রসাদে কোন দোষ নেই, জানবি।" নিরক্ষর লালটু অতশত বুঝিল না, বলিয়া ফেলিল—"আপুনি যা পাবেন, হামনে তাই খাওয়া করবে। হামনি ত আপুনার প্রসাদ পাবে—বাকী আর কুছু পাবে না।"*

সরলচিত্ত বালককে তাঁহার প্রসাদপ্রার্থী দেখিয়া ঠাকুর রামলাল দাদাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাবো, শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।"*

দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর লালটুকে কাছে বসাইয়া পরমহংসদেব আপনার

---

* এই কথাগুলি রামলাল দাদার মুখে শুনিয়াছি।

অন্ন হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিলেন। বালক আনন্দের সহিত তাহা ভোজন করিয়া একাধারে তৃপ্ত ও ধন্য হইল।

ক্রমে ক্রমে তথায় একে একে ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের নানাবিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—*"কলকাতায় যাবিনিরে ; সারা বেলা যে কাটিয়ে দিলি এখানে ?" পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—"পয়সা আছে তো রে, যাবি কিসে ?" কোন কথা না বলিয়া বালক আপনার পকেট নাড়া দিয়া পকেটস্থ পয়সাগুলিকে বাজাইয়া দিল। ঠাকুর হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

দ্বিতীয়বার দর্শনের পর মনিবগৃহে কাজ করা লালটুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরিবারস্থ কেহ কোন কাজ করিতে বলিলে লালটু এমন একটি ভঙ্গী দেখাইত যাহাতে বোঝা যাইত যে, সেই কর্ম্মগুলি সে করিতে চাহে না, তাহাতে তাহার অনিচ্ছা আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থের সব কাজগুলি সে করিয়া দিত। মনিব রামচন্দ্র বালকের এইরূপ মতিগতি লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। গৃহকর্ত্রী লালটুর এইরূপ উদ্যমহীন অভৃত্যোচিত ব্যবহার দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

ভক্ত রামচন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া একদিন লালটুর তৎকালীন কর্ম্মবিমুখতার কথা জানাইলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন—"ওগো রাম ! এমনটি হয়ে থাকে। ইখানকে আসবার জন্যে ওর মন কেমন করে ! একদিন তাকে পাঠিয়ে দিস।"

পরমহংসদেবের কথামত তার পরদিনই রাম বাবু লালটুকে দক্ষিণেশ্বরে

* এই কথাগুলি রামলাল দাদার মুখে শুনিয়াছি।

পাঠাইয়া দেন। ঠাকুরের নিকট হইতে বালক যাহা পাইল তাহা আমরা কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি। কবিরাজ মহাশয় সেইদিনই দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ঠাকুরকে কামারপুকুরে যাইতে বলিয়াছিলেন।

"দেখিস্ বাপু! এখানে আসবার জন্য যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিস্নি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তোকে খেতে দেয়, পরতে দেয়, তোর সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, তুই যদি তার কাজ না করবি তা'হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, অকৃতজ্ঞ হবিনি।"

রামকৃষ্ণের এইরূপ দ্ব্যর্থ-বোধক উপদেশ শুনিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। গদগদভাষায় ঠাকুরের নিকট আর্ত্তি জানাইয়া বলিল—"হাম্‌নে আপুনার ইথান্‌কে থাকবে। আর নকরি করবে না। আপুনার কাজ হাম্‌নি কোরবে।"

বালকের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"তুই এখানে থাকবি, আর রামের সংসার দেখবে কে? রামের সংসার যে আমার সংসার। সেই সংসারেই তুই থাক না।"

তত্রাচ বালক বুঝিতে পারিল না, এমন কি বুঝিতে চাহিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাঁদকাঁদ হইয়া বলিয়া ফেলিল—"হামি আর যাবে না উথানে। হামি ইথানে থাকবে।"

ঠাকুরও হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আমিও ইথানকে থাকছি নারে।" কবিরাজ মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এনারাই ত আমাকে দেশে যেতে বলছেন।"

এ কথার পরে লালটুর আর কি বলিবার থাকিতে পারে? লালটু চুপ করিয়া রহিল। ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"দেশ থেকে ফিরে আসি তখন এখানে আস্‌বি, কি বলিস?"

যতখানি আশা লইয়া লালটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিল, ততখানি নিরাশ হইয়া সিমলায় মনিবগৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এইবার একটি অমূল্য উপদেশ শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঠাকুর কোন ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন—"…সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়।"

এই উপদেশে লালটু খানিকটা শান্তি পাইয়াছিল, একথা আমরা বহুদিন পরে তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখো…। ওনার কত কৃপা। উনি দেশে যাবার আগে হামাকে কেমন সুন্দোর গল্পটি শুনিয়ে গেলেন। হামাকে শুনিয়ে দিলেন—মনিবের সংসারে কেমন কোরে থাকতে হয়। বাকী হামার মনের দুঃখু যাবে কেনে?"

এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া স্বগ্রামে যাইলেন। ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের সংসারে থাকিয়া লালটু নিজের দুঃখ নিজেই ভোগ করিতে লাগিল। সেই সময়ে অনুক্ষণ তাহার চেষ্টা ছিল যাহাতে ঠাকুরের নির্দ্দেশকে মানিয়া সে চলিতে পারে। অথচ পরমহংসদেব তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপদেশ দিয়া যান নাই। পরমহংসদেবের উপদেশগুলিকে তিনি যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রদ্ধাবান হইয়া তিনি নিজে নিজেই চলিয়াছিলেন।

আর চলিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উপদেশগুলিকে প্রাণবন্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণের মত তিনি উপদেশ ও গল্পগুলির গূঢ় অর্থ

জানিবার দিকে অগ্রসর হইতেন না; কিন্তু উপদেশগুলিকে পালন করিতেন, সেগুলিকে কাজে নামাইতেন এবং তার প্রত্যক্ষ-ফল উপভোগ করিয়া অন্তর্নিহিত গূঢ় মর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। আধুনিক মনোবৃত্তির যে কার্য্যধারা অর্থাৎ আগে বুদ্ধির দ্বারা সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা এবং তৎপরে তাহাতে ব্রতী হওয়া, বালকের মধ্যে সেরূপ কোন প্রচেষ্টা ছিল না; বাল্যকাল হইতেই তিনি কাজে নামিয়া দেখিতে চাহিতেন—কাজটা তাঁহার হৃদয়কে কতদূর বিস্তৃত করিয়া তুলিতেছে, কতদূর ব্যাপক করিয়া ধরিতেছে। এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসবান ছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই ধরনের কতকগুলি কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—"তোমরা কুছু কোর্‌বে না, শুধু সাধুকে ঝুট্‌মুট্‌ দিক্ কর্‌তে আসবে। আরে! সাধু কি তোমাদের সংস্কার ধুয়ে দিতে পারে? সংস্কার যে তোমার। বাকী তোমরা চাইবে সাধুর কথায় তোমাদের সংস্কার কেটে যাক্। তোমাদের ভিতরে কি ভাব আছে? শ্রদ্ধার সঙ্গে না বুঝলে বোঝা পাকা হয় না। সাধন-ভজন না থাকলে সংস্কার দূর হয় না।"

ঠাকুর যখন স্বগ্রামে, মনিবগৃহে লালটুর দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা লাটু মহারাজের নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি—"জানো··· তাঁর জন্যে হামার ভারী মন কেমন কোরতো। বড় অস্থির হোয়ে পড়্‌তুম্। রাম বাবুর উথানে থাকতে পারতুম না—লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম—বাকী সেখানেও আনন্দ মিলতো না—তাঁর ঘরে যেতে পারতুম না—সব ফাঁকা লাগ্‌তো; বাগিচাটা ঘুরে বেড়াতুম—গঙ্গাতীরে বসে বসে কান্না পেতো; হামার দুঃখু তোমরা কি বুঝবে? হামি সাঁচ বলছি হামার কথা

তোমরা বুঝ্‌বে না; কুছু রাম বাবু বুঝতেন। তাই তিনি হামাকে কত বুঝাতেন। হামাকে একখানা তাঁর ছবি দিয়েছিলেন।"

অবধূত নিত্যগোপালের মুখে শুনিয়াছি—"লালটুর তখন চাতক-পাখীর অবস্থা।" এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে যতখানি বোঝান হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। আমরা আর ব্যাখ্যা করিয়া ঐ কথাটি বিস্তৃত করিতে চাহি না।

ব্যাকুলতা ও সেবাস্পৃহা

লালটুর ব্যাকুলতার আর একদিক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন, অবধূত নিত্যগোপালের সেবা, সেব্যসেবকভাবের উদ্দীপন, পরমহংসদেবের দক্ষিণেশ্বরে আগমন এবং ভক্তগোষ্ঠীর পুনর্মিলন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লালটু মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিত, এমন কি, যখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন না, দেশে গিয়াছিলেন, তখনো লালটু সেইখানে গিয়া পঞ্চবটী ও গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিত। একদিন সেইখানে রামলাল দাদা তাহাকে দেখিতে পান। রামলাল দাদা পূর্ব্ব হইতেই বালককে জানিতেন। গঙ্গাতীরে তাহাকে নির্বাক নিস্পন্দভাবে নির্জনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া রামলাল দাদার মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় লালটুকে রাম বাবু কোন কারণে বকিয়াছেন, তাই মনের দুঃখে বালক এইখানে আসিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। রামলাল দাদার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি :

"বালককে দেখি গঙ্গাতীরে বসে কাঁদ্‌ছে—কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলুম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন করছে। বালকের ধারণা—পরমহংস মশায়ের অদ্ভুত ক্ষমতা, তিনি ইচ্ছামাত্র সব কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হোয়ে বালক একান্তে তাঁকে ডাকৃছে, যাতে করে তিনি সশরীরে তার সাম্‌নে উপস্থিত হন। বালক নাকি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছে যে, ঠাকুর

দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন—দেশে গেলেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন এবং সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে বালক বসে আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আমি তাকে বাড়ী যেতে বলি। আমার কথা শুনে বালক কি বল্লে জান?—'হামি ঠিক শুনেছি তিনি ইখানকে আছেন—হামি তাঁর সাথে দেখা না কোরে যাবে না।' আমি যত বলি—'না রে না তিনি দেশে গেছেন।' বালক ততই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলে—'আপুনি জানেন না; পরমহংস মশায় ইখানকে আছেন।' বালকের এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। মন্দিরে সন্ধ্যারতি করবার জন্য ফিরে গেলুম। মন্দিরে এসে মনে পড়লো যে লালটুকে ত মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়নি। প্রসাদ নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখি যেন কাকে ও প্রণাম করছে। কিছু বুঝতে পারলুম না —চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মিনিট দুই তিন পরে বালক সামনে আমাকে দেখে যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে 'পরমহংস-মশায় কুথায় গেলেন?' আমি ত থ হয়ে গেলুম। কোন উত্তর দিতে পারলুম না। বালককে প্রসাদ দিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলুম।"

সাধারণ ব্যক্তি এই ঘটনাটিকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে জানি না। যাহারা অলৌকিকে বিশ্বাসী তাহাদের নিকট এই ঘটনাটি মাত্র বিস্ময়ের উৎপাদন করিবে মানি। কিন্তু যাহারা অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী তাহাদের নিকট ইহা যে মানসিক দৃষ্টিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নয়, বলাই বাহুল্য। আশ্চর্য্য এই যে, ঠাকুরের যতজন অন্তরঙ্গ ভক্ত বা সেবকের সম্বন্ধে আমরা জানি, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এইরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়াছি। এত লোকের

দৃষ্টিভ্রম বলিতে আমাদের দ্বিধা হয়—কারণ তাঁহাদের মিথ্যা বলিবার কোন কারণ বা স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক সভ্যতার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত আমরা! আমাদের কাছে যুক্তি ও বিজ্ঞান স্বীকৃত। যুক্তি ও বিজ্ঞানের অতীত কোন অলৌকিকে সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস নাই। কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তুকে কি জানা যায়? যুক্তি ও বিজ্ঞানের একটি সীমা আছে—সেই সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার শক্তি তাহার নাই। একমাত্র অনুভূতিই যুক্তি ও বিজ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে। তীব্র অনুভূতিবেগ-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তর্ক ও বিতর্ক সব ভাসিয়া যায়। যাঁহার যেরূপ অনুভূতি তিনি সেইরূপ যুক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যিনি বিশ্বাসী, তিনি বিশ্বাস-প্রতিপাদনাত্মক যুক্তিগুলি উপস্থিত করেন, আর যিনি অবিশ্বাসী তিনি বিশ্বাস-নিরোধাত্মক যুক্তিগুলির অবতারণা করেন। ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না।

আধুনিক যুগে অধিকাংশ বিচার-প্রণালীই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্বাসকে ঘিরিয়া চলিতে থাকে। যদি কেহ সেই তথ্য ও বিশ্বাস-গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া অপর কোন অনুভূতিমূলক ধারণাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে হয় পাগল, নয় গণ্ডমূর্খ সাজাইয়া আমরা সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে থাকি। এই প্রচারের ফলে মানবকুলের কি যে অপরিমিত ক্ষতি হইতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদকে বড় করিয়া আমরা বিজ্ঞানাতীত অনুভূতিবাদকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছি। যুক্তি মানুষকে যতটা কর্ম্মোন্মুখ করে,

হৃদয় তদপেক্ষা বেশী কর্ম্মোন্মাদনার মধ্যে মানুষকে টানিয়া তুলে। সেইজন্য যদিও যুক্তিবাদের দিক হইতে বালকের পরমহংসদেবের দর্শনপ্রাপ্তিকে অস্বীকার করিতে হয়, তথাপি অনুভূতিবাদের দিক হইতে ইহা যে তাহার নিকট অতি বড় সত্য এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কোন বস্তুর অপ্রাপ্তিতেই আমাদের ব্যাকুলতা জাগে—প্রাপ্তি-মাত্রেই ব্যাকুলতার অবসান হয়। প্রাপ্তির প্রলোভনই মানুষকে পাগল করিয়া থাকে। লালটুর সম্বন্ধে ঠিক এই কথাটাই খাটে। ঠাকুরের দর্শনপ্রাপ্তির পর লালটুর ব্যাকুলতা কমে নাই বরং বাড়িয়া গিয়াছিল।

তৎকালীন বালকের দৈনন্দিন জীবন কি ভাবে কাটিতেছিল সেই সম্বন্ধে আমরা নানা ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি। সকলেরই নিকট প্রায় একই কথা শুনিয়াছি। "তৎকালে তাহার আহারে-বিহারে, আমোদে-প্রমোদে রুচি ছিল না, মনিবের গৃহকর্ম্মে মনো-যোগ ছিল না, নিদ্রায় ও জাগরণে স্বস্তি ছিল না। মানুষের যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেইগুলিতে পর্য্যন্ত তাহার আবশ্যক বোধ ছিল না।"

বালকের এইরূপ পরিবর্ত্তন ভক্ত রাম বাবুকেও আঘাত দিতেছিল। তিনি লালটুকে ভালবাসিতেন। তাহার সরলতায়, অকপটতায়, তাহার সেবাপরায়ণতায় তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অধুনা তাহার উৎকণ্ঠাতেও তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারই গুরুর প্রতি বালকের অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখিয়া তিনি অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি গৃহস্থালীকর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিতে লালটুকে কিছু বলিতে পারিতেন না।

যিনি নিজে ভক্ত, তিনি ভক্ত-হৃদয়ের ব্যথা বুঝেন। রাম বাবু নিজে পরমহংসদেবের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাতে ভক্তিমান,

তাই তিনি ভক্তিমান লালটুর ব্যথা বুঝিয়াছিলেন। আর বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি লালটুর প্রতি রুষ্ট হইতে পারেন নাই; বরং যাহাতে তৎকালে বালকের ভগবদ্‌ব্যাকুল মনের উপর গৃহকর্ম্মের বোঝা চাপান না হয়, তাহাই চাহিয়াছিলেন। সেই সময় অন্য একটি গৃহভৃত্য নিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি লালটুকে একেবারে কর্ম্ম হইতে অবসর দিতে পারেন নাই।

কারণ, তাঁহারই গৃহে অবধূত নিত্যগোপাল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ভীষণ টাইফয়েড রোগ অবধূতের জীবন-মরণ লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। অবধূত ছিলেন একজন উন্নত সাধক। সাধন-অবস্থায় তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব হইত; ভাবাবেগে স্বেদ, অশ্রু, কম্প, গদগদ প্রভৃতি অবস্থাগুলি আসিয়া পড়িল। রোগজীর্ণ অবস্থায়ও এইরূপ ভাবের আবেগ মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল। তজ্জন্য গৃহস্থ সকলে ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। এহেন রোগীর সেবার জন্য রাম বাবু লালটুকে নিযুক্ত করেন এবং বলিয়া দেন যে, যখনই রোগীর সাত্ত্বিক বিকারাদির লক্ষণ উপস্থিত হইবে, তখনই তাঁহাকে 'নাম'-শ্রবণরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ দিতে হইবে। 'নামে'ই ভাবের স্থিতি, আর 'নামে'ই ভাবের মুক্তি। সেইজন্য 'নাম' শুনাইতে গিয়া লালটুকে বড় মুশকিলে পড়িতে হইয়াছিল। ভাববিভোর অবস্থায় নাম শুনাইতে শুনাইতে অবধূতের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত বটে, কিন্তু পুনশ্চ 'নাম' শুনিতে শুনিতে তাঁহার ভাববিহ্বল অবস্থা আসিয়া যাইত। এ হেন রোগীর পরিচর্য্যার ভার পাইয়া লালটুকে দিবারাত্র নাম জপিতে হইত। মুখে তাহার নাম লাগিয়া থাকিত।

জানি না, অবধূতের সেবা বালককে কতখানি শান্তি দিয়াছিল,

কিন্তু শাস্ত্রে পড়িয়াছি যে, অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনে মানসিক ব্যাকুলতার অবসান হয়। শাস্ত্রে আরো পড়িয়াছি যে, সাধুসঙ্গের মহিমা অপার। পরমহংসদেবও বলিতেন—"কষ্ট করেও সাধুসঙ্গ করবি। সংসার-নেশা কাটাবার ওরাই একমাত্র চালধোয়ানী জল। সংসারমত্ততা-রূপ রোগ সারাবার ওরাই উৎকৃষ্ট বৈদ্য। সাধুসঙ্গে থাকলে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়—তাঁর উপর ভালবাসা হয়; তাঁকে লাভ করবার সদ্‌বুদ্ধি জন্মায়।" যে সাধুসঙ্গের এরূপ মহিমা তাহা যে বালকের তৎকালীন ব্যাকুলতাকে শান্ত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

অবধূতের সেবাকে উপলক্ষ করিয়া লালটুর ব্যাকুলতা প্রশমিত হইয়াছিল—একথা আমরা মহাপুরুষ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শিবানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন—"লাটুভাই অনেকদিন অবধূতের সেবা করেছিল। তারই সেবায় তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পান। রোগ-মুক্ত হয়ে অবধূত লাটুভাইকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সাধুসেবার কত যে মহিমা তোমরা কি বুঝবে। তাঁদের সেবায় মনের মোড় ফিরে যায়। তাঁদের টানের কত জোর—নীচু মনকেও তাঁরা উঁচুতে তুলে ধরতে পারেন। দেখিস নি ঠাকুরের কৃপায় কত লোকের মন ফিরে গেলো।"

দীর্ঘ চার মাস কাল অবধূত অসুস্থ থাকেন এবং এই চার মাস ধরিয়াই লালটু দিবানিশি তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করেন। উত্তর-কালে অবধূতের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি—"লাটুর ঐকান্তিক সেবা ও পরিচর্য্যা ভুলিবার নয়। দিবারাত্র সে আমার কাছে কাছে থাকিত; আমার কখন কি দরকার তাহা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়া দিত। কখনো কোনো কাজে

তাকে বিমুখ দেখি নাই। সে দিনরাত আমাকে নাম শুনাইত, আমার সব কাজ করিত, আমায় স্নান করাইত, খাওয়াইত, ঔষধ দিত, এমন কি আমার বাহ্য-প্রস্রাব পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিত। তার মুখে 'রাম' নাম শুনিতে শুনিতে আমার রোগের যন্ত্রণা কমিয়া যাইত।"

পরবর্ত্তী কালেও আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার সেবা কিরূপ আন্তরিক ও ঐকান্তিক। যথাস্থানে সে কথা লিপিবদ্ধ করিব।

এখন অবধূতের সেবাকে উপলক্ষ করিয়া লালটুর মানসিক শান্তির মাঝে আরো একটি বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়াছিল—যে কথাটি না বলিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল সূত্রটি আমরা হারাইয়া ফেলিব।

অবধূত নিত্যগোপাল কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে রাম বাবু তাঁহাকে সন্ধ্যা-কালে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সেই সময় প্রত্যহ লালটু তথায় উপস্থিত থাকিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিতে সেব্য-সেবক সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা লইয়া মাঝে মাঝে রাম বাবু ও নিত্যগোপালের মধ্যে আলোচনা হইত। লালটু তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিত। মাঝে মাঝে রাম বাবু ঠাকুরের উক্তি ও গল্পগুলির দ্বারা কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে সমুদায় ব্যাখ্যাটি মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য হইয়া যাইত। রাম বাবুর নিকট হইতে সেব্য-সেবক ভাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদাহরণটি বালক শুনিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহাই আমাদের নিকট তিনি গল্প করিয়াছিলেন :

"জানো…। এক গ্রামে এক তাঁতি থাকতো। বড় ধাৰ্ম্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করত, আর ভালবাসতো। তাঁতি হাটবাজারে

কাপড় বিক্রী করতে যেতো। খদ্দের পেলেই বলতো—রামের ইচ্ছে সূতোর দাম এতো, রামের ইচ্ছে মজুরীর দাম এতো, রামের ইচ্ছে আমার মুনাফা চাই এতো। লোকেরা সব তার কথায় বিশ্বাস করে কাপড় নিয়ে যেতো। বাকী একদিন কি হোলো জানো? ঐ লোকটা দুপুররাতে দাওয়ায় বসে ভগবানের নাম লিচ্ছে, আর কতকগুলো ডাকু ঐখান দিয়ে তখন যাচ্ছে। তারা তাকে পাকৃড়ে নিয়ে গেলো। একজনের বাড়ীতে ডাকাতি কোরে তাঁতির মাথায় জিনিসগুলো সব উঠিয়ে দিলে। এমন সময় পুলুস এসে তাঁতিকে পাকৃড়ে ফেল্লে। ডাকুরা সব ভেগে পড়লো। পুলুসের হাতে তাঁতির খুব বেইজ্জুতী হোলো। বাকী তাঁতি তখনো 'রামের ইচ্ছে' এ কথা ছাড়লো না। হাকিম এসে তাঁতিকে ধমক দিলো। তাঁতি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—'হুজুর! রামের ইচ্ছে হামি ভগবানের নাম করছিলাম; রামের ইচ্ছে ডাকুরা হামায় পাকৃড়ে নিলে; রামের ইচ্ছে একজনের বাড়ীতে ডাকাতি করলে; রামের ইচ্ছে হামার মাথায় মোটমুটুরী সব তুলে দিলে; রামের ইচ্ছে হামায় পুলুস বেইজ্জুতী করলে; রামের ইচ্ছে হামায় হাজতে রাখলে; রামের ইচ্ছে হামায় এখন হুজুরের সামনে নিয়ে এলো; রামের ইচ্ছে হুজুর হামায় ধমক দিলেন।' হাকিম তাঁতিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন—তাঁতি ছাড়া পেয়ে বল্লে—'রামের ইচ্ছে, হুজুর হাঁমায় ছেড়ে দিলেন।'

সেব্য-সেবক-মনোভাবের কথাগুলি লাটু মহারাজ এমন বিচিত্র করিয়া উত্তরকালে বলিতেন যে, যে-কেহ শুনিত তাহারই মনে এই ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিত—"আরে! ভগবানের সেবা করবি, তাঁর খোসামদ করবি কেনো? ভগবান কি বড় লোকদের মতন খোসামদ

চায়? দেখেছো তো, বড় লোকদের কত মোসাহেব থাকে। কিছু পাবার জন্য তারা কত না মোসাহেবী করে। বাকী, যেই পেলে অমনি সেখান হোতে চলে গিয়ে অন্য বড়লোকের কাছে গেলো। তারই আবার মোসাহেবী লাগিয়ে দিলে। যার কাছে পয়সা পেয়েছে, তাকেই গালাগাল দিয়ে নোতুন বড়লোকের মন ভিজালে—সেও কিছু তাকে দিলে। আবার তাকে ছেড়ে অন্য লোকের কাছে গেলো। এইরকম কোরে ত তাঁর সেবা করা যায় না। তাঁর সেবায় লাগলে বিষয়, মান, অপমান, লজ্জা সব দূরে ফেলে দিতে হয়। কোন পিত্তেশ কোরে তাঁর সেবা করতে নেই। বাকী শুধু তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হোয়ে থাকতে হয়। আরে! তিনি ত তোমার উপকার করছেনই, তুমি ত তাঁকে ভুলে যাও—তাঁর সেবায় লাগো না—তাই ত তোমাদের এতো দুর্দ্দশা। যে উপকার পেয়ে উপকার মানে না, তার কি কখনো উন্নতি হয়? তাঁকে ভুলেই ত তোমাদের দুঃখু ঘুচে না।"

এইরূপ নানা ভাবের ছোট ছোট কথার মাঝে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি। আর সেই সেব্য-সেবকের ধারণা তিনি অবধূত নিত্যগোপালের পরিচর্য্যাকালে দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন।

আমাদের কাছে সেবা-সেবক-সম্বন্ধ যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট নয়। আমাদের ধারণায় সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ 'স্লেভমেণ্টালিটীর' বা দাসসুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সমাজনীতির দৃষ্টিতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ রূপান্তরিত হইয়া প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বড় মধুর, বড় আনন্দদায়ক। সেখানে সেব্য প্রভুত্বের দাবী রাখে না, আর সেবক দাসবোধ দ্বারা আপন অন্তরাত্মাকে ক্ষুণ্ণ করে না।

সেখানে সেব্য-সেবকের সম্বন্ধ হয় পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মত, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মত, রাজা-প্রজার সম্বন্ধের মত, সখা-সখীর সম্বন্ধের মত—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচের স্তরভেদ থাকিলেও মাধুর্য্যের আকর্ষণের অভাব থাকে না। কেহই কাহারো নিজস্ব ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে এককভাবে উপভোগ করিতে চাহে না। পরস্পর পরস্পরকে আপন আপন ঐশ্বর্য্য ও অধিকার পরিবেশন করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে।

এ-হেন সেব্য-সেবক-মন্ত্রে অযাচিতভাবে দীক্ষালাভ করিয়া লালটুর হৃদয়াকাশ হইতে ব্যাকুলতার তীব্র ঝঞ্ঝাবাত শুধু দূরীভূত হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে সেই স্থানে উদিত হইয়াছিল শরণাগতির স্নিগ্ধ আলোক, যে আলোকে লালটু গন্তব্য লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছিল। এতদিন জানিত না সেব্য কে? সেব্যের প্রকৃতি কি? এখন সেই বিষয় তাহার ধারণা হওয়ায় তাহার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইতে বসিয়াছিল।

দীর্ঘ আট মাস পরে পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। সেই দিনই তিনি রাম বাবুর গৃহে পদার্পণ করেন। সেদিন ছিল দুর্গাপূজার সপ্তমী তিথি। মায়ের আগমনের দিনে মাতৃভক্তের আগমন ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। সেই দিনই রাম বাবুর গৃহমন্দির ভক্তমণ্ডলীর কাকলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন লালটুর আনন্দ দেখে কে? সে যেন বসন্ত-মলয়ে মুঞ্জরিত বৃক্ষের মত নবচেতনপ্রাপ্ত। তাহার ত্বরিত গমন, উল্লসিত ভাষণ, প্রফুল্লিত আনন এবং চঞ্চল কর্ম্মোদ্দীপন সকলকেই আশ্চর্য্য করিয়াছিল। তাহারই সাহায্যে রাম বাবু একইকালে একাদশটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। তাহাকে দিয়াই পল্লীস্থ ভক্তগোষ্ঠীর নিকট খবর পাঠাইলেন, তাহাদের

আহারের বন্দোবস্ত করাইলেন, সংকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করাইলেন এবং আরো কত কি করাইলেন, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। সেদিন আর বালক নিষ্প্রাণ নহে—জড়ত্বকে নাশ করিয়া চঞ্চল কর্ম্মময় হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনকার চাতকপাখী আজ নবজলধর শ্যামঘন মূর্ত্তির অমৃত-সিঞ্চনে আত্মহারা।

দক্ষিণেশ্বরে

দক্ষিণেশ্বরে লালটুর রাত্রিযাপন, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি, তিন রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে বাস ও ঠাকুরের সেবা, সস্ত্রীক রাম বাবুর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও লালটুকে লইয়া কলিকাতায় গমন, কলিকাতায় আসিয়া লালটুর গৃহকর্ম্মাদি, ভক্তমণ্ডলীর উৎসবাদিতে লালটুর উৎসাহ, নরেন বাবুকে ডাকিয়া আনার বিবরণ, ঠাকুরের সেবক ও ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের মন্দির ত্যাগ, যোগ্য সেবকের অভাবে ঠাকুরের কষ্ট, রাম বাবুর নিকট হইতে লালটুকে চাহিয়া লওয়া এবং লালটুর দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ী বসবাস

কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া ঠাকুর কয়েকদিন বড় ব্যস্ত ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই কলিকাতায় আগমন করিতেন এবং অধিক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেন। কোন কোন দিন কলিকাতায় আসিয়া রাম বাবুর গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং সেখান হইতে কলিকাতাস্থ অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর গৃহে গমন করিতেন। সেই সময় লালটু তাঁহার সহিত প্রায়ই ভক্তগৃহে গমন করিত। পরে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন, সেই কার্ত্তিক মাসের একদিন অপরাহ্নে লালটু মনিবপ্রদত্ত ফলমূল ও মিষ্টান্নাদি লইয়া তথায় গিয়াছিল। সেইদিন ঠাকুর তাহাকে স্নেহভরে বলিয়াছিলেন, "ওরে! এই রাতে আবার কলকাতায় যাবি। আজ এখানে থেকে যা না।" পরমহংসদেবের নিকট হইতে এইরূপ আদেশ শুনিয়া লালটু অত্যন্ত খুশী হইয়াছিল, কারণ বহুদিন হইতে সে ইহাই চাহিতেছিল। এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আশা পূরণ হইতে দেখিয়া লালটু নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিল।

সেই রাত্রে তথায় প্রসাদ পাইয়া লালটু পরমহংসদেবের পদসেবায় নিযুক্ত হয়। পদসেবাকালে লালটুর মধ্যে কেমন যেন এক উন্মাদনার সৃষ্টি

হইয়াছিল! সেইদিন তথায় ঠাকুরের ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রুত কথাগুলি নিম্নে বিবৃত করিতেছি :

পরমহংস মশায় লালটুকে বলিলেন— "কী রে ঘুম পাচ্ছে নাকি ?"

লালটু— না, ঘুম পায় নি।

ঠাকুর— ভয় কর্‌ছে ?

লালটু— না, ভয় কোরে নি।

ঠাকুর— মন কেমন করছে ?

লালটু— না, মন কেমন কোরে নি।

ঠাকুর— তবে তোর ঢুল এসেছে।

লালটু— 'হামার ঢুল আসেনি।'

ঠাকুর— 'তোর চোখ অমন কেন রে ?'

লালটু— 'হামি কি জানে ?'

ঠাকুর— 'হ্যাঁরে ! তোর কি হয়েছে ? অমন করে চেয়ে আছিস্ কেন ?'

লালটুর আর কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরেই লালটুর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুর পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন— "হ্যাঁরে ! তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন রে ? তোর হোলো কি ? এমন ত দেখিনি, বাপু ? কি হয়েছে বল না রে ?" পরে কেদার বাবুকে সম্বোধন করিয়া— 'দেখ্‌গো, এ ছেলেটি কেবল কাঁদ্‌ছে, কিছু বল্‌ছে না।'

কেদার বাবু— এ ত আপনারই লীলা। আপনি এই ছেলেটির মধ্যে শক্তিসঞ্চার কোরেছেন, তাই ত এমন ভাব জমে গেছে।

এই দিনই যে লালটুর দীক্ষালাভ হইয়াছিল একথা কেদার বাবু অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন।

দেবমানবের দীক্ষাপ্রণালী বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। তিনি যে কাহাকে কি ভাবে দীক্ষা দেন, তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, যিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন। অন্যলোকে সে কথা বুঝিতে পারে না। তাঁহারই স্পর্শে সেইদিন যে লালটু আনন্দের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতেই যে লালটু নির্ব্বাক, স্তব্ধ ও স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই আমরা অনুমান করিতে পারি।

পরবর্ত্তী কালে আমরা লাটু মহারাজের নিকট এরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি দীক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; মাত্র বলিয়াছিলেন— "ঠাকুর হামার মনের অবস্থা বুঝতেন। হামায় তিনি নানাভাবে বিড়ে নিতেন। হামার উপর ভালবাসা ডেলে (অর্থাৎ ঢেলে) দিতেন। হামায় তিনিই ত দেখালেন।"

জনৈক ভক্ত— কি দেখালেন মহারাজ?

লাটু মহারাজ— আরে! সে কি মুখে বলা যায়? এ-সব অনুভূতির কথা; নিজে না বুঝলে, না দেখলে, না পেলে কেউ একে বলে বুঝাতে পারে না। ভগবান কি কথার ব্যাপার? তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, তিনি কথার অতীত, মনের অতীত, তাঁকে বুঝবার একমাত্র পথ—অনুভূতি।

জনৈক ভক্ত— সেই অনুভূতিটি কিরূপ, আমাদের বলুন না, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— আরে! তাঁর কথা এতো পড়ো, এতো শুনো, তবু তোমাদের হুঁশ হয় না। তিনি বলতেন—চিনি যেমন বোলে বুঝান যায় না, এই ঈশ্বরতত্ত্ব ঠিক তেমনি; এও বোলে বুঝান যায় না। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাকী শুনে কি হবে? দেখো না তাঁকে। তাঁকে দেখবার লাগে বসে যাওনা। তিনি ঠিক দেখা দিবেন।"

এইরূপ ভাবে তিনি আমাদের প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, লালটুর সেই স্থির অক্ষিপল্লব পরদিন প্রভাতেও চঞ্চল হইয়া উঠিল না। অচঞ্চল অপলক দৃষ্টিতে লালটু স্থির হইয়া রহিল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত। মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা পড়িয়া গেল, ঠাকুর পরমহংসদেব আসিয়া বালককে ডাকিলেন—"কি রে! দুপুর যে হোয়ে গেলো, মাকে দেখবি নি, এক্ষুণি মন্দির বন্ধ হোয়ে যাবে। যা—মাকে দেখে আয়। এখানে এসেছিস, মায়ের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে আয়।" এইরূপ স্নেহপূর্ণ ডাকে বালকের ভাবের ঘোর কাটিয়া গেল। বালক নিদ্রা হইতে সদ্যোত্থিতের ন্যায় শিথিল-গমনে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইল এবং মাকে প্রণাম জানাইয়া দৈনন্দিন শৌচস্নানাদি সমাপন করিতে চলিয়া গেল। এই কথাগুলি রামলাল দাদা আমাদের বলিয়াছেন।

এর পরের ঘটনা বিশেষ কিছু নয়। লালটু সেইবার একাদিক্রমে তিন দিন তিন রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যায়। সেই তিন দিন তিন রাত্রি ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দিতেন না—নানাভাবে তাহার দ্বারা টুক্‌টাক্ কাজ করাইয়া লইতেন। সেই কদিন লালটুকে ঠাকুরের জন্য স্নানের জল তুলিতে হইয়াছিল, তামাক সাজিতে হইয়াছিল, গৃহমার্জ্জন করিতে হইয়াছিল, এমন কি ঠাকুরের সঙ্গে যদু মল্লিকের বাগানে যাইয়া পাঠ শুনিয়া আসিতে হইয়াছিল।

তিন দিন পরে ঠাকুর লালটুকে মনিবগৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন—"ওরে! রাম যে তোর জন্য ভেবে ভেবে সারা হোলো।"

লালটু তখন উত্তর দিয়াছিল— "হামি ইথানকে থাকলে মনিবের কোন গুঁসা হয় না। তিনি ত আর একজনকে রেখেছেন—সেই সব কাম্ করবে। হামি ইথানকে থাকবে।"

"সে কি রে? তুই রামের মাইনে খেয়ে এখানকে বসে থাকবি?

এ ত হয় না বাপু ! যার মাইনে নিবি, তার কাজ করবি, এইত জানি। একজনের মাইনে নিবি আর অপরের কাজ করবি, এমন কথা ত কোথাও শুনি নি।"

এই কথা চলিতেছে, এমন সময় ভক্ত রাম বাবু সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। রামকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"ওগো রাম ! এই ছেলেটা কি রকম দেখ, বাপু ! যত বলি বাড়ী যা, ওরা কত ভাবছে, ছেলেটা কেবল ফিক্ ফিক্ করে হাসছে, আর বলছে—এখানে থাকলে ত মনিবের গুঁসা হয় না। ইখান হোতে চলে যেতে হামার মন কেমন করে ! হামি যাবে না। যত বলি কলকাতায় যা—কিছুতেই কি এখান হোতে নড়বে না ! একি বাপু ! কাজকর্ম্ম ছেড়ে এখানে এত থাকা কেন ? পারতো তুমি ওকে বুঝাও।"

ঠাকুরের কথার ভাবে ভক্ত রামচন্দ্র ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। বালক যে ঠাকুরের কৃপা পাইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া রাম বাবু কৃত্রিম ক্রোধে লালটুকে বুঝাইতে বসিলেন—"হ্যাঁরে ! এখানে কিসের জন্যে পড়ে আছিস, বলতো ? বাড়ী যাবি না ?"

লালটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কথার কোন উত্তর দিল না।

পরক্ষণেই রাম বাবু ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন—"ভালবেসে ছেলেটার ত মাথা খেলেন, আর কেন আমায় এ বিড়ম্বনা ভোগ করান ?"

ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিলেন—"কি মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায়, বলতো রাম ! আমি ত কিছু বুঝি না।"

ভক্তের কাছে ভগবান জানিতে চাহেন—ভক্ত কেন ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এ রহস্যের মীমাংসা কে করে ?

যাহা হউক, সেবার মায়ের সঙ্গে (রাম বাবুর স্ত্রীকে লালটু মা বলিত)

লালটু সিমলায় ফিরিয়া আসিল। লালটুকে ফিরাইয়া আনিয়া রাম বাবুর স্ত্রী তাহাকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু লালটুর সেই এক কথা—"হামি আর নকরি করবে না। হামি আর আপুনাদের মাহিনা লিবে না। বাবুকে বলবেন, হামি উখানকে থাকবে।"

মা যত বুঝান— "কেন রে! তোর এখানে থাকতে কি কষ্ট হচ্ছে?" লালটু ততই আবদারের সুরে বলে—"উখানকে থাকতে হামার ভাল লাগে।"

মা বলেন— "উখানে তোকে খাওয়াবে কে? তোকে কাপড়-চোপড় দেবে কে?"

লালটু— কেনো, হামি ওনার সেবা করবে, প্রসাদ পাবে আর আপুনারা হামাকে কাপুড়-চোপড় দিবেন?

মা— বাবু দিতে রাজী হবেন কেন?

লালটু— হামায় এতো ভালবাসেন, আর হামায় একখানা কাপুড় দিবেন না?

বালকের নির্ব্বুদ্ধিতায় মা হাসিয়া উঠিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের সমগ্র ঘটনাটি কেদার বাবুর নিকট হইতে রাম বাবু শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শক্তিপ্রাপ্ত লালটুকে দিয়া তাঁহার গৃহকর্ম্ম করাইতে দ্বিধা করিলেন। তাহাতে লালটুর অনেক কাজ কমিয়া গিয়াছিল।

তৎকালে লালটুকে প্রায়ই মনিবপ্রদত্ত ফলমূলমিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইত এবং কলিকাতাস্থ রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর সংবাদাদি লওয়া ও কলিকাতাস্থ ভক্তমণ্ডলীর নিকট পরমহংসদেবের আগমনসংবাদ বহন করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিতে হইত না। অধিকন্তু ঠাকুরের আগমন উপলক্ষ্যে প্রায় প্রত্যেক ভক্তই কিছু না কিছু উৎসব করিতেন। সেই সব

উৎসবে ভক্তপালক রাম বাবুর পরামর্শ যাহারা গ্রহণ করিতেন, রাম বাবু তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য নিজ প্রিয় ভৃত্যকেও পাঠাইয়া দিতেন।

প্রত্যেক উৎসবে সে একাই দশজনের কার্য্য করিত। এই সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবু কিছু বলিয়াছেন:

"রাম বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছেন। আমাদের কাছে লাটু এসে বল্লে— 'লোরেন বাবুকে উনি ডেকেছেন।' এই বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল— 'উনি যে ডাকছেন; আপুনাদের এত দেরী কেনো?' দাদা তখন বাহিরে আসিয়া বলিল — 'যাচ্ছি রে, যাচ্ছি।'

'হামায় এখন কেতো জায়গায় যেতে হবে—আপুনি শীগগীর শীগগীর আসুন। বাকী দেরী হলে হামার উপর গুঁসা করবেন।' এই বলিয়া পুনশ্চ চলিয়া গেল। মিনিট চার পাঁচের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনশ্চ বলিল— "কৈ লোরেন বাবু! আপুনি এতো দেরী করছেন।" দাদা পুনরায় বলিল— 'যাচ্ছি রে, তোর যে আর তর সয় না। ডেকে আনতে বল্লে বেঁধে নিয়ে যেতে চাস।' 'আরে! আসুন, উনি যে আপনার তরে বোসে আছেন।' এইভাবে লাটু দাদাকে রাম বাবুর বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে যেতো।··· দাদাকে খবর দেওয়ার মাঝে লাটু আরো দুজনকে ডাকতে গেছিলো। তাহারা ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে চলেছে। আমরাও তাহাদের সহিত এক জোটে রাম বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম।"

এইভাবে রাম বাবুর গৃহে আরো কিছুদিন লালটুকে থাকিতে হইল। পরে তাহার দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। কি ভাবে যে সুযোগ আসিয়াছিল তাহা নিম্নে বলিতেছি:

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবক ও ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের কুমারী-পূজা লইয়া মনোমালিন্য হয়। ঠাকুরের ভাগিনেয় কাহারো পরামর্শ না লইয়া ৺মথুর বাবুর নাতনীর পায়ে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করেন। কন্যার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া ৺মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং এই কারণে রুষ্ট হইয়া হৃদয়কে মন্দিরের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দেন। তৎকালে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ই ছিল ঠাকুরের সেবক। মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি না দেওয়ায় শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সেবা হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। যদিও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবকের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য ত্রৈলোক্য বাবু সেই দিনই একজন পশ্চিমদেশীয় ভৃত্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে দিয়া ঠাকুরের সেবা সম্ভব হইল না। কারণ, তৎকালে ঠাকুর মাত্র শুদ্ধসাত্ত্বিক ব্যক্তির স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন; অশুদ্ধ অসাত্ত্বিক লোকের সেবা বা স্পর্শ তাঁহার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হইত।

এইজন্য হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের অবর্ত্তমানে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সেবার ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া ভক্ত রাম বাবু শুদ্ধসাত্ত্বিক লালটুকে ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

দিন দুই পরে রাম বাবু নিজে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রাম বাবুকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—"দেখ রাম! এই ছেলেটিকে (লালটুকে দেখাইয়া) তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসত্ত্ব, আর এখানকে থাকতেও ভালবাসে।" তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া লালটুকে তথায় রাখিয়া দিলেন।

অতঃপর লালটু দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সেবক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ঠাকুর আদর করিয়া তাহাকে কখনো লেটো, নেটো, লাটু প্রভৃতি নামে ডাকিতেন। তন্মধ্যে 'লাটু' এই নামটাই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন হইতে 'লাটু' এই নামই ব্যবহার করিব।

শিক্ষা

মহাপুরুষের সেবক হইবার সৌভাগ্য কি কি গুণে হয়, লাটুর কি কি গুণ ছিল, লাটু শিক্ষিত কি না, পাশ্চাত্ত্য মতে শিক্ষিতের মাপকাঠি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অসম্পূর্ণতা কোথায়, ভারতীয় শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য কি, ইহলৌকিক পারলৌকিক ও পারমার্থিক শিক্ষার ক্ষেত্র ও পরিধি এবং তাহাদের পার্থক্য, ঠাকুরের অভিনব শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষা ও সাধনায় একত্ব, পঠন-পাঠন-রূপ শিক্ষায় লাটুর অক্ষমতা, পারমার্থিক শিক্ষায় লাটুর উদগ্রীবতা, লাটুর ভাষায় দক্ষিণেশ্বরে শিক্ষাপাঠের কথা, ব্রহ্ম-নেশা করানর শিক্ষা, দিল সাফ্ রাখার শিক্ষা, সেবার শিক্ষা।

সাধারণতঃ দেখা যায় শিক্ষা, সঙ্গ, শুদ্ধি ও সাধনা এই চারি বস্তুর একত্র সংযোগ না হইলে মহাপুরুষের সেবক হইবার সৌভাগ্য ঘটে না। কিশোর লাটুর জীবনে দেখা যায় যে সঙ্গ, শুদ্ধি ও সাধনা এই তিনটির সংযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষার সদ্ভাব ঘটে নাই। ভক্তপালক রামচন্দ্র দত্তের গৃহে অবধূত নিত্যগোপালের সেবা করায় তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হইয়াছিল। অবধূতের সেবাকালে অনুক্ষণ নামকীর্ত্তনে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল এবং সাধনারও সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও তাহার লিখনপঠনরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। সেইজন্য নিরক্ষর বর্ণপরিচয়হীন লাটুর মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া আশ্চর্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

লাটু নিরক্ষর, বর্ণপরিচয়জ্ঞানহীন। কিন্তু তাই বলিয়া লাটু কি অশিক্ষিত? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে শিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের সংজ্ঞা নির্ণয় করা উচিত এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত।

পাশ্চাত্ত্য মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে—"মানুষকে একাধারে লিপিজ্ঞ, ভাষাজ্ঞ ও ব্যবহারজ্ঞ করা" এবং উচ্চতর শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য হইতেছে "মানুষকে চিন্তাশীল করা।" আর তাহাদের মতে শিক্ষিতের প্রাথমিক সংজ্ঞা হইতেছে—"লিখন ও পঠন ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি"; এবং উচ্চশিক্ষিতের সংজ্ঞা হইতেছে—"পাঠন ও গবেষণাক্ষম ব্যক্তি"। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বলেন—"It is to teach them how to use their mind in thinking" এবং শিক্ষিতের মাপকাঠি করেন—"An educated man is one who can accomplish things." শেষোক্ত সংজ্ঞাটি এখনও পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু সাধারণে এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞাগুলির দ্বারা বিচার করিলে লাটুকে শিক্ষিত বলা যায় না—কারণ, লাটু লিপিজ্ঞ ও ভাষাজ্ঞ নহে। কিন্তু শিক্ষার উচ্চতর মাপকাঠিতে লাটু মহারাজকে বিচার করিলে তাঁহাকে অশিক্ষিত বলা যায় না। কারণ তাঁহার মধ্যে চিন্তাশক্তির তীব্রতা ও শৃঙ্খলা ছিল। নিরক্ষর হইয়াও তিনি যে ভাবে নিজের মনোজগতের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন—শিক্ষিত হইয়াও আমরা সেই সংস্কৃতির অধিকারী হইতে পারি নাই।

পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বিকৃত শিক্ষায় আমরা শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্যকে দিন দিন যে ভুলিতে বসিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তাহাদেরই আদর্শের মত আমরা শিক্ষাকে বহিরঙ্গের ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি; এমন কি দর্শন প্রভৃতির পঠন-পাঠন ব্যাপারেও আমরা বহিরঙ্গের আলোচনা আনিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে অভ্যস্ত

হইয়া উঠিতেছি। শিক্ষা যে অন্তরের ব্যাপার তাহা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে বাহিরের সংস্কৃতি নহে—অন্তরের সংস্কৃতি, তাহাও একপ্রকার অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কারণ অন্তরের মধ্যে যাতায়াত করিবার কৌশল আধুনিক শিক্ষাপাঠের মধ্যে নাই। আধুনিক শিক্ষাপাঠের অবলম্বন জড়বস্তুকে ঘিরিয়া ও জাগতিক বস্তুকে ঘিরিয়া। যাহা সত্যকারের অজড়, যাহা প্রাণবন্ত, যাহা অপার্থিব, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব না হওয়ায় আমাদের এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। রাষ্ট্রিক আদর্শের মধ্যে পড়িয়া আমাদের শিক্ষা ব্যাপারটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এত বেশী কৃত্রিম, এত বেশী আড়ম্বরপূর্ণ যে, সাধারণতঃ আমরা তাহাতে প্রাণের স্পর্শ পাই না, অন্তরের অনুভূতিতে দীপ্ত হইয়া উঠি না। বরং রাষ্ট্রিক বুদ্ধির ও কার্য্যকুশলতার কাছে অন্তরের অনুভূতিকে বন্ধক দিয়া আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশসাধন করিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা বেশ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করি যে, অন্তরের অনুভূতিতে আমরা অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছি। দয়া, সহানুকম্পা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলিতে দুর্ব্বল হইয়া আমরা আমাদের জীবনের ওজনে হাল্কা হইয়া পড়িতেছি— না জানি আরো কত হাল্কা হইয়া স্বার্থের পাল্লা ভারী করিব! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এই যে দুর্ব্বলতা, ইহা আমাদের কতদিকে কতভাবে পঙ্গু করিতেছে, তাহা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং প্রকৃত শিক্ষিতের জীবন কি তাহা দেখাইবার জন্য কতিপয় তথাকথিত শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও ভ্রান্তশিক্ষিত যুবককে আপনার শিক্ষাধীন রাখিয়া গড়িয়া তুলিলেন। সেবক লাটু· তাহাদের মধ্যে অন্যতম অশিক্ষিত যুবক।

সেবক লাটুকে শিক্ষিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাই ভারতীয় সনাতন পন্থা; তাহাতেই সত্যকাম জাবালির মোহভঙ্গ হইয়াছিল এবং ভক্তিমান নারদের ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়াছিল। ইহা বহু দিন হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কালের অমোঘ ধ্বংস-লীলায় ইহার ব্যবহার সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই শিক্ষায় পঠন-পাঠনের বিশেষত্ব নাই অথবা আচার-অনুষ্ঠানের অতিনিষ্ঠা নাই। ইহা মোটেই ইহলৌকিকের আশায় ছুটে না, অথবা পারলৌকিকের পথে ধাবিত হয় না; ইহা চলিতে থাকে পারমার্থিক ধর্ম্মকে ঘিরিয়া।

অনেকের ধারণায় পারলৌকিক ও পারমার্থিক এক বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারলৌকিক ও পারমার্থিকে বহু পার্থক্য। পারলৌকিক শিক্ষা দৈববিজ্ঞান, মন্ত্রবিজ্ঞান, তন্ত্রবিজ্ঞান, যজ্ঞবিজ্ঞানকে লইয়া চলে, কিন্তু পারমার্থিক শিক্ষা তত্ত্বের সংবেদনকে ঘিরিয়া চলিতে থাকে। পারলৌকিক শিক্ষায় বস্তু ও অর্থের প্রয়োজন আছে, পারমার্থিকে তাহা নাই। পার-লৌকিকের কর্ম্মযজ্ঞে সকাম ভোগের বীজ থাকিয়া যায়, কিন্তু পারমার্থিকের ক্রিয়াকাণ্ডে অনাসক্তির ও শরণাগতির আস্পৃহাই প্রবল। পারলৌকিক মানুষকে দৈবসম্পদের অধিকারী করে, আর পারমার্থিক মনুষ্যকে দিব্য দেবতা করিয়া তুলে। ইহলৌকিকের মত পারলৌকিক সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু কিন্তু পারমার্থিক সম্পদ চিরস্থায়ী। পারমার্থিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 'পাওয়া' নয়, 'হওয়া'; তাই পারমার্থিকের মধ্যে এতটুকু চালাকী বা ফাঁকি চলে না। সেখানে মানুষের পূর্ণ সত্তাটিকে একইকালে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিতে হয়, একইকালে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, আধারশুদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় পবিত্রতার দ্বারা তাহাই পরিমার্জ্জিত করিতে হয়।

পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য ঠাকুর লাটুকে নিজের কাছে

টানিয়া লইলেন। তিনি বলিতেন—"চারাগাছে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নচেৎ গরু-বাছুরে খেয়ে যায়"; তাই তিনি লাটুকে সেবক হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন।

একদিন তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট জানাইলেন—"ওগো! এখানে এত বড় বড় শিক্ষিত লোকসব আসে, এদের সঙ্গ পেয়েও কি এই ছোঁড়াটার কিছু লেখাপড়া হবে না? তোমরা একটু চেষ্টা করে দেখো না?" তারপর জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, এর জন্য একখানা 'প্রথম ভাগ' এনো তো।"

ভক্তটি পরদিনই 'প্রথম ভাগ' লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব লাটুকে পড়াইতে বসিলেন। বর্ণপরিচয় খুলিয়া তিনি লাটুকে বলিলেন—"বল্ 'অ'।" লাটু বলে—"অ"। "আ"; লাটু বলে, "আ"। এইভাবে সেইদিন সম্পূর্ণ স্বরবর্ণ লাটুর আয়ত্তে আসিল। দুইদিন ধরিয়া লাটু এই পাঠটি খুব অভ্যাস করিয়া লইল। তৃতীয় দিনে ব্যঞ্জনবর্ণ আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুর বলিলেন—"বল্ 'ক'।" লাটু উচ্চারণ করে—"কা"। ঠাকুর যত বলেন—"ওরে, এটা 'ক'।" লাটু ততবার বলে—"কা"।

পার্শ্বস্থ রামলাল প্রভৃতি সেবকবৃন্দকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"শালা 'ক'-কে 'ক' বলতে পারে না, কেবল 'কা', 'কা' করছে। আরে! এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে ক-এ-আকারকে কি বলবি?" বিহারী জিহ্বা 'ক'-এর ধ্বনিকে ঠিকমত উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না; বারে বারে বিফল হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—"যাঃ! আর তোর পড়ে দরকার নেই।"

ঠাকুরের মত শিক্ষকের শিক্ষকতায়ও লাটুর লিখন-পঠনরূপ শিক্ষা

জনৈক ভক্ত—কি শেখাতেন, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— আরে ! নেশা করতে শিখাতেন। আউর কি শিখাবেন ?

এই কথা শুনিয়া ভক্তটি অবাক হইয়া যায়। ভক্তের সেই বিস্মিতভাব দেখিয়া লাটু মহারাজ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন—"আর যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা করতে শিখালেন। তিনি হামাদের ভগবানের নেশা করিয়ে দিলেন। সংসারী লোক ছেলেদের কামিনীকাঞ্চনের নেশা করতে শিখায়, মদ-জুয়ার নেশা করতে শিখায়, আউর মান-ইজ্জতের নেশা করতে শিখায়। বাকী তিনি শিখাতেন—ব্রহ্মনেশা। এ নেশা ভারী জবর। এ নেশার কাছে অন্য সব নেশা ফিঁকা হয়ে যায়।"

এই কথাগুলি শুনিয়া ভক্তের বিস্মিতভাবের অবসান হয় এবং পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করেন—"কেমন কোরে তিনি আপনাদের এই নেশা করতে শেখাতেন ? তিনি কি ভগবানকে গুলে আফিমের ডেলার মত কোরে আপনাদের খেতে দিতেন ?" লাটু মহারাজ—"তোমার এ কেমন কথা ?··· ভগবানের নেশা করতে গেলে কিছু পান করতে হয় না—যে ভগবানকে পেয়েছে তাঁর দরশন-পরশনেই নেশা জাগে। তাঁর সঙ্গ করলেই মন ব্রহ্মনেশায় ভরপূর হোয়ে যায়।"

জনৈক ভক্ত—আমাদের মধ্যে সেই ব্রহ্মনেশাটি জাগিয়ে দিন না, মহারাজ ! আমরা যাতে এই সংসারের মায়া থেকে মুক্ত হোতে পারি, তার ব্যবস্থা কিছু করে দিন।

লাটু মহারাজ—হ্যাঁ ! ব্যবস্থা ত আছেই। বাকী জানতো—! আগে মানুষ ভাঙের নেশা করে, ভাঙ্ ছেড়ে গাঁজা ধরে, গাঁজা ছেড়ে চরস খায়, চরস ছেড়ে মদ খায়, শেষে আফিম ধরে। আফিমের নেশা ধরলে কি আর ভাঙের নেশায় মন মজে ? তোমাদেরও ঐ। আগে সংসার

তোমাদের নেশা ধরিয়েছে—নাম, যশ, টাকা, মেয়েমানুষ এদের নেশা কাটিয়ে উঠো, তবেই ত আফিমের মৌতাত পাবে। এসব নেশার পরে ব্রহ্মনেশা জাগে। এতে মশগুল হোলে ভাঙ্, গাঁজা, চরস, মদ কুছু ভাল লাগবে না। ঐ নেশা করবে ত এসো। ইখানে বোসো—দুটি দুটি খাও আর হরবকত তাঁর নাম লাও। নামের নেশায় বুঁদ হোয়ে যাও। বাকী চালাকী করলে হোবে না। উনি বলতেন—'মনের অঙ্কট-বঙ্কট থাক্‌লে চলবে না।'

—মহারাজ! মনের অঙ্কট-বঙ্কট কি জিনিস?

লাটু মহারাজ—তা বুঝো না? আরে! ঐ ত মায়া। তোমরা সংসারের নেশায় মজবে আর সংসারকে দুষবে। সংসার ছেড়ে আসতে চাইবে না, বাকী সংসারে থেকেও লড়তে পারবে না। একে উনি বলতেন অঙ্কট-বঙ্কট।

* * *

অন্য একদিনের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত:

"জানো…! ঠাকুর হামাকে টেনে নিলেন। হামি একটা অনাথ, কুথাকার কে—হামায় তিনি ভালবাসা ডেলে (ঢেলে) দিলেন। হামায় তিনি কৃপা না করলে হামাকে নকরী করতে করতে বকৃরী বনে যেতে হোতো; হামার সারাজীবন বিলকুল লষ্টো (নষ্ট) হোয়ে যেতো। হামাকে তিনিই ত এসব শিখাতেন, হামি মুখ্যু, হামি এসব কী জানবে। হামায় বলতেন—'দেখ্! দিল সাফ রাখবি আর গরদা ঢুকতে দিবি নি।'

জনৈক ভক্ত—গরদা কি জিনিস, মহারাজ?

লাটু মহারাজ (হাসিয়া)—আরে, জানো না? কত্তো ধুলোবালি. সব রয়েছে।

ভক্তটি বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ভক্তের বিস্মিতভাব দেখিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন—"আরে! 'গরদা' জানো না। অহংকারের ব্যাপারকে উনি গরদা বলতেন। অহঙ্কারী মানুষ কেমন জড়িয়ে পড়ে দেখো না—হামার ছেলে, হামার মেয়ে, হামার টাকা, এ সব বলে বলে কেবল নিজের জাল নিজে বুনে থাকে। সেই জালে পড়ে কেমন তারা ঘুরতে থাকে দেখেছো। (তখন তাঁহারই কাছে একটি মাছি মাকড়সার জালে পড়িয়াছিল তাহা দেখাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া)—আরে! দেখো দেখো! ঠিক এইভাবে মায়া মানুষকে ঘুরাতে থাকে। দেখেছো তো ঘুর্ণীতে কেমন ফেনা উঠে; একদম সফেদ, দেখতে ভারি থাপসুরৎ; বাকী ফেনাগুলো সব জলকে ঢেকে দেয়। ফেনা ত ময়লা। ময়লা পড়লে সিসাতে কি মুখ দেখা যায়? ময়লা সাফ করতে হবে, তবে ভালো কোরে দেখতে পাবে। উনি তাই ত বলতেন—'দিল সাফ করো, চিত্তশুদ্ধি করো, সত্য পবিত্র হও।' তিনি ত হামেশা হামাদের বলতেন—'দেখ! ইথানকে (নিজের বুকে হাত দেখাইয়া) সাঁচ্চা থাকবি—কামকামনা ঢুকতে দিবি নি। ওরা বড্ড বেশী দিক্ করলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবি, তাঁর নাম নিবি, তাঁকে ডাকবি। তিনি তোদেব বাঁচিয়ে দেবেন। যখন তাঁতেও মন বসাতে পারবি নি তখন মন্দিরে মায়ের সামনে বসে যাবি, না হয় ইথানকে দৌড়ে আসবি।'"

* * *

আর একদিনের ডায়েরীর কথা দিয়া আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করিব। (ভক্ত নবগোপাল ঘোষের নিকট হইতে শ্রুত)

"জানো···! হামার যা কুছু সব তাঁর দৌলতে। হামার মত

মুখ্যুর কি আর সাধন করবার দিল্ থাকতো ? হামি সাধনার কি জানে ? হামাকে তিনিই ত সব সাধনভজন দেন। হাম্নি ত কেবল তাঁর সেবক হোতে চেয়েছিলুম ; বাকী তিনিই ত হামাকে সাধনভজন শিখালেন। হাম্নি ত জানে না তখন সাধনভজনে লাভ কি ? উনিই ত হামাকে শুনালেন রামজীর ব্যাপার।"

জনৈক ভক্ত—রামজীর ব্যাপার কী শোনালেন, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ—একদিন হামি তাঁর পায়ে হাত বুলোতেছিলুম। তিনি হামাকে বল্লেন—'বল্‌দিকিনি তোর রামজী এখন কী করছেন ?' শুনে হামনি ত অবাক হোয়ে গেলুম—রামজীর ব্যাপার হামি কি বুঝতে পারে ? হামাকে চুপ দেখে তিনি কি বললেন জানো ?—'ওরে ! এখন তোর রামজী স্ুঁচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন।'

জনৈক ভক্ত—কি বললেন, মহারাজ ? স্ুঁচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন—এর মানে কি, মহারাজ ?

"তা' বুঝলে না ?—হামার এতটুকু আধার, হামার মধ্যে তিনি সাধন ডেলে (ঢেলে) দিচ্ছিলেন।"

জনৈক ভক্ত—সাধন কি ঢেলে দেওয়া যায়, মহারাজ ?

"যায় বৈ কি। তবে যে-সে পারে না। যে ভগবানকে দেখেছে, তাঁর আনন্দে ডুবে যেতে পেরেছে, সেই পারে। বাকী যার সাধন নাই, সে ত পারবেক না।"

জনৈক ভক্ত—মহারাজ ! আমাদের মধ্যে একটু সাধন ঢেলে দিন।

লাটু মহারাজ—আরে ! তিনি পারতেন ব'লে হামনি পারবে ?

জনৈক ভক্ত আর্ত্তি দেখাইয়া—"পারবেন, মহারাজ ! আমাদের

উপর একটু কৃপা করুন। আমরা যাতে এই জীবনে কিছু সাধনলাভ করতে পারি তার ব্যবস্থা একটু কোরে দিন।"

লাটু মহারাজ--দেখো! তোমাদের ঐ এক কথা। ইখানে এলে মনে হয় সাধনভজন নিয়ে থাকবে, আর বাড়ী ফিরে গিয়ে মনে হয়, তুৎতোর সাধনভজন।—সংসারে তোমাদের টাকাই সাধন, সেখানে ওরই জন্য তোমাদের দিনরাত খাটতে হয়। বাকী যা সাধনা করবে তাতেই ত সিদ্ধিলাভ করবে। তোমরা ত ভগবানের সাধনা চাও না—ভগবানকে তাই পাও না।

জনৈক ভক্ত—সংসারে থাকতে গেলে টাকা যে চাই-ই চাই। টাকা-পয়সা ছাড়া সংসার চলে না, এটাত আপনিও জানেন।

লাটু মহারাজ—হ্যাঁ! জানি বৈ কি। তবে যেমন চাইবে তেমন পাবে তো!—সাধনভজন চাইতে গেলে অন্য কুছু চাইতে পারবে না। উনি বলতেন—"তাঁর কাছে যা' চাইবে, সব পাবে। বাকী তাঁকে চাইলে সব পাওয়ার শেষ হোয়ে যাবে।"

জনৈক ভক্ত—আমরা ত তাঁকে ডাকতে পারি না, মহারাজ! আমাদের মত অভাগার ডাক কি তাঁর কানে পৌছায়?

লাটু মহারাজ—পৌছায় বই কি। তোমাদের ডাকে আছে টাকা, টাকা, টাকা। তিঁনি তাই ত তোমাদের টাকা পাঠাচ্ছেন; আর যে দিন এই ডাকের মধ্যে আসবে 'টাকা, যশ, মান, ইত্যাদি কুছু চাই না, বাকী তাঁকে চাই'—সেদিন তিনি আসবেন। উনি বলতেন—"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়, আর ভোগ থাকলেই জ্বালা বাড়ে।" উনি দিনরাত হামাদের এই কথা শিখাতেন, বলতেন—"যাগে-যোগে জেগে

থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম্ তাঁর সেবায় লাগবি।"

*　　　*　　　*

মনে হয় লাটুর শিক্ষার মূলমন্ত্র এই চারিটি বাক্যে সন্নিবিষ্ট—"যাগে-যোগে জেগে থাকবি।"—অর্থাৎ, সদাসর্ব্বদা তাঁর দিকে মন ফেলে রাখবি। "ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি।"—এর দুটি অর্থ হোতে পারে: একটি, রাত্রে নির্জনে তাঁকে ডাকবি; অপরটি হোতে পারে—মনে তামস ভাবের উদয় হোলেই তাঁকে ডাকবি। তৃতীয়—"কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি।"—ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট: কোন কাজেই নিজের অহঙ্কারকে বাড়তে দিবি নি। আর "হরদম্ তাঁর সেবা করবি।"— অর্থাৎ বৃথা আলস্যে দিন কাটাবি নি, সদাসর্ব্বদা তাঁর কাজ নিয়ে মশগুল থাকবি। জানি না গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার পথে ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন কি-না। তবে এই-সব কথা-প্রসঙ্গে যে-টুকু বাহির হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ঠাকুরের শিক্ষা-প্রণালীতে দিব্যস্পর্শের আভাস রহিয়াছে, দিব্য উন্মাদনার সঙ্কেত রহিয়াছে এবং সত্য পবিত্রতা ও সরলতার পথে হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবার গোপন কৌশল রহিয়াছে। এখানে বিচার ও বুদ্ধির মননক্রিয়া তত বেশী নাই, যত বেশী আছে হৃদয়ের অনুভূতির জাগরণ। অনুভূতিমূলক শিক্ষার প্রথম কথা—বস্তুর সেবা, বস্তুর বিচার নয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সেই কথাই বলিতে প্রয়াস পাইব।

সেবা

বাস্তব সেবার গোপন কথা, প্রণিপাত ব্যতীত সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যায় না, ভক্ত শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রসঙ্গ, ধনী ভক্তের কুড়ুলে নমস্কারপ্রসঙ্গ, জনৈক ভক্তকে কড়া কথা বলায় সেবক লাটুর প্রতি ঠাকুরের আদেশ, ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে উৎসবপ্রসঙ্গ, ভক্ত শ্রীযুত মনোমোহন মিত্রের গৃহে উৎসবপ্রসঙ্গ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় সনাতন শিক্ষাপ্রণালীতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ভাব বর্ত্তমান। প্রণিপাত ব্যতীত আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। অথচ প্রণিপাত বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। লাটু মহারাজ যখন বলরাম মন্দিরে বাস করিতেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে প্রণিপাতের অর্থ কি এবং ঠাকুর প্রণিপাতধর্ম্মে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবার জন্য কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একদিন জনৈক ধনী ভক্ত লাটু মহারাজকে দুহাত তুলিয়া নমস্কার করেন। তাহাতে তিনি সেই ভক্তটিকে বলেন—"দেখুন! সাধু-সন্ন্যাসী ও দেবতাকে দণ্ডবৎ হোয়ে প্রণাম জানাতে হয়। উনি (অর্থাৎ পরমহংসদেব) বলতেন—'এরকম কুড়ুলে নমস্কারে ফল হয় না।'"

সেই কথা শুনিয়া অন্য একটি ভক্ত লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজ! কুড়ুলে নমস্কার কি জিনিস?"

লাটু মহারাজ—আরে! জানো না, তোমরা ঐ যে দুহাত তুলে কপালে ঠেকাও, ওকে উনি কুড়ুলে নমস্কার বলতেন। একদিন গিরিশ বাবু ঠাকুরকে এইভাবে নমস্কার করেন। অমনি হামাদের সামনে তিনি গিরিশ

বাবুকে কোমর নুইয়ে নমস্কার করলেন। গিরিশ বাবু আবার ঠাকুরকে নমস্কার করলেন। উনি আরো নীচু হোয়ে গিরিশ বাবুকে নমস্কার করেন। এইভাবে নমস্কার করতে করতে গিরিশ বাবু যেবার মাটীতে শুয়ে দণ্ডবৎ হোলেন, সেইবার ঠাকুর তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। পরে তাই ত গিরিশ বাবু বলতেন—'এবার উনি এসেছিলেন নমস্কার করে জগৎ জয় করতে। কৃষ্ণ-অবতারে বাঁশী, চৈতন্য-অবতারে নাম, আর এবারের অস্ত্র নমস্কার।'

ধনী ভক্তটি— মহারাজ! আমরা অতশত বুঝি না—সকলে এইভাবে নমস্কার জানায়, আমরাও তাই শিখেছি। আমার অপরাধ নেবেন না।

লাটু মহারাজ— আরে! তুমি যে দোষ করেছো একথা কে বলছে? তবে উনি বলতেন কি জানো?—'সমানে সমানে নমস্কার জানাবে, কিন্তু যেখানে কেউ তোমার চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধি সাধনায়, নাম যশ ও অর্থে বড় সেখানে তাঁর কাছে মাথা নুইয়ে প্রণাম করতে হয়। যাঁকে প্রণাম জানাতে হয়, তাঁর কথা সব পালন করতে হয়, তাঁতে মনোযোগ করতে হয়। তাঁর কাছে নিজের অভিমান ও অহঙ্কার মুছে দিতে হয়।' তিনি ত হামাদের হামেশা বলতেন—'ওরে! মন-মুখ এক কোরে প্রণাম করবি। লোকদেখান প্রণামে কিছু ফল হয় না।'

আর একদিনের ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন ঠাকুর কিরূপে আপন সেবককে দক্ষিণেশ্বরে প্রণিপাতধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই কথাগুলি কাশীতে হইয়াছিল :

"দেখো! হামাদের তিনি ত হামেশা শুনাতেন—'ওরে! দণ্ডবৎ হোতে শেখ—মান-অভিমান সব দূরে চলে যাবে।' একদিন দক্ষিণেশ্বরে একজন ভক্ত ভারী বেয়াদবি আরম্ভ কোরে দিলে; হামি আর থাকতে

না পেরে তাকে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিলাম। হামার কথা শুনে তিনি ভারী দুঃখিত হোলেন। ভক্তটির ব্যথা উনি বুঝলেন। হামায় তখন (অর্থাৎ ভক্তটি চলে যাবার পর) বললেন—'এখানে যারা আসে তাদের ওরকম কড়া কথা বলতে নেই। একে ত তারা সংসারের জ্বালায় জ্বলছে; এখানে এলে তোরা যদি তাদের বেয়াদবিতে এতো কড়া কথা বলে দুঃখু দিবি, তাহ'লে তারা যায় কোথায় বলতো? সাধুসঙ্গে থাকতে গেলে কড়া কথা বলতে নেই; লোকের মনে দুঃখু হয়, এমন কথা বলবি নি।' তারপর উনি হামায় আদেশ দিলেন কি জানো? বললেন—'কাল ওখানে যাবি, যাতে সে দুঃখু না করে তাই বলে আসবি।' পরদিন হামি ত সেখানে গেলাম; বাকী হামার মনে বড় অভিমান জাগলো। হামি তাকে অনেক কথা বলে এলাম। ফিরে এলে উনি কি বললেন জানো?—'হ্যাঁরে! এখানকার প্রণাম দিয়ে এসেছিস?' হামি ত অবাক! পুনশ্চ বললেন—'যা যা শীগগীর যা, এখানকার প্রণাম জানিয়ে আয়।' হামনি ফিন তার কাছে গেলাম—প্রণাম জানাতে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না দেখে হামার মনেও বড় দুঃখু জাগলো। হামি ফিরে আসতে তিনি বললেন—'এবার তোর সব অপরাধ খণ্ডে গেলো।'"

এই দুইটি ঘটনা হইতে যাহা বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় যে, সেবক লাটুর মনের অহঙ্কার ঘুচাইবার জন্য ঠাকুর তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রণিপাতে অহঙ্কারের নাশ হয় এবং নিরহঙ্কার হইবার প্রেরণা আসে। সেবক লাটুকে নিরহঙ্কার করিবার জন্য ঠাকুর আরো কি ভাবের শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা (আমাদের অনুমান মত) বলিতেছি। পাঠকগণ এই দৃষ্টান্তগুলিকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার অনুমতি পাইবার পর ঠাকুর সেবক লাটুকে লইয়া ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের (ঠাকুর তাহাকে সুরেশ মিত্তির বলিয়া ডাকিতেন) গৃহে গমন করেন। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে ভক্ত সুরেশ মিত্তির সামান্য মাত্র উৎসব করেন। সেই উৎসবে সেবক লাটুর একটি নূতন শিক্ষা হইয়াছিল। ভক্ত সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের জন্য একছড়া ভাল গোড়ে মালা আনিয়াছিলেন। সেই মালাটি ঠাকুরকে দেওয়া হইলে ঠাকুর তাহা গলা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দেন। ইহাতে সুরেশ বাবু ভারী দুঃখিত হন এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন। ভক্তের এবম্বিধ ব্যথা দেখিয়া ঠাকুর 'ভক্তমাল' হইতে কোন-এক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীকে কোন-কিছু দান করিতে হইলে কিরূপ মনোবৃত্তি লইয়া দান করিতে হয় এবং নিরভিমানের দান যে দেবতা গ্রহণ করেন, তাহাও ইঙ্গিতে জানাইয়া দেন। তখন সুরেশ বাবু আপনার ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া পড়েন। ভক্তকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সকল কীর্ত্তনীয়াকে উচ্চভাবে উন্নীত করিয়া স্বয়ং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সুরেশ বাবুর প্রদত্ত মালাটি গ্রহণ করিয়া গলায় পরিলেন এবং সকলকে শুনাইয়া কীর্ত্তনে আখর দিলেন—"আমি জগচ্চন্দ্র-হার পরেছি। অশ্রুজলে সিক্তকরা জগচ্চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগচ্চন্দ্র-হার পরেছি।" ইত্যাদি।

লাটু মহারাজ উত্তরকালে এই ঘটনাটি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন এবং ইহারই উপর নিজের অভিজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ আলোক ফেলিয়াছিলেন—"সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের রসদ্দারদের মধ্যে একজন, তবুও ঠাকুর তাঁর দান

গ্রহণ করিলেন না। বাকী যখন তিনি কেঁদে শুদ্ধ হোলেন তখন সে মালা তিনি গলায় পরলেন।”

উপরোক্ত ঘটনাটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে হইয়াছিল, আর নিম্নোক্ত ঘটনাটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মনোমোহন মিত্রের বাটীতে উৎসব উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে লাটু মহারাজ ইহাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাসকালীন সেবক ও সাধক-অবস্থারই উল্লেখ থাকিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি :

“জানো··· কতোবার মনোমোহন বাবুর বাড়ীতে গিয়েছি, বাকী ওনার (ঠাকুরের) সঙ্গে যে-বার গেলুম, সেইবার সব কি নোতুন দেখলুম! ওনার (মনোমোহন বাবুর) ওখানে বহু ভক্ত এসেছিলেন, খুব কীর্ত্তন হয়েছিলো। ভারী ধুমধাম চলেছিলো। বাকী অনেকেই দেখলুম কেমন কেমন। মনের ভাব সব—দেখো হামি কেমন গাই, কেমন নাচি, কেমন বাজাই! জানো···! সব ঝুটা মাল দেখলুম। উনি (অর্থাৎ ঠাকুর) অনেকক্ষণ বসেছিলেন। শেষে কীর্ত্তন থামলে বললেন কি জানো?—‘নাম করবার আগে নামকে প্রণাম জানিও গো।’ ”

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—“মহারাজ! শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভাব ত আমরা ঠিক বুঝলুম না। নামকে প্রণাম জানানোর কথা আমরা ত শুনি নি বা জানি না।”

লাটু মহারাজ—তোমরা শোন নি বলে কি আর ওসব কথা থাকতে পারে না? উনি বলতেন নামকে প্রণাম জানিয়ে তবে জপে বসতে হয়। নামের কাছে শরণ লিতে হয়। নাম নামী এক। নামের কাছে আর্ত্তি জানালে তবে নামীর কাছে তা’ পৌঁছায়।

এইবার নিজের কথায় আরম্ভ করলেন—"আরে! নামই ত শক্তি, নামী ত দেওতা (দেবতা)। শক্তির সাধনা না করলে দেওতাকে পাওয়া যায় না।"

এইখানে জনৈক ভক্তের সহিত লাটু মহারাজের কথা বন্ধ করিলাম। দক্ষিণেশ্বরে সেবক লাটুকে নিরহঙ্কার ও নিরভিমান করিয়া তুলিবার জন্য ঠাকুরের দৃষ্টান্তবহুল অলৌকিক কৌশলটি কেমন সার্থক ও সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখুন।

দীক্ষা ও শিক্ষা

প্রণিপাতের সঙ্গে সেবা-শিক্ষাদানের প্রণালী, লাটুকে অঙ্গীকারবদ্ধকরণ, বুড়ো গোপাল-দাদার কথা, সেবা-সাধনায় গুরুকরণের আবশ্যকতা, গুরুর মূর্তিতে সেব্য-স্মরণের কৌশল, সেবাকে জীবনসর্ব্বস্বকরণ, শ্রীমার কথা, লাটু ঠাকুরকে কিভাবে দেখিতেন, নারায়ণ আয়েঙ্গারের প্রসঙ্গ, সেব্যের নিকট আত্মনিবেদন, প্রকৃতিভেদে সাধকের সাধনায় বিভিন্নতা, ঠাকুরের গল্প ও লাটুর টীকাটিপ্পনী

প্রণিপাত-তত্ত্বের শিক্ষার সাথে সাথে ঠাকুর লাটুকে সেবাতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। সেবা সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন লাটুকে বলিলেন—"দেখিসরে লেটো! তুই যেন বাহিরটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে! এটার (অর্থাৎ হাড়মাসের খাঁচাটার) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, তাঁর সেবা করলে সব পাবি।"

এই কথা শুনিয়া সেবক লাটু যাহা বলিয়াছিল তাহা বুড়ো গোপাল-দাদার নিকট হইতে যেমনটি শুনিয়াছি, তেমনটি লিখিয়া যাইতেছি। কেবল ব্রাকেটের মধ্যে কথাগুলি আমাদের সংযোজিত:

লাটু—এর ভেতর আবার কে আছেন? হাম্‌নি ত জানে না।

ঠাকুর—ওরে! এর ভিতরই ভগবান আছেন। শিবই জীব হোয়ে এই দেহের মধ্যে বাস করছেন।

ঠাকুরের এই কথার পর লাটু চুপ করিয়া থাকে। পরে ঠাকুর যেন কিঞ্চিৎ জোরের সঙ্গে বললেন—"দেখিসরে লেটো! তুই একে (নিজের দিকে আঙুল দেখাইয়া) ভুলিস নি। একে মেনে চলতে পারবি ত রে। দেখিস বাপু! একে যেন ভুলিস নি, খবরদার একে ভুলিস নি।" একে

কথায় লাটু কেমন যেন হইয়া যায়। পরে হাতজোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিল—"হামাকে আপুনি এতো দয়া করেন, এতো ভালবাসেন, আপুনাকে কি হাম্‌নে ভুলতে পারে? আপুনাকে না মানলে হামার নিমকহারামী হবে। হাম্‌নে আপুনার হুকুম তামিল করবে। আপুনার কথা হামি ভুলবে না।"

লাটুর কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওরে, আমার কথা নয়। ইখানকার কথা মানতে হবে।" এই বলিয়া পুনশ্চ নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকাইলেন।

তাহাতে লাটু উত্তর করিল—"ইখানকার কথা হাম্‌নে জানে না। আপুনি হামাকে ইখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।"

সেবক লাটুর এই কথা শুনিয়া ঠাকুর (বুড়ো গোপাল-দাদাকে শুনাইয়া) বলিলেন—"ওগো গোপাল! শুনো লেটো কি বলে! বলে ইখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। ইখানকার কথা কি বুঝান যায়? তুমিই বলতো, বাপু, এ কেমন আবদার!"

ঠাকুরের এই মস্করায় বুড়ো গোপাল-দাদা বলিয়াছিলেন—"আপনার ত জানা আছে, বলে দিন না।"

তাহাতে ঠাকুর বলেন—"ওগো! তোমার এ কি রকম কথা? ইখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে?"

বুড়ো গোপাল-দাদা তাহাতে উত্তর করেন—"ইখানকার কথা শোনবার জন্যই ত আমরা সব এসেছি। আমাদের না বললে আমরা জানবো কেমন করে।"

(ঠাকুর স্মিত হাস্যে)—এখন নয়। এখন নয়। ইখানকার কথা এখন নয়। সময় হোলে একদিন তোমরা সব বুঝবে।

এইখানেই বুড়ো গোপাল দাদার কথার ইতি করিয়া দিলাম।

সেবক লাটুর নিকট হইতে সেবারূপ সাধনশিক্ষার পূর্ব্বে কেন যে ঠাকুর এইরূপ স্বীকৃতি চাহিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অনুমান হয় যে, সেবারূপ সাধনশিক্ষার মূলে গুরুকরণের আবশ্যকতা আছে, তাই, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তদীয় সেবকের নিকট হইতে এইরূপ স্বীকৃতি দাবী করিয়া বসিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"শিষ্যেরা ঠিক ঠিক উপদেশ মত না চললে উত্তম গুরু জোরজবরদস্তি পর্য্যন্ত করতে ছাড়ে না।" সেই-জন্যই কি শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সেবককে এইরূপে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন?

সে যাহা হউক, সেবক-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে গুরুকরণের যে আবশ্যকতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ গুরুহীন সেবক নোঙ্গর-ছেঁড়া নৌকার মত কর্ম্মসমুদ্রে ভাসিতে থাকে। সেবকধর্ম্মের লক্ষ্য কি তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে রাজসিকতার পূর্ণ উদ্দীপনা লইয়া চলিতে থাকে ও কর্ম্মচক্রের গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া ক্লান্ত, অশান্ত ও অস্থির হইয়া পড়ে। যাহাতে লাটুর মত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন যুবক অকালে অপরিপক্ক অবস্থায় কর্ম্মোদ্দীপনার মধ্যে আসিয়া রাজসিক হইয়া না পড়ে, ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সেইজন্য লাটুকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। বলিলেন—"ওরে! দেখিস, একে যেন ভুলিস নি।"

সেবক লাটু জীবনভোর ঐ একটি কথা পালন করিয়াছে। কোন দিন তাঁহাকে ভুলে নাই—কোন দিন তাঁহার কথা অমান্য করে নাই, কোন দিনই তাঁহার নিকট অকৃতজ্ঞতা দেখায় নাই। শুধু দক্ষিণেশ্বরে নয়, শুধু ঠাকুরের জীবনকালে নয়, ঠাকুরের দেহাবসানেও লাটুর সেই একই ভাব, সেই একই প্রেরণা, সেই একই কামনা—"তাঁকে যেন না ভুলি।"

সেবকের মনে সেব্যকে স্মরণ রাখিবার কৌশলটি ঠাকুর এই ভাবেই দৃঢ় করিয়া তুলিলেন। সেব্যের স্মরণ-মননে দিনাতিপাত করিতে বলিয়া ঠাকুর নিজেকে গোপন করিলেন সেবকের কাছে। তিনি জানিতে দিলেন না যে, তিনিই সেই; অথচ ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁহাকে ধরিয়া তাঁতেই পৌঁছান যাইবে। সেবক লাটুও তাঁতেই পৌঁছিবার জন্ম তাঁহাকে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) ধরিয়াই সেবার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) অবলম্বন করিয়া সাধন-জীবনের সূত্রপাত করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তীকালে গুরুভ্রাতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন—"ঠাকুরকে ঠিক ঠিক লেটোই ধরেছে, আমরা শুধু তাঁর উপদেশের জাবর কেটেছি।" [এই কথাটি শ্রীম'র মুখে শুনিয়াছি। শ্রীম নিজের কথা বলেন নাই—নরেন ভাইয়ের কথা (বিবেকানন্দের কথা) বলিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।]

একজন মানুষ যে আর একজনকে 'জীবন-সর্ব্বস্ব' করিতে পারে এ ভাবটি লাটু মহারাজকে না দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম না। অনেকে অনেকের জন্ম প্রাণপণ করিতে পারে মানি, কিন্তু অহঙ্কার ও আত্মাভিমানকে মুছিয়া দিয়া, একজন যে আর একজনকে আপনার 'সর্ব্বস্ব' বলিতে পারে এবং সেইভাবে জীবনযাপন করিতে পারে—ইহা বাস্তবিকই জগতে অতি বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সেবক লাটু পরমহংসদেবকে অবতার বলিয়া ভাবিত না, বা পরবর্ত্তীকালে অবতার বলিয়া তাঁহার পূজা করিত না, বরং কাশীতে বসবাসকালে শ্রীযুত নারায়ণ আয়েঙ্গারের (শ্রীবাসানন্দ) প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তা'হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না, তাঁর ধারে থাকা যায়?"

লাটু মহারাজের এই উত্তরে মাদ্রাজী ভক্তটি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করেন—'ঠাকুরকে আপনার কি মনে হয় ?'

লাটু মহারাজ— তিনি সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ, আর কি মনে করবো ?

তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মাদ্রাজী ভক্তটি পুনরায় প্রশ্ন করেন— "ঠাকুরকে কি ভগবান বলে আপনার মনে হয় ?"

লাটু মহারাজ— আরে ! তাঁরই ত কথা—শিবই জীব হয়ে ঘটে ঘটে বিরাজ করেন। তোমাদের এ কেমন ভাব জানি না। তিনি কি ছিলেন তা' কি হামনেই বুঝেছি ? নোরেন ভাই কুছু বুঝেছে—সেই ত হামাদের বুঝালে।

নারায়ণ আয়ঙ্গার—কি বুঝালেন ? মহারাজ !

লাটু মহারাজ—তাঁর বই পড়ো, সব পাবে।

নারায়ণ আয়েঙ্গার—তিনি ত ঠাকুরকে অবতার বলেন না।

লাটু মহারাজ (হাসিতে হাসিতে)—দশ অবতারের মধ্যে ত তাঁর নাম নাই—বিবেকানন্দ ভাই ত ঠিকই বলেছে। কই ভাগবতে আছে ?

নারায়ণ আয়েঙ্গার—এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, মহারাজ !

লাটু মহারাজ (কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাণ দেখাইয়া)—তা'হলে হামায় কেনো জিগগেস করছো ? হামি যা' বলবে, তাই কি তোমার বিশ্বাস হবে ? তোমার যা মনে হয়, তুমি সেইভাবে তাঁকে মানো। হামার কথায় ত তোমার বিশ্বাস আসবে না। দেখতে পাচ্ছো যে, তাঁর জন্য হামি এখনো বসে আছি। হামি জানে তিনি ছাড়া হামার গতি নেই !*

* এই কথোপকথনটি শ্রীবিভূতিভূষণ মৈত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তিনি শ্রীযুত আয়েঙ্গারের সহিত লাটু মহারাজের সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন। সাধু সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত 'সৎকথায়' ইহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্মকথা দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সঙ্গ পাইবার পর হইতেই সেবক লাটুর মনে 'তিনি ছাড়া হামার গতি নেই' এইরূপ ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনের সূত্রপাতেই এই ভাব দৃঢ় হওয়ায় সেবক লাটুর অন্তর্দ্বন্দ্ব কমিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার দরুন আত্মকর্ত্তৃত্ববোধ মুছিয়া গিয়াছিল। আমরা সাধারণতঃ নিজের বুদ্ধিকে নিজের উন্নতির জন্য চালিত করিয়া থাকি ; সেইজন্য নিজের বুদ্ধির দৃষ্টি ও পরিধি যতটুকু বিস্তৃত, ততটুকুর মধ্যে আমাদের উন্নতির আস্পৃহা আবদ্ধ : ততটুকু উন্নতিই আমাদের করায়ত্ত। যদি আমাদের বুদ্ধির দৃষ্টি ও পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এটুকু ঠিক যে, আমাদের আস্পৃহাও সেই ব্যাপকতাকে ঘিরিয়া চলিতে থাকিবে। সাধারণ মানুষ সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে নিজের বুদ্ধির দৃষ্টি ও পরিধিকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু যাঁহারা উদার ও অনাসক্ত, (তাঁহাদের নিকট সাংসারিক প্রয়োজন যথাসর্ব্বস্ব না হওয়ায়) তাঁহারা তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে আরো ব্যাপক পরিধিযুক্ত করিয়া লইতে পারেন এবং সেইভাবের আস্পৃহান্বিত হইয়া জীবনযাপন করিতে পারেন। আমাদের লাটু মহারাজও যৌবনে সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় এইরূপ সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিলেন—তিনি সংসারের সেবা করিবেন, না আরো বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যের সেবা লইয়া থাকিবেন। তিনি আপন বুদ্ধিকে সংকীর্ণ করিয়া জীবন পথে চলিবেন, না যথার্থ উদার ও অনাসক্ত গুরুর বুদ্ধিতে চালিত হইবেন।

একে নিরক্ষর, তাহার উপর আবার ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তিনি আত্মসমর্পণের পথ বিনা দ্বিধায় বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যদি আমাদের মত তথাকথিত শিক্ষিত ও বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব হইতেন তাহা

হইলে তাঁহাকে আমাদের মত অন্তর্দ্বন্দ্বে কাবু হইয়া পড়িতে হইত, সন্দেহ নাই। ঠাকুরের যে কয়জন শিক্ষিত ভক্ত বা অন্তরঙ্গ দেখা যায়, ঠাকুরকে গ্রহণ করিবার কালে, তাঁহাদের সকলের মনে সংশয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে যথাসম্ভব নিজ নিজ বুদ্ধির দৌড়-মাফিক পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কি, কেহ কেহ ঠাকুরকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লাটু ঠাকুরকে কখনো সেইভাবে পরীক্ষা করে নাই। ঠাকুর যখন যাহাই বলিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাসী হইয়া লাটু সেই কাজ করিয়াছে—কখনো প্রশ্ন তুলে নাই—'এ কাজ করিব কেন?' শৈশবে শিশু যেমন পিতামাতার হস্তে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, লাটুও সেইরূপ পিতৃজ্ঞানে পরমহংসদেবের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাই ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'দেখো! সংসারে দুরকম সাধক আছে—এক রকম সাধকের বানরের ছাঁর স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছাঁড় স্বভাব। বানরের ছাঁ নিজে যো সো ক'রে মাকে আকড়িয়ে ধরে। ··· বিড়ালের ছাঁ কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে প'ড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে—মা যা' করে। ··· সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। মা তার কান্না শুনে নিজে ধরা দেয়।' এই কথাগুলির মধ্যে বিড়ালের ছাঁর স্বভাবটি সেবক লাটুর মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। আর পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়াই লাটু নিজে আত্মকর্তৃত্ববোধ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিল।

সেবাধর্ম্মের সূত্রপাতে নিজেকে মুছিয়া দিতে হয়। কারণ, নিজেকে মুছিয়া দিতে না পারিলে যথার্থভাবে কাহারও শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যা

করা সম্ভব নয়। আমরা ভাবি যে, শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করা বড় সহজ, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে. অন্তরের দরদ না থাকিলে শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার কার্য্যটি হইয়া উঠে অতি বড় বোঝা—বড় একঘেয়ে, বড় মর্ম্মবেদনাদায়ক, বড় উৎকণ্ঠাযুক্ত। সেইরূপ সেবায় সেবকের মন আশা-নিরাশার দোলায় দোতুল্যমান হইয়া থাকে—সেইরূপ সেবায় সেবকের লাভালাভের দিকে দৃষ্টি থাকে। যেখানে লাভের সম্ভাবনা নাই সেইখানে সেবা-প্রবৃত্তির মধ্যে প্রায়শঃই দরদ-হীনতার প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইরূপ দরদ-হীন প্রাণের সেবা মানুষকে উন্নীত করিতে পারে না, এমন কি, মানুষের বুদ্ধিকেও উদার ও মহৎ করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু দরদী সেবা মানুষকে উন্নীত করে, মহৎ করে, এমন কি উদারও করিয়া তুলে। দরদী সেবা বলিতে উৎকণ্ঠাযুক্ত সেবা বুঝিবেন না। উৎকণ্ঠাযুক্ত সেবা ও দরদী সেবায় যথেষ্ট পার্থক্য। উৎকণ্ঠায় ভয়ের উদ্রেক হয় কিন্তু দরদে ভয় থাকে না, উৎকণ্ঠায় ফলাকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকে কিন্তু দরদে সেইরূপ কোন ফলাকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে না। ঠাকুর তাই লাটুকে দরদী সেবার মর্ম্মকথায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখ! কোন কিছুতে আশা রেখে চলবি নি—সব তাঁর হাতে ছেড়ে দিবি। তাঁকে ধরে থাকলে সব পাবি, সব জানবি, কিন্তু তাঁকে ছাড়লে কোন কিছু পাওয়ারই শেষ করতে পারবি নি।" *

সেবা বলিতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা লাটু মহারাজের মুখ হইতে যেভাবে শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি! (মনে রাখিবেন যে, উত্তরকালে লাটু মহারাজ যেকথা

* ঠাকুরের এই কথাগুলি শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত কথাপ্রসঙ্গে লাটু মহারাজের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।

বলিতেন বা উপদেশ দিতেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-অভিধান হইতে সংগৃহীত হইত। তিনি নিজের কথা বড় বেশী বলিতেন না; পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে যেভাবে চলিতে বলিয়াছিলেন তাহাই তিনি নিজ ভক্তমণ্ডলীর নিকট উদ্ধৃত করিতেন।)

"উনি হামাদের বলতেন কি জানো…! লোককে খাওয়ান একরকম তাঁরই (ভগবানের) সেবা করা। সকলার মধ্যে তিনি (ঈশ্বর) ত রয়েছেন। তিনিই ত ক্ষুধারূপে সকলার ভেতরে আসছেন। সেই আগুনে আহুতি দিলে তাঁরই ত সেবা হোলো, কি বলো?"

তদুত্তরে জনৈক ভক্ত বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, মহারাজ! তা' একরকম হোলো বই কি? কিন্তু আমাদের সে বোধ কই? আমরা ক্ষুধা পেলে খাই, ঘুম পেলে ঘুমাই, তাঁর কথা ত মনে হয় না। মনে হয় আমার ক্ষুধা, আমার ঘুম পেয়েছে। আপনি কি এই আমার-বোধকে তাঁর (অর্থাৎ ভগবান) বলে ধরছেন?"

লাটু মহারাজ—হ্যাঁ! তোমার ত ক্ষুধা পায়; ঘুম পায়। আচ্ছা বলতো—তুমি কে? তুমি কি?—হাত, না পা, না দেহ, না মন, না কি? তোমার এই বোধটা কুথাকে এলো?

জনৈক ভক্ত—তা জানিনি মহারাজ! আমি যে কে, তা আমি জানি না; কিন্তু বুঝি বেশ যে, আমার খিদে পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে, আমার অমুক জিনিস চাই, অমুক জিনিস পেলে আমি খুশী হই। ইত্যাদি। *

* * *

* এর পরবর্ত্তী কথাগুলি এখানে সন্নিবেশিত করিলে সেবাপ্রসঙ্গ হইতে আমাদের দূরে সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাই এখানে আর এই প্রসঙ্গ তুলিলাম না। ইহা বলরাম মন্দির ও কাশীর অধ্যায়ে পুনশ্চ বলা হইয়াছে।

অন্য আর একদিনের কথা।

"দেখো…! উনি বলতেন লোককে দান করা একরকম তাঁর (ভগবানের) সেবা করা। সংসারী লোক যদি কাউকে দান করে আর সে যদি মান না চায়, যশ না চায়, স্বর্গ না চায়, আউর যাদের দান করছে তাদের থেকে কোন উপকার না চায়, তাহলে সেই দানে ভগবান খুশী হয়, জেনো! তোমরা যে দান করো, তাতে ভগবানেরই সেবা করা হয়। বাকী চালাকী করে দান করলে তোমার দান সেথায় পৌঁছবে না।"

জনৈক ভক্ত—চালাকী ক'রে দান করা কিরূপ? মহারাজ!

লাটু মহারাজ—কুছু উপকারের পিত্তেশ রেখে দান করলে চালাকীর দান হোলো, বাকী ও রকম চালাকীতে শেষে বোকা বনতে হবে।

জনৈক ভক্ত—বোকা বনতে হবে কেন? মহারাজ!

লাটু মহারাজ—আরে! যারা আগে জিতে, শেষে ঠকে, তাদের তোমরা কি বল?—'বোকা' বল তো? বাকী যে আগে ঠকে, শেষে জিতে, সেই ত চালাক। কেমন—তাই না?

* * *

অন্য আর একদিনের কথা।

"উনি কি বলতেন জানো…! 'যা কিছু করো না কেন সব তাঁতে (ভগবানে) গিয়ে পৌঁছবে।' তোমরা ভাবো—'ডুবে ডুবে জল খাই, শিবের বাবার সাধ্য নেই' (এখানে প্রবাদবাক্যের মধ্যে যে 'বুঝা' কথাটি আছে তাহা লাটু মহারাজ বলিতেন না)। আরে! তোমরা কি চালাকী করবে? যিনি এতো বড়ো সংসার চালাচ্ছেন, তাঁর কাছে তোমাদের চালাকী খাটবে কেনো? তোমাদের সব ভাল মন্দ তাঁর কাছে পৌঁছবে। এতো তাঁরই খেলা। উনি বলতেন—'সব কিছু করবার আগে তাঁকে মনে

মনে ডেকে কাজে লাগতে হয়—কাজের ফুর্‌সতে তাঁকে ডেকে নিতে হয়, কাজ শেষ হোলে তাঁকে আবার ডাকতে হয়। যে এভাবে তাঁর সেবায় লাগতে পারে তার আবার ভাবনা কি ?' ”

পাছে লাটুর মত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন যুবক অকালে অপরিপক্ক অবস্থায় জীবসেবা লইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া বসে, ঠাকুর সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাই সেবার সূত্রপাতেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। শাস্ত্রের ভাষায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক সেবার কথা না বলিয়া ঠাকুর ইঙ্গিতে লাটুকে সেবার ত্রিবিধ ভাবের কথা জানাইয়া দেন এবং এই ত্রিবিধ সেবার মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাব ও মনোবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা যথাকালে ও যথাস্থানে বুঝাইয়া দেন। তিনি লাটুকে নানাস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। নানা ভক্তকে দেখাইয়া নানাভাবে তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই কথা বলা হইয়াছে।

সেবক-জীবন

সেবক-জীবনের ঘটনাবলী (১৮৮১—১৮৮৫), সেবাকালে বাহ্যশুচির প্রয়োজনীয়তা, আন্তর শুচির প্রয়োজনীয়তা, সেব্যের প্রতি মনোযোগের আবশ্যকতা, ভিক্ষা ক'রেও সেব্যের তুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয়তা, মহাপ্রভুর ছবির কথা, শরৎ মহারাজের মায়ের কথা, ঠাকুরের জন্য লাটুর চচ্চড়ি আনয়নের কথা, ব্রাহ্মভক্তের গৃহ হইতে ফুলের তোড়া আনয়নের কথা ও ঠাকুরের সমাধি, শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় লাটুর নিযুক্ত হওয়ার কথা, ভগবান ঘুমায় কি-না প্রসঙ্গ, সেবক লাটুর ভুলভ্রান্তিতে ঠাকুরের তিরস্কার ও অপরাধমার্জ্জন, ভক্ত জ্ঞান চৌধুরীর গৃহে লাটুর শিক্ষা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব, উৎসবরাত্রে কলিকাতায় আগমন, পরদিন নরেন্দ্রের সহিত কথোপকথন, রাখাল মহারাজের কথা (পান-সাজার বিবরণ), প্রতাপচন্দ্র হাজরার কথা (ঠাকুরকে উপদেশ দান), ভক্ত-পালক বলরাম বসুর গৃহে প্রথম আগমন (সেইখানে রাখাল প্রভৃতির কীর্ত্তন ও নিত্যগোপাল-প্রসঙ্গ), ভক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহোৎসবে লাটু, ঠাকুরের সহিত মাহেশের জগন্নাথ ও চানকের অন্নপূর্ণা-দর্শন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-দর্শনে, সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে গমন ও শিবনাথ শাস্ত্রীকে প্রথম দর্শন, ভক্ত শ্রীযুত মণি মল্লিকের সহিত ঠাকুরের কথোপকথন ও লাটুর শিক্ষালাভ, বেলঘোরে শ্রীযুত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে গমন, ভক্ত শ্রীঅধর সেনের গৃহে আগমন (সাহিত্যসম্রাট শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দর্শন ও চণ্ডীগান-শ্রবণ), ঠাকুরের দ্বিতীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে লাটুর কীর্ত্তনে যোগদান, সেবক লাটুর পেনেটী গমন ও শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ভক্ত শ্রীযদু মল্লিকের গৃহে গমন ও সিংহবাহিনী-দর্শন, সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে লাটুর শিক্ষা, ভক্ত জয়গোপালের গৃহে গমন, কাঁকুড়গাছির বাগানে ঠাকুরের আগমন, ভক্ত ঈশানচন্দ্রের গৃহে ঠাকুরের সহিত লাটুর আগমন, ঠাকুরের তৃতীয় জন্মোৎসব, ঠন্ঠনে ভূধর বাবুর গৃহে আগমন ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দর্শন, সেবক লাটুর থিয়েটার দর্শন, বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তমন্দিরে অন্নকূট-উৎসবে লাটু

এইবার আমরা লাটুর সেবক-জীবনের ঘটনাবলী আরম্ভ করিতেছি। সেবক-জীবনে নানা ঘটনা ঘটিয়াছিল, সবগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি যেগুলির দ্বারা তাঁহার সেবক-জীবন পুষ্ট হইয়াছিল এবং সেব্য নির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছিল তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। লাটু

মহারাজের সমগ্র জীবনটি জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, মাত্র কতকগুলি ঘটনার কথা জানি। সজ্জিত করিয়া তাঁহার জীবনটি আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

লাটু মহারাজ প্রায়ই বলিতেন—"ওরে! সেবা করা বড় কঠিন। যারা মা-বাপেরই সেবা করতে পারে না তারা আবার গুরুর সেবা করবে কি? গুরুকে যেদিন মা-বাপের মত ভাবতে পারবে, সেদিন সে তাঁর কুছু সেবায় লাগবে, বাকী তার আগে তাঁকে সেবা করতে পারবে না। সেবার সময় কতো ধমক খেতে হয়। তিনি ত হামাদের কতো ধমকাতেন, বাকী যদি রাগ কোরে হামরা বসে থাকতুম, তা হলে কি তাঁর সেবায় লাগতে পারতুম?"

এরূপ কথা তাঁহার নিকট হইতে কতবার যে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিনের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি:—

একদিন লাটু অপরিষ্কৃত স্থানে স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'ওরে! এটা স্নানের জল—স্নান কোরে মানুষ শুদ্ধ হয় আর তুই কিনা সেই স্নানের জলটি নোংরা জায়গায় রাখলি? অশুদ্ধ জিনিসে কি কেউ পবিত্র হয়? জল নারায়ণ। তাই বলে কি নোংরা জলে ঠাকুরসেবা হয়? কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে আবার কোন জলে আঁচান, বাসনমাজা, কাপড়কাচা ইত্যাদি চলে কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না।' (মাণিকতলার কোন এক গৃহী ভক্তের নিকট এই কথা শুনিয়াছি। তিনি সেইদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন।)

*　　　*　　　*

আর একটি ঘটনা। কয়েক বৎসর ঠাকুরের এমন একটি অবস্থা

হইয়াছিল যে, তিনি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। সেই অবস্থায় লাটু প্রায়ই ঠাকুরের গাড়ু লইয়া যাইত এবং যখন সে দক্ষিণেশ্বরে থাকিত না তখন অন্য লোকের উপর সেই কাজের ভার পড়িত। একদিন রাতে ঠাকুর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। সেইকালে লাটু বা হরিশ কেহই উপস্থিত ছিল না। লাটু মহারাজ ইহাকে উপলক্ষ করিয়া পরবর্ত্তীকালে বলিয়াছিলেন—"জানো…! সেদিন হামার জপে মন বসলো না—হামার জপ ছুটে গেলো। হামি ঠাকুরের ঘরে ফিরে এলুম। উনি ঘরে নাই দেখে মন বড় বিগড়ে গেলো। বললুম—আপুনি কোথা? উনি তখন শৌচে গেছেন বুঝে, হামি গাড়ু নিয়ে সেখানে গেলুম। ফিরে এসে তিনি হামাকে কি বললেন জানো? 'ওরে! যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হয়, হুঁশ রাখবি। তবে ত সেবার ফল পাবি।' আর হরিশকে সেদিন কি বলেছিলেন, জানো? 'ওরে! তুই যার ধ্যোন করছিস, সে এক গাড়ু জলও পায় না। এ রকম ধ্যেনে কি ফল হবে রে?'"

* * *

অন্য আর একদিনের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুর লাটুকে সেবার যথার্থ রূপটি দেখাইয়া দেন। সেবা বলিতে যে শুধু দৈহিক শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা বুঝায় না তাহা ঠাকুর চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—'দেখ! ভিক্ষা কোরেও যদি কেউ তাঁকে ভাল ভাল বস্তু উপহার দেয়, তাহলে তার সেবা উত্তম জানবি।' এই বলিয়া তিনি 'ভক্তমালের' একটি গল্প বলেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

একদিন লাটু শুনিল যে, মহাপ্রভুর একখানি ছবি ঠাকুর নিজের

ঘরে রাখিতে চাহেন। পরদিনই কলিকাতায় আসিয়া লাটু রাম বাবুর নিকট হইতে একখানি মহাপ্রভুর ছবি লইয়া ঠাকুরের ঘরে রাখিয়া দেন। ছবিখানি দেখিয়া ঠাকুরের কত আনন্দ। তিনি বারে বারে লাটুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে! তুই রামের কাছ থেকে চেয়ে আনলি, রাম কি ভাবলে বলতো? আমার নাম কোরে চেয়ে আনলি?" ঠাকুরের এইসব প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিল—'না, আপনার নাম কোরে আনিনি।'

'তবে?'

'হামায় একখানা মহাপ্রভুর ছবি দিবেন'—এই কথা বলেছি।

'একথা বললি! রাম কি বললে?'

'উনি আমাকে মার কাছ থেকে চেয়ে নিতে বললেন।'

ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'বেশ বেশ। দেখিস বাপু! আমার নাম কোরে যেন চাসনি!'

*   *   *

আর এক দিনের ঘটনা। লাটুকে ঠাকুর কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন—শরৎ মহারাজের বাটীতে। সেখানে শরৎ মহারাজের মা লাটুকে আহার না করাইয়া ছাড়িলেন না। তাহাতে লাটুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অপরাহ্ণ হইয়া যায়। এত বিলম্ব হওয়ায় ঠাকুর লাটুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'দুপুরে খেয়েছিস ত রে, না সারাদিন না খেয়ে আছিস?'

লাটু—আজ শরোটের মা যা খাওয়া খাওয়ালে কী বলবো! তাইত এতো দেরী হোলো। শরোটের মা কেমন সুন্দর রাঁধেন। আজ এমন চচ্চড়ি তিনি রেঁখেছেন যে, হামিনে জীবনে খায়নে, মোশাই।

ঠাকুর—বলিস কি রে? তুই একা সেই চচ্চড়ি খেয়ে এলি—ইখানকার জন্য আনলি নি?

লজ্জায় লাটু অধোবদনে রহিল। তাহাকে লজ্জিত দেখিয়া ঠাকুর পুনশ্চ বলিলেন—'দেখ! কাল শরতের মায়ের কাছ থেকে ইখানকার জন্য চচ্চড়ি রাঁধিয়ে আনবি।'

লোভমুক্ত ঠাকুরের যে সত্যই চচ্চড়ি খাওয়ার লোভ হইয়াছে, একথা বলা শোভা পায় না। এখানে মানিতে হইবে যে, সেবককে সেবাধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব কৌশল। আত্মবৎ সেবা—নিজের যাহা ভাল লাগে তাহা দিয়াই সেব্যের মনস্তুষ্টি করিতে হয়। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি পরদিন পুনরায় শরতের গৃহে লাটুকে পাঠাইলেন। পরদিন লাটু সত্যসত্যই ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিল এবং শরৎ মহারাজের মায়ের নিকট হইতে চচ্চড়ি চাহিয়া আনিল। গুণগ্রাহী ঠাকুর তাহার আস্বাদনে প্রীত হইয়া বলিলেন—'ওরে! তুই যা বলেছিস ঠিক কি তাই? এমন চমৎকার রান্না চচ্চড়ি ত আগে খাইনি। শরতের মার মন ভালো, তা না হোলে কি রান্না এমন সুস্বাদু হয় রে?'

* * *

আর একদিনের ঘটনা। এদিনে লাটু কলিকাতাস্থ এক ব্রাহ্ম পরিবারের নিকট হইতে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়। ঠাকুর সেই তোড়াটি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন—'দেখ! যাতে উদ্দীপন হয় এরূপ বস্তু সাধুকে উপহার দিতে হয়।' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হন।

আর একদিনের ঘটনা বলিতেছি। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে

কালীমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে-নহবতখানা আছে তাহারই ছোট ঘরখানিতে শ্রীশ্রীমা বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী; আশ্চর্য্য, ঠাকুরের অতি নিকটে থাকিয়াও তিনি অতি সঙ্গোপনে দিন-যাপন করিতেন—কদাচ কাহারো সামনে আসিতেন। সেইকালে গোলাপ-মা প্রভৃতি মায়ের অন্তরঙ্গ ভক্তের আগমন না হওয়ায় শ্রীশ্রীমাকে বড় নির্জন জীবনযাপন করিতে হইত। এমন দিনে মায়ের গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য ঠাকুর লাটুকে নিয়োগ করিলেন। একদিন ঠাকুর দেখেন যে, লাটু গঙ্গাতীরে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে লেটো! তুই এখানে বোসে আছিস্ আর উনি (শ্রীশ্রীমা) যে নহবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না।' এই কথা শুনিয়া লাটু যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ঠাকুর ইতঃপূর্ব্বে লাটুকে মায়ের সাহায্য করিতে কোনদিন আদেশ করেন নাই। সহসা ঠাকুরের নিকট হইতে এবম্বিধ আদেশ পাইয়া লাটু নিজেকে ধন্য মনে করিল এবং তৎক্ষণাৎ ত্বরিতগমনে ঠাকুরের সহিত নহবতে উপস্থিত হইল। সেইখানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব শ্রীমতী সারদাদেবীকে বলিলেন—'দেখ গো! এ ছেলটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব, এ তোমার ময়দা ঠেসে, রুটী বেলে দেবে, তোমার যখন যা' প্রয়োজন হবে একে বোলো, এ করে দেবে।"

উপরোক্ত কথা কয়টি ছোট বটে কিন্তু ইহাতে সেবক লাটুর তৎকালীন দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধ অবস্থার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। সেবককে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিবার অধিকার দিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সেবক লাটু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই যে, আপন

সত্তাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিতে পারিয়াছিল, তাহা ঠাকুরের কথার পর আর পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

আর এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর শুদ্ধসত্ত্ব সেবকের সেব্য সাধনার উপর এক অভিনব আলোকপাত করিলেন। মনে হয়, তিনি ইহার দ্বারা সাধারণকে শিখাইতে চাহিলেন যে, প্রকৃত সেবায় মন পাকাইতে হইলে শুধু সেব্যের তৃপ্তিবিধায়ক সেবা করিলে চলিবে না—সেব্যের প্রিয়জনের ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও সেবা করিতে হইবে।

পরবর্তীকালে যখন তিনি কাশীতে ছিলেন তখন এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন—"দেখো! মা কতো কষ্টে না দিন কাটিয়েছেন! সামান্য এইটুকু ঘরে তিনি কতো দিন রইলেন, কেউ জানতে পারতো না। কখন যে গঙ্গাস্নানে যেতেন, কেউ টের পেতো না।··· মার মত বৈরাগ্য হাম্‌নি ত দেখে নি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে? হামার বহু ভাগ্য যে, উনি হামাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন—মায়ের কৃপায় হামার জীবন ত সার্থক হয়ে গেছে। ··· হামি আর তাঁর কি সেবা করেছি? তিনিই ত হামাকে ভালবাসা দিয়ে বেঁধেছেন। হামাদের কাছ হোতে তিনি ত কুছু পাবার আশা রাখেন না, বাকা তাঁর দয়ায় হাম্‌নে তাঁকে পেয়েছি।"

এ-রকমের বহু ঘটনাই আছে। উপরোক্ত ঘটনাগুলি সব ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে-সব ঘটনায় সেবক লাটুর শিক্ষা-সৌকর্য্য ঘটিয়াছিল তাহা এইবার বর্ণিত হইতেছে। আমরা ঘটনাগুলিকে কালানুযায়ী বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেইভাবের আলোচনায় কতকগুলি অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায় আমরা এখন ছাত্র লাটু,

সেবক লাটু, তাপস লাটু, সাধক লাটু ইত্যাদি অধ্যায় বিভাগ করিয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের জীবনটি আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এইবার যে ঘটনাটি বলিতে চাহি তাহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। একদিন বহু পরিশ্রমের পর (সেইদিন দক্ষিণেশ্বরে খুব সংকীর্ত্তন হইয়াছিল) রাত্রে ঠাকুরকে বাতাস করিবার সময় লাটু ঢুলিতে থাকে। লাটুকে ঢুলিতে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কি-না?"

ঠাকুরের এই প্রশ্ন শুনিয়া লাটু ত অবাক! বিস্মিতভাবে বলিল—"হামনে জানে না।"

গম্ভীরভাবে ঠাকুর বলিলেন—"ওরে! সবাই ঘুমোতে পারে, জীব-জগতে সকলেই ঘুমের অধীন কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমোলে সব অন্ধকার—জগতে মহাপ্রলয় ঘটে যায়। তিনি সারারাত সারাদিন জেগে জেগে জীবজন্তুর সেবা করছেন, তাই নির্ভয়ে জীবজন্তু ঘুমোতে পারছে।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া লাটু জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"তিনি জীবজন্তুর সেবা করছেন আর জীবজন্তু তাঁরই সেবা গ্রহণ কোরে ঘুমোচ্ছে?"

ঠাকুর—হাঁারে হ্যাঁ, ঠিক তাই। জীবজন্তুকে ঘুম পাড়িয়ে তিনি জেগে থাকেন!

এর পরে কি কথা হইয়াছিল তাহা লাটু মহারাজ আমাদের বলেন নাই। এইটুকু বলিয়া তিনি চুপ করিয়া যান—যেন কোন্ অতীতের ঘটনা সহসা তাঁহার চোখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দৃশ্যটি যেমন মধুর, তেমনি করুণ। ভক্তটি তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও সেইদিন তাঁহার নিকট হইতে আর কোন কথা শুনিতে পায় নাই।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ঘটনা ঘটে। ঠাকুর যখন কোথাও যাইতেন, তখন সেবক লাটু তাঁহার সঙ্গে থাকিত এবং ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যথা—গাম্‌ছা, বেটুয়া প্রভৃতি সমস্তই তাহাকে লইয়া যাইতে হইত। একবার এইরূপ কার্য্যে লাটুর ভুল হয়। লাটু গামছা ও বেটুয়া না লইয়াই ঠাকুরের অনুগমন করে। ভক্তগৃহে উপস্থিত হইয়া লাটু নিজের ভুল বুঝিতে পারে এবং অতি সন্তর্পণে ঠাকুরের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিতে থাকে। তাহাতে ঠাকুর লাটুর প্রতি বিরক্ত হইয়া সেই ভক্তগৃহেই তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন—"হ্যাঁরে লেটো! এমনি তোর ভোলা মন যে, সামান্য জিনিস আনতেও ভুল করলি। আমার ত কোমরে কাপড় থাকে না, তবু কখনো ওসব জিনিস নিতে ভুল হয় না। তোর এ রকম ভোলা মন হোলে চলবে কি ক'রে রে? এমন করলে ত বাপু···।"

এর পরবর্ত্তী কথা কি বলিতেন তাহা জানি না কিন্তু সেইখানেই ঠাকুর চুপ করিয়া যান। ঠাকুরের বিরক্তিতে লাটু অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং সম্মুখে মনিব শ্রীরাম দত্তকে উপস্থিত দেখিয়া লাটু তাঁহার নিকট অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিল—"হাম্‌নে এমন ভুল আর করবে না। একবার ওনাকে···।" আর বলিতে পারিল না। লজ্জিত ক্রন্দনের উদ্গত উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া বসিল।

ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরের এইরূপ গম্ভীর মূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই। তাই অনেকেই ঠাকুরের সেই গাম্ভীর্য্যকে লঘু জ্ঞান করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, প্রবীণ ভক্ত রাম বাবু ও মনোমোহন বাবুর উপরোধে ঠাকুর প্রসন্ন হন এবং লাটুকে সেইবারের মত ক্ষমা করেন।

এর পরের ঘটনা। সেবক লাটু শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত ভক্ত জ্ঞান চৌধুরীর গৃহে গমন করে। সেইখানে বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিত একজন। (পণ্ডিতগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারেন এবং ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য-বিভূতি হরণ করিয়া লন)। সেই উৎসবে গৌরী পণ্ডিতের সহিত সেবক লাটুর প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে লাটু একটি বহুমূল্য উপদেশ শুনিয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহা তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন—"গৌরী পণ্ডিত কি বলতো জানো—? নিজে অনুভূতি করা আর বই পড়া অনেক তফাৎ। বই পড়ে মানুষের মূর্খতা কাটে না; যতক্ষণ না মানুষের ভিতর তাঁর (ভগবানের) আলোক পড়ছে, ততক্ষণ মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তাঁর আলো এলেই সব অন্ধকার ঘুচে যায়, সকল মূর্খতার নাশ হয়; এমন কি, তাঁর আলোতে সত্যবস্তু যে কি তাহাই উপলব্ধ হয়।"*

সেই বৎসর হইতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে যাবতীয় ব্যয় ভক্তগণই বহন করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ভক্ত সুরেশ মিত্রের ও ডাক্তার রাম দত্তের দান সব চেয়ে বেশী। সেইদিন লাটুর খাটুনীর শেষ ছিল না। দিনভর অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন বিশ্রাম করিতে যাইতেছিল, সেই সময় ভক্ত মনোমোহন বাবু লাটুকে কোন একটি কাজের ভার দেন। লাটু তাহাও অম্লানবদনে পালন করিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুর তাহাকে কলিকাতাস্থ কোন এক ভক্তের গৃহে যাইতে বলেন। ভক্তটি জন্মোৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। তাই অহেতুক-কৃপাময় ঠাকুর আপন সেবককে দিয়া তাঁহারই গৃহে প্রসাদ পাঠাইলেন।

* এই কথাগুলি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি লাটু মহারাজের ভাষায় লিখেন নাই। সেইজন্য আমরা লাটু মহারাজের ভাষায় গৌরী পণ্ডিতের উপদেশ দিতে পারিলাম না।

তাহাতেও সেবক লাটুর মনে বিন্দুমাত্র বিরক্তির উদয় হয় নাই। ভক্তগৃহে উপস্থিত হইয়া লাটু আর সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গমন করে নাই, সেইখানে রাত্রিবাস করিয়াছিল। পরদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার নিম্নলিখিত কথালাপ হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ (অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ) তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। তাই ঠাকুরের সেবক লাটুকে উপস্থিত দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত ভোরে কোথা থেকে এলি রে? ওখানকার খবর কি?"

লাটু— কাল উথানে কতো উৎসব হোলো, আপনি যান নাই কেনো? আপ্‌নাকে উনি অনেক খুঁজেছেন। হামার সঙ্গে আজ উথানে চলুন। উনি আপ্‌নাকে দেখতে চান।

নরেন— আমার ওখানে যাবার সময় নেই এখন। সামনে এক্‌জামিন, এখন কি পাগলা বামুনের সঙ্গে সময় কাটাতে পারি?

লাটু (কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া)— কাকে আপনি পাগলা বামুন বলছেন? উনি ত পাগলা নন। ওনার মত মাথা ঠিক রাখতে আর কে পারে?

নরেন (হাসিতে হাসিতে)— তাই ওনার কোমরে কাপড় থাকে না, হাত পা তেওরে যায়, নাম শুনলেই ধেই ধেই করে নাচতে থাকেন, একটুও মান-ইজ্জত নেই, যেখানে সেখানে খালি গায়ে যাওয়া-আসা করেন। আবার এধারে ভেল্কী দেখানো আছে—কাউকে হিপনোটাইজ করছেন, কাউকে মেসমারাইজ করছেন। আরো কত কি!

তার পরই বিনীতভাবে নরেন বলিলেন—"আচ্ছা! তুই ত রাতদিন ওনার কাছে রয়েছিস—উনি কি সব সময়েই এইরূপ বিভোর ভাবে থাকেন? রাতেও কি উনি ঘুমোন না?"

লাটু— হামি রাতদিন ওনার সাথে সাথে আছি, বাকী হাম্‌নে ত কখনো তাঁর কোন বেচাল দেখে না, আউর কাউকেই ত তিনি কখনো ভেল্কি দেখান না। আপুনি যা' শুনেছেন, সব ভুল শুনেছেন। ওনার সাথে হামি এতোদিন রইলুম, হাম্‌নি ত কখনো শুনে নি—উনি 'পাগলা বামুন' আছেন। বাকী ওনার কাছে আজকাল যত সব বড়ো বড়ো লোক যাচ্ছেন। সেদিন কিশুব বাবু গি'ছিলেন, আউর ঐ যে এক দাড়িওয়ালা বাবু আছেন তিনিও গি'ছিলেন। কিশুব বাবুর সাথে সেদিন ওনার কতো কথা হোলো।

নরেন— কি কথা হোলো রে?

লাটু— সেদিন উনি কিশুব বাবুকে ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে কতো কথা বললেন! আপুনার কত সুখ্যাতি করলেন! কিশুব বাবুও কতো কথা বললেন।

এই কথা চাপা দিয়া নরেন পুনরায় লাটুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারে! ওখানে কি রাখাল যায়?"

লাটু— যায়। এমন কি দু-এক রাত সেখানে থেকেও যায়। তাকে উনি বড় পেয়ার করেন। নিজের কাছে বসিয়ে কত খাওয়ান, তার সঙ্গে কত ফষ্টিনষ্টি করেন। সে দিন তিনি ওনাকে মার কাছে নিয়ে গেলেন—বললেন—'এই নাও গো, তোমার ছেলে এসেছে।' মার কতো আনন্দ হলো! হামাদের উনি কতো সন্দেশ খাওয়ালেন।

নরেন— রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন?

লাটু— সাচ্‌ বলছি, তাই শুনেছি।

এইখানেই লাটু ও নরেনের কথোপকথন সংক্ষেপ করিয়া দিলাম।

উপরোক্ত কথোপকথনের কোন কোন অংশ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট শুনিয়াছি। আমরা শুধু ইহাকে গ্রন্থোপযোগী করিয়া লইয়াছি।

সেবকজীবন পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :

(১৮৮২)। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর তদীয় মানসপুত্র রাখালকে পান সাজিয়া আনিতে বলিলেন—"ওগো রাখাল! পান সাজা নেই, কিছু পান সেজে আনো না।" ঠাকুরের এই আদেশে রাখাল বলিয়াছিল—"পান সাজতে ত জানি না!"

রাখালের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—"সে কিরে! পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? পানসাজা আবার শিখতে হয় না কি রে? যা, পান সেজে নিয়ে আয়।" তথাপি রাখাল সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া সেবক লাটু মনে মনে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিল; লাটুর বিরক্তি রাখাল গ্রাহ্য করিল না, বরং তাহাকে দেখাইয়া ঠাকুরের আদেশকে পুনঃ পুনঃ অবহেলা করিতে লাগিল। লাটু তাহা সহ্য করিতে পারিল না; ঠাকুরের সমক্ষেই রাখালকে বলিয়া বসিল—"ওকি কথা? রাখাল বাবু! ওনার সামনে এমোন ভাবে কথা বলতে আছে কি? আপুনি ওনার আদেশ শুনছেন না, আবার তার উপর কথা বলছেন—এ আপুনার কেমন ব্যাভার (ব্যবহার)?" লাটুর উষ্মাযুক্ত কথায় রাখাল চটিয়া উঠিল এবং চিৎকার করিয়া বলিল—"তোর গরজ থাকে তুই সেজে নিয়ে আয় না। আমি পারবো না। জীবনে ওকাজ কোন দিন করি নি, আজ ওনার আদেশে আমি পান সাজি আর কি!"

রাখালের এই কথা শুনিয়া লাটু সত্যসত্যই চটিয়া উঠিল এবং আধা হিন্দী ও আধা বাঙ্গলায় নানা কথা তো তো করিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া ঠাকুরের ভারী আমোদ হইয়াছিল এবং এই আমোদ উপভোগ করাইবার জন্য আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিতে লাগিলেন—"ও রামনেলো ! (রামলাল দাদাকে ঠাকুর রামনেলো বলিয়া ডাকিতেন) রাখাল-লেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে।"

ঠাকুরের ডাকে রামলাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনো উভয়ের বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল। রামলালকে দেখিয়া ঠাকুর ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্‌তো কে বেশী ভক্ত—রাখাল না লেটো ?" ঠাকুরের মস্করা বুঝিয়া রামলাল হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল—"মনে হয় রাখালই বেশী ভক্ত।"

রামলাল দাদার কথা শুনিয়া লাটু সক্রোধে বলিতে লাগিল—"হাঁা, উনার কথা শুনলেন না, উনি হোলেন ভারী ভক্ত !"

লাটুর ক্রোধোক্তিতে ঠাকুর আরও হাসিতে লাগিলেন। রামলালকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস, রামনেলো ! রাখালেরই ভক্তি বেশী। দেখ দিকিনি ! রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর (লাটুকে দেখাইয়া) ঐ দেখ্ কেমন রেগে গেছে ! যার ভক্তি বেশী সে কি এর (নিজকে দেখাইয়া) সামনে রাগ দেখাতে পারে ? ক্রোধ ত চণ্ডাল ! ক্রোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা সব উবে যায়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া লাটু যেন কেমন হইয়া গেল। জোঁকের মুখে নুন পরিলে যেমন জোঁকের অবস্থা হয়, ঠাকুরের কথায় লাটুর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা শুনিয়া লাটু ক্রোধে লজ্জায় অভিমানে অশ্রুসিক্তনয়নে বলিতে লাগিল—"হাম্‌নে আর আপুনার সামনে রাগ দেখাবে না। হামাকে এবারের মত মাফ করুন।"

লাটুর চোখে জল দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন—"দেখ! রাখাল ঠিক বলেছে রে। এটার (নিজের দেহটিকে দেখাইয়া) পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল কি-না! তাই রাখাল সে কথা ঠেলে ফেলে দিতে পারলে। এর ভেতর যিনি আছেন, তাঁর পান খাবার ইচ্ছে হোলে রাখালের সাধ্য কি তাঁর কথা ঠেলতে পারে?"

যাহা হউক, নানাবিধ বাকবিতণ্ডার পর ঠাকুর লাটুকেই পান সাজিতে বলিলেন। ইহা আগাগোড়া রামলাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়াছি।

পরবর্ত্তীকালে এই প্রসঙ্গটিকে উপলক্ষ করিয়া লাটু মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টির কথা বুঝা যায়।

"জানো···! রাখালকে রাজা হোতে হবে কি-না, তাই রাখালকে দিয়ে তিনি কোন ছোট কাজ করাতেন না।" এরই সঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলিয়া যান, সেটি কোন্ বৎসরের ঘটনা জানি না। "একদিন রাখালকে ঠাকুর তেল মাখাতে বললেন। তেলের শিশি হাতে করে রাখালের মনে কি হোলো কে জানে! দেখি, রাখাল বারাণ্ডা থেকে নেমে চলেছে। ঠাকুরকে বলতে শুনলুম—'কোথা যাবি যা না দেখি, এখানকেই আসতে হবেক।' রাখাল সোজা বাহিরে যেতে লাগলো, বাকী ফটকের কাছে এসে তার কি মনে হোলো। অমনি ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির। রাখালকে আসতে দেখে উনি বললেন—'কি রে! যেতে পারলি নি?' রাখাল কাঁদতে লাগলো।"

* * *

ঠাকুরের দেশের লোক শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র হাজরা সবেমাত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। গ্রাম্য লোকেরা ধর্ম্মকে যেভাবে দেখিয়া থাকে, হাজরা

সেইভাবে ধর্ম্মকে মানিয়া চলিতেন। হাজরা পূজা, পাঠ, মালাজপকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতেন! যে-লোক পূজা, পাঠ, মালাজপ, তিলক, ছাপ ইত্যাদি করে না, তাহাকে তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করিতেন না। দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন বাস করিবার পর হাজরা দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুর পূজা, পাঠ, মালাজপ, তিলক, ছাপ ইত্যাদি কিছুই করেন না। তাই একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুরকে উপদেশ দিতে বসিলেন—"দেখ গদাধর! এ-রকম করা ত বাপু উচিত হচ্ছে না! এরকম করলে বেশী দিন লোকে তোমায় মানবে না। লোককে ভোলাবার জন্যে অন্ততঃ কিছু কর—আমার মত মালাটা নিয়ে ত জপতে পার। এত লোক আসে, তোমায় মালা করতে দেখলে তবু তারা ভাববে যে তোমার সাধনভজন কিছু আছে।"

হাজরার এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং লাটু, হরিশ, গোপাল, রামলাল প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো শুনেছো! হাজরা কি বলছে? আমায় মালা জপতে বলছে—আমি বাপু! এখন আর ওসব করতে পারি না। ও বল্‌ছে—মালা জপতে না দেখলে লোকে আমায় মানবেক না। হ্যাঁগা! হাজরার কথা সত্যি না কি?"

ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া সেবকবৃন্দ হাজরার উপর ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিল। হরিশ বলিয়া বসিল—"ওর কথা ছেড়ে দিন, যেমন গেঁয়ো লোক তেম্‌নি গেঁয়ো বুদ্ধি।"

ঠাকুর তখন হরিশকে বলিলেন—"না গো না, গেঁয়ো বুদ্ধি বলো না—ওর মুখ দিয়েই ত মা বলাচ্ছেন।"

হরিশ—কি যে বলেন! মা আর লোক পেলেন না—হাজরার মুখ দিয়ে আপনাকে কথা শোনালেন।

ঠাকুর— হাঁ গো, হাঁ! এমনি করেই 'মা' জানান দেন।

এতগুলি কথার মধ্যে 'এমনি করেই মা জানান'—এই কথাটি লাটুর প্রাণে বাজিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে তিনি আমাদের নিকট ঠিক এই কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতেন।

এইখানেই হাজরার সম্বন্ধে লাটু মহারাজের পরবর্ত্তীকালীন ধারণার কথা বলিতে চাহি—কারণ অন্যত্র হয়ত বলিবার সুবিধা হইবে না। লাটু মহারাজের ধারণায় "হাজরার মনের অঙ্কট-বঙ্কট যায় নি; হাজরা মালা জপতে জপতে বিষয় চিন্তা করতো, তাইতো তার উন্নতি হোলো না।··· লোরেন ভাইকে ধরে হাজরা তরে গেলো। লোরেনের জেদেই ঠাকুর তাকে কৃপা করেন।··· উনার দেহরক্ষার পর তার ধারণা হয়েছিল—সে একজন বড় অবতার, ঠাকুরের চেয়েও বড়।··· একদিন হাজরার ভারী ইচ্ছে হোলো ঠাকুরের পদসেবা করতে, ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন। তাই না দেখে হাজরা ভারী দুঃখিত হোলো। বাহিরে গিয়ে মুখ ভার কোরে রইলো। শেষে উনি হাজরাকে ডেকে পাঠালেন। সেই একদিন মাত্র হাজরা ঠাকুরের পদসেবা করেছিল।···একদিন হাজরার ইচ্ছে হোলো লোককে উপদেশ দিবে—সে দিন যারা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলো তাদের সবাইকে জানাতে লাগলো, 'উনি আজ এখানকে নেই—উখানে বসে আর কি হবে? ইখানে এস—দুটো কথা শোনো।' বাকী কেউ কি তার কাছে বসলো না! একজন সে দিন বসতে গিয়েছিলো, ঠাকুর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিলেন। হাজরার কি দুঃখু!··· হাজরার সাথে লোরেন ভাই-এর ভারী মিল খেতো—হাজরা তাকে তামাক সেজে খাওয়াতো। তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত। লোরেন ভাই তাকে ঠাট্টা

ক'রে বলতো—'তুমি ত একজন ভারী সিদ্ধপুরুষ দেখছি। তোমার মত মালা জপতে খুব কম লোককে দেখি। তোমার মালাটি ত বেশ —বড় বড় দানা, ভারী চক্চকে। তোমার মত সিদ্ধপুরুষ আর কে আছে?' একথা শুনে হাজরার ভারী অহঙ্কার হয়েছিলো। হামাদের সামনে বল্তো—'তোরা আমায় কী বুঝ্বি? তোদের লোরেন হামায় ঠিক বুঝেছে। উনিও বুঝতে পারেন নি।' শুনেছো! তার অহঙ্কারের কথা। মানুষ এমনি কোরে সাধন থেকে পড়ে যায়, জানো?… হাজরা সোঽহং জপ করতো, ভারী তর্ক লাগাতো, তাইতে উনি (ঠাকুর) হামাদের বলেছিলেন, 'হাজরা ইখানকার মত উল্টে দিতে চায়; তোরা ওর সাথে বেশী মিশিস নি, বাপু! তোদের ভক্তির ঘর, শুক্নো জ্ঞানে তোদের কাজ কি?'… একদিন হাজরা অধর সেনের বাড়ীতে নেচেছিলো, তাই নিয়ে লোরেন ভাই কতো মস্করা করেছিলো।"

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, মাস জানি না ঠাকুর লাটুকে লইয়া বলরাম বাবুর গৃহে আসিয়াছিলেন। সেই তাহার (লাটুর) বলরাম মন্দিরে প্রথম আসা। বলরাম বাবু অনেকটা শিখদের মত পোশাক পরিতেন। তাই প্রথম দর্শনে লাটু তাঁহাকে ভুল করিয়াছিল। সে জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিল—"দেখো…! উনাকে (বলরাম বাবুকে) যখন প্রথম দেখলুম তখন হাম্নে ভাবতে পারে নি যে, উনি বাঙ্গালী আছেন। বাঙ্গালীদের মত উনি কাপুড়জামা পরতেন না— মাথায় এক পাগ্ গর বাঁধতেন, হাতে এক লাঠি নিতেন। গায়ে তার আলখাল্লা জামা আর পিরান থাকতো। তার লম্বা দাড়ি ছিলো। ভারী দুব্লা। হামাদের হামেশা উখানকে যেতে হোতো।"

এইবার বলরাম বাবুর সম্বন্ধে লাটু মহারাজ যে-সব কথা আমাদের

বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন কথা শুনিয়াছি, আমরা সেইগুলি সাজাইয়া এই স্থানে বলিতেছি।

"উনি বলতেন—'ঐ ত আমাদের বাগবাজারের কেল্লা, কলকাতার বৈঠকখানা।' (শ্রীঅধরচন্দ্র সেনের গৃহকেও তিনি বৈঠকখানা বলিতেন)...বলরাম বাবুর বাড়ীতে নিত্য জগন্নাথসেবা হোতো, তাই ত উনার অন্নকে খুব শুদ্ধ বলতেন।...বাড়ীতে জগন্নাথের রথ টানা হোতো, হামাদের সব খুব খাওয়াতেন।...উনি (ঠাকুর) কতো দিন উথানকে গিয়েছিলেন তা লিখে রাখতেন। হামনে শুনেছি যে, উনি (ঠাকুর) তাঁর বাড়ীতে একশো বার গিয়েছিলেন। ... উনি (বলরাম বাবু) মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। ... উনাকে ঠাকুর মহাপ্রভুর দলের লোক বলতেন—ঠাকুর তাঁকে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে দেখেছিলেন। ... বলরাম বাবু ঠাকুরকে অন্দরমহলে নিয়ে যেতেন—তাঁর দাদা (হরিবল্লভ বাবু) তা পছন্দ করতেন না। গিরিশ বাবুর সাথে হরিবল্লভ বাবুর খুব মিলামেশা ছিলো, তাই গিরিশ বাবু সে কথা জানতে পারলেন। একদিন উনি (ঠাকুর) উথানে (বলরাম বাবুর গৃহে) আসলে গিরিশ বাবু তাঁকে (হরিবল্লভ বাবুকে) ডাকলেন। তিনি (হরিবল্লভ বাবু) ঠাকুরের সামনে এসে বসলেন। কি যে হোলো, জানো—! দুজনেই কাঁদতে লাগলেন, কেউ কোন কথা কইলেন না, কেবল কাঁদলেন। কেন যে কাঁদলেন তা হাম্‌নে বুঝলুম না। হামি ত সে কথা জানবার জন্তে কটকে গি'ছিলুম, বাকী উনি (হরিবল্লভ বাবু) সে কথা ফাঁস করলেন না। ... বলরাম বাবু খুব সাধুসেবা করতেন, উনি সাধুসেবার জন্তে সংসার থেকে পয়সা বাঁচাতেন, তাই ত ওনার আত্মীয়স্বোজন সব উনাকে কৃপণ বলতো।

হাম্‌নি ত জানে না উনার কতো পয়সা। একদিন তাঁকে এটুকু (হাত দেখাইয়া) বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে হামি বললুম—'আপুনি মশায় একটু বড় বিছানা করবেন, এ বিছানাটি বড় ছোট হয়েছে।' তাতে উনি কি বললেন জানো?—'মাটির দেহ মাটিতে যাবে, বাকী বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগবে।' হামি ত তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলুম। তাঁর হাড়ে হাড়ে সাধুসেবা করবার ইচ্ছে ছিলো, তাই ত অমন কথা তিনি বলতে পারলেন। ... উনার মেয়ের বিয়েতে খুব ধুমধাম হয়েছিলো, বাকী মেয়ের বিয়েতে উনার (বলরাম বাবুর) এতো টাকা খরচ করবার মন ছিলো না, উনি বলতেন 'আত্মীয়-ভোজন না ভূত-ভোজন।' শেষে যোগীনকে কুছু খাইয়ে উনার মনে তৃপ্তি আসে। যোগীন ভাই-এর কাছে শুনেছি, উনি না কি বলেছিলেন—'হামার এতো টাকা খরচ করা সার্থক হোবে, বাকী তুমি যদি কুছু খাও।' যোগীন ভাই কুছু খেয়েছিলো। ... উনি ত হামাদের খুব পেয়ার করতেন। উনার বাড়ীতে হামি ত কতো দিন ছিলুম। আরো আরো গুরুভাইরা সব উনার বাড়ীতে যেতো। রাখাল, শরোট্, যোগীন, তারক, মহিম, কালী এরা ত রোজ ওনার বাড়ীতে যেতো, উনি এদের সঙ্গে খুব মিশতেন।" ইহা যে কোন্ বৎসরের কথাকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন জানি না। ঠাকুরের মহাসমাধির পূর্ব্বের ঘটনা হইতে পারে অনুমান করিয়া এখানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পুনশ্চ এই ধরনের কথা লিখিত হইয়াছে 'বলরাম মন্দিরে' অধ্যায়ে।

"একদিন তিনি (বলরাম বাবু) কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত একখানা গাড়ী বার আনা দিয়ে ভাড়া কোরে দিলেন। সস্তার গাড়ীতে চড়ে তিনি (ঠাকুর) ভারী বিপদে পড়েছিলেন। আসতে

আসতে গাড়ীখানার চাকা গেলো খুলে। আবার ঘোড়াগুলো সব বেয়াড়াপনা লাগিয়ে দিলে—চাবুক খেলে ত দৌড় দিলো আর চাবুক বন্ধ হোলো তো চলতে চাইলে না। এ রকম কোরে তিনি ত অনেক রাতে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছুলেন। উনি একথা নিয়ে কতো মস্করা করতেন।”

আর একটি প্রসঙ্গ। “একদিন হামাদের সব দুপুরে নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। সে দিন রাখালও ছিলো। খাওয়ার দেরী দেখে রাখাল ঘুমোতে লাগলো। হামাদের খাওয়া সব শেষ হোলো তবু রাখালের ঘুম ভাঙলো না। এই না দেখে ঠাকুর একটি গল্প বললেন—‘দেখো! একজন মাদুর বগলে কোরে যাত্রা শুনতে এসেছিলো। যাত্রাওয়ালাদের দেরী দেখে ভাবলে একটু শুয়ে নি। শুতে শুতে তার ঘুম এলো। এমন সময় যাত্রা শুরু হোয়ে গেলো। যাত্রা যখন হোতে লাগলো তখন সে ঘুমোতে লাগলো। বাকী যাত্রা শেষ হোলে তার ঘুম ভাঙলো। ঘুম থেকে উঠে দেখলে যে, আসর ফাঁকা হোয়ে গেছে। তখন তার বড় দুঃখু হোলো, এমন মজার যাত্রা শুনতে পেলো না। বাড়ী গিয়ে সে কী বলবে? পথে যেতে যেতে কোন্ পালার গাওনা হোয়ে গেলো শুনে নিলে। আউর বাড়ী ফিরতে ফিরতে বলতে লাগলো—আজকে যাত্রাওলারা ভারী চমৎকার গেয়েছে। যারা তাকে ঘুমোতে দেখেছিলো, তাদের কাছেও একথা বলতে লাগলো। তখন, যারা আসরে যাত্রা শুনেছিলো, তারা বললে—তুমি ত ঘুমিয়েছো, তুমি আবার শুনলে কোথায়? একথা না শুনে সে ভারী চটে উঠলো—হামি শুনেনি একথা কোন শালা বলে? এর-পর ঝুটাপুটী লেগে গেলো।”

জনৈক ভক্ত— এ প্রসঙ্গটির গূঢ় অর্থ কি, মহারাজ?

লাটু মহারাজ—আরে! এও বুঝো না? এতো সব পড়াশুনো করেছো, তবু এর মানে বুঝো না!

জনৈক ভক্ত— না, মহারাজ! আমরা এর গূঢ় অর্থ ধরতে পারছি না।

লাটু মহারাজ— এ সব তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ কোরে বলেছেন। দেখো—! এই সংসার-আসরে ভগবানের লীলা দেখতে এসে ঘুমিও না। এখানে সাধন-ভজন নিয়ে জেগে থাকো। সাধন-ভজন না থাকলে এ সংসার-লীলা বুঝতে পারবে না। কেবল ঝুটাপুটী লাগবে। একজন বলবে—'এমন তিনি'; আর একজন বলবে—'তেমন তিনি'। এই নিয়ে সংসারে কোতো বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে, দেখছো তো। বাকী যাঁরা সাধন-ভজন কোরে তাঁকে (ভগবানকে) জেনেছেন তাঁদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই। তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন, একই ভাবে চলেছেন। যত কুছু গণ্ডগোল তাদের চেলাচামুণ্ডার মধ্যে। তারাই ত তাঁদের কথাগুলোকে সব বিগড়ে দিয়েছে।

বলরাম বাবুর গৃহে লাটুর উপস্থিতিতে বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, সবগুলির বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব। তন্মধ্যে কয়েকটি বাছিয়া লইয়াছি এবং এইখানেই সন্নিবেশিত করিতেছি। এগুলি বিভিন্ন গুরুভাইদের ও ভক্তমণ্ডলীর কথা। সংক্ষেপ করিবার জন্য আমাদের ভাষায় লিখিত হইল।— সেখানে লাটু রাখাল মহারাজকে ভাবাবেশে প্রথম নৃত্য করিতে দেখেন।··· সেখানে অবধূত নিত্যগোপালকে ভাবে মাতোয়ারা হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি দেখিতে পান এবং এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করিতে দেখিয়া

ঠাকুর তাহার (নিত্যগোপালের) চৈতন্ত সম্পাদন করেন। ··· সেখানে নরেন্দ্রনাথের গান শুনিয়া ঠাকুরকে সর্ব্বপ্রথম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখেন। ··· সেখানে একজন তান্ত্রিক ভক্তের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলেন— 'হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না, সর্ব্বদাই সংশয়। শিষ্য হোতে গেলে গুরুর উপর সংশয় রাখতে পারবে না—তা সে যেমন গুরুই হউক না কেন ? ··· কলিকালে তান্ত্রিক ক্রিয়া বড় কঠিন, যে-সে লোক ওসব সাধনা পারে না। তন্ত্রের ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, সংযমীর ধর্ম্ম। যারা শুদ্ধসত্ত্ব কেবল তারাই তন্ত্রের কাজে (অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ডে) বা সাধনায়, সিদ্ধ হয়।' ··· সেখানে গিরিশ বাবুকে তিনি প্রথম দেখিয়াছিলেন। তুলসী (নির্ম্মলানন্দ) মহারাজের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ বলরাম মন্দিরে হইয়াছিল। সেখানে ছোট নরেন, হরিনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেন।

বাহুল্যভয়ে এইখানেই বলরাম বাবুর কথা শেষ করিলাম। ঘটনাগুলির কোন দিন-সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

(১৮৮২)। সেই বৎসর সেবক লাটু ঠাকুরের সহিত ভক্ত শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে গমন করে। প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে ঠাকুর 'মোটা বামুন' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন এবং মাঝে মাঝে নিজের গৃহে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া উৎসব করিতেন। অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর গৃহে লাটুকে শতসহস্র কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইত, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবুর গৃহে (ও শ্রীঅধর সেনের গৃহে) লাটু সুস্থির হইয়া বসিয়া ভক্তমণ্ডলীর কথা শুনিতে পাইত। সেইখানে বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। দিন সাতেক পূর্ব্বে বাবুরাম সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন কিন্তু সেইখানে তাঁহার সহিত লাটুর আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। 'মোটা বামুনে'র গৃহে বাবুরামের সহিত প্রথম

মিলনের কথা বলিতেছি—"উনার (মোটা বামুনের) বাড়ীতে আঁটপুরের বাবুরামের সহিত হামার কথা হয়েছিলো। বাবুরাম তখন বড্ড ছেলে-মানুষ—দেখতে বেশ ফুট্‌ফুটে, ছিপ্‌ছিপে। ঠাকুর তাকে বড় আদর করতেন। শুনেছি—বাবুরামের মা ঠাকুরের হাতে তাকে সঁপে দিয়েছিলেন। দেখো তো, মা হোয়ে ছেলের কেমন শুভ কামনা করলে! এ-রকম মা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। যার মা ছেলেকে বলে—'ভগবান লাভ কর, ত্যাগী সন্ন্যাসী হ', সে ত মুক্ত মা। সে মা আর ছেলেদের দুঃখভোগ করাতে চায় না। নিজেরা সংসারে দুঃখভোগ করে যায়।"

এইবার প্রাণকৃষ্ণ বাবুর প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। বহুবার তাঁহার গৃহে লাটু গিয়াছিল, সেইজন্য কবে কোন্ প্রসঙ্গটি হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

..."হামি ত মোটা বামুনের বাড়ীতে উনাকে বলতে শুনেছি—'জানো! সেবকের কাম-ক্রোধ-লোভ থেকে সাবধান হোতে হয়। দেখো না মহাবীরকে। রামজীর কাজে লঙ্কায় গিয়ে ক্রোধের বশে কি করলেন! লেজের আগুন দিয়ে লঙ্কাটা পুড়িয়ে ছারখার কোরে দিলেন। ক্রোধ এতো খারাপ জিনিস!' উনি বলতেন—'যে সেবক জিতেন্দ্রিয়, সে কী না করতে পারে?' ... হামাদের ত হামেশা বলতেন—'ওরে! কাম-ক্রোধ-লোভকে বাড়তে দিবিনি রে। শালারা ত যাবে না, তাই ওদের মোড় ফিরিয়ে দে রে। কামকে বলবি—থাক্ শালা কাম! তুই ঈশ্বর-কামনা নিয়ে, ঈশ্বর-রমণ নিয়ে; তোকে মেয়েমানুষের দিকে মন নামাতে দেবো না। ক্রোধকে বলবি—থাক্ শালা তুই! কাম-কামিনী-কাঞ্চনের পথ রুখে। ওরা এলেই ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়বি, যাতে ওরা ভয় পেয়ে আর তোকে জ্বালাতন করতে না আসে। আর লোভকে বলবি—ওসব

ছোট লোভ করবি কেনো, মন? একেবারে তাঁর লোভে লেগে যা; তিনি ছ-ছটা ঐশ্বর্য্যের মালিক, তাঁর চেয়ে লোভের বস্তু আর কে আছে?' "

আর একটি প্রসঙ্গ আমরা জানি।

"জানো—! অনেক লোক একদিন দক্ষিণেশ্বরে মোটা বামুনের খুব সুখ্যাতি করছিলো। তা শুনে ঠাকুর তাদের হাসতে হাসতে বললেন—'আরে মোটা বামুন ত আমার উৎসব করবেই; আমি যে তাকে ঘুস দিয়ে রেখেছি।' " লাটু মহারাজের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল এবং নিজের বিস্ময়কে চরিতার্থ করিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মহারাজ! ঠাকুর ওনাকে ঘুস দিতে গেলেন কেন? যিনি টাকা যশ মান কিছুই চান না—তাঁর আবার ঘুস দেবার প্রয়োজন কি?"

লাটু মহারাজ— আরে! সত্যি কি তিনি ঘুস দিয়েছেন? ও একটা মস্করা করলেন।

জনৈক ভক্ত— এ কেমন মস্করা হোলো বুঝতে পারছি না, মহারাজ! একটু খুলে বলুন। আমরা ত তাঁর কথার ভাব ধরতে পারলুম না।

লাটু মহারাজ— আরে! এও বুঝলে না? ঠাকুরের কৃপায় তাঁর (প্রাণকৃষ্ণ বাবুর) দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি ছেলে হয়। সন্তান হবার পর থেকেই বামুন ঠাকুরকে নিয়ে খুব উৎসব করতেন। তাই উনি বললেন—'আরে! ঘুস দিয়ে রেখেছি।'

জনৈক ভক্ত— এ কি কথা, মহারাজ! যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী তিনি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সন্তান কামনা করলেন!

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! তাতে হয়েছে কি? সন্তান কামনা করায়

কি দোষ আছে? সংসার ত তাঁকে ডাকবার জন্যই—সন্তান হোলে কি আর তাঁকে ডাকতে পারা যায় না?

জনৈক ভক্ত— কই মহারাজ! আমরা আর পারছি কই? সংসারে ছেলেপুলে নিয়েই ত আমরা বড় বেশী নাকানি-চোবানি খাই। তাইত তাঁকে ডাকতে পারি না।

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! তা ত খাবেই। তাঁকে ভুলে সন্তান-সন্ততিতে মজেছো, তাই ত তোমাদের এতো দুঃখু। এই সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁকে ডাকো না, ছেলেপুলেদের সব তাঁকে ডাকতে শিখাও না—তোমাদের সব দুঃখু চলে যাবে।

জনৈক ভক্ত— মহারাজ! আপনারা সন্ন্যাসী, সংসারীর দুঃখ ঠিক বুঝবেন না। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমরা কেমন ল্যাতাজোব্‌রা হোয়ে পড়ি তা' আপনারা জানবেন কি করে? একটু তাঁকে ডাকতে বসেছি, অমনি একটি ছেলে কেঁদে উঠলো—বাবা, খিদে পেয়েছে। গীতা নিয়ে পড়তে বসেছি, অমনি আর একটি ছেলে বায়না ধরলে—বাবা, পড়াটা বলে দিন না। একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, অমনি গিন্নী এসে বললেন—খোকাটাকে ধর গো। ঘুমোচ্ছি তখনো আমাদের ছাড়ানছুড়ান নেই—খোকা ডাকছে—বাবা, মুত পেয়েছে। আচ্ছা বলুন ত, এই সব নিয়ে কেমন করে আমরা ভগবানকে ডাকি?

ভক্তের কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন—"আরে! তোমাদের ঘর আর 'মোটা বামুনে'র ঘর! ও এক জমীদার লোক। ওর ঘরে পয়সা কতো! ওদের ছেলেপুলেদের ঝক্কি নিতে হয় না। ওসব লোকেদের ভগবানের পথে আনবার জন্য তিনি কেমন কৌশল করলেন! একটি ছেলে দিয়ে, তার মনটাকে ভগবানের দিকে টেনে তুললেন।

অনৈক ভক্ত— মহারাজ! এ তাঁর লীলা, তিনিই বুঝেন। আমরা তার কিছু বুঝি না।

লাটু মহারাজ— তোমরা বুঝবে কি করে? আগে কুছু সাধনভজন কর, শেষে সব বুঝতে পারবে—কার কোন্ দিকে আকর্ষণ আছে, কেমন কোরে তা ছুটবে, সব বুঝতে পারবে।

এইবার লাটুর সেবকজীবনের অন্য আর একটি দিক দেখান হইতেছে। লাটুকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর যেমন ভক্তগৃহে যাইতেন সেইরূপ অন্যত্রও (তীর্থক্ষেত্রে বা মন্দিরদর্শনে) তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইতেন। একদিন (সেদিন উল্টারথ ছিল) গিরীন্দ্র বাবু দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন—"দ্যাখ গো! আজ মাহেশের রথযাত্রা দেখতে ইচ্ছে হচে। একখানা নৌকা ভাড়া করো।" ঠাকুরের কথামত গিরীন্দ্র বাবু নৌকা ভাড়া করিলেন। ঠাকুর লাটুকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় চাপিলেন। তাঁহারা প্রথমে দ্বাদশ গোপাল দেখিয়া মাহেশের জগন্নাথ দেখেন। বৈকালে তাঁহারা নৌকাযোগে চাণকের শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে পেনেটী হইয়া গদাধরের পাটবাড়ীতে আসেন। ঠাকুরের নিকট হইতে লাটু মাহেশের জগন্নাথ, দ্বাদশ গোপাল ও পাটবাড়ীর ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিল। বাহুল্যভয়ে ইতিবৃত্তগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। যেদিন আমাদের সমক্ষে এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল সেদিন তীর্থগমন ও তীর্থকৃত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি তিনি বলেন—"তীর্থস্থানে তীর্থমাহাত্ম্য শুনতে হয়। তীর্থমাহাত্ম্য শুনতে শুনতে উদ্দীপন আসে, তখন তীর্থদেবতায় মন আকৃষ্ট হয়। তীর্থে গিয়ে তীর্থকৃত্য করতে হয়। তীর্থবাস করলে সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া যায়। তীর্থ তপস্যার স্থান, সেখানে সাধনভজন করলে অল্পতেই সিদ্ধ হওয়া যায়।"

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসঙ্গে আসিতেছি। ১৮৮২ খ্রীঃ, ৫ই আগষ্ট ঠাকুর ভবনাথ, হাজরা ও শ্রীমকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজের খুব সুখ্যাতি করিতে থাকেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে এরূপ লোকের দর্শন-স্পর্শনে পুণ্য আছে। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এরূপ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য লাটু উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন। আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, কলিকাতায় আসিলে লাটু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য প্রায়ই বৈকালের দিকে মেট্রোপলিটান কলেজের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এরূপ প্রায় অনেক দিন তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে একদিন লম্বশিখাযুক্ত মুণ্ডিতমস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পথে দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। এই কথাগুলি তাহার ভাষায় এইবার বলিতেছি। তিনি নানা ভক্তের নিকট নানাভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করিতেন। আমাদের সংগ্রহমত আমরা তাহা এইস্থানেই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখে উনি (ঠাকুর) বলেছিলেন—'এতো দিনে সাগরে এসে মিশলুম।' তাতে বিদ্যাসাগর মশায় কি বলেছিলেন জানো—? —'তবে কিছু লোনা জল নিয়ে যান।' তাতে উনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জানো?—'ওগো, তুমি লোনা জলের সাগর নয়, তুমি অমৃতের সাগর।' হাম্‌নি ত দেখবার জন্য পথের ধারে বসে থাকতুম। এমন কতো দিন হয়েছে। শেষে একদিন তাঁর (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের) দেখা পেলুম। তাঁর মত লোককে দেখলেও পুণ্য হয়, জানো! তাঁর মত দাতা ত আজকাল দেখা যায় না। কলিকালে দানই ধর্ম্ম, তিনি সেই ধর্ম্ম পালন করেছেন, ব্যস্!

এতেই তাঁর সব খেয়া মিটে গেছে।…জীবনকালে তাঁকে (বিদ্যাসাগরকে) লোকে বুঝ্‌তে পারে নি, তাই অনেকে তাঁকে নাস্তিক বলতো। বাকী তিনি ত নাস্তিক নন। উনি বলতেন—'বিদ্যাসাগর বিরাটের উপাসনা করেন।' অনাথ গরীবের উপর তার কী দয়া! লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কতো সাহায্য করতেন। এত গোপনে করতেন যে কেউ জানতে পারতো না।… দেখো—! বিদ্যাসাগরের মত অহঙ্কারশূন্য হবে। তিনি এতো বড়ো বিদ্বান, এতো টাকা তাঁর আয়, এতো মানসম্ভ্রম তাঁর, বাকী তিনি কেমন সবার সাথে মিশতেন, গরীব-গুর্‌বোদের সাহায্য করতেন! কখনো বলতেন না—এতো টাকা দিয়েছি, এত উপকার করেছি। বাকী যে-কেউ তাঁকে নিন্দা করতো, তাকে জিগগেস করতেন—'আমি কি কোন দিন তোমার কোন উপকারে এসেছি, বলতে পারো?' ”

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের একটা ঘটনা বলেন। তিনিও এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন। "দেখো—! একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এক স্টেশানে নেমে এক মুদীর দোকানে তামাক খাচ্ছিলেন (তখন বিধবাদের বিয়ে নিয়ে সমাজে ভারী গণ্ডগোল চলেছে)। সেই মুদির দোকানে বিদ্যাসাগরকে তামাক খেতে দেখে, সেই দেশের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নানান কথা কইতে লাগলো। ব্রাহ্মণ জানতো না যে তিনিই বিদ্যাসাগর। এ-কথা সে-কথার পর বিধবাদের বিয়ে নিয়ে কথা উঠ্‌লো। সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশায়কে উদ্দেশ কোরে খুব গালিগালাজ দিয়ে গেলো। বললে—'বিদ্যাসাগরকে পেলে আমি তার নিকেশ করে দিই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় সব জেনেশুনেও কুছু বললেন না। শুধু বললেন—'তুমি বিদ্যাসাগরকে চেনো তো?' দেখোতো, কত গালিগালাজ সয়ে নিলেন, কুছু বললেন না। এ রকম তোমরা পারো?…তোমরা ত এক দাম্‌ড়ি দান করলে, বাজার

গরম কোরে তুলো। বাকী তিনি কি করতেন? কাউকে জানতে পর্য্যন্ত দিতেন না।...আরে! উনি ত দেওতা লোক (অর্থাৎ দেবপ্রকৃতির লোক)। ঠাকুর বলতেন—'সামনে জন্মে তিনি আরো বড় শক্তি নিয়ে জন্মাবেন।'... তোমরা বিধবাদের দুঃখু কি বুঝো? বিদ্যাসাগর মশায় বুঝতেন; তাইতো তিনি ওদের জন্যে এতো করলেন। তোমরা বড়জোর একঘটী কাঁদো, বাকী (কিন্তু) কাজের বেলায় কুছু করো না। বাকী তিনি কি করলেন দেখো! সমাজের সাথে এমন যুদ্ধ দিলেন যে, লাটসাহেব (গভর্ণমেণ্ট) পর্য্যন্ত তাঁর কথা মেনে নিলেন।...দান ত অনেকেই করে, বাকী উনার মত খেটে-খুটে উপায় কোরে ক'জন দান করতে পারে? উপায়ের কড়ি দান করতে পারো? তবে ত বলি দানের দিল্ আছে। যে নিজের খাটুনীর পয়সা দান করে, সেই ভাগ্যবান। (যে ব্যক্তিকে এই কথাগুলি লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন তিনি একটি বড় ষ্টেটের ট্রাষ্টী ছিলেন)।... আরে! বিদ্যাসাগর, কিশুব সেন, বিজয় গোস্বামী, মহেন্দ্র সরকার—এরা ত কেউ মূর্খ নন্, সকলেই পণ্ডিত। এঁনারা সবাই উনাকে (ঠাকুরকে) খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। কুছু না কুছু একটা বুঝেছিলো, তাই ত তারা মেনেছিলো। গুণ না থাকলে মানবে কেনো? এক দিন, না হয় জোর দুদিন মানবে। বাকী তারপর ভক্তি-বিশ্বাস সব পালিয়ে যাবে।... জানো—! বিদ্যাসাগর মশায় মাকে মানতো; তাই ত মায়ের আশীর্ব্বাদে তাঁর সব কাজ পূরণ হয়েছিলো। তোমরা ত গর্ভধারিণী মাকে মানো না। তোমাদের মনস্কামনা পুরণ হোতে পারে না। যে মাকে মানে না, সে আবার সাধন করবে কি? গুরুর কথা সে কি মানতে পারবে?... বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখিয়ে উনি মোহন্তদের কেমন শিক্ষা দিলেন, বললেন —'দ্যাখো গো! গেরস্তদের মধ্যে থেকেও বিদ্যাসাগর কেমন ত্যাগী

হোতে পারলেন? নিজের টাকা সব বিলিয়ে দিলেন, আর তোমরা সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকেও সঞ্চয় করবার লোভ ছাড়তে পারো না।' "

এইখানেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসঙ্গ শেষ হইল।

* * *

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজের নিকট শুনিয়াছি যে, যে-বৎসর তিনি প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখেন, সেই বৎসরে তিনি প্রথম সিঁতির মহোৎসবে যান। এইটুকু হইতে আমরা অনুমান করিতেছি যে, তিনি সিঁতির বাগানে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াছিলেন। আমাদের অনুমানকে দৃঢ়তর করিবার জন্য আর একটি ঘটনার কথা বলিতে পারি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন যে, সিঁতির বাগানে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি প্রথম দেখেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী সিঁতিতে বেণী পালের মহোৎসবে গিয়াছিলেন। (শ্রীম-'কথামৃত')

"জানো—! সিঁতির বাগানে উনাকে (ঠাকুরকে) নিয়ে কিশুব বাবুর দলের লোকেরা খুব উৎসব করতেন। সব বড় বড় লোক আসতেন। সেথানে হামি ত তোমাদের আচার্যকে (শিবনাথ শাস্ত্রীকে) প্রথম দেখি। শিবনাথকে ঠাকুর বড় পেয়ার করতেন, বল্‌তেন—'এক গাঁজাখোর অপর এক গাঁজাখোরকে দেখলে যেমন খুশী হয়, তোমায় দেখলে আমি (ঠাকুর) তেমন খুশী হই।' বাকী শিবনাথ শাস্ত্রী বড় বেশী ওনার সাথে দেখা করতেন না।...একদিন তাঁর আসবার কথা ছিলো, এলেন না। এই না দেখে উনি (ঠাকুর) কি বললেন জানো?—'আস্‌বো বলেছিল, এলো না— এটা ভাল নয়। কথার খেলাপ করতে নেই, কলিকালে সত্যই তপস্যা। যার সত্যে আঁট নেই তার ভগবানলাভ হয় না। সত্যে আঁট না

থাকলে শেষে সব নষ্ট নয়।'··· একদিন তিনি (ঠাকুর) তাঁকে (শিবনাথ শাস্ত্রীকে) বললেন—'আপনি না কি বল আমার (ঠাকুরের) মাথার ঠিক নাই? আপনি দিনরাত বিষয়চিন্তা কর, আপনার মাথার ঠিক আছে ভাবো, আর আমি কি না দিনরাত ঈশ্বরচিন্তা কোরে বেহেড হোয়ে গেলুম!'...বাকী শিবনাথ বড় বাহাদুর—(হাজার কাজের মাঝে) ঈশ্বর ঈশ্বর কোরে জীবন কাটিয়ে দিলে।"

বেণী বাবু প্রতিবৎসর নিজের উদ্যানে দুইবার করিয়া উৎসব করিতেন এবং খুব খাওয়াইতেন। উৎসবে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইত। সেইখানে সেবক লাটু তিনবার গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবারের একটি প্রসঙ্গ বলিতেছি:

"উৎসব শেষ হোলে বেণী বাবু নিজে হাতে কোরে এক চেঙ্‌রা খাবার উনার গাড়ীতে তুলে দিতে চাহিলেন। উনি তা নিলেন না। এই না দেখে বেণী বাবু ভারী দুঃখিত হোলেন, বললেন—'রামলাল (দাদা) আসতে পারলে না, তার খাবারটা সঙ্গে দিলুম, তাও নিলেন না।' বাকী বেণীবাবু সে খাবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

এইবার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা বলিতেছি। লাটুকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর মণি মল্লিকের গৃহে গমন করেন। মণি মল্লিককে ঠাকুর তাঁর একজন ভক্ত বলিতেন। ···"একদিন তাঁকে (মণি মল্লিককে) বললেন—'ত্থাখ গো! তুমি ভারী হিসেবী, এত হিসেব করে চল কেন? ভক্তের যত্র আয় তত্র ব্যয়।' ···তিনি (মণি মল্লিক) দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর জিগ্‌গেস করতেন —'আজ কিসে এলে গো?' উনি (মণি মল্লিক) বাড়ী থেকে গরাণহাটা পর্য্যন্ত হেঁটে আসতেন, সেখান থেকে শেয়ারের গাড়ীতে বরানগরে নামতেন, সেখান থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। তাই ঠাকুর এ কথা জিগ্‌গেস

করতেন। ··· এক;এক দিন রোদে তাঁর মুখ লাল হোয়ে যেতো, তাই না দেখে ঠাকুর তাঁকে বলতেন, 'গ্যাখো, এত কষ্ট কোরে তুমি আসো কেনো ? তুমি একখানা গাড়ী কোরে এলেই ত পার।' তাতে উনি কি বলতেন জানো ?—'আমি যদি গাড়ী চড়ি, আমার পরে যারা থাকবে, তারা ত জুড়ি চাপবে। আপনিই ত বলেন—সংসারীকে ছেলেপুলের জন্য উপায় করতে হবে, উপায়ের কড়ি দান করতে হবে, আবার তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় ক'রে রেখে যেতে হবে, তা না হলে ছেলেপুলেরা গালিগালাজ করবে।' ··· এক দিন তীর্থভ্রমণ করে এসে তিনি (মণি মল্লিক) ঠাকুরকে বললেন—'তীর্থে সাধু-সন্ন্যাসীরা বড় পয়সার জন্য দিক করে।' তাতে ঠাকুর কি বললেন জানো ?—'সাধু-সন্ন্যাসীরা দু-একটি পয়সা চায়, তা' দিতে তোমার এত বিরক্তি লাগে। এ মন নিয়ে ত তীর্থে যাওয়া উচিত নয়। তীর্থে গিয়ে দান করতে হয়। সন্ন্যাসীরা ত আর রোজগার করে না—দু-এক পয়সা তাই তাদের চাইতে হয়। দুনিয়ার সব সুখ তোমরা ভোগ করবে, আর সাধুরা সব ত্যাগ করে যাবে—ওরা বুঝি হাওয়া খেয়ে থাকবে।' ···একবার রাখাল ভাইয়ের দেশে বড় জলকষ্ট হয়েছিলো। ঠাকুর ওনাকে (মণি মল্লিককে) একটা পুকুর কাটিয়ে দিতে বললেন। ···ওনার (মণি মল্লিকের) এক ছেলে মারা যায়। ঠাকুরের কাছে এসে একদিন খুব দুঃখ জানাচ্ছেন। উনি (ঠাকুর) সব শুনে একখানা গান জুড়ে দিলেন। তাতেই ওনার (মণি মল্লিকের) দুঃখু কমে যায়। ···উনি গরীব ছেলেদের পড়াবার জন্য অনেক টাকা খরচ করতেন। ···একদিন তাঁকে (মণি মল্লিককে) বললেন —'গ্যাখো ! বয়স হোলে সংসার থেকে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করতে হয়, তাহলে তাঁর উপর প্রেম জন্মায়।'

এই বৎসরে ঠাকুর লাটুকে লইয়া বেলঘোরে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের

গৃহে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে অন্য কোন কথা আমাদের জানা নাই।

মনে হয়, ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত অধরচন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহে সেবক লাটু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজ শ্রীযুত অধরচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হইল :

"হামাদের নিয়ে উনি (ঠাকুর) শোভাবাজার বেনেটোলায় যেতেন। অধর বাবুর বাড়ীকে ঠাকুর কলকাতার বৈঠকখানা বলতেন। ...অধর বাবুর বাড়ীতে হামেশা উৎসব হোতো, আর তিনি হামাদের খুব খাওয়াতেন। ... অধর বাবুর মা ভারী ভক্তিমতী ছিলো, ভাদ্র মাসে যখন আমের দর চড়ে যেতো তখন তিনি লাঙ্‌ড়া আম, আর মর্ত্তমান কলা আর কড়াপাকের সন্দেশ পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুর অধর বাবুর দেওয়া জিনিস খুব খেতেন। ...এক দিন ওনার বাড়ীতে হামাদের সব নিমন্ত্রণ হয়েছিলো। বাকী রাম বাবুকে উনি বলতে ভুলে গেছিলেন। রাম বাবু তাতে ভারী দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি (রাম বাবু) ঠাকুরকে অভিমান কোরে বললেন—'আমাদের বাদ দিচ্ছেন, আমরা এত কি অপরাধ করেছি ?' উনি (ঠাকুর) এই কথা শুনে রাম বাবুকে বললেন—'গ্যাখো রাম ! নিমন্ত্রণের ভার ছিল সব রাখালের উপর, রাখাল তোমায় বলতে ভুলে গেছে। রাখালের উপর তোমার অভিমান করা কি সাজে ? ও ত ছেলে মানুষ !' একথা শুনবার পর রাম বাবুর বাড়ীতে অধর বাবু নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ কোরে এসেছিলেন। ... একদিন ওনার (অধর বাবুর) বাড়ীতে উনি (ঠাকুর) খাবার সময় বললেন—'গ্যাখ গো ! টক আমগুলো আমার পাতে দিও না।' একথা শুনে অধর বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে বেছে বেছে ভাল আম এনে ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর

সেই আম খেয়ে বললেন—'এ বুঝি তোমার মা বেছে দিলেন, তা না হোলে এমন মিষ্টি আম তুমি বাছতে পারতে না।' ...ওনার (অধর বাবুর) বাড়ীতে রাখাল ভাই ভাত খেতো, তাতে দু-চার জন ভক্ত বলেছিলো—'রাখাল সোনারবেনের ভাত খেয়েছে।' এই না শুনে উনি (ঠাকুর) কি বল্লেন জানো?—'ভক্তের আবার জাতবিচার কি? ভক্তের অন্ন শুদ্ধ অন্ন; সেখানে খেলে দোষ নেই।' ... সেখানে (অধর বাবুর বৈঠকখানায়) হামি তোমাদের বঙ্কিম বাবুকে প্রথম দেখি। ওনার সাথে তাঁর অনেক কথা হয়েছিলো। তোমাদের বঙ্কিম বাবু ভারী চালাক লোক। ওনাকে (ঠাকুরকে) বিড়ে নিতে এসেছিলেন। বাকী ওনার কাছে হার মেনে গেলেন। যাবার সময় কি বলেছিল জানো?—একদিন ওনার (বঙ্কিম বাবুর) বাড়ীতে যেতে। বাকী তিনি নিমন্ত্রণ পাঠালেন না। ওনার (ঠাকুরের) তাই যাওয়া হলো না। ... অধর বাবু দিনকতক রোজ দক্ষিণেশ্বরে যেতেন আর সঙ্গে করে রোজ খাবার নিয়ে যেতেন। ... একদিন তিনি ওনাকে (ঠাকুরকে) বললেন—'আপনার কি কি সিদ্ধাই আছে?' উনি (ঠাকুর) এ কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—'যারা ডিপুটী হোয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে, মায়ের ইচ্ছায় হামি সে-সব ডিপুটীকে ঘুমপাড়িয়ে রাখি।' ...অধর বাবুকে উনি (ঠাকুর) ঘোড়ায় চড়তে মানা করেছিলেন, বাকী তিনি সেকথা শুনতেন না। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেলেন। ...অধর বাবুর মৃত্যুর কথা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন—'একে একে সব বৈঠকখানা বন্ধ হচ্ছে, এবার এ আড্ডাখানাও বন্ধ হবে দেখতে পাচ্ছি।' ...অধর বাবুর বাড়ীতে ভারী ভারী (অর্থাৎ বড় বড়) কীর্ত্তনিয়ারা সব আসতো, সেইখানে হামি ত তেমোদের দেশের চণ্ডীর গান শুনেছি। রাজনারাণের চণ্ডীর গান হামার ভারী ভালো লেগেছিলো। ...অধর

বাবুর গাড়ীতে ঠাকুর মাঝে মাঝে কালীঘাটে যেতেন, সেখানেও ভক্তদের নিয়ে তিনি খুব আমোদ-আহ্লাদ করতেন। ...অধর বাবু দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমিয়ে পড়তেন। তাই না দেখে কেউ কেউ ওনার (অধর বাবুর) নিন্দে করতো। তাতে ঠাকুর একদিন কি বললেন জানো?—'তোরা কি বুঝবিরে শালা? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তিক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়-কথা না বোলে ঘুমেচ্ছে, সে ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে।'"

*　　　*　　　*

দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের দ্বিতীয় জন্মোৎসবের দিন আসিয়া গেল। সেইদিনকার সংবাদ আমরা লাটু মহারাজের মুখে যে ভাবে শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি। লাটু মহারাজ আমাদের কোনো তারিখ বলেন নাই। আমরা শ্রীম-কথিত 'কথামৃত' হইতে তারিখটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

ঠাকুরের দ্বিতীয় জন্মোৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' লিখিত হইয়াছে। পুনরুক্তিভয়ে তাহা বিস্তৃত করিতে চাহি না, শুধু তাহাতে যেটুকু পাই নাই অথচ লাটু মহারাজ যাহা আমাদের বলিয়াছেন তাহাই লিখিত হইতেছে।

"সেদিন ঠাকুর হামার গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে বললেন। মাত্র এক কলসী জলে তিনি আস্নান করলেন। আস্নান কোরে তিনি মায়ের মন্দিরে গেলেন। হামাদের তখন রান্নার জোগাড় দিতে হয়েছিলো। প্রায় ১০০।১৫০ লোক খেয়েছিলো। সেদিন কোন্নগর থেকে মনোমোহন বাবু কীর্ত্তনের দল এনেছিলেন। তাদের সাথে ঠাকুর খুব কীর্ত্তন কোরেছিলেন। হামাদেরও তিনি যোগ দিতে বলেছিলেন। সেবার পঞ্চবটীতে গান হয়েছিলো। সেদিন

ঠাকুর বলেছিলেন—তিনি শুধু সন্ন্যাসী নন, তিনি সন্ন্যাসীর রাজা। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর যা বেঁচেছিলো সব গরীবদের দেওয়া হোলো।"

"এর মধ্যে রাখাল ভায়ের একদিন দক্ষিণেশ্বরে অসুখ করে, তাতে উনি রাখালকে বললেন—'ওরে! জগন্নাথের প্রসাদ খা, তাহলে তোর অসুখ সেরে যাবে।' জানো! জগন্নাথের প্রসাদের এমন গুণ! তোমরা জগন্নাথের প্রসাদকে মানো না, আর তিনি সকলকে বলতেন—'খাবার আগে দু-এক দানা মহাপ্রসাদ খাবে।'"

"অন্নপূর্ণাপূজায় হামাদের সব সুরেশ মিত্তিরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হোতো। সেখানে উনি বছর তিনেক গিয়েছিলেন। সুরেশ বাবু ঠাকুরকে খুব আদরযত্ন করতেন, বাকী খাওয়াতে খুব দেরী করতেন। তাই একবারের পূজায় বলেছিলেন, 'দ্যাখো, অন্নপূর্ণা যার ঘরে আসেন, সেদিন তার ঘরে অন্নের অভাব হয় না, সবাই পেট ভরে খেতে পায়। কিন্তু কেউ পায় খিদের সময় খেতে, আর কেউ পায় সেই রাতভিতে খেতে। যে খিদের সময় পেলে, সে ভাবলে মায়ের কৃপা হয়েছে, আর যে খিদের সময় পেলে না, সে মনে করলে মায়ের কৃপা আর হোলো না। জেনো, মা সবাইকে ঠিক ঠিক দিচ্ছেন—যার যেমন দরকার পড়ছে, সে সেইভাবে মায়ের কৃপা বুঝে নিচ্ছে গো।'"

"জানো! দশহরার দিন হামাদের সব উনি গঙ্গাপূজা করতে বললেন। রাখালকে বললেন—'গঙ্গামায়ী সাক্ষাৎ দেবী, আজকে তাঁর পূজা করতে হয়। রাখালভাই গঙ্গামায়ীকে তখন দেবী ভাবতেন না। তাই না শুনে ঠাকুর একটি ঘটনা বললেন (এটি ঠাকুরের সাধন-অবস্থার দৃষ্ট ঘটনা)। একদিন তিনি পোস্তার ধারে বেড়াচ্ছেন। বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে সন্দেহ হোলো—গঙ্গামায়ী দেবী কি-না। এমন সময় তিনি

শুনলেন যে, গঙ্গার মাঝে খুব শাঁকের আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। ক্রমে ক্রমে শাঁকের আওয়াজ খুব কাছে এসে গেলো, অমনি দেখলেন কি না একটি ছেলে শাঁক বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে, আর তাঁর পিছু পিছু এক দেবী চলেছেন। এ সব দেখবার পর তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঠাকুরের এই কথা শুনে রাখালভাই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলো, বললেন—'আমাদের অতশত জানা নেই, আমরা জানি গঙ্গা ত নদী, স্রোতের জল, মাঝিমাল্লারা ওখানে কতো প্রস্রাব ক'রে থাকে।' রাখাল ভাই-এর কথা শুনে ঠাকুর ভারী রাগ করলেন, বললেন—'খবরদার! গঙ্গায় কখনো বাহ্যে-প্রস্রাব করবি নি।' সেই অবধি রাখাল-ভাইকে আর গঙ্গার ধারে শৌচ করতে দেখি নি।"

* * *

"সেই বৎসর হামি ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পেনেটীর মহোৎসবে যাই। হামি, রাখাল, ভবনাথ সব রাম বাবুর গাড়ীতে যাই। আরো আরো ভক্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তোমাদের নবদ্বীপ গোঁসাইকে দেখি। তাঁর সাথে ঠাকুর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সেবার ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখে হামাদেরও ডর লেগেছিলো। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো, মুখ চোখ বুক সব একদম লাল হোয়েছিল, হাতের চেটো পর্য্যন্ত লাল হোয়ে গেলো। ওনার এমন ভাব দেখে সবাই তাঁর পায়ের ধূলার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, বাকী হামাদের বড় মুশকিল হোলো। ঠাকুরকে সবাই ছুঁতে চায়, হামরা তাদের ছুতে বারণ করি ; কেউ শুনে না। এই নিয়ে বহুৎ গণ্ডগোল লেগে গেলো। রাম বাবু বললেন, 'ওরে লেটো! ছেড়ে দে, লোকেরা সব ওনাকে ছুঁয়ে ধন্য হোক্।' বাকী রাম বাবুর কথা হামি শুনতে পারলুম না। হামি ত দেখেছি যে, সমাধির সময়

তাঁকে কেউ ছুঁলে তাঁর কেমন কষ্ট হোতো! রাম বাবু হামায় বারে বারে একথা বললেন। হামি, রাখালভাই আর ভবনাথ-ভাই তিন জনে মিলে ঠাকুরকে সেখান হোতে বাহিরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলুম। বাকী লোকেরা কি শোনে? ওনাকে যখন নিয়ে যাচ্ছি, তখনও তাঁর পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করছে। শেষে রাম বাবু করলেন কি জানো? একমুঠো ধূলো ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে লাগলেন। তবে তাঁকে বাহিরে আনতে পারি। ··· এর পরের বছরে হামি সেখানে গিয়েছিলুম, বাকী এবার নৌকা করে গিয়েছিলুম। সেবার (শ্রীশ্রীমাকে) নিয়ে যাবার কথা হয়। মা হামাদের সাথে যেতে চাইলেন না। এই না দেখে ঠাকুর তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) ভারী সুখ্যেত করলেন, বললেন—'কেমন বুদ্ধিমতী দেখেছো! পাছে কোন কথা উঠে তাই নিজে থেকেই যেতে চাইলে না।' সেবার ঠাকুর সবার সাথে প্রসাদ পেলেন, ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে তুহাত তুলে নাচতে লাগলেন।"

"পেনেটীর মহোৎসবে একবার বৈষ্ণব-বিদায়ের সময় ঠাকুর পাঁচ টাকা পেলেন। অন্য সবাই এক টাকা তু টাকা পেলো, উনি পেলেন পাঁচ টাকা। উনি ত টাকা নিতে চাইলেন না, বাকী কর্ম্মকর্ত্তারা ছাড়লেন না। শেষে রাখালের হাতে টাকা দিলেন। রাখাল-ভাই পাঁচ টাকায় এক ঝুড়ি আম আর এক ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলো। এই না দেখে ঠাকুর রাখালের উপর খুব গোঁসা করলেন, আউর রাখালভাইকে সাবধান করে দিলেন, বললেন—"দ্যাখ্! এমন কাজ আর করবি নি। তুই নিলে আমার (ঠাকুরের) নেওয়া হোলো। পঞ্ছী আউর দরবেশের কিছু সঞ্চয় করতে নেই।"

"তুর্গাপূজার মাস তু'য়েক আগে হামাদের নিয়ে এক দিন উনি

(ঠাকুর) পাথুরেঘাটায় (যদু মল্লিকের বাড়ী) এলেন। যদু মল্লিককে হামি তার বাগানে দেখেছি, বাকী আগে কোন দিন তার বাড়ীতে আসি নি। তার বাড়ীতে তখন (শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী) দেবী ছিলেন। তাই হামাদের নিয়ে দেবীকে দর্শন করতে এলেন। দেবী-দর্শনের পর তিনি বাবুর (যদু বাবুর) খোঁজ নিলেন। যদু বাবু তখন একখান লম্বা মার্ব্বেলের টেবিলে খালি গায়ে শুয়ে ছিলেন। উনাকে দেখতে পেয়ে যদু বাবু বললেন—'এস, এস, ছোট ভট্‌চাজ! (যদু বাবু ঠাকুরকে ছোট ভট্‌চাজ বলিতেন)। এদিকে ত আর এসো না—মা এসেছেন, তাই আমাদের মনে পড়েছে, তাইত তুমি এসেছো।' যদু বাবুর এই কথা শুনে উনি (ঠাকুর) বললেন—'তুমি কেমন লোক বলতো? মা এসেছেন, আমাকে কি সে খবরও দিতে নেই?' ঠাকুরের কথা শুনে যদু বাবু বললেন—'দেখ ছোট ভট্‌চাজ! তোমার চেয়ে মায়ের সংবাদ বেশী রাখতে আর কাউকে ত দেখি নি? পরশু মা এসেছেন, মা আসতে না আসতেই তুমি এসে হাজির। তোমায় জানাবার সময় পেলুম কোথা?' ঠাকুর হাসিতে হাসিতে—'তা তো বটেই। এখন মায়ের প্রসাদ কিছু আনাও। অমনি মুখে কি ফিরতে আছে?' যদু বাবু সেইভাবে শুয়ে শুয়ে একজনকে মায়ের প্রসাদ আনতে পাঠালেন। তুরন্ত সে প্রসাদ নিয়ে এলো। উনি সেই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন, আর সেখান হোতে প্রসাদ পেয়ে যেই গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমন সময় যদু বাবু বললেন—'কই মায়ের সঙ্গে দেখা করলে না?' একথা শুনে ঠাকুর সেখান হোতে ডাকতে লাগলেন—'কই গো যদুর মা, একগ্লাস জল দাও না?' ঠাকুরের গলার আওয়াজ শুনে যদুর মা নীচে এলো। ঠাকুর তার হাত হোতে এক চুমুক জল খেয়ে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীতে আর আর

সব ভক্তেরা ঠাকুরকে বললেন—'আপুনি মশায় এমন বড় লোকের বাড়ীতে আর আসবেন না। এরকম লোকের কাছে আসেন কেন? আপুনাকে এরা বসতে পর্য্যন্ত বললে না। এরকম লোকের বাড়ীতে এসে খামকা কেন অপমান হন।' ভক্তদের কথা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—'ওগো! ওরা বিষয়ী, সারাক্ষণ বিষয় নিয়ে পাগল। ওরা যে এত বিষয়চিন্তার মাঝেও দেবীর পূজা করছেন, এই ত যথেষ্ট। তোমরা ত তাও কর না। ও (যদু বাবু) আমাকে বসতে বললে কি না বললে, তাতে তোমাদের কেন মাথাব্যথা? ওদের মনের অবস্থা তোমরা কি বুঝবে? এসেছিলে ঠাকুর দেখতে—প্রসাদ পেয়ে গেলে, এই ত যথেষ্ট। এমন সময়ে ঠাকুরের প্রসাদ দেয় কে? তোমরা কি কর্ত্তাকে দেখতে গিয়েছিলে যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান করছো?' (ভক্তগণের মধ্যে যাহারা যদু বাবুর সম্বন্ধে বলছিলো) তারা উনার (ঠাকুরের) কথা শুনে চুপ কোরে গেলো। ... ঠাকুর এইরকম কোরে সব হামাদের বিড়ে নিতেন, বলতেন—'সাধু হতে চাস্ ত অভিমান ছাড়তে হবে। কেউ মানলে, কি মানলে না—এসব দেখলে চলবে না।' "

যদু বাবুর সম্বন্ধে নানাপ্রসঙ্গ লাটু মহারাজ আমাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বলিয়াছেন। মনে হয়, সেইগুলি এইখানে একত্র লিখিত হইলে পাঠকগণের সুবিধা হইবে। এর মধ্যে কোনটি বলরাম মন্দিরে, কোনটি কাশীতে, কোনটি বা হরমোহন বাবুর বাড়ীতে শুনিয়াছি। কোনটি হয়তো লাটু মহারাজের আসিবার পূর্ব্বের ঘটনা (পরে উনি শুনিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছেন), আবার কোনটি হয়তো দক্ষিণেশ্বরে বাসকালীন ঘটনা।

"জানো—! যদু বাবুকে একদিন উনি বললেন—'হ্যাগা যদু! তুমি

ওদের (কয়েকটি মোসাহেবজাতীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া) সঙ্গে এত মিশো কেন ?' একথা শুনে যদু বাবু কি বলেছিলো জানো ?—'ভদ্রলোকের ছেলে ভিক্ষে করতে পারে না, কিছু পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে, তাদের বঞ্চিত করলে তারা যায় কোথায়।' তাতে ঠাকুর বলেছিলেন —'ওদের সঙ্গে মিশো না, মিশলে ক্ষতি হতে পারে ?' তাতে যদু বাবু বলেছিলেন—'হ্যাখো ছোট ভট্‌চাজ ! বিষয়-আশয় রাখতে গেলে এমন লোকের দরকার আছে।' ··· একদিন ঠাকুর তাঁকে (যদু বাবুকে) বললেন—'ইখানকার জন্য (অর্থাৎ ইহলোকের জন্য) ত অনেক সংগ্রহ করেছো, কিন্তু (লাটু মহারাজ বলেছিলেন বাকী) পরকালের জন্য কি যোগাড়-যন্তর করলে ?' একথা শুনে যদু বাবু বললেন—'পরকালের কাণ্ডারী ত তুমি আছ, ছোট ভট্‌চাজ ! শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে, সেই আশায় ত বসে আছি। আমায় উদ্ধার না করলে তোমার পতিতপাবন-নামে কালী পড়বে। দেখো ছোট ভট্‌চাজ ! শেষের দিনে ভুলো না।'··· দেখো, যদু মল্লিকের এতো টাকা ছিলো, তবু টাকার লোভ যাইনি। তাই উনি (ঠাকুর) একদিন তাঁকে বললেন—'কি গো যদু ! এত টাকা করেছো, এখনো টাকার লোভ গেলো না !' তাতে যদু বাবু বলেছিলেন—'দেখ ছোট ভট্‌চাজ ! ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পার না, বিষয়ী লোক তেমনি টাকার লোভ ছাড়তে পারে না। আর টাকার লোভ ছাড়বে কেন, বল ? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্য পাগল হোতে পার, কিন্তু আমি যে তাঁর ঐশ্বর্য্যের জন্য পাগল হয়েছি। তুমি সব ছেড়ে তাঁকে চাইছো, আর আমি তাঁর ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল হোয়ে টাকা টাকা করছি। আচ্ছা বল দিকিনি ছোট ভট্‌চাজ ! টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য্য নয় ?' একথা শুনে ঠাকুর ভারী খুশী হয়েছিলেন, বললেন—'এটা

যদি ঠিক বুঝে থাক, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো ?' তারপর তাঁকে জিগ্‌গেস করলেন—'কি গো যদু ! সরলভাবে একথা বলছো, না চালাকী কোরে বল্‌ছো ?' একথা শুনে যদু বাবু বলেছিলেন—'সে ত তুমি জানো, ছোট ভট্‌চাজ। তোমার কাছে মনের কথা লুকোতে ত পারবো না।' ...একদিন উনি যদু বাবুকে বললেন—'ভাখ ! আগে তুমি ভগবানের নাম করতে, এখন তাঁকে ডাকতে এত অন্যমনস্ক হয়ে যাও কেন ?' তাতে যদু বাবু বললেন—'কি জানো ছোট ভট্‌চাজ ! তোমায় দেখবার পর থেকে আমার কেমন ভগবানকে ডাকতে মন যায় না। আমি দেখি যে তাঁর (ভগবানের) নাম নিলে বিষয়চিন্তায় মন বসে না, তাই তাঁতে অন্যমনস্ক হোয়ে আমায় বিষয়-আশয় দেখতে হয়।' এই কথা শুনে ঠাকুর কি বললেন জানো ?—'এতটা ভাল নয়, যদু ! ঘানির বলদ হোয়ে ঘুরতে চাইছো কেন ?' যদুবাবু বললেন—'কর্ম্মফল মান ত ছোট ভট্‌চাজ ?' ... যদু মল্লিকের মা একদিন ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর খাওয়াচ্ছেন, খুব দেরী হচ্ছে দেখে দেবেন বাবু (ইটালীর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার) চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এমন সময় হামাদের সব বাড়ীর ভিতরে খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেলো। খেয়ে উঠে দেবেন বাবু উনার (ঠাকুরের) পায়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন। হাম্‌নে ত কুছু বুঝ্‌লুম না। শেষে একদিন দেবেন বাবুকে জিগ্‌গেস করলুম। দেবেনবাবু বললেন—'দেখো ! আমার মনে বড় কু গেয়েছিলো। আমি ঠাকুরকে সন্দেহ করেছিলুম। কিন্তু যাবার পথে দেখলুম যে যদুর মা ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাতে বুঝলুম তাঁর বাৎসল্য ভাব। আর আমি (দেবেন বাবু) ভেবেছিলুম অন্যকথা। ঠাকুর অন্তর্য্যামী কি না ! তাই আমার (দেবেন বাবুর) সন্দেহ ঘুচিয়ে দিলেন।' "

(১৮৮৪)। ... "একদিন হৃদয় ঠাকুর (ঠাকুরের ভাগিনেয়) ওনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠাকুর তাঁর সাথে দেখা করবার জন্য যদু মল্লিকের বাগানে গিয়েছিলেন। ... যদু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। দক্ষিণেশ্বরে বেশী লোকজন থাকলে তিনি মাঝে মাঝে রাখাল-ভাইকে, লোরেন-ভাইকে আর ভবনাথ-ভাইকে সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে যেতেন। শুনেছি, লোরেন-ভাইকে উনি ওখানেই সব দেখিয়েছিলেন। ... যদু বাবু বাগানে এলে ওনাকে ডেকে পাঠাতেন, আর বসে বসে তাঁর গান শুনতেন। ঠাকুরকে গান শুনাবার জন্যে তিনি একজন লোক আনতেন। তার ভারী মিঠে গলা ছিল, ঠাকুর তার গানের সুখ্যাত করতেন। একদিন ঠাকুরকে তিনি চৈতন্যলীলার (গিরিশ বাবুর) গান শুনালেন। তাতেই ত ওনার থিয়েটার দেখবার ইচ্ছে হোলো।"

এইখানেই যদু বাবুর প্রসঙ্গ শেষ হইল।

(১৮৮২-৮৩-৮৪)। "পূজার সময় তিনি (ঠাকুর) ভক্তদের বাড়ী যেতেন। সপ্তমীর দিন যেতেন রাম বাবু ও সুরেশ বাবুর বাড়ীতে। অষ্টমীতে যেতেন কিশুব বাবু, অধর বাবু, রাম বাবু ও আর আর ভক্তদের বাড়ী! নবমীর দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, কোথাও বড় যেতেন না। একবার অধর বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন রাত নয়টা-দশটায়। দশমীর দিন তিনি যেতেন নবকুমার চাটুয্যের বাড়ী (নবকুমার বাবু দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেন)। একাদশীর দিন সব ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। ... শুনেছি মথুর বাবু যদ্দিন বেঁচেছিলেন তখন তিনি পূজার সময় তাঁদের বাড়ী যেতেন। মথুর বাবুর মরবার পর তিনি সেখানে আর পূজার সময় যেতেন না। ... তোমাদের ঐ লক্ষ্মী (কোজাগরী লক্ষ্মী) পূজার দিন কিশুব বাবু দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক ভক্ত আসতো।... একবার তিনি

কিশুব বাবুকে নারিকেল-মুড়ি আর তালের ভিতর একরকম কি হয় সেই খাইয়েছিলেন। সবার সাথে কিশুব বাবু ঐ সব খেলেন। এতো বড়ো লোক একটুও মান দেখালেন না। ··· কালীপূজার দিন মায়ের মন্দিরে খুব আলো দেওয়া হোতো, পোস্তার ঘাটে সব আলো দেওয়া হোতো। সেদিন রামলাল (দাদা) পূজায় বসবার আগে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে যেতো; উনি সেদিন নিজের ঘরে বসে থাকতেন। রাতে মাকে দেখতে যেতেন। সারারাত নহবৎ বাজতো। ··· একবার শনিবারে কালীপূজা হয়েছিলো। ঠাকুর হামাদের সব বললেন, 'ওরে, আজকে রাতে খুব জপ করবি। এমন দিনে জপ করলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হওয়া যায়।' সে রাতে ঠাকুর হামাদের কাউকে ঘুমোতে দিলেন না; অনেক রাত পর্য্যন্ত নিজে গান গাইলেন। ··· জগদ্ধাত্রীপূজার দিন হামাদের নিয়ে উনি মদনমোহন বাবুর বাড়ী যেতেন। সেখানে একবার একজন এমন খোল বাজিয়েছিলো যে, তার বাজনা শুনে ঠাকরের সমাধি হোয়ে গেলো।"

(১৮৮৩)। "জানো—! একবার তিনি কিশুব বাবুকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিশুব বাবুর তখন অসুখ করেছে। উনি এসেছেন শুনে উপর থেকে নেমে এলেন। ঠাকুর তাঁর অসুখ দেখে বলেছিলেন— 'এবার মায়ের ইচ্ছা বুঝতে পারলুম না।' তারপর তিন চার মাসের মধ্যে কিশুব বাবু দেহ রাখলেন। ··· আর একবার অসুখ হয়েছিলো। ঠাকুর তাঁর জন্য সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব চিনি মেনেছিলেন। কিশুব বাবু ভালো হোলে ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরীর কাছে পূজা পাঠিয়েছিলেন। ··· বিজয় বাবু ও কিশুব বাবুর দলের লোকেরা একবার মণি মল্লিকের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে উনি কিশুব বাবুর অসুখ শুনলেন। কিশুব বাবুর অসুখ শুনে ঠাকুর যেন কেমন দুঃখিত হোলেন; সেদিন আর সেখানকার নাচে-গানে

যোগ দিলেন না। জানো—! কিশুব বাবুকে ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। তিনি ঠাকুরের কাছে হাতজোড় কোরে বসে থাকতেন। ঠাকুরের কথার উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ছিলো।"

শুনিয়াছি, তিনি (ঠাকুর) সেবক লাটুকে লইয়া ভক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়াছিলেন—কোন্ বৎসর তাহা বলিতে পারি না। জয়গোপাল বাবুর সম্বন্ধে লাটু মহারাজ পরবর্ত্তীকালে বিশেষ কিছু বলেন নাই। মাত্র শুনিয়াছি যে, গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে জয়গোপাল বাবু দক্ষিণেশ্বরে বরফ-দেওয়া তরমুজের সরবৎ, বেলের সরবৎ, কুল্‌ফীবরফ প্রভৃতি লোক-মারফৎ পাঠাইয়া দিতেন। ঠাকুর বরফ-দেওয়া সরবৎ খাইতে বড় ভালবাসিতেন। জয়গোপাল বাবু এত অধিক পরিমাণে সরবৎ পাঠাইতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের সকল ভক্তের কুলাইয়াও উদ্‌বৃত্ত থাকিত। ঠাকুর তাহা দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন।

"জানো ! একবার তিনি (ঠাকুর) হামাকে, বাবুরামকে আর রামলাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক ভক্তগৃহে যাত্রা শুনেছিলেন। যাত্রাওয়ালা বড় সজ্জন ছিলো, ঠাকুরকে মেনেছিলো। তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলো। ঠাকুর তার কাছে কত গান শুনলেন। শেষে বললেন—'দ্যাখো ! তুমি যখন এমন গান বাঁধতে পেরেছো, তখন তোমার এতেই হোয়ে যাবে।' তিনি রামলাল (দাদাকে) বললেন গানগুলো সব লিখে নিতে। লাটু মহারাজের এই কথাগুলি যে কোন্ যাত্রার দলকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে তাহা আমরা জানি না—নীলকণ্ঠের যাত্রার দল কিনা বলিতে পারি না। ··· তিনি আর একদিনের যাত্রার কথা বলেছেন। সেদিন কালীপূজার দিন ছিল—মনে হয়, ফলহারিণী কালীপূজা (শ্রীম—'কথামৃত', ১৮৮৪)।··· 'দ্যাখো— ! ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একদিন যাত্রা হয়েছিলো।

সারারাত ধরে যাত্রা শুনেছি। উনিও বসে বসে শুনেছিলেন। সেখানে শুনলুম যে একজন আর একজনকে ভালবাসতো—এমন ভালবাসতো যে তার সাথে মিলবার জন্য মাটীর তলায় গর্ত্ত কোরে রাস্তা বানিয়েছিলো। দেখো তো ভালবাসার কতো টান! উনি (ঠাকুর) বল্‌তেন—'তিন টান এক না হোলে ভগবান মিলবে না।' "

জনৈক ভক্ত— তিনটি টান কি কি মহারাজ?

লাটু মহারাজ— এক —মেয়েলোককে ভালবাসলে যে টানে পড়তে হয়, সেই টান; দুই —বালবাচ্ছার উপর বাপমায়ের যে টান, সেই টান। আর তিন নম্বর —নেশাখোরের নেশার উপর যে টান আছে, সেই টান। (এখানে ঠাকুর বলতেন বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান)। এই তিন টান এক করলে তবে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়।

"রাম বাবু সাধন করবার জন্যে একটি বাগান নিয়েছিলেন। সেখানে হামাদের নিয়ে ঠাকুর একদিন গেলেন। কাঁকুড়গাছির বাগানের পথ ভারী খারাপ ছিলো, গাড়ী যেতো না। ঠাকুর হেঁটে হেঁটে গেলেন। পথে এক সাধুর আড্ডা দেখে সেইখানে আলাপ জুড়ে দিলেন। হামাদের সব দাঁড়াতে বলে তিনি সাধুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বহুৎক্ষণ বাৎচিৎ হোয়েছিলো। যারা সব সঙ্গে ছিলো, সব চঞ্চল হোয়ে উঠলো। শেষে তারা সব তাঁকে ডাকতে গেলো। সাধুর আখ্‌ড়া হোয়ে ঠাকুর রাম বাবুর* বাগানে গেলেন। সেখানে রাম বাবু একটি তুলসীকুঞ্জ বানিয়েছিলেন। ঠাকুর তাই দেখে বললেন—'রাম! এইখানটি ত বেশ নির্জন,—যেন তপস্যার স্থান। এখানে

* শ্রীম কথিত 'কথামৃতে' আছে—সাধুর সহিত কথা হইবার পর ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে যান। কিন্তু লাটু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বোঝায় যে রাম বাবুর বাগানে যাইবার সময় সাধুর সহিত দেখা হইয়াছিল।

এসে মাঝে মাঝে ধ্যান করবে, জানো!' সেদিন রাম বাবু ভক্তদের সব মেওয়া, আঙ্গুর, বেদানা, কমলালেবু, মাখন, মিছরি, সন্দেশ, খেজুর সব খাইয়েছিলেন। কাঁকুড়গাছির বাগান থেকে ঠাকুর সুরেশ মিত্তিরের বাগানে যান। সেখানে ঠাকুর হামাদের নিয়ে মাঝে মাঝে যেতেন আর সুরেশ বাবু সেখানে মাঝে মাঝে উৎসব করতেন।" (সুরেশ বাবুর বাড়ীতেও উৎসব হইত)।

"একবার ঠাকুর হামাকে সঙ্গে নিয়ে ঈশান বাবুর বাড়ী যান। ঈশান বাবুর (শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) বাড়ীতে অনেক পণ্ডিত এসেছিলেন। তারা সব নিজের নিজের মধ্যে শোলোক (শ্লোক) বলাবলি করছিলো। একজন ত মুখে মুখে এমন একটি শোলোক বানিয়ে দিলে যে সবাই হেসে উঠ্‌লো। শুনে ঠাকুর বললেন—'ওগো তোমরা এতো হাসে তোমাদের কি কথা হচ্ছে?' পণ্ডিত লোকেরা তখন শোলোকটি তাঁকে শুনালেন আর সব শোলোকের মানে লাগিয়ে দিলেন। একজন মানে করলেন—'অন্নচিন্তা চমৎকারা', আর একজন ওরই মানে বললেন 'ভগবান চিন্তা বড়িয়া চিন্তা।'"

"ঈশান বাবু ওনাকে বিশ পঁচিশ রকম তরকারী কোরে খাওয়াতেন। তাঁর বাড়ীর রান্না ঠাকুর খুব পছন্দ করতেন। একদিন ওনার বাড়ীতে অনেক রকম আচার খেয়েছিলেন।"

"একবার হামাকে নিয়ে তিনি (ঠাকুর) ঈশান বাবুর বাড়ী থেকে শশধর পণ্ডিতকে দেখতে যান। উনি (ঠাকুর) তাঁকে (পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি) বললেন—'ত্মাখ গো! চাপ্‌রাস না পেলে কেউ কারোর কথা শোনে না। তুমি কি তাঁর (ভগবানের) আদেশ পেয়েছো?' এ কথা শুনে পণ্ডিতজী কোন কথা বললেন না। দিন পাঁচেকের পর পণ্ডিতজী দক্ষিণেশ্বরে

ফিরে ফিত্তি গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তেন। ... ঈশান বাবু একবার ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করেছিলেন। সেখান হোতে এলে তিনি (ঠাকুর) তাঁকে বলেছিলেন—'ত্মাথ গো ঈশান! মন ভাল হোলে দেহ শুদ্ধ হোতে বেশী দেরী হয় না, কিন্তু মনের কাম বা আসক্তি থাকলে দেহ শুদ্ধ করতে অনেক সময় লাগে। দেহ ও মন এক সঙ্গে শুদ্ধ করতে না পারলে তপস্যায় আঁট থাকে না।'

কাশীতে একজন ভক্ত একবার কোন জিনিস বেশী দর দিয়ে নিয়ে যান্ ; তাইতে লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরের একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বাসকালীন ঘটনা বলিয়া ইহা এইখানে সন্নিবেশিত করিতেছি।

"দেখো! একবার যোগীনভাইকে একখানা লোহার কড়া উনি (ঠাকুর) আনতে বললেন। যোগীনভাই তা ভালো কোরে দেখে আনে নি। এই না দেখে ঠাকুর তাকে বললেন—'হ্যাঁরে! জিনিসটা আনলি তা দেখেও আন্‌লি নি? এটা যে একটু ফাটা রয়েছে, এতে ত কাজ চল্‌বে না। যা বাপু! আবার বদলে নিয়ে আয়। দেখিস্! এবার যেন দোকানীর কথায় বিশ্বাস করিস্ নি। দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে, সে ত আর ধর্ম্ম করতে বসে নি। তার কথায় বিশ্বাস কোরে ঠকে আসবি কেনো? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেনো? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? এ কি রকম তোর ভাব বুঝি না বাপু! ঠিক ঠিক দাম দিবি, ঠিক ঠিক জিনিস নিবি, এই ত জানি! দাম দেবার আগে দেখে নিবি, ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কিনা, ঠিক ঠিক ওজন দিলে কিনা। এমন কি যে সব জিনিসে ফাউ পাওয়া যায়, সে সব জিনিসের দাম দেবার সময় ফাউ চাইতে হয়, জানিস্!' ঠাকুর এমন ভাবে যোগীনভাইকে বুঝালেন। তিনি ত সন্ন্যাসী, তবু এমন

তার উপদেশ! তোমরা গৃহী হোয়ে এমন বেফজুল খরচ করছো কেনো? এতো দামের জিনিস হামার জন্য আনতে হয়? হামার ত এটুকুতে হোয়ে যেতো—তোমরা এতো খরচ করলে কেনো?"

বলরাম মন্দিরে তিনি নিম্নলিখিত ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। ইহা 'দক্ষিণেশ্বরে' এই অধ্যায়ে সন্নিবেশযোগ্য।

"একবার যোগীনভাই-এর সামনে একজন লোক ঠাকুরের খুব নিন্দে করতে থাকে। যোগীনভাই-এর তখন এমন অবস্থা যে কোন কুছুতে বাধা দিতে পারতেন না। সাধনকালে এমন একটা অবস্থা হয়, জানো, তখন কোন লোকের গায়ে হাত তুলা যায় না, কোন লোকের উপর রাগ করা যায় না। সেইকালে যোগীনভাইকে তাঁর নিন্দে পর্য্যন্ত সইতে হয়েছিলো। দু-চার দিন পরে ঠাকুর এই কথা শুনলেন। তিনি মনে মনে জানতেন যোগীনভাই কেনো কুছু বলতে পারলে না, বাকী হামাদের শিখাবার জন্য তিনি (ঠাকুর) বললেন কি জানো?—'ওরে! ইখানকার নিন্দে করলে, আর তুই চুপ কোরে শুনে এলি। গুরুনিন্দে শুনতে নেই যে রে। খোমতা থাকলে তাকে শাস্তি দিতে হয়, আর তা না থাকলে সেখান হোতে উঠে চলে আসতে হয়।' যোগীনভাই তাঁর কথা শুনে চুপ কোরে ছিলো।"

এরই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেন, তাহাও দক্ষিণেশ্বরের ব্যাপার, কিন্তু যোগীন মহারাজকে লইয়া নহে। উহাও এইখানে বলিয়া যাইতেছি। "দেখো—! এই রকমের একটি ঘটনা নিরঞ্জনভাই-এর সামনে হয়েছিলো। নিরঞ্জনভাই তখন নৌকায় ছিলো। যেই ঠাকুরের নিন্দে শুনলে অম্‌নি নিরঞ্জনভাই রেগে নৌকাখানা খুব হেলাতে দোলাতে লাগলো। নৌকার মধ্যে যেসব লোক ছিলো তারা সব ভয় পেয়ে গেলো। ভয়ে তারা ঠাকুরের নিন্দা করা বন্ধ কোরে দিলো। দক্ষিণেশ্বরে এসে

তাঁকে সব জানালে। . এই না শুনে ঠাকুর নিরঞ্জনভাই-এর উপর খুব বিরক্ত হোয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন—'লোকগুলোকে তুই ডুবিয়ে দিতে গেছিলি? একি কথা রে? এমন রাগও ত দেখিনি বাপু! না হয় আমায় একজন নিন্দেই করেছে, একজনের জন্তে কি নৌকাশুদ্ধ লোককে শাস্তি দিতে আছে রে? যদি নৌকাখানা ডুবে যেতো, এতগুলো লোকের দশা কি হোতো, বলনা রে? খবরদার! এমন রাগ করিস নি। একজনের দোষে হাজার জনকে শাস্তি দিবি এমন বিধান ত কোথাও দেখি নি।' ঠাকুরের কথা শুনে নিরঞ্জনভাই-এর চোখে জল এসেছিলো।"

এইরকম আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তবে তাহা দক্ষিণেশ্বরে নহে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে নরেন্দ্রনাথের গৃহে। বলরাম মন্দিরে আমরা এই ঘটনাটি লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার দক্ষিণেশ্বর বাসকালীন সেবকজীবনের ব্যাপার বলিয়া উহা এইখানে লিখিত হইল।

"এক উকিল লোরেন বাবুর সামনে ঠাকুরকে ইডিট্ (Idiot) না কি বোলেছিলো। তাতে লোরেন বাবু তার সাথে খুব তর্ক জুড়ে দিলেন। বাকী তখনো সে বুঝতে চাইলো না। তখন লোরেন বাবু হাসতে হাসতে বললেন—'উনি (ঠাকুর) ত একজন গেঁয়োলোক, তোমার কাছে ইডিয়ট হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি?' একথা শুনে উকিল বাবু হাসতে হাসতে চলে গেলো। ও (উকিল বাবু) চলে যাবার পর হামি লোরেন বাবুকে বললুম—'এ আপুনার কেমন কথা হোলো, লোরেন বাবু! এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? উনাকে (ঠাকুরকে) ইডিট্ বললে আর আপুনি সয়ে গেলেন, উনার কথা মেনে নিলেন, এমন বেয়াদপের কথা আপুনি মানলেন কেমন কোরে?' হামার কথা শুনে লোরেন বাবু হাসতে হাসতে বললেন—

'আরে ! বুঝলি নি, এখন ওর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে আমার কতো সময় চলে যেতো, একটু মেনে নিলে দেখলুম ও লোকটা খুশী হয়ে চলে যাবে। তাই ওর সামনে এমন কথা বল্লুম। তুই (হামাকে উদ্দেশ করিয়া) ত জানিস্ ভাই আমার মনের কথা। আমি ঠাকুরকে কি ভাবি তা ত তুই জানিস্ ?' হামার তখনো মনে হোতে লাগলো—'লোরেন বাবু এমন কথা মানলেন কি করে ?' আমার মনের ভাব লোরেন বাবু বুঝে ফেললেন, বললেন—'রাগ করিস্‌নি, ভাই ! তোর সামনে এমন কথা আর কখনো বলবো না।' "

"দক্ষিণেশ্বরে যোগীনভাইকে উনি (ঠাকুর) মা-কালীর প্রসাদ রাখতে বলতেন। একদিন মন্দির থেকে প্রসাদ আসতে দেরী হোলো। তাই না দেখে উনি (ঠাকুর) নিজে কালীবাড়ীর সরকারিতে খোঁজ করতে গেলেন। এই না দেখে যোগীনভাই ভাবলে— ইনি দেখছি এখনো ভট্‌চায্যি বামুন আছেন, ফলটলের মায়া ছাড়তে পারেন নি। যোগীনভাইকে এই কথা ভাবতে দেখে অন্তর্য্যামী ঠাকুর কি বললেন জানো ?— 'গ্যাখ ! ভক্ত ও সাধুসেবা হবে বলে রাসমণি মন্দিরের জন্য এত সব সম্পত্তি দিয়ে গেছে। এখানে তার যতটুকু আসে তাতে ভক্ত ও সাধুসেবা হয়। আর বাকী সব বামুনেরা অবিদ্যার জন্য নিয়ে যায়। তোরা খাস্ তবু সার্থক হয়।' "

আর একদিনের কথা— "যোগীনভাই বিয়ে করবার পর লজ্জায় ঠাকুরের কাছে আর আসতো না। তাই ঠাকুর একদিন একজন লোককে তার কাছে পাঠালেন। তাকেঁ বলে দিলেন, 'গ্যাখ ? ওকে বলবি এখানকার পয়সা কেন দিয়ে যায় না ?' লোকটা যোগীনভাই-এর কাছে সেকথা বলাতে সে ত এলো, বাকী ঠাকুর তাকে বললেন— 'হ্যাঁরে ! বিয়ে করেছিস তাতে কি হয়েছে ? এখানে আসিস্ না কেন ? আমিও ত বিয়ে করেছি।' এমন কোরে ঠাকুর ভক্তদের ডেকে পাঠাতেন।"

"লোরেন বাবু অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে না গেলে তিনি তাঁকে ডাকতে পাঠাতেন। অনেক সময় বলে দিতেন, 'ত্থাখ! গিয়ে বলবি আমার শরীর ভালো নেই, হাতে বড় যন্ত্রণা হয়; বোধ হয় হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে, তাই আপুনাকে সেথানে যেতে বলেছেন।' এমন কোরে তিনি হামাদের বলে দিতেন। দেখতো—! লোরেন বাবুর উপর তাঁর কেমন টান ছিলো।"

লাটু মহারাজের সেবক-জীবনের আরো তু-চারটি ঘটনা আমরা শুনিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের যখন হাত ভাঙ্গিয়া যায় সেই সময়কার ঘটনাগুলি এইবার বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ কোন্ বৎসরে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারিতেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের জীবনটিকে যেন তিনটি ঘটনার অন্তর্বর্ত্তী কালে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একটি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শনের অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ী বসবাস করার কাল হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়টি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শনের পর হইতে ঠাকুরের হাতভাঙ্গার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রীঃ আগষ্ট হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত এবং তৃতীয়টি ঠাকুরের হাতভাঙ্গার পর হইতে শ্যামপুকুরে বাস করার কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীঃ জানুয়ারী হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ আগষ্ট পর্য্যন্ত।

শ্রীম-কথিত কথামৃতে আমরা পাই যে, ১৮৮৪র জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ঠাকুরের হাতে বার বাঁধা ছিল। তাই আমরা বলিতে সাহস করিতেছি যে, এইবার যে-সকল ঘটনা ও প্রসঙ্গ বলিব তাহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ও তার পরের ঘটনা।

"একবার তিনি (ঠাকুর) চলতে চলতে তার বেঁধে পড়ে যান। তাতে তাঁর হাতের হাড় সরে গেছিলো। মধু ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। সে সময় উনি যাকে দেখতেন, বলতেন—'ত্থাখ গো রাম (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত

রামচন্দ্র দত্ত) বলে আমি নাকি অবতার হয়েছি ? আপনারা কি বল ? অবতারের কি কখনো হাত ভাঙ্গে শুনেছ ?' একথা শুনে অনেকেই অনেক কথা বলতেন। মাষ্টার মশায় (শ্রীম) বলতেন—'অবতারেরা যখন মানুষ হোয়ে আসতে পারেন তখন মানুষের লীলায় তাঁদের হাতও ভাঙ্গতে পারে।' তখন যে-কেউ দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাকে হাত দেখাতেন আর বলতেন, 'কিসে সারবে বলতে পার ?' এই না দেখে রাখাল বাবু বড় বিরক্ত হোতেন। একদিন তিনি (রাখাল বাবু) ত দেবেন বাবুকে বলে দিলেন, 'দেখুন ! ওনার সামনে আপনারা আর কোন ঔষধের নাম করবেন না। আপনাদের কথায় বিশ্বাস কোরে কেবল ঔষধ পাল্টাবেন। এরকম করলে ত ওনার হাত সারবে না। জিগগেস করলে বলবেন, যা' চলছে তাই চলুক. ওতেই সেরে যাবে।'··· একদিন তিনি বললেন, 'ওষুধ আর খাবোনা, অমনি সেরে যাবে।' দেখো ! কেমন ব্যাপার হোলো, ওষুধের শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেলো।··· উনার হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় সেবারের জন্মোৎসব পিছিয়ে গেলো। ফাল্গুন মাসে হোলো না। হাত ভাল হ'লে তবে সেবার জন্মোৎসব হয়েছিলো।··· জানো ! ওনার যখন হাতে বার বাঁধা ছিলো তখন কিশুব বাবুর দেহত্যাগ হয়। তা শুনে উনি (ঠাকুর) একদিন হামাদের বললেন —'জানিস্ রে ! মা দেখিয়েছিলেন যে, কেশব সেন ইখান্‌কার একটি অঙ্গ।' ”

এরই সঙ্গে ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা বলিয়া যান। মনে হয় ঘটনাটি লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে শুনিয়াছিলেন, দেখেন নাই। তাই তিনি 'শুনেছি' এই কথা ব্যবহার করিয়াছেন।— “শুনেছি, একবার একজন মাঝি আর একজন মাঝিকে একটি চাপড় মেরেছিলো। তাতে উনি চীৎকার করে উঠেছিলেন। সবাইকে দেখালেন, পিঠে তার দাগ রয়েছে— দাগ যে কুথা থেকে হোয়েছিলো কেউ বলতে পারলে না।”

"উনার হাতে বার বাঁধা যদ্দিন ছিলো, উনি কুথাও তখন যেতেন না। দুপুরে রামলাল (দাদা)কে ডেকে রামায়ণ শুনতেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন হোতো, তাতে যোগ দিতেন, মাঝে মাঝে গান গাইতেন। সকালে বারাণ্ডায় এসে বসতেন।··· একদিন শরোট বাবু আর শশীবাবু এসেছিলেন। শশী বাবুকে ঠাকুর খুব আদর করতেন। তাঁকে রাতে থাকতে বলতেন, তিনি থাকতেন না। শরোট বাবুকে তিনি যীশুর দলের লোক বলেছিলেন। ··· একদিন কলকাতা থেকে এক ভক্ত এসেছিলো। (পরে শুনিছি গঙ্গাধর মহারাজ) । তার ভারী নিষ্ঠা ছিলো, নিজের হাতে রেঁধে খেতো; কালীবাড়ীর প্রসাদ পেতে চাইতো না। একদিন ঠাকুর তাকে খেতে বললেন। প্রথমে রাজী হোলো না; শেষে কালীবাড়ীর প্রসাদ পেলো বটে, বাকী মাছ ছুঁলো না। এই না দেখে ঠাকুর তাকে বললেন— 'হ্যাঁগো! মাছ, পানে দোষ কি আছে? ওসব খেয়েও ভগবানে মন রাখা যায়।'··· একদিন হরি বাবু (মঠের মাষ্টার স্বামী তুরীয়ানন্দ) সেখানকে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বল্‌লেন— 'তুমি এখানে মাঝে মাঝে আসবে গো, যখন কেউ থাকবে না এমন সময় আসবে, জানো?' হরি বাবু দক্ষিণেশ্বরে সকালবেলা আসতেন, বেলা হোতে না হোতে চলে যেতেন, কোন কোন দিন দুপুরে এসে সন্ধ্যার আগে কলকাতায় ফিরে যেতেন।"

"সে সময়ে একদিন সুরেন্দর বাবু (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, যাহাকে ঠাকুর সুরেশ বলিয়া ডাকিতেন) একটা মাদুর আর বালিশ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন, বললেন সেখানে থাকবেন। দু-চার দিন রইলেন। পরে পরিবারের ভয়ে আর থাকতে পার্‌লেন না। তাঁর পরিবার তাঁকে কুথাও রাতে থাকতে দিতেন না। তাঁর মনের কথা ঠাকুর বুঝলেন, তাই একদিন ডেকে বললেন, 'ওগো সুরেশ! তোমার পরিবার বড় ভাবছে— মাদুর বালিশ

নিয়ে বাড়ী যাও, সংসার ছেড়ে ইখানকে রাতদিন থাকবার দরকার নেই। এরা ত রয়েছে, দেখাশুনার কিছু অভাব হবে না। ইখান্‌কে আসবে-যাবে, যেমন করতে তাই করবে, তাতেই তোমার হবে।' "

"যে বছরে ঠাকুরের হাত ভেঙ্গেছিলো, সেই বছরে লোরেন বাবুর বাবা মারা যান। তখন লোরেন বাবু দক্ষিণেশ্বরে আসতে পারতেন না। উখানকে (নরেন্দ্রনাথের গৃহে) ঠাকুর তখন হামাদের হামেশা পাঠাতেন। গেলে পরে লোরেন বাবু ভারী খুশী হোতেন। এতো ত বিপদ, তার উপর আত্মীয়স্বজন সব বাদ সাধ্‌লো, বাকী লোরেন বাবু কুছুতে কাবু হোতে চাইতেন না। তাঁর মুখ দেখে কেউ ধরতে পারতো না— কেমন বিপদ তার পড়েছে। হামাকে দেখলে দক্ষিণেশ্বরের খবর সব জিগ্‌গেস করতো আর বলতো, 'ওরে প্লেটো! এক কল্‌কে তামাক ভালো কোরে সেজে খাওয়া না।' হুঁকো হাতে কোরে হামায় ফায়ার (fire) করতে বসতো। কতো লিকচার দিতো জানো?"

জনৈক ভক্ত— কি লিক্‌চার দিতেন, মহারাজ? আপনার সামনে কোন্ কোন্ বিষয়ের কথা হোতো? আমাদের একটু বলুন না। নরেন্দ্রনাথের জীবনকথা শুন্‌তে আমাদের বড় ভালো লাগে।

লাটু মহারাজ—হুঁ্যা! শুনতে তোমাদের ভাল লাগে, বাকী তাঁর মত কঠোর করতে মন লাগে না। কি বলো? জানো, সে সময় উনি (লোরেন বাবু) যে-সব কথা হামায় বলতেন, হামাদের মধ্যে কেউ তখন সে সব কথা ভাবতো না। উনি বলতেন কি জানো?—"ঈশ্বরকে না দেখলে, আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি না। উনার (ঠাকুরের) কথায় আমি বিশ্বাস কোরে নিব না, আমাকে অজ্ঞান কোরে দিয়ে 'এই দেখ ঈশ্বর' বললে আমি সে কথা মানবো না।" আবার এক এক দিন বলতেন—'ঈশ্বর

যদি দয়াময় হয়, তবে জগতের এতো কষ্ট কেন? তোমাদের ঈশ্বর ভারী নিষ্ঠুর, লোককে কেবল যন্ত্রণা দেয়, আমি সে ঈশ্বর মানবো না।' এক এক দিন আবার অন্য কথা পারতেন, বলতেন, 'উনি (ঠাকুর) যা বলেন, দেখি, শাস্ত্রের সঙ্গে (এখানে বোধহয় Bibleকে ইঙ্গিত করছেন) সব ঠিক ঠিক মিলে যায়। উনি ত শাস্ত্র পড়েন নি, এত সব জানলেন কি করে? তোকে বলছি প্লেটো! তুই অমন লোককে কিছুতেই ছাড়িস নি। ওনাকে (ঠাকুরকে) ধরে থাকবি, দেখবি শেষে কত বড় হবি।' এমন কতো কথা হয়েছিলো, সব কি মনে আছে? যেদিন যা' শুনতুম সব ওনাকে এসে বলতুম। উনি বলতেন—'সংশয়মেঘ কেটে গেলেই ভক্তির অরুণোদয় হয়।'

"দেখো! একদিন (হাত ভাঙ্গার কিছুদিন পূর্ব্বের ঘটনা) একজন ভারী পাঞ্জাবী মুসলমান হনুমন্ত সিং-এর সঙ্গে কুস্তী লড়তে এসেছিলো। মুসলমানটি ভারী জোয়ান, দিন-পনের ধরে খুব কস্‌রৎ করতে লাগলো আর ঘি, দুধ, মাংস খুব খেতে লাগলো। পালোয়ানের চেহারা দেখে সবার ডর লাগলো, তার তাকৎ দেখে সবাই ভাবলে ঐ জিতবে। বাকী হনুমন্ত সিং ওসব কুছু করলে না, একদিন ওনার (ঠাকুরের) আশীর্ব্বাদ নিতে এসে শুনে গেলো যে, খাওয়া কমাতে হবে, কস্‌রৎ কমাতে হবে, আর দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। তাঁর (মহাবীরজীর) কৃপা হলে সব শত্রুর বিনাশ হবে। ঠাকুরের উপর দারোয়ানজীর খুব বিশ্বাস ছিলো, তাঁর কথা মেনে নিলে, তাই কুস্তীর দিনে তারই জয় হোলো। দেখোতো নামের কতো শক্তি! তিনি হামাদের ত হামেশা বলতেন— 'নামের শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নাই।'"

"একদিন (হাতভাঙ্গার সময়কার ঘটনা) তিনি রাখাল বাবুকে হামার

সাথে কুস্তী লড়তে দেখলেন। রাখাল বাবু আগে কুস্তী লড়তো, বেশ জোয়ান ছিলো; অম্বু বাবুর আথ্ড়ায় যেতো। কুস্তীর সময় রাখাল বাবু হামাকে মাটীতে ফেলতে পারতো না, হামিও রাখাল বাবুকে নীচে নামাতে পারতুম না। তাই না দেখে উনি (ঠাকুর) বললেন— 'ওগো! তোমাদের যে গজ-কচ্ছপের মত যুদ্ধ চলছে গো। কেউ কাউকে হারাতে পারছো না, দু-জনই বরাবর যাচ্ছ।' ”

এই প্রসঙ্গটি শুনিয়া জনৈক ভক্ত একটি প্রশ্ন করিয়াছিল— 'দক্ষিণেশ্বরে আপনি বরাবর কি লড়্তেন, মহারাজ?'

লাটু মহারাজ তার উত্তরে বলিয়াছিলেন— “না, বরাবর লড়ি নি। উনি মানা করবার পর থেকে হামাদের লড়া বন্ধো হোয়ে যায়।”

“উনি মানা কর্লেন কেন, মহারাজ?”

লাটু মহারাজ— হামার শরীর বড় শুকিয়ে যাচ্ছিলো, তাই না দেখে একদিন উনি বললেন— 'ওরে! এত রোগা হোয়ে যাচ্ছিস্, এখন আর বেশী কস্রত করিস নি। বেশী ধ্যান করলে, বেশী কস্রত করা উচিৎ নয়; দুটো নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।' তারপর থেকে হামি আর কুস্তী লড়্তুম না। মাঝে মাঝে একটু ঠেলাঠেলি কর্তুম।

“তাঁর অসুখের সময় একদিন মহিন্দর কব্রেজ (শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল) দেখতে এলেন। যাবার সময় রামলাল (দাদার) হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে গেলেন। উনি কুছু জানতেন না। সে দিন রাতে দেখি, তিনি বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন। হামি অনেকক্ষণ বাতাস করলুম তবু তাঁর ছটফটানি কমলো না। শেষে হামায় বললেন— 'যা তো রামনেলোকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছু করেছে, তা' না হোলে

রাত্তে চোখ বুঝছে না কেন ?' তখন রাত হবে একটা কি তুটো। হামি রামলাল (দাদা)কে ডেকে আনতেই ঠাকুর তাকে বললেন— 'যা শালা যা, এখানকার জন্তে যার ঠেঙ্গে টাকা নিয়েছিস, শীগ্‌গির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' রামলাল (দাদা) তখন ঠাকুরকে সব বললেন। সেই রাত্তে রামলাল (দাদা) হামাকে সঙ্গে নিয়ে কবরেজ মশায়ের বাড়ী গেলো, তাকে ঘুম থেকে তুলে টাকা ফেরৎ দিয়ে এলো, জানো ?"

"তাঁর অসুখের সময় দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথ, রাখাল, লোরেন আর আর সব ভাই মিলে একদিন বড় হাণ্ডা কোরে রান্না লাগিয়ে দিলো। সবাই খেতে যাবে এমন সময় এক বাউল এসে হামাদের পংক্তিতে বসে গেলো। তাই না দেখে ঠাকুর তাকে পংক্তি থেকে উঠিয়ে দিলেন। লোরেন বাবু বললেন— 'ও বসুক না, বেশী আছে, হয়ে যাবেখন্।' ঠাকুর তাতে বললেন— 'না, না, তা হবে না, তোমাদের খাওয়া হোলে কিছু থাকে যদি তবে ও পাবে। তোমাদের সঙ্গে খেতে পারে না।' খাওয়া শেষ হোলে হামাদের সব বললেন— "দ্যাখো, ওর কি ভাগ্যি আছে যে, তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে ? সাধন-সময় যার তার সঙ্গে খেতে নেই।' "

"একবার রাম বাবু এক চেঙড়া জিলিপী উনার জন্তে আন্‌ছিলেন, বাকী পথের মাঝে একখানা দান করেছিলেন। ঠাকুর সেদিন আর রাম বাবুর জিলিপী মুখে দিতে পার্‌লেন না, বললেন— 'দেখ রাম! ইখান্-কার জন্ত যা আন্‌বে, তা আর কাউকে দিও না। যে জিনিসের আগের ভাগ অপরকে দেওয়া হোয়ে যায়, সে জিনিস কি আর মাকে নিবেদন করা যায় ? জানতো, মাকে নিবেদন না কোরে আমি কিছু খেতে পারি না।' "

"তাঁর অসুখের সময় একদিন তারক বাবু (স্বামী শিবানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে এলেন— বৃন্দাবন থেকে ছোলা, রজ, তিলকমাটী, মালা, আর আর সব জিনিস নিয়ে। ঠাকুরের হাতে বার বাঁধা দেখে বললেন— 'আপনার হাতে কি হয়েছে?' ঠাকুর তাঁকে হেসে হেসে বললেন— 'চাঁদা মামা দেখতে গিয়ে, পায়ে তার বেঁধে পড়ে গেছি; হাতে সামান্য চোট লেগেছে, এখন তার জের চলেছে।' তারক বাবু আবার বললেন— 'হাড় সরে গেছে, না ভেঙ্গে গেছে?' ঠাকুর তাতে বললেন— 'কে জানে বাপু! কি হয়েছে? ওরা ত সব আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে দিয়েছে। একটু যে আরাম কোরে মাকে ডাকবো, তার যো নেই। এ সব বাঁধাগোঁধা খুল্‌তে দেবে না। বল ত, এমন কোরে বাঁধলে কি আর মাকে ডাকতে ইচ্ছে হয়? অনেক সময় মনে হয়, তুত্তোর বাঁধাবাঁধি, সব কেটে বেরিয়ে যাই, আবার মনে হয়, নাঃ! এও একরকম বেশ খেলা চলছে, এরো মাঝে রস-কস্ আছে।' এই সব শুনে তারক বাবু বলেছিলেন— 'আপনি ত ইচ্ছে করলেই ভালো হোয়ে যেতে পারেন।' ঠাকুর তাই শুনে বললেন— 'এ্যাঁ! ইচ্ছে করলেই ভালো হোয়ে যেতে পারি?' এই কথা বলে কুছুক্ষণ চুপ্ কোরে রইলেন, পরে বললেন— 'নাঃ! রোগের ভোগই ভালো, এখন যারা সব কাম-কামনা নিয়ে এখানে আসছে, তারা এই দেখে ভেগে যাবে, আমায় আর বেশী বিরক্ত করতে চাইবে না।' পরক্ষণেই 'মা! এ বেশ কৌশল কোরেছিস গো মা।' তার পরই গান আরম্ভ কোরে দিলেন. গান গাইতে গাইতে সমাধি হোয়ে গেলো।"

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে একজন বড় বিষয়ী লোক (শ্রী—) এসে বিষয়কথা কইতে লাগলো। তাই না শুনে ঠাকুর বললেন— 'এখানে এসব কথা নয়, (খাজাঞ্চীখানা দেখাইয়া) ঐখানকে যাও।' লোকটি

তাঁর কথায় ঐখানকে গেলো। তখন ঠাকুর হামায় বললেন— 'ওরে! ঐ কোণে গঙ্গাজল আছে, ছিটিয়ে দেনা রে। শালা কামকাঞ্চনের দাস! ঐ জায়গায় বসে সাত হাত মাটী নোংরা কোরে দিয়ে গেলো। বেশ ভাল কোরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে!' "

"একদিন গিরিশ বাবু বেহুঁশ মাতাল হোয়ে দক্ষিণশ্বরে এলেন। তাই না দেখে তিনি হামায় বললেন— 'যা ত, গাড়ীতে কিছু ফেলে এলো কিনা দেখে আয় তো। কিছু পড়ে থাকলে এখানে নিয়ে আসবি, জানিস।' হামি ত গাড়ীতে দেখি এক বোতল মদ রয়েছ, আর একটা গেলাস রয়েছে। দুটো নিয়ে ঘরে ফিরে এলুম। হাতে মদের বোতল দেখে ঘরের ভিতব যে-সব ভক্ত ছিলো সব হেসে উঠলো। তাই না দেখে উনি বললেন— 'ওগুলো রেখে আয়। শেষ খোঁয়াড়ীর সময় কাজে লাগবে।' ভক্তের জন্য উনি কেমন উদার হোতেন, দেখো তো!"

"একদিন রাতে গিরিশ বাবু দানাকালীকে (শ্রীকালীপদ ঘোষ) দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। দানাকালী ভারী মাতাল, বাড়ীতে পয়সাকড়ি কুছু দিত না, সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতো। বাকী তার পরিবার ছিলো খুব সতী-সাধ্বী। অনেকদিন আগে একবার ঠাকুরের কাছে এসে-ছিলেন, শুনেছি (শুনেছি বললেন এই কারণ যে, বোধ হয় তখন লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে আসেন নাই) দানাকালীর স্ত্রী ঠাকুরের কাছ থেকে স্বামীর মন ভালো করবার জন্য ঔষধ চেয়েছিলো। বাকী ঠাকুর তাকে ওষুধ দিলেন না, মার (শ্রীশ্রীমা) কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মা তাকে ঠাকুরের কাছে পাঠালেন। এমন ভাবে তিন তিন বার তাকে যাওয়া-আসা করতে হয়েছিলো। শেষে মায়ের কাছে একটি ইঙ্গিত পেলেন। একটা পূজা-করা বেলপাতায় ঠাকুরের নাম লিখে মা দানাকালীর স্ত্রীকে

দিয়েছিলেন আর তাকে খুব নাম করতে বলেছিলেন। মায়ের কথামত দানাকালীর পরিবার বার বছর ধরে নাম করেছিলো। তাইত ঠাকুর দানাকালীকে দেখবামাত্র বলেছিলেন— 'বৌটাকে বার বছর ভুগিয়ে তবে ইখানকে এলে। একথা শুনে দানাকালী চমকে গেলো, কুছু বললে না। তাই দেখে উনি বললেন— 'তোমার কি চাই বল না গো?' দানাকালী এমন ছ্যাঁচড় যে, ওনার সামনে বললে— 'একটু মদ দিতে পারেন?' ঠাকুর হেসে বললেন— 'তা দিতে পারি। তবে এখানকার মদে বড্ড নেশা হয়, তুমি সইতে পারবে না।' দানাকালী ভাবলে বোধ হয় এখানে সত্যিকারের মদ পাওয়া যায়, তাই বললে— 'খাঁটি বিলিতী মদ, তাই একটু দিন না, গলটা ভিজিয়ে নি।' ঠাকুর হাসতে হাসতে বল্লেন— 'এ বিলিতী মদ নয় গো, বিলিতী মদ নয়। একদম খাঁটি দেশী কারণ-বারি আছে। এ মদ যাকে-তাকে দেওয়া যায় না। সবাই এ মদ সহ্য করতে পারে না। ইখান্‌কার মদ পেলে আর বিলিতী মদ ভালো লাগে না। তুমি কি ঐ মদ ছেড়ে ইখান্‌কার মদ ধরতে রাজী আছ?' দানাকালী কি ভাবলে, পরে তাকে বল্‌তে শুনলুম— 'সেই মদ আমায় দিন, যা' পেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হোয়ে থাকবো।' একথা বলবার পর ঠাকুর তাকে ছুঁয়ে দিলেন। তার পরশ পেয়ে দানাকালীর কি কান্না! সবাই মিলে তাকে চুপ করাতে পারি নি।... ঐ দানাকালীর জীভে পরে একদিন ঠাকুর গঙ্গার মাঝে নৌকায় ইষ্ট-মন্তর লিখে দিয়েছিলেন। পরে সে ঠাকুরের একজন মস্ত ভক্ত হোয়েছিলো, তাঁর সেবার জন্যে অনেক টাকা দিয়েছিলো।... জানো— স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী হয় তাহলে সে স্বামীর জন্য কঠোর করতে পেছ্‌পাও হয় না। স্ত্রীর জন্য কালী উদ্ধার হোয়ে গেলো।"

"হাত ভালো হোলে একদিন তিনি আহিরীটোলায় বারোয়ারী দেখতে এসেছিলেন। গাড়ী কোরে আসতে আসতে পথে দু-চার জন স্ত্রীলোককে দেখলেন— খুব সেজেগুজে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই না দেখে বলতে লাগলেন—'মা! এমন সেজেছো তুমি।'··· ব্যস্! বলতে বলতে আবেশ এসে গেলো। গাড়ীর ভিতর যারা ছিলো তারা কেউ ওনার আবেশভাব দেখেন নি। তারা ভাবলে উনি বুঝি ভিরমি গেছেন। হামায় খুব ডাকাডাকি লাগিয়ে দিলে। গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বললে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সমাধি ভেঙ্গেছিলো। তখন আবার গাড়ী চালাতে বললুম।"

"আর একদিনের কথা। সেদিন দুপুরে কলকাতা থেকে এক ভক্ত (শ্রীভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ঠাকুর তখন তেল মাখছেন। এসেই একটা গান লাগিয়ে দিলেন—(গানের দুটি কলি অন্য একটি ভক্ত আমাদের বলিয়াছিলেন)—'হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে! পার করেন দয়াল হরি দুটি রাঙা চরণ-তরী দিয়ে।' গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে তার কাঁধের উপর পা চাপিয়ে বললেন— 'এই নাও, এই নাও।' "

এবার আমরা যে প্রসঙ্গে আসিতেছি তাহা ঠিক কোন্ বৎসরে ঘটিয়াছিল, জানিনা। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা ১৮৮৪ সালের ঘটনার মধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম। একদিন ঠাকুর কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়ীর ভিতরে আছেন আমাদের রামলাল দাদা ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেব আর গাড়ীর চালে ক্যোচমানের পাশে আছে সেবক লাটু। পথে আসিতে আসিতে ঠাকুর কাশীপুরের কাছে বলিলেন— 'ওরে লেটো! গাড়ীটা থামাতে বল।' গাড়ী থামিবামাত্রই ঠাকুর রামলাল

(দাদা)কে বলিলেন— 'ওরে ! আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে। তোর কাছে কিছু আছে ? যা না কাগুর দোকান থেকে গরম গরম হিংএর কচুরী ভাজিয়ে নিয়ে আয়।' ঠাকুরের কথামত রামলাল (দাদা) কচুরী আনিতে গেলেন। আর এদিকে সেবক লাটুও বিশেষ প্রয়োজনে জঙ্গলের দিকে একবার গিয়াছিল। উভয়ে ফিরিয়া আসিতে বোধ হয় মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগে নাই। ইতোমধ্যে ঠাকুর গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে একদিকে চলিয়া যাইতেছেন। উভয়েই আসিয়া দেখেন যে, ঠাকুর গাড়ীতে নেই ; নিকটে কোথাও তাঁর দেখা পাইলেন না। তখন উভয়েই তাঁর অনুসন্ধানে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই রামলাল দাদা ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন। রাললাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়া নিম্নোক্ত কথা-গুলি লাটু মহারাজ আমাদের নিকট পরবর্ত্তীকালে বলিয়াছেন :

"জানো—! রামলাল (দাদা) উনাকে যত ডাকে, উনি কোন জবাব দেন না, কেবল হন্ হন্ কোরে এগোতে থাকেন। শেষে তাঁর নাগাল ধরবার জন্য রামলাল (দাদা)কে দৌড় দিতে হয়েছিলো। তাঁর হাত ধরে বললেন— 'কুথাকে যাচ্ছেন, গাড়ীতে চলুন।' তিনি (ঠাকুর) এমন ভাব দেখালেন যেন রামলাল (দাদা)কে চিনতে পারছেন না। শেষে এ্যাঁ এ্যাঁ করতে লাগলেন। তখন রামলাল (দাদা) বললে— 'আমাকে গরম কচুরী আনতে বলে আপনি কুথাকে যাচ্ছেন ? গরম কচুরী খাবেন না ? চলুন।' একথা বলবার পর তবে তিনি গাড়ীতে ফিরলেন। সেই থেকে হামাদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর কাছে সদাসর্ব্বদা থাকতো।"

সেই বছর দুর্গাপূজার সময় দক্ষিণেশ্বরে গোলকধাম খেলা হইয়াছিল। প্রথমবারেই সাত চিৎ ফেলায় লাটুর ঘুঁটী একেবারে গোলকধামে গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া লাটু এত বেশী উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে,

ঠাকুর গোলমাল শুনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (শ্রীম—'কথামৃত' দেখুন)

"একদিন ঠাকুর হামাদের নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। কাশীপুরের কাছে এসে গাড়ী থামতেই ঠাকুর দেখতে পেলেন যে, শুঁড়ির দোকানের সামনে বসে কয়েকজন মাতাল মদ খাচ্ছে, আর গান গাইছে। মাতালদের গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের ভাব লেগে গেলো। তিনি গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। একটা পা পাদানীতে দিয়ে তিনি টলতে লাগলেন। এই না দেখে দু'জনে তাকে ধরতে গেলো। হামি তাদের বললুম—'ওনাকে ছোঁবেন না, উনি আপুনি গাড়ীতে উঠবেন। ওনাকে একজন রক্ষে করছেন। তিনি তাঁকে গাড়ীর ভিতর তুলে দেবেন।' হামার কথায় কেউ তাঁর গায়ে হাত দিলো না; তিনি নিজে গাড়ীর ভিতর ঠিক গেলেন। জানো! সমাধির সময় কাউকে ছুঁতে নেই। অশুদ্ধ লোক ছুঁয়ে থাকলে মায়ের শক্তি সাধকের ভিতর নামতে পারে না। হাম্‌নেত দেখেছে অশুদ্ধ লোকের পরশনে তাঁর কতো কষ্ট হোতো।"

"জানো—! উনি হামাকে থিয়েটর দেখতে নিয়ে যেতেন। সেখানে গিরিশ বাবু ওনাকে খুব খাতির করতেন। উনি ষোলো-আনা দিতেন আর তাই নিয়ে গিরিশ বাবু তিন-চার জনকে উপরে বসাতেন। আবার একটা পাখা করবার লোকও বন্দোবস্ত কোরে দিতেন। গিরিশ বাবু উনার সঙ্গে উপরে দেখা করতে আসতেন। একবার কি হোয়েছিলো জানো? গিরিশ বাবু মাতাল হোয়ে থিয়েটরে ওনার কাছে আবদার করলেন—'তুমি আমার ছেলে হবে। বল, এ জন্মে ত আর তোমার সেবা করতে পারলুম না, আমার ছেলে হোলে তোমায় খুব সেবা করতে পার্‌বো। বল, তুমি আমার ছেলে হবে।' ঠাকুর তাতে বললেন—'আমি কেন তোমার ছেলে

হোতে যাব গো ?' ঠাকুরের কথা শুনে গিরিশ বাবু ভারী রেগে গেলেন। রাগের মাথায় ঠাকুরকে অনেক গালিগালাজ করলেন। ওনাকে গালিগালাজ করছে দেখে হামার বড় রাগ হয়েছিলো, হাতে ডাণ্ডা ছিলো, ডাণ্ডা তুলতে যাবো কি দেবেন বাবু হাত চেপে ধরলেন। বললেন— 'উনি যখন সয়ে যাচ্ছেন, তুমি কেন ডাণ্ডা তুলছো ?' বাকী হামার এতো রাগ হয়েছিলো যে দেবেন বাবু ঐ কথা না বললে হামি সেদিন গিরিশ বাবুকে মেরে বসতুম। গাড়ী কোরে যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরছি, দেবেন বাবু ওনাকেও সেকথা বলে দিলেন। উনি শুনে বললেন— 'ও কি রে! গিরিশের গায়ে হাত তুলতে আছে কি ? দেখলি নি, এত গালাগালি দিলে তবু গাড়ীতে উঠবার সময় মাটিতে শুয়ে প্রণাম করলে। ওর কেমন বিশ্বাস দেখেছিস ?' গাড়ীতে আসতে আসতে কেবল বললেন— 'মা, ও নেটো (নট) গিরিশ, তোমার মহিমা কি বুঝবে। ওর অপরাধ নিও নি মা।' "

"থিয়েটারের ঘটনা ভক্তেরা সব শুনলেন। সবাই বললেন— এমন লোকের কাছে আর যাওয়া উচিত নয়। রাম বাবুও শুনেছিলেন, তাই পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। রাম বাবু আসতেই উনি বললেন— 'রাম! তুমি কি বল ? রাম বাবু বললেন— 'দেখুন, কালীয়সাপ যেমন কৃষ্ণকে বলেছিলো— প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাবো কোথায় ? গিরিশ বাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায় ? তাঁর উপর আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেনো ?' রাম বাবুর কথা শুনে উনি বললেন— 'তবে চল রাম! তোমার গাড়ীতেই একবার সেখানকে যাই। এই না বলে তিনি হামাকে, রাম বাবুকে আরো দু জনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ওধারে গিরিশ বাবুর মনে ভারী দুঃখু হয়েছিলো, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে বসে বসে কেবল দিনভোর কেঁদেছেন। সন্ধ্যার কুছু আগে হামরা

তাঁর বাড়ীতে গেলুম। ঠাকুর এসেছেন শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই মাটীতে সটান শুয়ে পড়লেন। ঠাকুর যখন বললেন— 'হয়েছে হয়েছে' তখন তিনি মাটী ছেড়ে উঠলেন। পরে কতো কথা বললেন। সেদিন গিরিশ বাবুকে বলতে শুনেছি— 'আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর! তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিন্দা-স্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারো নি, তোমার পরমহংস-নামে অধিকার আসে নি। তুমি আমাদেরই মতন একজন, লোক ভাঁড়িয়ে খাও। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি নি! আমার ভার সব তোমার উপর দিয়ে দিলুম। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।' "

"এর পরেও হামাদের নিয়ে তিনি থিয়েটরে গিছিলেন। একদিন 'দশমহাবিদ্যা' (শেষে ইহারই 'দক্ষযজ্ঞ' নাম হয়) পালা হচ্ছিলো। সেখানে গিরিশ বাবুকে যেই বলতে শুন্‌লেন— 'শিব নাম আর না রাখিব ধরায়' অমনি উনি বললেন— 'শালা বলে কি, শিব নাম আর না রাখিব ধরায়। শালা আচ্ছা শিক্ষা দিচ্ছে ত। এসব আর শুনতে নেই, কি বলো?' গিরিশ বাবু শুনলেন, ঠাকুর চলে যেতে চান। অমনি সেই পোশাকে এসে গেলেন। বললেন— 'আর একটু শুনুন'। ঠাকুর বললেন— 'এসব কি লিখছো—শিব নাম আর না রাখিব ধরায়— এসব কি লিখতে আছে?' গিরিশ বাবু অমনি বললেন— 'পেটের দায়ে ওসব লিখতে হয়।' গিরিশ বাবুর কথা শুনে তিনি আরো কুছুক্ষণ থিয়েটর দেখলেন।"

"থিয়েটরে আর একটা ব্যাপার শুনেছি। সেদিন থিয়েটর হবার পর গিরিশ বাবু ওনাকে সাজঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানকার যত সব মেয়েছেলে ছিলো সবাইকে গিরিশ বাবু বললেন— 'ওরে, বাবাকে পেন্নাম কর, তোমাদের

সব পাপ ধুয়ে যাবে।' মেয়েরা সব ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায় দেখে উনি বলেছিলেন—'ওখান থেকে করলেও হবে গো।' তারা কি সব শোনে? কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়েছিলো। দক্ষিণেশ্বরে এসে হামাদের বললেন—'ওরে পা-টা বড় জ্বালা করছে রে।' রামলাল (দাদা) তাই না শুনে গঙ্গাজল এনে পা ধুয়ে দিলেন, তবে সে জ্বলুনি কমে। জানো—! তিনি অশুদ্ধ লোকের পরশন্ সইতে পারতেন না।"

"অন্নকূটের দিন মাড়োয়ারীরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলো। ঠাকুর হামাদের নিয়ে সেখানে গিছিলেন। সেবার মাড়োয়ারীরা ভারী উৎসব করেছিলো। এত লোক হয়েছিলো যে, বেলা পাঁচটার সময় হামাদের খাওয়া শেষ হোলো। তারপর ঠাকুর একখানা গাড়ীতে রাম বাবু ও আরো দু'জনকে উঠিয়ে নিলেন। দেওয়ালীতে পথে খুব আলো দিয়েছিলো, সেদিন উনি রাম বাবুকে এক পয়সার একটি কল্‌কে কিনতে বললেন।"

"একবার একজন মেয়ে-ভক্ত মায়ের কাছে এসে বললেন—'আমি বড় গরীব, ঠাকুরের জন্য বিশেষ কুছু আনতে পারি নি, তাঁর সেবার জন্য সামান্য কিছু খাবার তৈরী করে এনেছি।' একথা শুনে মা বললেন—'ওনার খাওয়া হয়ে গেছে। উনি কি এখন আর খাবেন? এত দেরী কোরে আনতে হয়, বাছা!' মায়ের কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভাবে টলমল করতে করতে সেই দিকে এলেন আর মেয়েটির হাত থেকে খাবার নিয়ে প্রসাদ কোরে দিলেন। তারপর হামায় বললেন—'ছাখ! এবার থেকে যে-কোন জিনিস আসবে, সব নহবতে এনে দেখাবি, তারপর সবাইকে দিবি।'"

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'ঠাকুর এ নিয়ম কেন কর্‌লেন, মহারাজ?'

লাটু মহারাজ— কেনো করলেন জানো ? অসুখের আগে দক্ষিণেশ্বরে এমন সব লোক আসতে লাগলো যাদের দেহ মন শুদ্ধ নয়। সে সব লোক আবার মানসিক করে তাঁকে খাবার পাঠাতে লাগলো। এমন সব ব্যেপার হোতে লাগলো যে, হামি যদি একটা জিনিস তাঁর পাতে দিয়েছি অমনি তিনি চেঁচিয়ে বল্‌তেন— 'এ জিনিস কোন্ শালা দিয়েছে রে ? শালার ছেলে ভালো থাক্‌বে মানসিক কোরে তাই গঙ্গা পাঠিয়েছে। শালা হাড় কিপ্পিন।' এই না বলে সেই জিনিস ফেলে দিতেন। এমনি সব ব্যেপার হোতে লাগলো। জিনিসগুলোর দোষ কাটাবার জন্যে তিনি মায়ের কাছে নহবতে পাঠাতে বলতেন।"

"একবার দক্ষিণেশ্বরে ওনার (ঠাকুরের) পা ফুলতে লাগলো, মহিন্দর কব্‌রেজ (শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল) বললেন লেবু খেতে। যোগীনভাই সেই না শুনে রোজ দুটো কোরে টাট্‌কা লেবু এনে দিতো। ঠাকুর রোজ সে লেবুর রস খেতেন, বাকী একদিন তা' খেতে পারলেন না। যোগীনভাই এতে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলো। শেষে শোনা গেলো যে, যে-বাগান হোতে যোগীন-ভাই লেবু আনতো, সেই বাগানের ফলপাকড় সব অন্য একজন লোককে সেইদিন হোতে জমা দেওয়া হয়েছিলো। সত্যে নিষ্ঠা ছিল বোলে তিনি (ঠাকুর) পরের জমা-নেওয়া ফল খেতে পারলেন না।"

এই প্রসঙ্গের সঙ্গে লাটু মহারাজ আর একটি প্রসঙ্গ বলিয়া যান। "ঠাকুর একদিন দেখলেন যে, মন্দিরের বাগানে একটি পাকা আম পড়ে রয়েছে। আমটি তিনি নিতে পারলেন না, শেষে হামাদের একজনকে বললেন— 'ওরে ! ওখানে একটা আম পড়ে আছে, খাজাঞ্চীকে সেটা দিয়ে আয় না।' খাজাঞ্চীবাবু সেই আমটা নিলেন না, যে নিয়ে গেছিলো তাকে বললেন— 'তোমরা খেয়ে ফেলো।' "

"দক্ষিণেশ্বরে শেষ যে-বার তাঁর জন্মোৎসব হোলো সেবার নরোত্তম কীর্ত্তনিয়া এসেছিলেন। সেবারে লোকের ভীড় হয়েছিলো—২৫০।৩০০ লোক খেয়েছিলো। সেবারে লোরেন বাবুকে ছুঁয়ে উনার সমাধি হোয়ে গেলো। সেইবার থেকে দুটো দল হোলো জানো—একদলে রইলেন রাম বাবু, গিরিশ বাবু, মনমোহন বাবু, কেদার বাবু আরো সব— তানারা ওনাকে 'অবতার' বলতে লাগলেন। আর একদলে রইলেন বলরাম বাবু, কিশোরী বাবু, সুরেশ বাবু, প্রাণকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি। সেবার উনি সকলকে জানালেন, 'যিনি ইশ্বর তিনিই ত মায়া হয়েছেন, তিনিই ত জীবজগৎ হয়েছেন। অবতারেতে তাঁর একরকম প্রকাশ, আর জীবেতে তাঁর আর একরকম প্রকাশ। তিনি এক, তিনিই সব। ··· যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবার (নিজেকে দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ হয়েছেন।' "

"একদিন তিনি গিরিশ বাবুর বাড়ী গেলেন। সেখানে গিরিশ বাবুর ভাই অতুল বাবুর (শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ) সাথে তাঁর অনেক কথা হোলো; সেখানে খাবার সময় উনি লোরেন বাবুর পাতে দই প্রসাদ দিয়েছিলেন।"

"লোরেন বাবুর বাবা মারা যাবার পর তাঁদের সংসারে ভারী কষ্ট হয়েছিলো। লোরেন বাবুর আত্মীয়স্বজনেরা সব তাঁর বিয়ের যোগাড় কোরেছিলো। এই না শুনে উনি (ঠাকুর) ভারী চিন্তিত হোলেন। একদিন হামাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গাড়ী কোরে লোরেন বাবুর বাড়ী গিছিলেন। লোরেন বাবু বললে—'আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। আপনারা যখন টালার মোড়ে, তখন আপনাদের দেখতে পেলুম; তাই বেরুলুম না।' একথা শুনে ঠাকুর বললেন— 'বাড়ী বসে আমাদের দেখতে পেলে কেমন কোরে?' তখন লোরেন বাবু অনেক কথা বলে গেলো। জানো— সাধন করলে এমন সব অবস্থা হয় যাতে দূরের জিনিস কাছে দেখতে পাওয়া যায়, আর দূরে

কে কি বলছে সব শুনতে পাওয়া যায়। লোরেন বাবু সেইভাবে হামাদের দেখতে পেয়েছিলো। এসব কথা শুনে উনি বললেন— 'ওগো! এ সব কাউকে বলুনি গো, বলতে নেই, আরো কতো সব দেখবে, শুনবে, কাউকে বলুনি, জানো।' সেদিন লোরেন বাবুকে সেই গাড়ী কোরে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। একথা সেকথার পর বললেন— 'ত্থাখ, আমার কাজের জন্য মা তোমাকে টেনে এনেছেন, তোমার ত বিয়ে করা হবেক না।' তাতে লোরেন বাবু কি বলেছিলো, জানো?— 'সংসারে যে ভারী টানাটানি, টাকা না হোলে আর চলছে না, তার কি করি বলুন? মা, ভাই, বোনের কষ্ট আর যে দেখতে পারি না।' লোরেন বাবুর কথা শুনে ঠাকুর বললেন—'তুমি ত 'মা'র কাছে গিয়েছিলে। কিন্তু টাকা চাইতে পারলে না, বিবেক-বৈরাগ্য প্রেম সব চেয়ে বসলে। এখন আমি কি করতে পারি? যাও, মায়ের ইচ্ছেয় তোমাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না।' যেই ওনার মুখ দিয়ে এমন কথা বেরিয়ে গেলো, অমনি লোরেন বাবু কি বললে, জানো? 'জানবেন, আর আমি বিয়ে করবো না।' তাই না শুনে ঠাকুর বললেন—'মা যে তোমাকে সাধুর বেশে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গো? সেকি ভুল হোতে পারে?' " এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত কাশীর পাঁড়ে হাউলীর বাড়ীতে লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'মহারাজ! আমরা ত শুনেছি যে নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছেন—নর-ঋষির অংশ। আর পড়েছি যে, স্বর্গ হোতে একটা জ্যোতি কলকাতার দিকে পড়েছিল, তার জন্ম সেই জ্যোতি হোতে। কোথাও ত শুনি নি যে, ঠাকুরকে মা নরেন্দ্রনাথের সাধুর বেশ দেখিয়েছিলেন।'

লাটু মহারাজ— জানো! ব্রাহ্মসমাজে একবার এক নাটক হোয়েছিলো, তাতে লোরেন বাবু সাধু সেজেছিলো। ঠাকুর সেই নাটক দেখতে

গিয়েছিলেন। লোরেন বাবু যখন সাধু সেজে এলো তখন উনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভালো করে তাঁকে দেখতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'এই ঠিক মিলেছে গো, এই ঠিক মিলেছে।'* তারপর লোরেন বাবুকে ডাকতে লাগলেন। লোরেন বাবু তখন সেজে আছে, নেমে আসতে চাইলো না, তখন কিশুব বাবু বললেন— 'উনি (ঠাকুর) যখন বলছেন, নেমে এসো না। তারপর কাছে এলে উনি লোরেন বাবুর হাত ধরে বললেন—'গ্যাখ! তোমায় এই বেশে একদিন মা দেখিয়েছিলেন। এখন দেখছি ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।'

এই কথা শুনিয়া অনৈক ভক্ত বলিলেন— 'মহারাজ! আপনি এমন সব কথা বলেন যা' অন্য কোন বই-এ পাওয়া যায় না।'

লাটু মহারাজ— হ্যাঁঃ। উনার সব কথা যেন বলা হয়ে গেছে! উনি কতো ভাবে কতো কথা বলতেন, কেউ কি সব কথা জানতে পারে, না, বলতে পারে! যে যতটুকু শুনেছে সে ততটুকু বলবে। বাকী তাঁর কথার কি শেষ আছে? না, তাঁর কথা ফুরোতে পারে? দেখো! ঈশ্বোর সম্বন্ধে মানুষ কতো দিন থেকে কতো কথা বলে আসছে, কেউ কি সে কথার শেষ করতে পেরেছে? তেমনি উনার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) কথার শেষ কেউ করতে পারবে না।

এইখানেই— কোন্ বৎসরের ঘটনা জানি না— নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটি (দক্ষিণেশ্বরের) প্রসঙ্গ বলিয়া যাইতেছি।

"দেখো! দক্ষিণেশ্বরে একদিন মাংস রান্না হচ্ছে। উনি (ঠাকুর) সেদিকে বেড়াতে গিয়ে বললেন—'কি হচ্ছে রে?' সবাই বললেন— মাংস

* 'সৎকথা'য় আছে, 'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।' আমরা শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মৈত্রের লিখিত নোট অনুযায়ী এই প্রসঙ্গটি ছাপাইলাম।

রান্না হচ্ছে, নরেন খাবে। একথা শুনে আর কুছু বললেন না। ··· জানো! তিনি বলতেন— 'ওকে অনেক কাজ করতে হবে—একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে পারবে কেন?' ··· ওর (নরেন্দ্রনাথের) মধ্যে জ্ঞান-অগ্নি জ্বলছে, ও যা খাবে সব হজম হোয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না।' তাই মাড়োয়াড়ীরা কুছু দিয়ে গেলে সব লোরেন বাবুকে খেতে দিতেন।"

"···একদিন লোরেন বাবু ওনার সামনে বললে, 'মদ মাংস হোলে খুশী হবে আর তা না হোলে চটে যাবে—অমন ঈশ্বর আমি মানি না।' তাই না শুনে উনি (ঠাকুর) বললেন— 'এখন মানছ না, একদিন সব মানতে হবেক, দেখে নিও। শক্তিকে মানো না, তাইত তোমার এত কষ্ট।' পরে লোরেন বাবুকে সব মানতে হয়েছিলো। যেদিন উনি শুনলেন যে, লোরেন বাবু 'মা'কে মেনেছেন, সেদিন খুব খুশী হয়েছিলেন। শক্তিকে মানবার পর, লোরেন বাবুর জন্যে 'মা-কালী'র কাছে উনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, জানো?" নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা 'সৎকথা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে পুনরায় লিখিত হইল না।

এইবার রাখাল মহারাজের দক্ষিণেশ্বর-জীবনের যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।

"একবার রাখাল বাবু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভোগের আগভাগ কুছু খেয়েছিলো। তাই না জানতে পেরে উনি রাখাল বাবুকে বললেন— 'ও কি রে? ভোগের আগে তুই আগভাগ নিয়ে নিলি? আগভাগ-নেওয়া জিনিস 'মা'কে কি নিবেদন করা যায় রে?' ··· রাখাল বাবুর বিয়ে হবার পর মনমোহন বাবু তাদের (অর্থাৎ রাখাল বাবুকে ও তার স্ত্রীকে) একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। ঠাকুর তাদের আশীর্বাদ করলেন, আর রাখাল বাবুর বৌকে বললেন— 'ওগো! তোমার ভয়

নেই, আমি রাখালকে এখানে আটকে রাখবো না, মাঝে মাঝে ওখানে (বাড়ীতে) পাঠিয়ে দেবো।' তারপর ঠাকুর তাদের বললেন— 'ওখানকে (অর্থাৎ নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট) একবার যেও গো।' আর হামাকে চুপি চুপি বলে দিলেন— 'দ্যাখ, গিয়ে বলবি টাকা দিয়ে যেন মুখ দেখে।' মা (শ্রীশ্রীমা) টাকা দিয়ে রাখাল বাবুর বৌ-এর মুখ দেখলে, জানো ?"

জনৈক ভক্ত— টাকা দিয়ে মুখ দেখতে বললেন কেন, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— আরে ! রাখাল যে তাঁর মানসপুত্তর, ছেলের বৌ এলে কি অমনি হাতে মুখ দেখতে আছে ? তোমাদের ঘরে এসবের চলন আছে,— জানো না ?

জনৈক ভক্ত— মহারাজ ! তাঁর (ঠাকুরের) ত তখন পরমহংস-অবস্থা, তবু তিনি এসব মেনে চলতেন ?

লাটু মহারাজ— তাঁকে ত আরো এসব মেনে চলতে হোতো। জানো ত তিনি বলতেন— 'ওরে, আমি যদি একতিল এধার-ওধার কোরে বসি, তাহলে তোমরা (অর্থাৎ শিষ্যেরা) ত একতাল ওধার কোরে বসবে। আমি ষোল টাং করলে, তবে তোমরা এক টাং করতে শিখবে।' ... রাখাল বাবু বেশীদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকলে, ঠাকুর তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন, জানো ? বাড়ী থেকে এলে পরে বলতেন— 'যা আগে গঙ্গার জল তিন গণ্ডুষ খেয়ে আয়, তারপর ইখানে মায়ের মন্দিরে যাবি।' ... ঠাকুর যেদিন শুনলেন যে, রাখাল বাবুর একটি ছেলে হয়েছে, সেদিন হামাদের সব বললেন— 'মায়ের ইচ্ছেয় রাখালের ভোগ সব কেটে গেলো। এবার তাকে আমার কাজে লাগতে হবে।' ... ছেলে হবার পর থেকে রাখাল বাবু দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। তাকে তিনি কেবল জপ-ধ্যান

করতে বলতেন। ··· উনি (ঠাকুর) আর কাউকে বেশী আদর করলে রাখাল বাবুর অভিমান হোতো, তাই না দেখে ঠাকুর তাকে একদিন বললেন— 'ওরে! সাধুর সব যায়, শুধু অভিমান যায় না। অভিমানকে কাটিয়ে উঠো, তখন সব বুঝতে পারবে।' শেষে রাখাল বাবু সে অভিমানকেও কাটিয়ে উঠেছিলো, জানো? তাই ত বিবেকানন্দ-ভাই বলেছিলো —'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।' (এই প্রসঙ্গটি গ্রন্থকারের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শ্রীম এই বিষয়টি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীম-র আদেশে এই কথা লিখিত হইল)। ··· দক্ষিণেশ্বরে রাখাল মহারাজ যেদিন থাকতেন, সেদিন উনি ভারী খুশী হোতেন— সে রাতে তিনি হামাদের নিয়ে এক ঘরে ধ্যেন করতেন! (খুব অল্প কয়েক দিনের জন্য তিনি এই ব্যবস্থা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন, পরে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন।)

এইবার ১৮৮৫-র একটি ঘটনা বলিতেছি : "(বুড়ো) গোপাল দাদার (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বড় ইচ্ছা ছিলো যে, তিনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা নিবেন; বাকী তিনি ত কাউকে দীক্ষা দিতেন না। (তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেন, কিন্তু দীক্ষা দিতেন না) সকলের সামনে একথা বলতে তাঁর লজ্জা হোতো, তাই একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার আগে ঠাকুরকে একলা বাগানে বেড়াতে দেখে তিনি তাঁকে মনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। হাম্‌নে সেদিন দেখেছি যে, গোপাল দাদা হাঁটু গেড়ে মাটীতে বসেছিল আর তাঁর পাদুটি ধরে খুব কাঁদতে লেগেছিলো। শেষে কি হোলো জানো?— ঠাকুর তাকে মাটী থেকে হাত ধরে উঠালেন। তখনো দেখি গোপাল দাদা কাঁদছেন। তিনি কি বলেছিলেন

হাসিতো শুনি নি। বাকী তারপর থেকে সন্ধ্যার সময় গোপাল দাদাকে বিষ্ণুমন্দিরে কীর্ত্তন করতে দেখতুম।"

* * *

"জানো! একদিন হরিশ-ভাই একটি বড় সুন্দর কথা বলেছিলো।"

জনৈক ভক্ত— কি বলেছিলেন, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— হরিশভাই বলতো যে ওনার কাছ থেকে চেক পাশ করে না নিলে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে না।

জনৈক ভক্ত— হরিশ দাদা একথা কেন বলতেন, মহারাজ? ঠাকুরের ত আর সত্যসত্যই ব্যাঙ্কে টাকা ছিলো না।

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! তোমরা জানো শুধু টাকার ব্যাঙ্কের কথা—বাকী কৃপার ব্যাঙ্কও আছে, জানো? এক এক সময় পৃথিবীতে এমন সব সাধু-সদ্‌গুরু আসেন, যাঁদের কৃপা না পেলে সিদ্ধ হওয়া যায় না; হরিশ-ভাই ওনাকে (ঠাকুরকে) তেমন সাধু ভাবতো। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা জমা রাখতে হয়, তবে তার উপর চেক কাটতে পারা যায়, তেমনি ঠাকুরের কৃপা-ব্যাঙ্কেও সাধকদের সব সাধনা জমা ছিলো—এবার তিনি নিজে এসে সকলকে তার সুদ দিয়ে গেলেন। (অর্থাৎ তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কৃপা করলেন।)

জনৈক ভক্ত— মহারাজ! 'সাধকদের সাধনা সব জমা ছিলো' একথা-গুলির অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি নি। আপনি কি পূর্ব্বজন্মের সাধনার কথা বলছেন, না, এই জন্মে দক্ষিণেশ্বরের সাধনার কথা বল্‌ছেন?

লাটু মহারাজ— আরে! সাধনা কি এক জন্মে হয়? জানো, একবার ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন কোরে বালক ধ্রুবের মনে বড় অহঙ্কার হয়েছিলো; তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এতো কম সাধনায় ভগবান পাওয়া যায়? এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে হাজির হোলেন আর তাঁকে

সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। বেড়াতে বেড়াতে এমন এক জায়গায় এসে পড়লেন যেখানে একটা উঁচু পাহাড় দেখা গেলো! বালক দেবর্ষিকে জিগ্‌গেস করলেন— 'ওটা কি?' এই না শুনে দেবর্ষি বললেন— 'জানো না?—ওটা একটা হাড়ের পাহাড়। তুমি যতবার এখানে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) আসা-যাওয়া করেছো, ততবারের হাড়গুলি ওখানে জমা করা আছে।' সেই কথা শুনে বালক কি বললে, জানো?— 'আমায় এতোবার এখানে আসতে হয়েছে!' এসব দেখে তবে ধ্রুব মহারাজের অহঙ্কার মুছে যায়। তাই ত বলি, সাধনা এক জন্মের ব্যাপার নয়। যে জন্মে যতটুকু সাধনা করবে ততটুকু জমা থাকবে। যখন জমার ভাগ বেশী হোয়ে যাবে, তখন আসল ত মিলবেই, বাকী সুদ ভি মিলবে।

জনৈক ভক্ত (আশ্চর্য্য হইয়া)— সুদ মিলবে, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! সুদ ভি মিলবে। সাধু-সদ্‌গুরুর কৃপা মিলবে। এমন সুদ মিলে গেলে সাধকদের ভারী আনন্দ হয়, জানো না? তারা তখন আসল উসুল করবার সাধনায় লাগে। ঈশ্বরদর্শন হোলে তবে আসল উসুল হোয়ে যায়। তার আগে আসল পাওয়া যায় না।

জনৈক ভক্ত— এ যে একেবারে 'ইন্সিয়োরেন্সের' ব্যাপার দেখছি। 'লাইফ-পলিসি' আছে, 'এণ্ডাওমেণ্ট' আছে, আবার মধ্যে মাঝে 'বোনাস-পেমেণ্ট' আছে।

ভক্তের কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ হাসিয়া ফেলিলেন।

"একবার ঠাকুর হামাদের নিয়ে ভদ্রকালী গেছিলেন। চারখানা নৌকা হোয়েছিলো! খুব ধুমধাম করে যাওয়া হয়েছিলো, জানো? সঙ্গে খোল, করতাল, শিঙ্গে সব ছিলো। হামাদের হরিনাম শুনে নদীর ওপারে লোকের ভীড় হোয়ে গেলো; ধামিধামি (ধামাধামা) বাতাসা সব লুট

দিতে লাগলো। সেখানে (ভদ্রকালী) শিবু আচার্য্যির বাড়ীতে হামাদের সব যাওয়া হয়েছিলো। সেখানকার একজন পণ্ডিত এমন সব বাজে তর্ক করতে লাগলো যাতে লোকের মনে সংশয় আসে। তাই না দেখে উনি বললেন— 'জানো! কত তপস্যার ফলে মানুষের ভগবানে বিশ্বাস হয়, আর তুমি কিনা পণ্ডিত হয়ে ভগবানে সংশয় তুল্‌ছো! এ তোমার কেমন পণ্ডিতি বিদ্যে গো?' সে কথা শুনে পণ্ডিত বলেছিলো— 'না, না, আমি ঠাট্টা করছিলুম।' ঠাকুর বুঝলেন যে, পণ্ডিত তখনো চালাকী করছে। তাই থপ্‌ কোরে তার গা-টা ছুঁয়ে বললেন— 'ভেতরটা যে একদম শুক্‌নো কাঠ হোয়ে গেছে গো। এ জন্মটাই তোমার বৃথা গেলো, এত শাস্তর পড়ে শেষে কিনা কপটতা শিখলে?' পণ্ডিত তখন আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে সভা ছেড়ে চলে গেলো। জানো! তিনি এমনি কোরে শুকনো পণ্ডিতদের সব শাসন করতেন।" এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া লাটু মহারাজ ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিতের সহিত ঠাকুরের বিচার-প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। সকলের সেকথা জানা আছে, তাই এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' দেখুন।

"জানো! একবার দক্ষিণেশ্বরে একজন ছেলে আত্মহত্যা করেছিলো; সেই সময় ঠাকুর হামাদের সব বলেছিলেন— 'ত্যাখ! আত্মহত্যা মহাপাপ। ও পাপের বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত।'" এইকথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'মহারাজ! শাস্ত্রে ত কোন কোন অবস্থায় আত্মবলি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে; যারা সে ব্যবস্থামত চলে, তাদেরও কি বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়?'

লাটু মহারাজ— দেখো! উনি বলতেন— 'জ্ঞানলাভের পর ইচ্ছে করে দেহপাত করলেও আত্মহত্যা-পাপের ভাগী হতে হয় না।'

অনৈক ভক্ত— আর যারা জ্ঞানলাভ না করে দেহপাত করে, তাদের কি গতি হয়, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— তাদের অনেক দিন ধরে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকে না। (যে ভক্তটি এই প্রশ্নগুলি করিয়াছিল তাহার একটি ছেলে যৌবনে আত্মহত্যা করিয়াছিল। লাটু মহারাজ তাহাকে ছেলের জন্য গয়ায় পিণ্ড দিয়া আসিতে বলেন)।

"একবার রাম বাবুর ভারী অসুখ হয়েছিলো। ঠাকুরের উপর রাম বাবুর বিশ্বাস ছিলো ভারী জবর, ডাক্তার-বদ্যির ওষুধ পর্য্যন্ত খেতে চাইতেন না। একদিন উনি তাঁর বাড়ীতে এলেন, বললেন— 'রাম! এ সব কি শুনছি গো, তুমি নাকি ডাক্তার-বদ্যিদের ওষুধ খেতে চাইছো না? এ সব ত ভাল নয়। রোগ হলে ডাক্তার-বদ্যিকে দেখাতে হয়, আর তুমি কিনা তাদের কথা শুনছো না?' একথা শুনে রাম বাবু কি বলেছিলেন, জানো?— 'যাঁর কৃপায় আমার ভবব্যাধি সেরে গেলো, তাঁর চেয়ে বড় বদ্যি আর কাউকে ত আমি মানতে পারি না। আপনার চরণামৃতই আমার এই তুচ্ছ রোগকে সারিয়ে দেবে; এর চেয়ে বড় ঔষধ আর কিছু নেই।' একথা শুনে ঠাকুর হাসতে লাগলেন। সামনে নিত্যগোপাল ও তারক বাবুকে দেখে বললেন— 'রামকে আর আমি বাপু বোঝাতে পারছি নি, তোমরা একটু ওকে বুঝিয়ে বল।' জানো! সেবার তিনি (রাম বাবু) ওনার (ঠাকুরের) চন্নামেত্য খেয়ে রোগ ভাল করে-ছিলেন।"

"একদিন গিরিশ বাবুর ছেলের কলেরা হয়েছিলো— ডাক্তার-বদ্যির ওষুধ খেয়ে যখন রোগের কুছু কম্‌তি হেলো না, তখন গিরিশ বাবু ঠাকুরের চন্নামেত্য (চরণামৃত) আনতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুর হামাকে

দিয়ে মায়ের চন্নামেত্য পাঠিয়ে দিলেন। গিরিশ বাবুর এমন বিশ্বাস ছিলো যে, ছেলের অমন অসুখেও আর ডাক্তার-বত্যি দেখালেন না। কুছুদিনের মধ্যে গিরিশ বাবুর ছেলে ভালো হোয়ে গেলো, জানো ?"

"একদিন উনি (ঠাকুর) দেবেন বাবুর (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিবাস তখন আহিরীটোলা নিমু গোস্বামীর লেনে ছিল) বাসায় গেলেন। সেখানে অনেক কুলপী বরফ খেয়েছিলেন। ··· ওনার গলার অসুখ যখন শুরু হয়েছিলো, তখন বরফ খেলে ওনার গলার বেদনা ভাল থাক্‌তো। তাই উনি প্রথম প্রথম খুব বরফ খেতেন। একদিন ত এক ছোক্‌ড়াকে (পরে জানিয়াছিলেন যে তিনিই শশী মহারাজ) এক পয়সার বরফ আনতে বললেন। ছোক্‌ড়াটি পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যেতো, শ্যামবাজারের মোড় থেকে এক পয়সার বরফ কিনে গাম্‌ছায় মুড়ে এনেছিলো ; এমনভাবে মুড়ে এনেছিলো যে, রোদে বরফ গলে যায় নি। তাই না দেখে উনি (ঠাকুর) তাকে বলেছিলেন—'ভ্যাখ! ঠিক রোদ্দুরে যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে বড় কৃপণ বলে। কিন্তু আমি দেখছি তুমি কৃপণ নও গো, তুমি দাতা।'"

একথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"শশী মহারাজকে ঠাকুর দাতা বলেছিলেন ?"

লাটু মহারাজ—হ্যাঁ ! তার চেয়ে বড় দাতা আবার কে আছে ? শশী ভাই ত হামাদের সব ভিক্ষে করে (তপস্যার সময়) খাইয়েছে। শশী ভায়ের শাঁক-ঘণ্টা-নাড়ায় হামাদের দুবেলা দুমুটো জুটতো। যে এতো-গুলো লোককে দুবেলা খাওয়াতো তাকে তোমরা দাতা বলবে না ?

এই অধ্যায়ে শশী মহারাজের কথা এইখানেই শেষ হইল। পরে যথাস্থানে শশী মহারাজের কথা পুনশ্চ বলা হইবে।

"জানো ! ওনার (ঠাকুরের) গলার বেদনা রোজ রোজ বাড়্‌ছে দেখে রাম বাবু, গিরিশ বাবু, মনমোহন বাবু, সুরেশ বাবু তাঁনাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। তখন বাবুরাম ভাই দক্ষিণেশ্বরে থাকতো। উনি (ঠাকুর) একদিন বাবুরাম ভাইকে জিগগেস করলেন— 'কি গো, তুমি কি বল ?' বাবুরাম ভাই চুপ করে ছিলো। সেখানে লোরেন বাবু ছিলো, বললে— 'সেই ভালো, কলকাতায় আমাদের যাওয়া-আসার সুবিধা হবে, আর ডাক্তার-বদ্যিদেরও তাতে সুবিধা হবে। রাম দাদা ঠিক বলেছেন —আপনি কলকাতায় চলুন।' কলকাতায় বাড়ী খোঁজবার ভার পড়লো বৈকুণ্ঠ বাবুর উপর (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল)। তিনি দু-চার দিনের মধ্যে বাগবাজারে একখানা বাড়ী ঠিক করে এলেন।"...

ইহার পরে ঘটনাগুলি 'ঠাকুরের মহাসমাধি' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

এইখানেই আমরা লাটু মহারাজের দক্ষিণেশ্বরের সেবক-জীবনের ঘটনাবলীর কথা শেষ করিলাম। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহাকে লইয়া কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন তাহা যতদূর শুনিয়াছি উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরেও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবক লাটু তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু দেখিয়াছিল এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও ভক্তগণের কোন কোন কথা শুনিয়াছিল। সেইগুলির মধ্যে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের অজানা আরো অনেক কথা থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা লাটু মহারাজের তাপস-জীবনের কথা আরম্ভ করিব।

তাপস-জীবন

লাটুর কৃচ্ছ্রপরায়ণতা, নেশাত্যাগের সঙ্কল্প, আহার-সংযমের সঙ্কল্প ও প্রয়াস, নিদ্রা-জয়ের সঙ্কল্প ও প্রয়াস, দক্ষিণেশ্বরে রোগভোগ, আসক্তিজয়ের সঙ্কল্প ও ব্রহ্মচারি-জীবন-যাপনের কথা, 'তুই কি ভাবিস্'-প্রসঙ্গ, ভিক্ষাপ্রসঙ্গ, তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা ও ঠাকুরের উপদেশ, লাটুর আঁটপুরগমন ও মানসিক উদ্বেগ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ঠাকুরের কৃপালাভ, প্রাতঃকৃত্য-প্রসঙ্গ (চটিজুতা-খোঁজার কথা) এবং তাপস-জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্ম

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে-বয়সে সেবক লাটু দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিল, সেই বয়সটি সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই রোমাঞ্চকর। সাধারণ মানুষ যৌবনে সহজেই চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্যের অস্থির প্রেরণায় মানুষ সাধারণতঃ ভোগবিলাসমুখী হইয়া থাকে। কিন্তু সেই-হেন বয়সেও লাটুর মত স্ফুটিতোন্মুখ যুবক ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরের আড়ম্বরহীন বৈরাগ্য-বহুল জীবনযাপন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। সাধুসঙ্গের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে এইরূপ ঘটনা যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সাধুসঙ্গের ফলে লাটু নিজের দোষত্রুটীগুলি বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেইগুলিকে সংশোধিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। নিজের দোষত্রুটীগুলিকে কাটাইয়া উঠিবার জন্য লাটুর কঠোর তপস্যা, অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন এবং অনতিক্রম্য দৃঢ়তা এই অধ্যায়ে একে একে বর্ণিত হইতেছে। সাধকজীবনের সূত্রপাতে এরূপ নিষ্ঠা ও তপস্যা সত্যই আধুনিক কালে বিরল।

আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, বাল্যে লাটু যে সমাজের মধ্যে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই শ্রেণীর সমাজ-প্রথায় 'মদ' খাওয়া কিছু নিন্দনীয় নহে—এমন কি, সেই শ্রেণীতে

পিতাপুত্রে একসাথে বসিয়া মদ-খাওয়ার চলন ছিল। ঠাকুর সেকথা জানিতেন; তাই দক্ষিণেশ্বরে তিনি লাটুকে নেশাজাতীয় বস্তু হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে বলিতেন। একদিন তিনি নিভৃতে আপন সেবককে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে, মদ আর কামিনীকাঞ্চন ভগবানে সংশয় আনে, ভগবানকে পেতে দেয় না। যে-কোন একটিতে আসক্তি এলেই ভগবানের পথে কাঁটা পড়ে। জান্‌বি, নেশা করে ধ্যান করা, আর যোগী হোয়ে স্ত্রীসঙ্গ করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।' এই কথা শুনিয়া লাটুর যেন চোখ খুলিয়া গেল। সবার অলক্ষ্যে যে-সব আসক্তি মনের কোণে জাগিত, তাহা ঠাকুর কি ভাবে জানিতে পারিলেন, প্রথম প্রথম লাটু তাহা বুঝিতে পারিল না; শেষে কিন্তু তাহার ধারণা হইয়াছিল যে ঠাকুরকে লুকাইয়া কোন কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্ত্তী কালে অনেক গোপন কথাই লাটু ঠাকুরের নিকট অকপটে বলিয়া যাইত।

"জানো, একদিন হামি কলকাতায় রাম বাবুর বাড়ীতে যাচ্ছি, কাশীপুরের মোড়ে একটী মদের দোকান ছিলো, তার সামনে এসে মন ভারী বিগড়ে গেলো; কেনো যে বিগড়ে গেলো, বুঝলুম না। পথে আর কুছু ভালো লাগলো না। শেষে দক্ষিণেশ্বরে এসে ওনাকে সব বললুম। উনি বললেন— 'মদের গন্ধে তোর মন বিগড়েছিলো। তুই আর ওসবের গন্ধ শুঁকিস নি।' " ঠাকুরের এই কথাগুলি লাটু কী ভাবে রক্ষা করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে রাম বাবু কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন—তাহা এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রাম বাবু ঠাকুরকে একদিন বলিলেন— 'ছোঁড়াটাকে এ কি এক আদেশ করেছেন? আপনার আদেশপালন করতে গিয়ে লালটুকে ঘোরা-পথে কলকাতায় যেতে প্রায় আট মাইল হাঁটতে হয়?'

রাম বাবুর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন— 'লেটোকে এমন কি বলেছি ? কই বাপু ! আমার ত কিছু মনে পড়ছে না।'

রাম বাবু তখন বলিলেন— 'ছোঁড়াটাকে আপনি মদের গন্ধ শুঁকতে বারণ করেছেন, তাই ছোঁড়াটা মদের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে পর্যান্ত সাহস করে না। যে-সব রাস্তায় মদের দোকান আছে, সেই সব রাস্তা মাড়ায় না, অন্য পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে।'

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর যেন বড় গম্ভীর হইয়া গেলেন, পরে লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন— 'ওরে ! মদের গন্ধ শুঁকতে বারণ করেছি, তা বলে ত আর সে পথ দিয়ে হাঁটতে বারণ করি নি। দোকানের পাশ দিয়ে যাবি তাতে কোন দোষ হবে না। ইখান্‌কে (নিজের বুক দেখাইয়া) মনে করবি, তাহলে আর কোন নেশা তোর মনকে টানতে পারবেক না।'

ঠাকুরের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে তিনি অমানুষিক দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখাইতেন। জীবনের বহু ক্ষেত্রে বহু আসক্তি—যাহাকে সাধারণে জীবত্বের সংস্কার বলে—সেই সংস্কারগুলিকে জয় করিবার জন্য ঠাকুর তাহাকে যে ভাবের নির্দ্দেশ দিতেন তাহাও বর্ণে বর্ণে পালন করিতে লাটু দৃঢ় সঙ্কল্প করিত। যে-সব ক্ষেত্রে সঙ্কল্প রক্ষা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই-সব ক্ষেত্রে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। শুনি, মানুষ আহার নিদ্রা ও মৈথুনের দাস, কিন্তু যে মানুষ ভগবানলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাকে এই ত্রিবিধ আসক্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। আসক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের যে চেষ্টা তাহাই প্রকৃত তপস্যা। লাটু মহারাজের জীবনে এই তপস্যা কি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাই এইবার বলিতেছি।

মদের গন্ধ এড়াইবার জন্য লাটুর দৃঢ়প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইবার আহারের আসক্তিত্যাগের জন্য তাপস লাটুর কৃচ্ছ্রসাধন-প্রসঙ্গে আসিতেছি। যে ব্যক্তি ব্যায়ামী, কুস্তীকসরতে অভ্যস্ত, যাঁহার কিশোর-জীবনের উদ্দেশ্য ছিল বড় পালোয়ান হওয়া (এই কথাটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট শুনিয়াছি), সেই ব্যক্তি যে অতিরিক্ত মাত্রায় আহারবিলাসী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! সেই ব্যক্তি যে পুষ্টিকর আহারের লোভ রাখিবে তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? রাম বাবুর বাড়ীতে তাঁহার যে রুচিমত আহার সংগৃহীত হইত, সে সংবাদ আমরা শুনিয়াছি। অথচ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি তাঁহাকে সেই চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের লোভসংবরণ করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম উদরপূর্ত্তির জন্য তাঁহার ভোজ্যপরিমাণ বেশী হইত। কিন্তু কোন গুরুভাইকে উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছিল।

একবার যোগীন মহারাজ ঠাকুরের নিকট বাস করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কসিলেন— 'রাতে কি খাস্?' যোগীন-ভাই বললেন— 'আধসের আটার রুটী আর এক-পোওয়া আলুর চচ্চড়ি।' ঐ কথা শুনে উনি (ঠাকুর) বললেন— 'তোকে আমার সেবা করতে হবে না। রোজ আধসের ময়দা! অত বাপু যোগাতে পারবো না, তার চেয়ে বরং তুই বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে এখানে আসিস।'

"জানো! হাম্‌নে খুব খেতে পারতুম। একসের দু'সের আটা এক একবারে খেয়ে নিতুম। বাকী একদিন উনি যোগীন-ভাইকে খাওয়া নিয়ে টুকলেন, বললেন— 'তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়।' হামার সে কথা মনে লাগলো। খাওয়া কমিয়ে দিলুম। গোড়াগুড়ি ভারী কষ্ট হোতো, বাকী দু'চার মাসের পরে সব ঠিক হোয়ে গেলো। তখন

আর বেশী খেতে পারতুম না। একদিন হামার খাওয়া দেখে উনি বললেন—'আরো একটু কমা, তবে ত ধ্যানধারণায় মন বসবে। বেশী খেলেই ঘুম আসবে।' উনার কথা শুনে খাওয়া আরো কমিয়ে দিলুম। এমন কম করতে লাগলুম যে মাঝে মাঝে খিদের চোটে পেটে ব্যেথা লাগতো। উনি (ঠাকুর) সে-সব কথা টের পেলেন, বললেন—'ওরে! অতটা ভাল নয়। শরীরধারণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবি, তার চেয়ে কম করলে ধ্যান-ধারণায় মন বসাতে পারবি নি।' এমন কোরে তিনি হামাদের সব চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর নজর এড়িয়ে হামাদের কুছু করবার শক্তি ছিলো না।"

একদিন কলিকাতার এক গৃহী ভক্তের বাড়ীতে তাপস লাটু প্রচুর ভোজন করিয়াছিল। গৃহী ভক্তটি পরদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সমক্ষে লাটুর ভোজন-ক্ষমতার প্রশংসা করিয়াছিল। ঠাকুর তাহা শুনিয়া নিভৃতে লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন— 'ওরে! এরকম পাল্লা দিয়ে খেতে নেই। দিনে বারুদঠাসা কোরে খেতে পারিস, কিন্তু খবরদার রাতে বেশী খাস নি। রাতে জল-খাওয়ার মত খাবি।' এইরূপ নানাদিক দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের উপদেশমত চলিয়া বছর দুয়ের মধ্যে লাটুর আহার-পরিমাণ এমন কমিয়া গিয়াছিল যে, যে-কেহ তাহা দেখিত সে-ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত।

আহারমাত্রার অত্যল্পতা লইয়া পুনরায় বহু লোক লাটুর সুখ্যাতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া পরমহংসদেব স্বয়ং একদিন তাঁহার আহারকালে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই লাটু অতিরিক্ত মাত্রায় কম খাইতেছে। এত কম যে, তাহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিলাভ সম্ভব নয়। পাছে অতিরিক্ত কম খাওয়ায় অকালে লাটুর দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠে,

সেই ভয়ে ঠাকুর দিন কতক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিতেন ও তাঁহার পাতে স্বহস্তে ঘৃত পরিবেশন করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রকৃতি অত্যল্প আহারের অতিশোধ লইতে ছাড়িল না। দক্ষিণেশ্বরবাসের বছর দু'য়ের মধ্যে লাটুকে এবার মাস খানেকের জন্য রোগভোগ করিতে হইয়াছিল। পরে সে কথা বলিয়াছি।

আহার-সংযমের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে নিদ্রাসংযমেরও নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসিতেছি।

আমরা শুনিয়াছি যে, লাটু বাল্যকাল হইতে ঘুমকাতুরে ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে, কার্য্যে অমনোযোগী ছিল তাহা নহে। সাধারণতঃ কুস্তীগীর পালোয়ানগণ যেরূপ অধিকমাত্রায় নিদ্রাসেবী হন, সেইরূপ লাটুও অধিক-মাত্রায় ঘুমাইত। একদিন কর্ম্মক্লান্ত হইয়া লাটু সন্ধ্যাকালে ঘুমাইতে থাকে। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহাকে জাগাইয়া দেন এবং বলেন— "ও কিরে? এই ভরসন্ধ্যাবেলা ঘুম কিরে? এমন ত কখনো দেখি নি! সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ডাকবি, তা না, শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস? ভরসন্ধ্যেবেলা ঘুমায় না—ওঠ।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লাটু তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল এবং যেন কত অপরাধ করিয়াছে এই ভাবিয়া বড়ই লজ্জিত লইয়া পড়িল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া লাটু আপনাকে বড় ধিক্কার দিয়াছিল। সাধারণ ব্যক্তি আপনাকে ধিক্কার দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, হয়তঃ সেদিনের মত অনুশোচনা করিয়া পুনশ্চ অন্য একদিন সন্ধ্যাকালে ঘুমাইতেন, কিন্তু তাপস-লাটু এই সূত্রে এক প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল— 'হাম্‌নে আর এমন সময় কোন দিন ঘুমাবে না।'

এই প্রতিজ্ঞা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতি বড় অসুস্থতার সময়ও লাটু মহারাজকে সন্ধ্যাকালে শায়িত অবস্থা হইতে উঠাইয়া বসাইয়া দিতে হইত। এবং যদি কেহ তাঁহাকে সেইকালে বসাইয়া দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। একবার (বরাহনগর মঠে) কঠিন নিউমোনিয়ারোগের সময় শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে বসাইয়া দিতে বিমুখ হন। ইহাতে লাটু মহারাজ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন— 'যাও, যাও। তোমাদের ডাক্তারদের কথা রাখ। তারা ত খুব বোঝে! এ তাঁর (ঠাকুরের) হুকুম, মানতেই হবে।' এ কথা শুনিয়াও শরৎ মহারাজ তাঁহাকে উঠাইয়া দিতে দ্বিধা করিলেন; তাহা দেখিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলেন— 'যদি তোমরা হামায় বসিয়ে না দাও, হামাকে মহাবীরজীর শরণ লিতে হবে।' শরৎ মহারাজ তাহা শুনিয়াও কোনপ্রকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। মুহূর্ত্তকালের জন্য শরৎ মহারাজ সেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে লাটু মহারাজ সেই অসুস্থ দেহ লইয়াও উঠিয়া বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎ মহারাজ সেই দৃশ্য দেখিয়া অনুশোচনার সুরে তাঁহাকে বলিলেন— 'লাটুভাই! এই রোগা শরীর নিয়ে কি এরকম করতে আছে? ডাক্তারেরা এত নিষেধ করে গেলেন। তাঁদের নিষেধ যদি না শুনিস, ভাই, রোগ সারবে কেমন করে? রোগের সময় ডাক্তার-বদ্যির কথা শুনতে হয়, এও ত তাঁর (ঠাকুরের) কথা। দেখেছিস্ ত তাঁকে। তিনি (ঠাকুর) অসুখের সময় ডাক্তারদের কথামত কেমন চলতেন। জানিস ত সেই জলখাওয়া মানা করার কথা? তবু কেন ভাই অমন করিস?' এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— 'হাম্‌নে অতশত জানে না, এ তাঁর হুকুম, হাম্‌নে তাঁর হুকুম মেনে চলবে।'

ঠিক এইরূপ একটি ঘটনা কাশীতে ঘটিয়াছিল— লাটু মহারাজের

শেষ অসুস্থতার সময়। তখনো তিনি ঠাকুরের আদেশ পালন করিয়াছিলেন। যে-অবস্থায় মানুষ কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারে না, সেই মুমূর্ষু অবস্থায় লাটু মহারাজ সন্ধ্যাকালে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে শুধু চিন্তিত হন নাই, ঠাকুরের আদেশপালন করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। সেদিন লাটু রাত্রির প্রথম প্রহরে নিদ্রিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শুধু ঘুম হইতে উঠাইয়া দেন নাই বরং কিছু তিরস্কার করিয়াছিলেন। খুব গম্ভীরভাবে তিনি (ঠাকুর) বলিয়াছিলেন— "হ্যাঁরে! এখনই যদি ঘুমোবি, তবে জপধ্যান করবি কখন? রাত নটা বাজে নি, এরি মধ্যে ঘুমোচ্ছিস! কোথায় তুই রাতভোর ধ্যান করবি, ধ্যান করতে করতে কখন যে রাত কেটে যাবে জানতে পারবি নি, তা না, এরই মধ্যে ঘুমে চোখ ঢুলে পড়ছে! তুই কি এখানে শুধু ঘুমোতে এসেছিস?"

ব্যাস! ঠাকুরের এই তিরস্কারে লাটুর মনে যে মর্ম্মান্তিক ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহারই ফলে লাটু চিরজীবনের জন্য রাতের ঘুম বিসর্জ্জন দিয়াছিল।— "ওনার (ঠাকুরের) কথায় হামার এমন দুঃখু হোলো, কী বলবো! হামি কিনা এমন সঙ্গ পেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাচ্ছি! জানো! মনকে খুব কোষে চাবুক মারতে লাগলুম। তখনি ত চোখে-মুখে জল দিয়ে পোস্তার দিকে বেড়াতে গেলুম। বেড়াতে বেড়াতে শরীর খুব গরম হোয়ে গেলো, তখন এসে তাঁর কাছে বসলুম। ফিন্ ঢুল এসেছিলো— হামিও ফিন্ বেড়াতে লাগলুম। এমন কোরে সারারাত ঢুলের সঙ্গে লড়াই দিলুম। পরের দিনও তাই করলুম। বাকী ভারী কষ্ট হোতো— দিনের বেলায় ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতো। হামি ঘুমকে ছোড়লুম

না— সেখানেও তাকে লড়াই দিলুম। এমন কোরে হররোজ চেষ্টা করতে লাগলুম। বাকী দিনের ঘুম কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।"

বছর দুই চেষ্টার পর তাপস লাটু নিদ্রাজয়ী হইয়া উঠিয়াছিল। নিদ্রাজয়ী বলিতে নিদ্রাত্যাগী বুঝিবেন না। যখন ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা ঘুমাইয়া শরীরকে সতেজ রাখিতে যে পারে, তাহাকেই নিদ্রাজয়ী বলা হইয়া থাকে।

লাটু মহারাজ যে নিদ্রাকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আপনাদের সমক্ষে ধরিতেছি —"কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁর দেহত্যাগের পর তিনি আজীবন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। গীতায় সেই ভগবদুক্তি— 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥'— তাঁহার জীবনে আক্ষরিক অর্থে ও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।··· এইরূপে সারারাত্রি ধ্যানধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।"

একই কালে আহার ও নিদ্রা জয় করিবার চেষ্টা করায় লাটুর দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি যে, দক্ষিণেশ্বরবাসের বছর দু'য়ের মধ্যে তাঁহার একবার আমাশয়রোগ হইয়াছিল। আর একবার তাঁহার (কিন্তু কখন তাহা বলিতে পারি না) গাত্রদাহরোগ হইয়াছিল। গাত্রদাহকালে ঠাকুর তাঁহাকে গঙ্গার মাটী মাখিতে বলিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরে অন্য কোন রোগ তিনি ভোগ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

মানুষের তিনটি জৈব সংস্কারের মধ্যে মৈথুন নামক তৃতীয় সংস্কারটি

লাটু মহারাজ কিভাবে জয় করিয়াছিলেন এবং তাহাতে জয়ী হইবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে কি উপদেশ দান করিয়াছিলেন, এইবার সেই কথায় আসিতেছি। বলরাম মন্দিরে একদিন লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন— "জানো! উনি হামাদের বলতেন, 'যারা ভগবানলাভ করতে চায়, তাদের স্ত্রীলোক থেকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।' স্ত্রীলোক থেকে সাবধান হওয়ার মানে একদিন তিনি হামাদের বুঝালেন— 'ওরে! মেয়েদের সঙ্গে বসা কি আলাপ করা, তাদের কথা শোনা, আর তা' নিয়ে মনে মনে আলোচনা করা, তাদের সম্বন্ধে কথা বলা আর বলতে বলতে সুখ পাওয়া, তাদের কোন জিনিস কাছে রেখে দেওয়া আর তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা, তাদের হাত ধরা বা পরশ করা—এসব থেকেও সাবধান হতে হয়, জানবি। যে ভগবানলাভ করতে চায় তাকে আট রকম রমণই ত্যাগ করতে হবে।' ... 'ভগবানকে জনেতে গেলে ব্রহ্মচারী হোতে হয়, যে বীর্য্যরক্ষা করতে পারে না, তার ভগবানের ধারণা দৃঢ় হয় না। ব্রহ্মচর্য্য থাকলে তবে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়। নিশ্চয়বুদ্ধি না হোলে ব্রহ্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মায় না। ব্রহ্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মালে জীব যে তাঁতে বাস করছে তার বোধ থাকে না।' "

ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে বলিয়াছিলেন— 'মহারাজ! এমনভাবে কি কেউ কঠোর করতে পারে? সংসারে থেকে মেয়েদের কথা ভাববে না, মেয়েদের গলার আওয়াজ শুনবে না, মেয়েদের চোখে দেখবে না, এমন কি মেয়েদের সঙ্গে আলাপ রাখবে না— এতটা কঠোর করা কি সম্ভব হয়?' ভক্তটির কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তাপস-জীবনের কঠোরতার কথা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। — "আরে! তোমরা সংসারীরা ভাবো যে,

এমন কঠোর কেউ করতে পারে না। বাকী এই পৃথিবীতে এমন সব বড় বড় লোক জন্মে গেছেন, যাঁরা সারাজীবন মেয়েদের মায়ায় ভুলেন নি। তাঁদের কাছে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি ঘেঁষতে পারে নি। উনি বলতেন—'শুকদেবাদি উর্দ্ধরেতা পুরুষ। তাঁদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ছিলো না।' আরে! আসক্তি ছুটে গেলেই ত আর মেয়েদের সম্বন্ধে কলাপনা (কল্পনা) চলে না। যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণই কলাপনা থাকে। কলাপনা বন্ধ করো, দেখবে তোমাদেরও কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ছুটে যাচ্ছে। আরে! অমনি কি কলাপনা বন্ধো হয়? তাঁর নামে মশগুল না হোলে কলাপনা ছুটে না। তিনি ত হামাদের বলতেন— 'দিনভোর জপধ্যান করবি। যে দিনভোর জপধ্যান করতে পারে, কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি তার মন থেকে চলে যায়।' আরে! হামাদের জীবনে ত দেখেছি, নামে মশগুল হোলে আর কুছু ভাল লাগে না। নামে যে রস আছে তাতেই মানুষ মাতাল হোয়ে যায়। তখন যে আনন্দ হয়, তার কাছে মেয়েমানুষের আনন্দ তুচ্ছ মনে হয়। তিনি বলতেন— 'কোটী রমণসুখেও ব্রহ্মরমণের এককণা সুখ পাওয়া যায় না।' "

উপরোক্ত কথাপ্রসঙ্গ হইতে আমরা অনুমান করিতেছি যে, ঠাকুর তাপস-লাটুকে ইন্দ্রিয়দমনের জন্য অনুক্ষণ নামস্মরণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যৌবনে সাধারণতঃ মন বিষয়ে আসক্ত হয়। সেইকালে নিত্য স্মরণ-মননে ব্রতী হওয়া বড়ই দুষ্কর। 'দিনেরাতে নিরন্তর তাঁর (ভগবানের) নাম কর, অহোরাত্রের মধ্যে একবারও তাঁকে ভুলো না'—এই ধরনের যে কথাগুলি ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেন, তাহা শুনিতে বেশ সহজ কিন্তু পালন করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় কোথায় এর দুঃসাধ্যতা, কেন ইহা এত কঠিন সাধনা, এত কঠোর তপস্যা! যে কালে মন

আসক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে, সেই কালে সেই আসক্তিকাতর মনকে প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত রাখা যে কী কঠোর পরীক্ষা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারিবে না। যে-সে লোক ইহার গুরুত্ব বুঝে না, কারণ এই সংগ্রামে শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ উভয়ে একই ক্ষেত্রে বসবাস করে। কে যে কখন কাহাকে পরাভূত করিবে, কে যে কি বেশে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা কেহ জানে না। উভয়েরই বল, শক্তি, তেজ একই আধার হইতে আহৃত হইয়া থাকে এবং উভয়েই একই আধারে ক্রিয়ান্বিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পক্ষকে বলশালী করিয়া থাকে। এ-হেন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচার ও বিবেক যাহার সহায় হয়, মাত্র তিনিই আপন পুরুষকার দ্বারা ইহাতে শান্ত ও নিরপেক্ষ থাকিয়া উত্তেজিত ও প্রলোভিত মনের রাশ টানিয়া রাখিতে পারেন।

আমাদের লাটু মহারাজকেও তপস্যাকালে এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি বিচার ও বিবেকের সাহায্য লইয়া আপন পুরুষকার দ্বারা বহু প্রলোভনের জাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন। যে-সকল প্রলোভনকে তিনি জয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিতেন, যত বড় দুঃসাধ্য তপস্যা হউক না কেন, তাহাকে জয় না করা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের ফলে তিনি নিত্য স্মরণরূপ মহাযজ্ঞে যথাকালে সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন।

নিত্য স্মরণরূপ যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অনাহারে না হউক অল্পাহারে এবং অনিদ্রায় না হউক অল্প নিদ্রায় বহুদিন তাঁহাকে বহু তপস্যা করিতে হইয়াছিল। এই তপস্যার কৌশল কি তাহা জনৈক ভক্ত একদিন লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই কথোপকথনটি দেওয়া হইতেছে:

জনৈক ভক্ত— মহারাজ! সাধুসন্ন্যাসিগণ ত বলেন কামিনী-কাঞ্চন-রূপ আসক্তি ত্যাগ করতে, কিন্তু আমাদের মত সংসারিগণ সেই আসক্তি কেমন কোরে ত্যাগ করতে পারে, বলুন? আমাদের মনকে আসক্তিগুলো সব ঘিরে রয়েছে। সেইখানে যে তাকে কোনপ্রকারে যুদ্ধ দেবো তার সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধ দেবো কি? যা নিয়ে যুদ্ধ করতে যাব, আসক্তিগুলো ত তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে কিছুতেই দেবে না। নাম করতে বলেন, কিন্তু দেখেছি যে, আসক্তিগুলোর টানে নাম করতে ইচ্ছে যায় না। বিচার করতে বলেন, সেখানেও দেখেছি বারে বারে বিচারককে স্তম্ভিত করে দিয়ে আসক্তিগুলো মনের মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। এখন আমাদের বলে দিন কি কৌশলে আপনারা আসক্তিগুলোর মাঝে নামের ও বিচারের আসন পেতেছিলেন?

জনৈক ভক্তের সেই প্রশ্নে লাটু মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একপ্রকার সাধন-ইঙ্গিত।

লাটু মহারাজ— তোমাদের শুধু ঐ এক কথা— নাম করি কেমন কোরে? আরে! নাম করতে করতে, নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয়, জানো? মন ত আসক্তির নেশায় ছুটছে। আসক্তিগুলো ত মনকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাচ্ছে। তাদের মত পাজি আর কে আছে? এই কথাই ত অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে স্বীকার করলেন যে, মন বড় পাজি। আর বললেন— 'হে অর্জ্জুন! আসক্তিগুলোর প্রতি বৈরাগ্যবান হও, আর নিত্য অভ্যাস করতে থাকো।' অভ্যাস করতে করতে মন স্থির হয়ে আসবে। মন যত বিষয়ের দিকে দৌড়ুবে তত মনের মধ্যে বিচার করতে থাকবে। আরে! বিষয়গুলো ত অনিত্য—ও আজ আছে, কাল নেই। অনিত্য জিনিসে তোমার যতটুকু

প্রয়োজন, তাই নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। বেশী নেবে কেনো? বেশী অনিত্যের বোঝা বাড়ালে সেখানে ত আর নিত্যবস্তু স্থান পাবে না, অনিত্য জুড়ে জুড়ে ত আর নিত্যবস্তুর সৃষ্টি হয় না। নিত্যবস্তু ত এক— ওহি ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্ম ছাড়া সব অবস্তু জানবে। এমন কোরে মনকে বোঝাবে। বুঝাতে বুঝাতে দেখবে বিবেক জেগে উঠেছে। জান তো, রাম সভার মধ্যে হনুমানকে মুক্তার মালা দিয়েছিলেন। বাকী হনুমানজী মালাটি নেড়েচেড়ে দেখলেন, একটা দানা দাঁত দিয়ে কেটে ভি দেখলেন, যেই দেখলেন তাতে রামনাম লিখা নেই, অমনি তা ফেলে দিলেন। তাই না দেখে লক্ষ্মণ রেগে গেলেন, বললেন, 'বাঁদর কিনা, মুক্তোর মালার মর্ম্ম কি জানে? অমন ভালো মুক্তোর মালা কিনা দাঁত দিয়ে কেটে নষ্ট করলে!' লক্ষ্মণের দুঃখু দেখে রামজী বললেন— 'ওকে জিগ্‌গেস্ কর না, কেন এমন করলে।' হনুমানজীকে জিগ্‌গেস করায় বললেন— 'দেখছিলাম এর মধ্যে রামনাম আছে কি না!' জানো! এমনি কোরে বিচার করতে হয়। বিচার জাগ্রত রাখাই ত সবচেয়ে কঠিন তপস্যা। যে বিচার করতে জানে, সে ত কামকামনার সঙ্গে হর্‌গড়ি লড়াই কোরে থাকে। আরে! বিচার আউর বিবেক জাগিয়ে তুলো, তবে ত কামকামনার সঙ্গে লড়তে পারবে। সদসৎবুদ্ধি না জন্মালে কামকামনাকে রুখবে কি করে? আগে বাহিরের জানলা দিয়ে যে-সব গর্‌দা মনের ঘরে আসছে তাকে সাফ্ করো দেখি; বিচার কোরে জানলাগুলোর (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির) সামনে 'প্রবেশ নিষেধ' এমন লুটিস্ (নোটিশ) টাঙিয়ে দাও দেখি। সে সব লুটিস্ না মেনে যে-সব গর্‌দা ভিতরে আসবে, তাদের সব পুলুসের হাতে (অর্থাৎ বিবেকের কাছে) ধরিয়ে দেবে। বিবেক পুলুসের (পুলিশ) সাহায্যে মনের সঙ্গে মনের লড়াই করতে থাকবে। তবে ত মনের ক্ষেত্র ফাঁকা হবে, সে ক্ষেত্রে তখন

ভগবানকে বসাতে পারবে। ভগবানকে না বসান পর্যান্ত কামকামনাগুলোকে জয় করতে পারবে না। জানোতো— 'মনেই কামের বীজ রয়েছে, সেই বীজকে রস দিচ্ছে ভিতরের সব ইন্দ্রিয়গুলো আর বাহিরের সব বিষয়গুলো। বীজের উপর রস পড়ে এন্‌তার ফসল জন্মাচ্ছে। সেই ফসলগুলোকে কাটতে হবে, তার বীজগুলোকে নষ্ট করতে হবে। তার পর সেইখানে ভগবানের নামের বীজ ছড়াতে হবে। তবে ত নামের ফসল ফলবে। এখন ত কামের ফসল ফলছে। তাইত তিনি বল্‌তেন— 'যাঁহা কাম, তাঁহা নেহি রাম; আর যাঁহা রাম, তাঁহা নেহি কাম।'

জনৈক ভক্ত—মহারাজ! আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে রুদ্ধ কোরে তবে নাম করতে বলছেন কি?

লাটু মহারাজ— ওভি হোনে সেক্‌তা। বাকী নামের এমন এক শক্তি আছে যে, কামের বীজকে পুড়িয়ে দিতে পারে। তিনি ত বলতেন— 'নামের বর্ম্ম ধারণ কোরে কামের আক্রমণ রুখে দে।

জনৈক ভক্ত— মহারাজ! নাম কেমন করে কামকে জয় করে?

লাটু মহারাজ— আরে! নামের কাছে কাম ঘেঁষতে পারে না। নামে এমনি এক টান আছে যে, সেই টানে মন বাঁধা পড়লে কাম জাগবার ফুরসৎ পায় না। নাম যে সত্যবস্তু, আস্‌লি বস্তু। যেখানে সত্যবস্তুর ধ্যেন চলতে থাকে, সেখানে ত অসত্যগুলো বাসা বাঁধতে পারে না।

জনৈক ভক্ত— এসব না হয় জাগ্রত অবস্থায় সম্ভব। কিন্তু মানুষ যখন ঘুমোতে থাকে, কামের আক্রমণ তখনও চলতে থাকে; সেই আক্রমণ হোতে মানুষ বাঁচবে কি করে? স্বপ্নে ও নিদ্রায় আসক্তিগুলোর হাত হোতে মন রক্ষা পাবে কি করে?

লাটু মহারাজ— সেই আক্রমণের হাত হোতেও নাম মনকে আগ্‌লে

রাখতে পারে। সাঁচ বলছি, ঠিক ঠিক যদি নাম নিতে পারো তাহলে নামের শক্তি ঘুমের কালেও কাজ করতে থাকবে। যে নাম করতে জানে, সে নিদ্রা জাগরণ সুষুপ্তি সব অবস্থায় নাম জপতে থাকে। ঘুমের সময় দেহের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ যেমন চলতে থাকে, তেমনি মনের মধ্যে নামের কাজও চলতে থাকে। মনে স্বপ্ন উঠতে দেয় না, আর যদিই বা উঠে ত ঘুম থেকে সাধককে জাগিয়ে দিয়ে নামই রক্ষা করে। এমনি কোরে দিনে রেতে নামের শক্তি সাধককে বাঁচাতে থাকে।

যে ভক্তটির সহিত উক্ত কথাগুলি হইয়াছিল সেই ভক্তটি তাঁহার লিখিত নোটের একস্থানে লিখিয়াছেন (গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সমগ্র কথোপকথনটি প্রকাশিত হইল না):

"লাটু মহারাজ— ··· এতো সরল কথার মানে বুঝতে পারছো না। আরে! মনের মধ্যে কামকামনা ত নিত্যি বাসা বেঁধে রয়েছে। কখনো সেগুলো মনের সামনে ভেসে উঠছে, আবার কখনো এমন ডুবে থাকছে যে, ঐসব কামনা কখনো ছিল কিনা টের পাওয়া যাচ্ছে না। যত তাঁর কাছে এগুতে থাকবে তত কামকামনার গাঁট সব দেখতে পাবে। যত দেহমন শুদ্ধ পবিত্র হোতে থাকবে, তত ভিতরের গরদাগুলো— যা' হাজার হাজার জন্মের সংস্কারে গোপন ছিল, সেইগুলো বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে এসে নামের সাথে যুঝতে থাকবে। যে নামের তাপে তারা বেরিয়ে আসে, সেই নামের তাপে তারা মনের কিল্লা থেকে ভেগে যেতে বাধ্য হয়। নামের শক্তির কাছে তারা পারবে কেনো?"

অন্য আর এক স্থানে লিখিয়াছেন— "জানো! বাসনাগুলো ভারী সেয়ানা, সেগুলো শুধু মনকে দখল করে না, মনের হাতিয়ারগুলোকেও দখল করতে থাকে। (মনের হাতিয়ার হচ্ছে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)

তাই মনে বাসনা জাগলেই ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল হোয়ে আপন আপন বিষয়ের সন্ধানে ঘুরতে ফিরতে থাকে। চোখ চায় দেখবার লাগে, কান চায় শুনবার লাগে, জিভ চায় চাখবার লাগে, বলবার লাগে, নাক চায় শুঁখবার লাগে আর দেহ চায় চামের পরশ লাগে। হাত ভি চায় তার লাগে কাজ করতে, পা ভি চায় যেথানে তা' (সেই বিষয়) পাওয়া যায় সেথানকে যেতে। আর বাদ-বাকী সব ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ থাকে। সুযোগ-সুবিধা পেলে ত খনিকটা সুখ নিয়ে নিলে। আর মন কি করতে থাকে জানো?— সেইগুলো নিয়ে কলাপনা (কল্পনা) চালাতে থাকে। এই কলাপনা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সেই ত মানুষের মনকে লোভ দেখায়, সেই ত বলে— 'বিষয়ে ভারী সুখ আছে।' আর সেই সুখের লোভে মানুষ তার সব বিবেকবুদ্ধিকে হারাতে বসে। দেখো তো, এই কলাপনার জন্তে মানুষ কেমন বিষয়ের দিকে এগুতে থাকে। তাই ত বলি কামকামনাগুলোকে রুখতে চাও ত কলাপনা (কল্পনা) বন্ধ করো।"

জনৈক ভক্ত— কল্পনা বন্ধ করা যায় কি করে, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— জানো! মনের সঙ্গে বিষয়ের যোগ বন্ধ করলেই কলাপনাকে রুখে দিতে পারবে, বাকী নিস্তরঙ্গ করতে পারবে না। একটা বিষয় বুঝতে গেলে কতোগুলো জিনিস দরকার হয়, তা জানো? উনি বলতেন— 'তিনটে: জিনিস দরকার— বিষয়বস্তুর দরকার, ইন্দ্রিয়ের দরকার, আবার মনের দরকার।' এই তিনের মধ্যে একটা বাদ দিলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না। তাই এই তিনটের মধ্যে একটাকে রুখলে মনের কলাপনা বন্ধ হোয়ে যায়। বিষয়বস্তুকে রোখা বড় কঠিন। সে ত আসবে যাবে, তার সাথে মোলাকাত হরবকৎ হতে থাকে, সেথান থেকে পালিয়ে বেঁচে লাভ নেই। কেনো জানো? যতক্ষণ তাকে এড়িয়ে যাবে, ততক্ষণ তোমার

সংযম ঠিক ঠিক থাকবে, বাকী যেই সে সামনে এসে পড়বে, তার মায়ায় তুমি অমনি ভুলে যাবে। তাই তোমাদের বলি ইন্দ্রিয় বা মন এ দুটোর মধ্যে একটার মোড় ফিরিয়ে দাও। একটাকে যদি রুখতে পারো তা' হলে বিষয়ের সঙ্গে তোমার যোগ ঘটতে পারে না। তখন সবই থাকে বটে, বাকী তোমাদের ঘরে ভাশুর-ভাদ্দরবৌ-এর সম্বন্ধের মত থাকে। ভাদ্দরবৌ যেমন ভাশুরের সেবা করে—তার দরকারী জিনিস সব গুছিয়ে রাখে, বাকী ভাশুরের সঙ্গে সব সময়ে একটা আড়াল রেখে চলে ; তেমনি মনের আর বিষয়ের মধ্যে একটা আড়াল রেখে তোমরা চলতে থাকো। সেখানে আড়াল দিতে পারে একমাত্র বিচার। বাকী বিচার কি নিয়ে করবে? তাঁকে ধরেই বিচার করতে হয়। তিনি বিনা বিচার বড় শুকনো হোয়ে উঠে, তাই শুধু বিচার নিয়ে চলতে নাই।

সেই কথোপকথনের আর একটি স্থানে ভক্তটি লিখিয়াছেন— লাটু মহারাজ বলিতেছেন, "একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যায়, মনের সংকল্প-বিকল্প সব বন্ধ হোয়ে যায়। তখন আর কলাপনা করবার কেউ থাকে না। আরে! মন যে কোথায় থাকে তা ত কেউ জানে না। সংকল্প-বিকল্প-এর ঢেউগুলোতে বুঝতে পারা যায় যে মনের কাজ চল্‌ছে। মনে যখন ঢেউ থাকে না তখনই মন নিস্‌পিওর (লাটু মহারাজ নিস্‌পিওর বলিতে অধিকতম পবিত্র বুঝিতেন) হয়। সেই নিস্‌পিওর মনে ভগবানের শক্তি নামতে থাকে। তখন সৎবস্তুকে চেনা যায়।"

সেই ভক্তটির লিখিত নোট হইতে আরো এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাও লাটু মহারাজের উক্তি— "... তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'জীবে কামকাঞ্চনরূপ তেল লাগলে আর তাতে সাধন চলে না। ত্যাগ-বৈরাগ্যের

খড়ি লাগিয়ে তবে তাতে সাধন চালাতে হয়।' আরে! ত্যাগ-বৈরাগ্য কি সহজ কথা! মনকে কতো বুঝাতে হয়, কতো শিখাতে হয়, কতো নামজপ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়। নামজপ দিয়ে ঘিরে না রাখলে, নামে মন বসবে কেনো? দিনভোর বিষয় নিয়ে মেতে থাকো, আর দশ-পনের কি একঘণ্টা তাঁর নাম নাও। এমন করলে ত হবে না। দিনভোর তাঁর নামে মেতে থাকো, আর একঘণ্টা কি দুঘণ্টা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া কর। তা'হলে দেখবে বিষয়গুলো আর তোমাদের মনকে টানতে পারছে না। বাকী তোমরা বলবে এতো সময় দেবো কি করে?"

'কাম কামনা কিরূপে যায়?'—এইরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ অপর একটি ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "একখানা ঠাকুরের ছবি কাছে রেখে দেবে। কামকামনা এলেই সেখানাকে চোখের সামনে রাখবে। তা'হলে আর ইন্দ্রিয়গুলো এধার-ওধার যেতে পারবে না। সেই ছবি দেখতে দেখতে তোমার মনের কামকামনা সব চলে যাবে। জানো?"

অন্য আর একটি ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন— "মনের কামনা-বাসনা কি অমনি যায়? তাঁর (গুরু বা ইষ্টের) উপর মন থাকলে তবে ওগুলো যায়। তাঁতে (ইষ্টে না হয় গুরুতে) মন থাকাই হোলো প্রধান। যার তাঁতে মন থাকে, তার আর ভাবনা কি? আরে! তিনিই ত তোমার সদ্‌বুদ্ধি দিয়ে তোমার কামকামনার মোর ফিরিয়ে দেবেন। তাঁর উপর নির্ভর করো, তাঁতে বিশ্বাস রাখো, দেখবে তিনিই সব বুদ্ধি জুটিয়ে দেবেন। আন্তরিক যদি তাঁর শরণ নিতে পারো, তাহলে তোমার সব বখেরা তিনি তুরন্ত মিটিয়ে নিবেন। বাকী মন মুখ এক কোরে তাঁর শরণ নিতে হবে।

ভক্তটি— মহারাজ! যাকে দেখি নি, তাঁর উপর নির্ভর করি কি

করে? তাঁর শরণাগত হওয়ার কৌশল ত আমরা জানি না। শুধু হে ভগবান! আমায় দয়া কর, আমায় কৃপা কর—একথাগুলো বলে চুপ করে বসে থাকলেই কি তিনি আমাদের দয়া করবেন?

লাটু মহারাজ— আরে! তিনি ত হর্‌গরি দয়া করছেন। তাঁই দয়ায় ত তুমি বেঁচে আছো। আচ্ছা! তঁকে ত জানোনা বলছো, বাকী তাঁর নাম জানো তো। সেই নাম ধরে এগোও না। আরে! নাম জেনেই ত তোমরা আপিসে সাহেবের কাছে চিরকুট পাঠাও। চিরকুট পাঠালে তবে ত সাহেবের সাথে তোমাদের দেখা হয়। আউর চিরকুটে কি লিখে থাকো? হামায় তোমার কাজে লাগিয়ে নাও, তোমার কাজ পেলে হামি ভারি খুশী হব, তোমার সব কথা মানবো, তোমার সব কাজ করবো, যা' বলবে তা' শুনবো। বাকী এগুলো ত সব সাহেবকে দেখবার আগেই লিখে দাও। দাও ত?

ভক্তটি— হ্যাঁ, মহারাজ! সেই ভাবেই আমরা দরখাস্ত (application) পাঠাই।

লাটু মহারাজ— পাঠাও তো? ভগবানের কাছে তেমনি কোরে দরখাস্ত পাঠাও। বাকী এ দরখাস্ত (কাগজে) লিখে পাঠাতে হয় না; নিজের মনের পাতায় লিখে ভগবানকে জানাতে হয়। মনের পাতায় আগে নামের মুসাবিদা করতে হয়। নামের মুসাবিদায় ভুল হোলে সে চিঠি পৌঁছাবে না, জানো ত? তেমনি কোরে তুমি লিখতে থাকো— 'হে ভগবান! আপুনার নাম হামি যেন না ভুলি। হামি আপুনার শরণ নিলুম। হামায় আপুনার কাজে লাগিয়ে নিন, কাজে লাগিয়ে হামার সব বখেড়া মিটিয়ে দিন। সব সংশয় নাশ করুন। আপুনি হামার স্বামী, হামার গুরু, হামার বাপ্ মা সব কুছু। হামি আপুনার সন্তান। যাতে

হামার কল্যাণ হয়, হামায় সেই পথে আপুনি নিয়ে চলুন। হামায় দিয়ে আপুনার যা কাজ সব করিয়ে নিন। বাকী আপুনার মায়া দিয়ে হামায় ভুলাবেন না। প্রভু! হামি ত আপুনাকে দেখিনি, শুধু আপুনার নাম শুনেছি। হামায় দয়া করে আপুনার করে নিন।' এমনি ভাবে হর্‌রোজ বলতে হবে। বলতে বলতে তবে একদিন তাঁর নেক-নজরে পড়বে। তাঁর নজরে পড়লে আর কোনো ভাবনা নেই। তখন তিনিই তোমায় চালাবেন, কোন্ কাজ করতে হবে, না হবে সব বলে দেবেন।

আর একদিন অন্য একটি ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! অহঙ্কার না গেলে কাম্‌কামনা যায় না। আগে বিচার দিয়ে অহঙ্কারকে মুষ্‌ড়ে ফেলো। তাহলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে।"

জনৈক ভক্ত— কেমন করে অহঙ্কার যাবে, মহারাজ?"

লাটু মহারাজ— হামি বড়—এ ভাব থেকেই ত অহং জেগে উঠে। সেই হামিটাকে ছোট কোরে দেখতে থাকো। বড় মনে হোলেই ভাববে— আরে! হামার চেয়ে কত বড় বড় লোক রয়েছে, হামি ত সামান্য লোক। হামার কি খ্যেমতা? সংসারে হামি ত নিজের জোরে আসে নি। ভগবান ত দয়া কোরে হামায় এখানে এনেছেন। সংসারে ত তিনিই লাগিয়েছেন, তাঁর সংসারে হামি খাটছি। হামার মত পরাধীনের ত অহংকার সাজে না। এমনি কোরে বিচার করলে তবে অহং চলে যায়। জানো?

পরবর্ত্তী কালে যিনি এইভাবে তাঁহার ভক্তদের সব উপদেশ দিতেন, তিনি যে সাধন-জীবনে ঐগুলি প্রতিপালন করিয়া কামকামনা ও আসক্তি-জয়ে ইহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসিগণ নিজ নিজ সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ভক্তগণকে সাধন-ইঙ্গিতাদি দান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ

তাঁহারা নিজ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত সাধন-কথা বলেন না। সেইজন্য যদিও ঠাকুর পরমহংসদেব তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু (কেবল 'দিনেরেতে তাঁকে ভুলিস্ নি' এই কথাটুকু ব্যতীত) জানি না, তবুও উপরোক্ত সাধন-ইঙ্গিতগুলির আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে ভরসা পাই যে, তাপস-লাটু 'নামজপের' দ্বারা আপনার কামকামনাগুলিকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ও তাহাতে জয়ী হইয়াছিলেন।

লাটু মহারাজ নামকে ধরিয়াই আসক্তিজয়ের তপস্যা করিয়াছিলেন। নামকে ধরা সত্ত্বেও কামকামনাগুলি তাঁহাকে নানাভাবে বিরক্ত বা প্রলোভিত করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি প্রসঙ্গ শুনিয়াছি।

"জানো! একদিন ত দক্ষিণেশ্বরে হামায় আসক্তিগুলো এমন দিক্ করেছিলো যে, হামি ওনার কাছে গিয়ে তবে রক্ষে পেলুম। নাম করবো কি, সেদিন নামে মন বসলো না। ওনার কাছে যেতেই উনি ঠিক বুঝে নিলেন, বললেন— 'তা ও আসবে যাবে কিন্তু নামকে ছাড়িস্ নি।'"

আর একদিনের প্রসঙ্গ। সেদিনও তাপস-লাটুর বিচার ও বিবেকশক্তি আসক্তির তীক্ষ্ণ প্রলোভনে বারে বারে স্তব্ধ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। সেইকালে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গটি বুড়ো গোপাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়াছি —"আমাদের মধ্যে লাটু ছিল সবচেয়ে সরল। সে নিজের দৌর্ব্বল্যের কথা অকপটে বলতে পারতো। যে-সব কথা কেউ বলতে চায় না সেগুলোও লাটু তাঁর কাছে বলতে কুণ্ঠিত হোতো না। একদিন আসন থেকে উঠে লাটুর মন বড় খারাপ হোয়ে যায়। দেখি, লাটু কেবল কাঁদছে আর বিড়্ বিড়্ করছে, কি যে বলছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সেই সময় তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তখন লাটুর কান্না আরো বেড়ে গেলো।

ঠাকুর তাকে বললেন— 'ছ্যাখ! আরো গোপনে আসন করে বসবি। এমন জায়গায় আসন করবি, যেখানে মেয়েদের নজর পর্য্যন্ত যাবে না।'"

দক্ষিণেশ্বরে আর একবার তাপস-লাটু আসক্তির দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে এক অশরীরী বাণী রক্ষা করিয়াছিল। তিনি নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি— "জানো! ঠিক শুনলুম যেন কে হামায় বলছে— 'তুই না তাঁর সন্তান।' তখন মনে ভারী জোর এলো, মনের সব মোহ কোথায় যে ভেসে গেলো কি বলবো! তার অনেকক্ষণ পরে তিনি হাসতে হাসতে এসে হামায় বললেন— 'যাঃ শালা! আজ খুব বেঁচে গেলি।'"

লাটু মহারাজের সাধনজীবনে এইরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। বহুবার তিনি অশরীরী বাণী শুনিয়াছেন ও অশরীরী রূপ দেখিয়াছেন। সেইগুলি দক্ষিণেশ্বরের ব্যাপার নয় বলিয়া তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল না।

যাহা হউক, ঠাকুরের কথায় অটুট বিশ্বাস রাখিয়া লাটু অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আপন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিল। সাধারণে বীর্য্য-রক্ষা বা বিন্দুস্খলনরোধ-করণকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের মহান উদ্দেশ্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঠাকুর মাত্র এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিতে কাহাকেও উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। 'নিত্য ব্রহ্মশক্তির মধ্যে বাস করিতেছি'—এইরূপ বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের প্রধান সাধনা বলিয়াছেন। নামের শক্তিতে সেই বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই লাটু নিত্য নাম-স্মরণের দ্বারা আপনার ব্রহ্মচর্যব্রত রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

একদিন ব্রহ্মচারী লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুই কি ভাবিস্ বল্‌তো?' সেইদিন তিনি রাখাল মহারাজকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন। রাখাল মহারাজ আপনার কথা বলিতে বলিতে উত্তরকালে তাপস-লাটুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি বলিয়াছেন— "ঠাকুরের সেই কথা শুনে লাটু প্রথমে চুপ ক'রে ছিল। শেষে ঠাকুর যখন তাহাকে পুনরায় সেই প্রশ্ন করলেন তখন লাটু তাঁকে (ঠাকুরকে) জানিয়ে দিলে যে, সে শুধু ভগবানের নাম করে যায়। লাটুর কথায় তিনি বললেন— 'ওরে! শুধু নাম করলে কি হবে রে? নামের সঙ্গে সঙ্গে নামীর ধ্যান-ধারণা করবি।' "

কেমন করিয়া লাটু ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

এখন তাঁহার তাপস-জীবনের আরো কতকগুলি প্রসঙ্গ যাহা শুনিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। আহার নিদ্রা মৈথুন—এই ত্রিবিধ জৈব সংস্কারের আসক্তি হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাপস-লাটু যেরূপ কঠোরতা করিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবের কঠোরতা তাঁহাকে বরণ করিতে হইয়াছিল— আপনার অভিমান ও অহঙ্কারকে নিস্তেজ করিবার চেষ্টায়। অভিমান ও অহঙ্কার আধ্যাত্মিক সাধনার পরম শত্রু। (মনে হয়, জৈব সংস্কারগুলিও তত বড় শত্রু নয়) সেই অভিমান ও অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন।

একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন— 'ওরে! ভিক্ষার অন্নে অভিমান ও অহঙ্কার দূর হয়।' ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া লাটুর মনে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প জাগিতে থাকে। অনেক দিন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ঠাকুরের আদেশ লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হয়, কিন্তু কি জানি কেন, ঠাকুরের নিকট সেই কথা বলিতে লাটু সাহস পাইত না। অবশেষে একদিন লাটুকে ঠাকুর নিজেই ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে

ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া লাটু মধ্যাহ্নের পরে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রচুর ভিক্ষান্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন— 'তোর যতটা দরকার ততটা আনবি। বেশী আনবি কেন? ভিক্ষান্ন সঞ্চয় করতে নেই।'

আর একদিনের কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি— "একদিন হামাকে আর রাখাল বাবুকে ঠাকুর ভিক্ষা করতে বললেন। যাবার সময় ঠাকুর (যেমন রোজ বলতেন) বলে দিলেন— কেউ গালি দেবে, কেউ আশীর্ব্বাদ করবে, কেউ পয়সা দেবে—তোরা সব নিবি। প্রথম একজন হামাদের ভিক্ষা করতে দেখে তেড়ে এসেছিলো। বললে—'এমন ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে, আবার ভিক্ষে করছো? কাজ কোরে খেতে পারো না?' রাখাল বাবু তাড়া খেয়ে মুষড়ে পড়লেন। হামি যত বলি ঠাকুর ত আগেই এ সব কথা বলে দিয়েছেন, হামাদের ত সব নিতে বলেছেন, রাখাল বাবু তত লজ্জা পান। শেষে বললুম— 'ভয় পাচ্ছেন কেনো? চলুন অন্য বাড়ী যাই।' তারপর একজন বিধবার বাড়ীতে ভিক্ষে করতে যাই। সেই স্ত্রীলোকটি বললে— 'তোমরা কি দুঃখে ভিক্ষে করছো, বাবা? তোমাদের অভাব কি?' তাকে তখন সব বললুম। তখন সে খুব খুশী হোয়ে একটা সিকি দিলে আর সূর্য্যনারায়ণের দিকে চেয়ে খুব আশীর্ব্বাদ করলে—'তোমরা যে জন্যে বেরিয়েছো, ভগবান তোমাদের আশা পূরণ করুন।' তারপর আউর অনেকের বাড়ী যাই। তানারা সব চাল পয়সা দিলে। সেগুলো এনে তাঁর (ঠাকুরের) কাছে দিলুম। ঠাকুর জিগ্গেস করলেন— 'আজ কেমন কোরে ভিক্ষা করলি বল্?' তাঁকে তখন সব বললুম। ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন— 'ও ঠিক বলেছে। ত্যাখ! ইখানকার সঙ্গে সূর্য্যনারায়ণের যোগ আছে।' "

একদিন জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'মহারাজ! ভিক্ষার

অন্নকে ঠাকুর এত পবিত্র বলতেন কেন ? যে খেটে খায় আর যে ভিক্ষে করে খায় তাদের মধ্যে কে শুদ্ধতর অন্ন গ্রহণ করে—বলুন না, মহারাজ ?'

লাটু মহারাজ— আরে ! যে খেটে খায়, সে যদি কারুর দাসত্ব না করে তাহলে সেই অন্ন খুবই শুদ্ধ। তারপর ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ জানবে। চাকুরীর চেয়ে ভিক্ষা করে খাওয়া ভালো। কেনো না, চাকুরী করলে পরের ইচ্ছায় কাজ করতে হয়। ভিক্ষা করলে নিজের স্বাধীনতা থাকে। স্বাধীন পেশা সব্‌সে আচ্ছা। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ কেনো, জানো ? এক দফা— যে ভিক্ষা দেয় তার ত পূণ্য হয় ; আর একদফা— যে ভিক্ষে নেয়, সে ত নিজের মান অপমান লোকলজ্জা সব ত্যাগ করবার শিক্ষা পায়। তাই ত তিনি মাধুকরীর অন্নকে সাধন-ভজনের সহায় বলতেন।

এই কথা শুনিয়া সেই ভক্তটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "মহারাজ ! মাধুকরী আর ভিক্ষা কি এক কথা ?"

লাটু মহারাজ— মাধুকরী কি জানো ? মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে বসে একটু একটু কোরে মধু খেয়ে পেট ভরায়, ঠিক তেমনি সাধু বাড়ী বাড়ী গিয়ে এক এক মুটো অন্ন সংগ্রহ কোরে শরীরধারণ করে। লোকে নানান্ কামনা কোরে সাধুকে ভিক্ষা দেয়, জানো তো ? যে যেমন (পরিমাণ) দেয়, তার সঙ্গে ততখানি কামনা মিশানো থাকে। সাধু এজন্য কারোর কাছ থেকে এক মুটোর বেশী নেয় না। এক মুটো দেবে, তাতে আর কতো কামনা করবে ! সেটুকু কামনাতে সাধন-ভজনের ক্ষতি হয় না। বাকী বেশী নিলে বেশী কামনা থাকে, তাতে সাধকের ক্ষতি হোতে পারে। সেইজন্য মাধুকরীর অন্ন বড় শুদ্ধ অন্ন, সাধনার পক্ষে অনুকূল।

সেই ভক্তটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'মহারাজ ! ঠাকুর

আপনাদের যখন মাধুকরীতে পাঠাতেন তখন আপনাদের মন সাধন-ভজন থেকে নেমে পড়্‌তো না ?'

লাটু মহারাজ— আরে ! মাধুকরী ত একটা সাধন-অঙ্গ। সেটা কি সাধনা থেকে আলাদা ? ভিক্ষার সময় কতো লোক কতো ছোটবড় কথা বলে, তাতে যে-সাধু তার মনমেজাজ ঠিক রাখতে পারে, তার ভিতর-কার রাগ, দ্বেষ, বিরক্তিকে প্রকাশ হোতে দেয় না, সে ত অনেক দূর এগিয়ে গেলো ! ভিক্ষা করা একটা শিক্ষা জানবে। যতক্ষণ মান-অভিমান থাকে, ততক্ষণ ভিক্ষা করতে কেউ পারে না। সেই জন্যেই ত শাস্ত্রে সন্ন্যাসীদের শরীররক্ষার্থে মুষ্টিভিক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে। সাধুর ভিক্ষা করা একটা তপস্যা জানবে। যে-সাধু নারায়ণের দয়া ভেবে ভিক্ষা নেয় আর যে দাতা নারায়ণজ্ঞানে ভিক্ষা দেয়, দু'জনেরই কল্যাণ হয় জানবে। সাধু ভগবানের উপর নির্ভর করতে শেখে। সেই নির্ভরতা আনবার জন্যই ত ঠাকুর আমাদের ভিক্ষা করতে পাঠাতেন।

ভক্তটি— মহারাজ ! ভগবানের উপর নির্ভর করার আরো ত অন্য পথ আছে ?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ ! আছে। বাকী ভিক্ষায় সে নির্ভরতা আরো বাড়তে থাকে। কেনো জানো ?— নিজের চেষ্টায় কারুর ত আর ভিক্ষা মিলে না, দাতার দয়া হোলো তবে তার ভিক্ষা মিলে। দাতার দয়া কি আপ্‌সে হয় ? তিনি (ভগবান) যদি সন্তুষ্ট হন তবে দাতার দান করার ইচ্ছা জাগে। এমন কি, দাতা গরীব হোলেও সেখান হোতে কুছু না কুছু দান মিলে। আর তিনি (ভগবান) সন্তুষ্ট না হোলে, ধনীর ঘরেও ভিক্ষা মিলে না।

ভিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি প্রসঙ্গ শুনিয়াছি। একদিন ভিক্ষাকালে

লাটুর ব্রহ্মচারিবেশ দেখিয়া কতিপয় যুবক তাচ্ছিল্য সহকারে বলিয়াছিল—'এই গ্যাখ্ রে। পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এরা পরে সব সন্ন্যাসী হোয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবে। এখানে কেন বাবা! জপতপ করবে ত হিমালয়ে যাও না। কলকাতায় ঘুরলে কি আর জপ-তপ হয়?' এই কথাগুলি ঠাকুরের নিকট বলায়, তিনি সে দিন ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে হিমালয়ের মাহাত্ম্যকথা বলিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে আরো কতকগুলি তীর্থবিশেষের নাম করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া জপ-ধ্যান করিলে সহজে সিদ্ধিলাভ করা যয়ে। স্থান-মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া লাটুর তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জাগিতে থাকে।

বহু দিন এই ইচ্ছা লাটু নিজের মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। কোন দিন কাহাকেও ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। তত্রাচ অন্তর্য্যামী ঠাকুর তাহা জানিতে পারিলেন। "এক দিন হাম্‌নে যখন তাঁর পা টিপছে তখন তিনি (ঠাকুর) হামার মনের কথা ধরে ফেললেন। বললেন—'ওরে! ইখানকার (দক্ষিণেশ্বরের) এমন প্রসাদী অন্ন ছেড়ে কোথায় যাবি? মন উচাটন করিস নি, বাহিরে গেলে খাওয়ার কত কষ্ট জানিস্ ত? কোথায় ঘোরাঘুরি করবি? একান্তই যদি কোথাও যেতে চাস্, তা যা না কলকাতায়— রামের ওখানে।' তাঁর কথা শুনে হামি ত কলকাতায় এলুম। বাকী কলকাতা ভালো লাগলো না। ওনার কাছে যেমন স্বাধীন থাকতে পেতুম, কলকাতায় তেমনটি ত আর পেতুম না। তাই দু-চার দিন পরেই ওখানকে ফিরে গেলুম।"

দিন কতক পরে পুনরায় লাটুর মনে তীর্থগমনের বাসনা বলবতী হইয়াছিল। ঠাকুর তাই একদিন হাসতে হাসতে বললেন—'ওরে! অনেক দিন ইথানে আছিস্, একবার ঘুরে আয় না।' এইরূপ অযাচিত

অনুমতি পাইয়া লাটু নিজেকে বড় ধন্য মনে করিয়াছিল। কিন্তু কোথায় যে যাইবে তাহা নিজে ঠিক করিতে পারিল না। শেষে ঠাকুরকে বললেন —'হামাকে কুথায় যেতে বলেন?'

ঠাকুর— দিন কতকের জন্য বাবুরামের ওখানে (অর্থাৎ আঁটপুরে) যা না। সেখানে বাবুরাম রয়েছে, তোকে কোন কিছু ভাবতে হবে না।

ঠাকুরের আদেশমত লাটু সেইবারে আঁটপুরে গিয়াছিল। আঁটপুরে লাটু দিন দশ-বার ছিল। সেই সময়ের ঘটনা আমরা বাবুরাম মহারাজের মুখে যেভাবে শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি।— "জানো! লাটু যখন প্রথমবার আমাদের ওখানে গিয়েছিল তখন প্রত্যহ বলতো— 'হামার আর ইখানে ভাল লাগছে না।' মা প্রথম প্রথম মনে করতেন, বুঝি কোনকিছুর অসুবিধা হচ্ছে। তাই রোজ আমাকে বলতেন— 'ওরে! জিগ্‌গেস কর না কি অসুবিধা হচ্ছে?' আমি ত বুঝতুম লাটুর কেন ভাল লাগছে না। সেখানে যে ঠাকুর ছিলেন না। লাটুর মত সেবক ঠাকুরকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন? একদিন ত সেখানে সে কেঁদেই ফেললে, বললে— 'হামি কালই দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবো।' লাটুর কান্না দেখে মা তাকে কলকাতায় আসতে বাধা দিলেন না।"

লাটু দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি রে! এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে?'

লাটু বিনীতভাবে উত্তর দিল— 'ওখানে থাকতে মন টিকলো না।'

ঠাকুর— কেন রে! সেখানটা ত বেশ জায়গা, তার উপর বাবুরামের মা বেশ ভক্তিমতী— সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করতে খুব ভালবাসে! এমন স্থানও তোর ভাল লাগ্‌লো না?

লাটু— কি জানি? সেখানে আপুনার জন্য বড্ড মন কেমন

করতো। কিছুতেই নামজপে মন বসাতে পারতুম না। সব যেন ফাঁকা মনে হোতো।

ঠাকুর যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন—'এমন কথাও ত শুনি নি। ওখানে মন বসে না, এখানে মন বসে—এসব কি কথা রে? ভগবান কি এইখানেই আছেন আর ওখানে নেই? ভগবানের নাম নিবি, তার আবার এখান-ওখান কি? যেখানে বসবি, সেইখানেই মন ডুবে যাবে— তবে ত জানবি, জপধ্যানে ঠিক ঠিক আঁট এসেছে।'

লাটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল— 'সেখানে আপুনি ছিলেন না।'

ঠাকুর— আমি না থাকলে আর তোর মন বসবে না— এসব কি বলছিস্? হ্যাঁরে! আমি কি তোর সঙ্গে চিরকাল থাক্‌বো?

লাটু কাঁদকাঁদ হইয়া বলিয়া গেল— 'আপুনাকে ছাড়া হামার জীবন বিল্‌কুল নষ্ট হোয়ে যাবে। আপুনি হামায় এমন কোরে নিন যাতে চিরকাল আপুনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'শালার আব্দার কতো!'

লাটু কাঁদিয়া ফেলিল। লাটুকে কাঁদিতে দেখিয়া ঠাকুর সস্নেহে বলিতে লাগিলেন— 'ওরে! একটুতেই এত উতলা হোলে চলে না।' এই কথাগুলি রামলাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়াছি।

কেন যে ঠাকুর লাটুকে আঁটপুরে পাঠাইলেন তাহা তিনিই জানেন। তবে আমাদের মনে হয় যে, ঠাকুর আপন সেবককে এইভাবে পরীক্ষা করিয়া একটি কথা জ্ঞাত করাইতে চাহিয়াছিলেন। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, ঠাকুর লাটুকে যাহা জানাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা ত তাহাকে মুখে বলিলেই পারিতেন। নিজের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া সেই কথা জানাইলেন কেন? এ সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বেশ একটি যুক্তি

দিয়াছিলেন— 'গুরু শিষ্যকে অমনি (অর্থাৎ বিনা কঠোরতায়) কৃপা করেন না। চারধাম ঘুরিয়ে তবে চেলাকে কৃপা করেন। কেনো জানো? চারধাম ঘুরে এলে তবে গুরুর মহিমা বুঝতে পারা যায়। গুরু যে শিষ্যকে কেমন ভালবাসেন, কতটা স্নেহ করেন, সে সব সদ্‌গুরুর কাছে থেকে তত বুঝা যায় না। গুরুর কাছ থেকে সরে এলে বুঝতে পারা যায় গুরু কেমন ভালবাসা দিয়ে শিষ্যকে বেঁধে রাখেন। তখন বুঝতে পারা যায় গুরুকৃপার শক্তি কতো! গুরু কৃপা করলে জগতে যা হোবার নয়, তাই হয়। নানা তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে যখন চেলাদের মনে 'সর্ব্বতীর্থময়ো গুরুঃ' এই তত্ত্বের জ্ঞান হয়, তখন চেলারা গুরুর উপর নিঃসংশয় হোয়ে থাকে, তার আগে গুরুতে সন্দেহ যায় না, গুরু যে অতো আপনার তা' বোঝা যায় না! গুরুতে নিঃসংশয় হোলে, তবে তাঁর উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি পাকা হয়।'

অনেকের ধারণা গুরু বুঝি শিষ্যকে বিনা পরীক্ষায় সাধনবীজ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সদ্‌গুরুই তাহা করেন না। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহারা শিষ্যকে সাধনবীজ দিয়া কৃপা করেন। সাধনবীজ প্রদান করিয়াও গুরু শিষ্যের নিষ্ঠা ও তপস্যা দেখিতে থাকেন। যে শিষ্য গুরুবাক্যে নিষ্ঠা রাখিয়া ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা তাঁহাতে যুক্ত হয়, তাহাকেই গুরু উচ্চতর সাধনাঙ্গের সন্ধান দিয়া কৃপা করেন; আর যে শিষ্য সাধনবীজ পাইয়াও বীজকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে চেষ্টা না করে, তাহাকে গুরু উচ্চতর সাধনতত্ত্বের সন্ধান দেন না। গুরুকৃপা সাধকের সাধনপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। 'শিষ্য যদি সাধনপথে একপোওয়া পথ অগ্রসর হয়, গুরু কৃপা কোরে (তদতিরিক্ত) আরো একপোওয়া সমুখ-পথের সন্ধান দিয়ে দেন।'— এই

ভাবের একটি কথা লাটু মহারাজ বলিতেন। আরো বলিতেন যে, গুরু পথের সন্ধান দিয়াই চুপ করিয়া থাকেন। শিষ্যকে আপন সাধনার দ্বারা সেই পথের বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। যে শিষ্য নিজে না খাটিয়া গুরুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তাহাকে বহুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, কোন সদ্‌গুরুই শিষ্যের কর্ম্মহীন গুরুমুখাপেক্ষিতার সমর্থন করেন না, এমন কি, তাহার প্রশ্রয়ও দেন না। সদ্‌গুরু চাহেন—শিষ্য কর্ম্মী হউক, নিজের সাধনবলে উন্নতিলাভ করুক, নিজের তপস্যায় সাধ্যতত্ত্বে পৌঁছাক। কিন্তু সৎশিষ্যগণ চাহেন গুরুকে ধরিয়াই সাধনপথে অগ্রসর হইতে এবং তাঁহাকেই ইষ্ট করিয়া সাধ্যতত্ত্বে পৌঁছিতে। সেইজন্য সাধনকালে সৎশিষ্য ও সৎগুরুতে বেশ একটি প্রেমের খেলা চলিতে থাকে। যেখানে শিষ্য চায় গুরুকে ধরিতে, সেখানে গুরু চায় শিষ্যকে ইষ্ট ধরাইতে। উভয়ের এই লুকোচুরি প্রেমের খেলায় শিষ্য হইয়া উঠে গুরুময়, আর গুরু হইয়া উঠেন ইষ্টময়— যে ইষ্ট শিষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী রূপ গ্রহণ করিয়া শিষ্যের নিকট আবির্ভূত হন। তৎকালে শিষ্য অন্তরে-বাহিরে গুরুর ধ্যানে ভরপূর থাকে! কিছুতেই গুরুর অদর্শন বা বিরহ সহ্য করিতে পারে না। অথচ গুরু সেই কালে তাহাকে দূরে দূরে রাখিয়া থাকেন। এ-হেন সময় শিষ্যের পক্ষে বড় মর্ম্মদায়ক।

যে সময়ে তাপস-লাটুর মানসিক অবস্থা ঐরূপ গুরুনির্ভরশীল, সেই সময়েই তিনি তাঁহাকে আঁটপুরে পাঠাইয়া দেন। আঁটপুরে আসিয়া লাটু নিজের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাপস-লাটু তখন গুরুগত-প্রাণ; গুরুবিরহ সহ্য করিবার মত মানসিক দৃঢ়তায় তখনও তাঁহার স্থিতিলাভ হয় নাই। তাই ঠাকুরকে ছাড়িয়া থাকিতে লাটুর অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। অথচ ঠাকুর তাঁহাকে সেই শিক্ষাই দিতে চাহেন। তিনি

যে মহাগুরু। তাই মহাগুরুর মত তিনি চাহিলেন যে, তাঁহার সেবক লাটু ভগবানলাভ করুক, ভগবানের ঈশ্বরত্ব দেখুক, মানুক এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হউক। ঠাকুরের শুভ আশীর্ব্বাদ লাটু বুঝিতে পারে নাই।

আঁটপুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর সেবক-লাটু যখন দেখিল যে, ঠাকুর আর তাহাকে কোন সেবার কার্য্য করিতে বলেন না, তখন সে মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া নির্জনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিল। জনৈক ভক্তের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সেই সংবাদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

'বাবুরামের দেশ হোতে আসবার পর হামার মনে হোতো যেন ঠাকুর হামায় দূরে দূরে রাখছেন। তখন তিনি হামায় আর কোন কাজ করতে বলতেন না। এমন কি, হামায় কোন উপদেশ দিতেন না। হামার যা কুছু কাজ সব যোগীন, বাবুরাম ওদের করতে বলতেন। তখন তিনি এমন ছাড়ো ছাড়ো ভাব দেখাতেন। তখন আর কি করি— কেবল মনে মনে তাঁকে ডাকতুম, বলতুম হামায় দূরে রাখবেন না, আরো কাছে টেনে নিন। এমনভাবে যে কতোদিন কেটেছে! শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন মাকে হামার দুঃখ জানালুম। মা হামায় আশ্বাস দিলেন। মার দয়া কি ভুলতে পারি? তিনিই ত হামায় তাঁর কৃপা পাইয়ে দিলেন।' পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই কৃপাপ্রসঙ্গটি বলা হইয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর হইতে তাপস-লাটু প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঠাকুরের মুখদর্শন করিয়া তবে ঘর হইতে বাহির হইত। প্রতিদিন প্রভাতে ঠাকুরকে স্মরণ-মনন ও প্রণাম না করিয়া লাটু দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিত না। একদিন কোন কারণে ঠাকুরকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া তাপস-লাটু সেই ঘর হইতে চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল— 'আপুনি

কুথায়?' লাটুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠাকুর বললেন, 'যাচ্ছি রে, যাচ্ছি।' যতক্ষণ ঠাকুর ঘরে না আসিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত লাটু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। ঠাকুর ঘরে আসিলে লাটু চোখ খুলিল এবং তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রণাম করিল।

আর একবার এইরূপ একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি। সেদিনও ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া লাটু চীৎকার করিতেছিল। সেদিন ঠাকুর তাহাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় আসিয়া লাটু তাঁহাকে ফুলের বাগানে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল— 'ওখানে কি খুঁজ্ছেন. মশায়?'

ঠাকুর— ওরে! কাল যে চটিজুতো-জোরা···এনে দিলে, তার এক পাটী রয়েছে, আর এক পাটী বোধ হয় শেয়ালে নিয়ে গেছে। দেখছি, এখানে এনেছে কি না!

ঠাকুর জুতা খুঁজিতেছেন শুনিয়া লাটু শিহরিয়া উঠিল, বলিল— 'চলে আসুন, মশায়! আর আপুনাকে খুঁজ্তে হবে না!'

ঠাকুর (সেইখান হইতেই)— তাইত রে! নোতুন জুতাজোড়াটি তোর ভোগে হোল না। কাল সবে এনে দিলে, মাত্র একবার পায়ে দিয়েছিস্।

এই কথা শুনিয়া লাটু উদ্বিগ্নস্বরে বলিয়া উঠিল— 'আপুনি চলে আসুন, মশায়! এতে যে হামার অকল্যাণ হবে। আপুনাকে ওসব খুঁজতে নেই— আজ দেখছি, সারা দিনটা হামার বিল্‌কুল্ খারাপ যাবে।'

তাহার কথা শুনিয়া ঠাকুর শুধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'দিন কি ওতে খারাপ যায় রে? যে দিন ভগবানের নাম হয় না সেইদিনই খারাপ যায়।'

দক্ষিণেশ্বরে সেবক-লাটু প্রতিদিন প্রভাতে ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম

করিয়া তবে তাহার দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিত। যেদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিত না, সেদিন অতি প্রত্যুষেই আপন ঠাকুরকে মনে মনে স্মরণ ও প্রণাম জানাইত। তারপর শৌচাদি সমাপন করিয়া তাপস-লাটু নহবতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে যাইত ও তাঁহার ফাইফরমাজগুলি শুনিয়া লইত। প্রায় প্রত্যহই মায়ের জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিত। মায়ের কার্য্য একদফা সারিয়া লাটু দক্ষিণেশ্বরে প্রথম প্রথম হনুমন্ত সিংহের আখড়ায় কুস্তি করিতে যাইত। পরে ঠাকুরের আদেশে কুস্তি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শেষাশেষি সকালবেলায় জপে বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যখনই অবসর পাইত তখনই নির্জনে নিঃসঙ্গ হইয়া নাম করিতে বা ভজনগানের দু-এক কলি গাহিতে থাকিত। তাঁহার মনোমত দুইখানি ভজনগান আমরা জানি—"মনুয়ারে! সীতারাম ভজন কর লিজীয়ে। ভুখে অন্ন, প্যাসে পানি, নাঙ্গা বস্ত্র দিজীয়ে।" আর একখানি—"রামনাম সুখধাম ভজলে মনুয়া।" যেদিন তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইত, সেদিন পথ চলিতে চলিতে নাম ও গান চলিতে থাকিত। তারপর পূর্ব্বাহ্ণে স্নানের জল তুলিয়া ঠাকুরকে তেল মাখাইতে বসিত। ঠাকুরকে স্নান করাইয়া লাটু নিজে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত। স্নানান্তে (শিব, বিষ্ণু ও কালী) মন্দিরের দেবদেবীগণকে প্রণাম করিয়া ও মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া তবে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিত। আহারের পূর্ব্বে পুনরায় জপধ্যান করিতে বসিত। আহারান্তে ঠাকুরকে ব্যজন করিত এবং যতক্ষণ না ঠাকুর তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বলিতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত লাটু সেই ঘরে অপেক্ষা করিত। মধ্যাহ্নের পর প্রায়ই ঠাকুর তাঁহাকে শিবমন্দিরে বা গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া দিতেন। সেইখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া লাটু অপরাহ্ণের দিকে ঘুমাইয়া লইত। অধিকাংশ দিনই লাটুকে সেইকারণে ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যাইত না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে

লাটু পুনরায় নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইত। সেখান হইতে ছুটি পাইলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিত। সন্ধ্যায় দেবদেবীর আরতি দেখিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া (শেষের ক' বছর) কীর্ত্তন করিতে থাকিত। কোন কোন দিন ঠাকুরের ঘরে কীর্ত্তন করিত। রাতে আহারাদির পর ঠাকুরের পদসেবা করিত। গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস করিত। ঠাকুর নিদ্রিত হইলে কিম্বা যাইতে বলিলে তবে সেই ঘর ত্যাগ করিত।

ঠাকুর যেদিন তাঁহাকে রাত্রিকালীন জপধ্যান করিতে আদেশ করিতেন, লাটু সেইদিন সেইখানে বসিয়া রাত কাটাইয়া দিত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনরায় ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাঁহার আদেশমত কোন কোন দিন উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে থাকিত। এইভাবে লাটু দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার তাপস-জীবনের দিনগুলি কাটাইয়াছিল।

সাধক-জীবন

সাধক-লাটুর ধ্যানধারণা, ধ্যেয় কে, ঠাকুরের সাধনইঙ্গিত, ঠাকুরের সমাধিমূর্ত্তিতে লাটুর ধ্যান, ভক্তপ্রসঙ্গে, গুরু ও ইষ্ট অভেদ, কীর্ত্তনানন্দে লাটু, খোকা মহারাজের কথিত প্রসঙ্গ, দিব্য সঙ্কেত, সঙ্কেতে লাটুর ব্যাকুলতা, রাখাল মহারাজ-কথিত একটি প্রসঙ্গ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গদর্শন ও রামলাল দাদা-কথিত প্রসঙ্গ, যোগীন মহারাজ-কথিত লাটুর বর-কামনা-প্রসঙ্গ, ধ্যানে জ্যোতিঃঘনমূর্ত্তির আবির্ভাব, বুড়ো গোপাল দাদার কথিত প্রসঙ্গ—লেটোকে বুঝি জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মাতৃমূর্ত্তিদর্শনে লাটুর ভাবাবেশ ও ঠাকুরের হাঁটু দিয়ে বুকডলার কথা, ইষ্টদর্শনের পর বিভিন্ন দেবদেবীর ধ্যানে দর্শনপ্রাপ্তি, যোগমায়ার বিভূতিদর্শনে লাটুর হৃদ্কম্প ও ঠাকুরের অভয়দান, বেলতলা যোগনিদ্রাভিভূত লাটু ও কুকুর-বেশী ভৈরব কর্ত্তৃক লাটুর দেহরক্ষা, লাটুর লীন অবস্থা, যদু মল্লিকের বাগানে কলাপাতা-কাটা-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লাটুর তপস্যার কথা বলা হইয়াছে। সেই সূত্রে বলিয়াছি যে, ঠাকুর তাঁহাকে নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান-ধারণা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া যে নামীর ধ্যান-ধারণা করিতে হয় তাহা ঠাকুর নিশ্চয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ঠাকুরের সেই অমূল্য উপদেশগুলি পাই নাই। কারণ লাটু মহারাজ নিজে বা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রকাশ করেন নাই। সাধক-লাটুর ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে যতটুকু আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই প্রসঙ্গ ও কথোপকথন হইতে সংগৃহীত।

ধ্যানধারণাকালে সাধারণতঃ যে প্রশ্নগুলি সাধক-মনে উদিত হয় তাহাদের মধ্যে 'ধ্যেয় কে' এই প্রশ্নই প্রধান। বলরাম মন্দিরে জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে ঠিক এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'ধ্যেয় একমাত্র ভগবান। ভগবান ছাড়া আবার কার

ধ্যান-ধারণা করবে? যাকে ধরেই এগোও না কেন, শেষে তাঁরই কাছে গিয়ে পৌঁছিবে।'

তাহাতে ঐ ভক্তটি প্রশ্ন করিয়াছিল—"শিব, কালী, বিষ্ণু—যে মূর্ত্তিরই ধ্যান করি না কেন, শেষে সেই একই ভগবানে গিয়ে পৌঁছিব। মহারাজ! একথাগুলি শুনতে কেমন একটু খট্‌কা লাগে না?"

লাটু মহারাজ—দেখো! ওনাকে (ঠাকুরকে) এরকম সব জিগ্‌গেস করতো। উনি ত একজনকে বলেছিলেন—'তোমার যে মূর্ত্তি ভাল লাগবে, তাঁরই ধ্যান করবে। সব মূর্ত্তি তাঁরই মূর্ত্তি; ভাব-ভেদে মূর্ত্তিভেদ। কারোর উপর বিদ্বেষ রাখতে মানা করতেন। শিব কালী হরি— সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলতেন।'

ভক্ত— মহারাজ! দেবদেবীরা না হয় ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, কিন্তু গুরুও কি তাই? পার্থিব গুরু ত মানুষ, তাঁর ধ্যানেও কি ভগবানে পৌঁছান যায়?

লাটু মহারাজ— যায় বই কি? তোমরা ভাবো গুরু বুঝি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। বাকী তা নয়। গুরু— সচ্চিদানন্দ। যে ভগবানকে দেখেছে সেই ঠিক ঠিক গুরু হতে পারে। বাদবাকী আস্‌লি গুরু নয়। আস্‌লি গুরুর মন সব সময়ে তাঁতেই যুক্ত থাকে, জানবে। তাই, তাঁর (ভগবানের) সঙ্গে আস্‌লি গুরুর কোন ভেদ থাকে না। শাস্ত্রে তাই লিখা আছে— 'গুরু ব্রহ্ম এক।'

ভক্ত— যে সাধক আস্‌লি গুরু ধরতে পারে না, তার কি হয়, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— আরে! তারও ভগবানলাভ হয়, বাকী দেরীতে হয়। (আস্‌লি গুরু না হোলেও) গুরুবাক্য ছাড়তে নেই। গুরুতে (লোকে

যাই বলুক না কেন) কথনও সংশয় করতে নেই। কারণ, গুরুতে সংশয় করলে গুরুর গুরুর সন্ধান মিলে না। গুরু যদি তেমন উপযুক্ত নাও হয় (কিন্তু শিষ্যের যদি ভগবান পাবার ঠিক ঠিক আগ্রহ থাকে) তাহলে গুরুর গুরু যে একজন আছেন তিনিই (অর্থাৎ ভগবান) সাধকের আন্তরিক চেষ্টা দেখে তারই অন্তরে বসে সব নির্দ্দেশ দিতে থাকেন।

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া ভক্তটি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে যে-কোন গুরুকে অবলম্বন কোরেই ভগবান পাওয়া যায়, কি বলেন ?'

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ, পাওয়া যায়। বাকী তেমন তেমন ক্ষেত্রে সাধককেই বেশী খাটতে হয়। কাঁচা-গুরুর পাল্লায় পড়লে সাধককে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়। উনি বলতেন— 'গুরু কাঁচা হোলে, গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা।' বাকী গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক নিষ্ঠা থাকলে, একদিন না একদিন তাতেই ভগবানলাভ হয়ে যায়। কেনো জানে ?— গুরু যে মন্ত্র দেন সে ত তাঁকেই (ভগবানকে) উদ্দেশ করে দেন। তাই মন্ত্র বা নামে কোন দোষ হয় না ; গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন করলে বস্তুলাভ হবেই।

ভক্ত— মন্ত্রের ধ্যানেও বস্তুলাভ হয় ? আচ্ছা ! অনেকে যে গুরুমন্ত্রের ধ্যান না কোরে গুরু-মূর্ত্তির ধ্যান করে— তাদের কি হয়, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— গুরুমূর্ত্তির ধ্যানেও ভগবানলাভ হয়। বাকী গুরুর যে-সে মূর্ত্তি নিতে নেই— গুরু যখন তাঁতে (ভগবানে) যুক্ত হন, তেমন মূর্ত্তির ধ্যান করতে হয়।

ভক্ত— কেন, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— আরে ! তখন যে (অর্থাৎ ধ্যানকালে) গুরুর ভিতর তাঁর (ভগবানের) আবির্ভাব হয়। সেই টানের টানে সাধকেরও উন্নতি

হোয়ে যায়। তাইত তিনি হামাদের বলতেন—'ত্যাখ! ধ্যান করতে বসবার আগে ইথান্‌কে (আপনার বুকে আঙ্গুল দিয়া) একবার ভেবে নিবি। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।'

মনে হয়, ঠাকুরের নিকট হইতে সাধক-লাটু ধ্যেয় সম্বন্ধে এইরূপ একটি ইঙ্গিত পাইয়াছিল। লাটুর মতন নিরক্ষর ভাবপ্রবণ সাধক গুরুমূর্ত্তিকেই ধ্যেয় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা এতাবৎ শুনি নাই যে, লাটুকে ঠাকুর অপর কোন ইষ্টমন্ত্র দিয়াছেন। অধিকন্তু নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে অনুমান হয় যে, সাধক-লাটু ঠাকুরের সমাধিমূর্ত্তিখানি মানসপটে অঙ্কিত রাখিয়া সাধনায় বসিতেন।

একদিন রাখাল মহারাজের কোন এক শিষ্যকে তিনি বললেন—"দেখ! এক একদিন মনটা এমন থাকে যে, যা' দেখা যায় তা' চট্ কোরে মনের মধ্যে বসে যায়। হাম্‌নে ত এতবার ঠাকুরের সমাধি দেখেছে, বাকী এক দিনের সমাধিতে তাঁর যা মূর্ত্তি দেখেছি, তার সঙ্গে অন্য কোন মূর্ত্তির তুলনা হয় না। সেদিন ঠাকুরের গায়ের রঙ্ কি বদ্‌লে গেছিলো! মুখখানিতে এমন অভয় ও করুণা মেশান ছিল, কি বলবো! এখনো ত হামি সে মূর্ত্তি ভুলতে পারে নি। তোমরা যে ছবিখানি ছাপিয়েছ তার চেয়েও সুন্দর সেই মূর্ত্তিখানি! সে মূর্ত্তি হামরা চারজন দেখেছি।"

রাখাল মহারাজের শিষ্যটি—আপনারা কে কে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন?

লাটু মহারাজ—হামি ছিলুম, রাখাল ছিলো, ভবনাথ ছিলো আর যোগীনভাই ছিলো।

রাখাল মহারাজের শিষ্যটি—কি কথা বলতে বলতে সেদিন তাঁর সমাধি হয়েছিল?

লাটু মহারাজ— কেমন কোরে ব্যাকুলতা জানাতে হয় সেদিন তাই দেখাতে গিয়ে তিনি সমাধিতে চলে গেলেন।

রাখাল মহারাজের শিষ্যটি— কতক্ষণ তিনি (ঠাকুর) সমাধিস্থ ছিলেন ?

লাটু মহারাজ— বেশীক্ষণ নয়, দশ-পনের মিনিট।

জানি না, সেইদিনকার সেই মূর্ত্তির ধ্যানেই তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন কি না। তবে তিনি যে, ঠাকুরের সমাধিমূর্ত্তিটিকে অবলম্বন করিয়াই ধ্যান-ধারণায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

কোন একটি দীক্ষিত ভক্ত একদিন লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন — 'মহারাজ ! ইষ্টমন্ত্রে ও ইষ্টমূর্ত্তিতে পার্থক্য রেখে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় কি ?' ভক্তটি কালীরূপের ভক্ত অথচ তাহারই কুলগুরু তাহাকে বৈষ্ণবমন্ত্র দান করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজ— তোমার যাতে মন বেশী বসে যায়, তাই নিয়ে কসে সাধন লাগিয়ে দাও। হামাকে এ-সব কথা জিগ্‌গেস করবার কি দরকার আছে ? তোমার মন যদি রূপে তুরন্ত বসে, তুমি রূপেরই ধ্যেন লাগাও; আর যদি মন্ত্রে বেশী আনন্দ পাও, মন্ত্র নিয়েই লেগে যাও। বাকী একটি নিয়ে লাগো। লেগে না থাকলে ইষ্টের সাক্ষাৎ মিলবে না। আর ইষ্টের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত মনের সংশয় যাবে না।

ভক্ত—কোন্‌টি নিয়ে লাগ্‌বো তা' যে ধরতে পাচ্ছি না, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— এই করতে করতে ত তোমার চল্লিশ বছর কেটে গেলো। কবে আরজপধ্যেন করবে ? উনি বলতেন— 'তিরিশের এধারে জপধ্যেনে লাগা ভাল।' যত কম বয়সে লাগা যায় তত বেশী সময় পাওয়া

যায়। বেশী বয়সে লাগলে শরীর ভেঙ্গে পড়তে পারে। শরীর একবার ভেঙ্গে গেলে আর কঠোর করা যায় না। এখনো সময় আছে, লেগে পড়।

ভক্ত— আমাকে ত লাগতে বলছেন। কিন্তু এই (সন্দেহযুক্ত) মন নিয়ে যদি ধ্যানধারণায় লাগি, তাহলে ইষ্টের সাক্ষাৎ পাবো কি? মনে সংশয় নিয়ে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন কি? আপনারা ত বলেন তাঁর (ইষ্টমূর্ত্তির) সম্বন্ধে নিঃসংশয় হোয়ে তবে তাঁর স্মরণ-মননে লাগতে।

লাটু মহারাজ— আরে! তাঁর সম্বন্ধে কেমন কোরে তোমরা এখনই নিঃসংশয় হোতে পারো? এখন তোমরা শুধু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে সাধনপথে এগোও। বিশ্বাস করো যে তিনিই তোমায় চালাচ্ছেন, তাঁর শক্তিতেই তুমি চলছো। বাকী তিনি কি? তিনি না কৃপা কোরে বুঝালে, তোমরা তা' বুঝতে পারবে কেনো? এসব ব্যেপারে নিজের বুদ্ধিতে চলতে নেই; গুরুকে ধরে চলতে হয়; গুরু না বুঝিয়ে দিলে এ ব্যেপার বুঝা যায় না। উনি বলতেন— 'গুরু যেমন সেথো—হাত ধরে নিয়ে যান; ভগবানদর্শন করিয়ে তবে শিষ্যকে ছেড়ে দেন।'

ভক্ত— গুরুই ভগবানকে দেখিয়ে দেন?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! সদ্‌গুরুর কৃপায় ইষ্টের দর্শন পাওয়া যায়। সদ্‌গুরুকে ধরে থাকো, তিনিই তোমার মনের খসড়্-ফসড়্ সব মিটিয়ে দেবেন। উত্তম গুরু কি করেন, জানো? শিষ্যের সামনে ইষ্টকে আগিয়ে দেন। তারপর তিনি বসে বসে গুড়ুক টানেন, আর দেখেন শিষ্যের মন কেমন ইষ্টের দিকে চলেছে। যে উত্তম শিষ্য হয়, সে সব ত্যাগ কোরে কেবল ইষ্টের স্মরণ আউর সেবা করতে থাকে; আর যে অধম শিষ্য হয়, সে সেইখানেই ইষ্টসেবা খতম্ কোরে দেয়। (এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন)··· দেবরাজ ও দৈত্যরাজ এক সাথে গুরুকৃপা পান। দুজনেই

ইষ্টকে দেখলেন। বাকী দৈত্যরাজ ইষ্টকে দেখবার পর আমোদ করতে চলে গেলেন; আর দেবরাজ ইষ্টকে দেখে এমন হর্ষিত হোলেন যে, সে মূর্ত্তি ভুলতে পারলেন না। তাঁকে দেখবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে গুরুজীর কাছে গিয়ে বললেন—'দোহাই গুরুদেব! আউর একবার হামায় ইষ্টদেবকে দেখান।' দেবরাজের কথায় গুরুদেব ভারী সন্তুষ্ট হোলেন আর কৃপা কোরে তার মোহ কাটিয়ে দিলেন। দৈত্যরাজ আর গেলেন না। তাই লড়াইয়ের সময় দৈত্যরাজ হেরে গেলেন। আর দেবরাজ ভগবানের কৃপায় স্বর্গরাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন।

গল্পটি শুনিবার পর সেই ভক্তটি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—'মহারাজ! ভগবানে নিঃসংশয় হইবার সহজ উপায় কি? তাঁকে ডাকা, না তাঁর বিচার করা?'

লাটু মহারাজ—উনি (ঠাকুর) বলতেন, 'ঈশ্বরকে বিচার কোরে কে জানতে পার্‌বেক? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কত বিচার করবে! বেশী করলে সব গুলিয়ে যাবে। বেশী বিচার করা ভাল নয়। বিচার করতে করতে নাস্তিকভাব এসে পড়ে। তার চেয়ে ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকা ভাল।' উনি বলতেন—'একবোতল মদে যদি মাতাল হও, শুঁড়ির দোকানে কতো মণ মদ আছে—সে খবরে তোমার দরকার কি? এক-আঁজ্‌লা জলে তোমার পিয়াস মিটে, তুমি তাই পান কর। পৃথিবীতে কতো জল আছে, তোমার জানবার ত কোনো দরকার নেই।'

ভক্ত—কাকে ডাকবো, মহারাজ—গুরুকে, না ইষ্টকে?

লাটু মহারাজ—যাঁকেই ডাকো না কেনো, ও একই কথা হবে। গুরু ও ইষ্ট একই জানবে। সাধনকালে গুরু ও ইষ্টে ভেদবুদ্ধি করতে নেই। সাধন করতে করতে সে-সব কথা বুঝা যায়। যে সাধন করবে না, তার মনে

এসব সংশয় ত জাগবেই। আরে! সংশয়ই ত যত নষ্টের গোড়া! বিশ্বাস কোরে গুরুর কাছে গোকা মাফিক্ পড়ে থাকতে হয় আর বলতে হয়— 'মায় গুলাম, মায় গুলাম, মায় গুলাম তেরা। তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।'

ভক্ত— তাহলে 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'—এই ধারণা নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। কি বলেন?

লাটু মহারাজ নিজে সাধনপথে ঠিক যেভাবে চলিয়াছিলেন ভক্তটিকে সেই ভাবের কথা বলিলেন— 'গুরুকৃপা হি কেবলম্।'

অন্য আর একদিন অন্য একটি ভক্ত বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন— 'মানুষ-গুরুতে মন রাখবার প্রয়োজন কি?' তদুত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'গুরু সচ্চিদানন্দ। তাই তাঁতে মন লাগালে পর সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের জ্ঞান হোতে থাকে। আউর গুরু যে ভগবানের ভক্ত। শাস্ত্রে লিখা আছে— ভগবানে মন রাখলে যে ফল পাওয়া যায়, তাঁর ভক্তে মন রাখলে সেই ফলই পাওয়া যাবে। ভক্ত ভগবান ভাগবত—তিনই এক।'

ভক্ত— সাধনপথে গুরুকরণ কি অবশ্য প্রয়োজনীয়?

লাটু মহারাজ— সাধনভজন করতে গেলে একটা গুরু করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করতে পারো। বাকী ভগবানের ভক্তদের গুরু করাই ভাল। কেনো, জানো? তোমার যখন পিয়াস লাগে, তুমি কি কর? জলের চেষ্টা করো তো? কাছাকাছি যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে যাও তো?

ভক্ত— হ্যাঁ, মহারাজ! তাই করি।

লাটু মহারাজ— সাগর ঢুঁড়তে যাও কি?

ভক্ত— হাতের কাছে জল পেলে কে আবার সাগরের সন্ধান করে বলুন ?

লাটু মহারাজ— তাহলেই ত হলো। ভক্তগুরু যেমন নদীর জল আর ভগবান হচ্ছেন সাগরজল। ভগবানের পিয়াস লাগলেই ভক্তগুরুর কাছে গিয়ে পিয়াস মিটাতে হয়। ভক্তগুরু ছাড়া আর কেউ সে পিয়াস তুরন্ত্‌ মিটাতে পারে না।

তাই মনে হয়, সাধক-লাটু প্রাণের পিয়াসবশতঃই ঠাকুরের দিকে সর্ব্বদা মন ফেলিয়া রাখিত। শুধু মন ফেলিয়া রাখিত না, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ধ্যানও করিত। ঠাকুরের ধ্যান করিতে করিতে সাধক-লাটু অমৃতময় পরমতত্ত্বেই লীন হইয়াছিল।

ঠাকুর জানিতেন— লাটু ভাবপ্রবণ। তাই হৃদয়ের ভাবপ্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া যে-সব সাধনা সাধনক্ষেত্রে সুপ্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে যেটি প্রধান ও সহজ-ফলপ্রসু, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুর তাহাকে সাধনপথে চালিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে নামসংকীর্ত্তন করিয়া লাটুর অন্তরে নামে রুচি আনিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে রামলাল দাদার মুখ হইতে শ্রুত দুইটি প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"একদিন কোন্নগরের কতকগুলি ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে কীর্ত্তন করতে থাকে। ঠাকুর সেই কীর্ত্তনে নিজে যোগ দিয়েছিলেন আর নিজের প্রিয় সেবক লাটুকেও যোগ দিতে বলেছিলেন। লাটুকে এর আগে কোনদিন কীর্ত্তন করতে দেখি নি। লাটু তখন ঐ স্থানটিতে স্থানটি দেখাইয়া) বসে ছিল। ঠাকুরের ডাকে তাদের সঙ্গে কীর্ত্তন করতে লেগে গেল। আবার অল্পস্বল্প নাচতেও লাগলো। লাটুকে নাচতে দেখে আমাদের ত ভয় হোল। ঠাকুর ভাবস্থ হোলে তাঁকে ধরবে কে ?

অনেকক্ষণ ধরে নাচতে নাচতে শেষে লাটু অবসন্ন হোয়ে পড়লো। তখন ঠাকুর তার অবসন্ন দেহটি ঘিরে রাম-নাম আরম্ভ করে দিলেন। তেমন মধুর রাম-নাম আমি জীবনে শুনি নি। কোন্নগরের এক ভক্ত ত রাম-নাম করতে করতে গদ্‌গদ হোয়ে পড়লো। শেষে আর সামলাতে না পেরে ঠাকুরের পায়ের গোড়ায় পড়ে গেল। শুনেছি, সেদিন নাকি সেই ভক্তটি ঠাকুরের নিকট হোতে রঘুবীর-মন্ত্র পেয়েছিলেন। তোমরা সেই মধুর রাম-নাম শোন নি তাই! সেই দিনকার সেই নামসংকীর্ত্তন শুনলে জীবনেও তা ভুলতে পারতে না।"

"ছেলেদের সব সকাল-সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করতে দেখে ঠাকুরের কেমন ইচ্ছে হোলো—মা-কালীর কাছে তাদের হোয়ে প্রার্থনা জানাতে। একদিন তিনি বললেন— 'মা! তোর যদি ইচ্ছে হয়, এই ছেলেদের একটু ভাব-টাব হোক।' তার দিন দুই পরে দেখি, ছেলেরা কীর্ত্তন করতে করতে ভাবে গদ্‌গদ হোয়ে পড়ছে। সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুঘরে কীর্ত্তন করবার সময় লাটু ভাবাবেশে এমন হুঙ্কার তুলতো যে, সারা মন্দিরটা তার গলার আওয়াজে গম্‌গম্ করতো। মাঝে মাঝে আবার ভাবাবেশে লাটু নাচতে থাকতো। একদিন যখন নাচছে আর হুঙ্কার তুলছে সেই সময় ঠাকুর সেখানে গেলেন। বিষ্ণুঘরের পুরোহিত তাঁকে দেখে বড় খুশী হোয়ে বললেন— 'এদের সঙ্গে আপনিও একটু যোগ দিন— সোনায় সোহাগা মিশে যাক।' তাতে ঠাকুর কি বললেন, জানো?— 'ওগো! এখানে আর কি ফোঁড়ন দেবো? এতে পাঁচ ফোঁড়ন মেথিটি পর্য্যন্ত পড়ে গেছে।' "

অন্য আর একদিনের কথা। "সেদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের ঘরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে বিভোর হইয়া পড়িলেন। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ঠাকুর স্বয়ং সেদিন কীর্ত্তনে যোগ

দিলেন এবং তাঁহারই দিব্য উন্মাদনায় ভক্তগণ দিব্য উল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। কেহ বা আত্মহারা হইয়া উন্মাদের মত কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ বা হাসিতে লাগিলেন, আবার কেহ বা নাচিতে লাগিলেন। দুই-এক জন ভক্ত সেই কীর্ত্তনে স্তব্ধ হইয়া চিত্রপুত্তলিকার মত স্থিরনেত্র হইয়া গেলেন। একজন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভক্তপদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেই-হেন কীর্ত্তনে আমি (পরবর্ত্তী কালে যাঁহাকে সকলে খোকা মহারাজ—সুবোধানন্দ বলিতেন তিনি) উপস্থিত ছিলাম। ভক্তগণের ভাববিহ্বলতায় বরাবরই সন্দিগ্ধ ছিলাম; তাই নিঃসন্দিগ্ধ হইবার মানসে আমি সেইদিন সেইখানে বসিয়া রহিলাম। সকলে চলিয়া গেলে সেই ঘরে আমাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি গো, তুমি এখনও বসে রইলে যে?' তাঁহার কথায় বলিলাম— 'আমার একটু জিজ্ঞাস্য ছিল। আজকে এই যে কীর্ত্তন হোল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল?' আমার মত সন্দিগ্ধমনাকে সন্দেহমুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন— 'আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে, আর সবার অল্পস্বল্প।' " (পরবর্ত্তী কালে এই কথাগুলি স্বামী সুবোধানন্দের মুখে আমরা শুনিয়াছি)।

উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি হইতে বলিতে ভরসা পাই যে, সাধক-লাটু সংকীর্ত্তনের মাঝেই দিব্য-সঙ্কেত পাইয়াছিল। সাধনপথে দিব্য-সঙ্কেত একটি অমূল্য সম্পদ। কারণ, দিব্য-সঙ্কেত না পাওয়া পর্য্যন্ত নামে ঠিকমত রুচি হয় না, এমন কি নামে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মায় না। অধিকন্তু সাধক যে সাধনপথে অগ্রসর হইতেছে তাহাও সে নিজে বুঝিতে পারে না। তাই একদিকে দিব্য-সঙ্কেত যেমন সাধনার সহায়ক, অন্যদিকে তেমনি দিব্য-সঙ্কেতই সাধকের অন্তর-বেদনার কারণ। একদিকে যেমন ইহা সাধক-হৃদয়ে

ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি ইহা বৈষয়িক জীবনের প্রতি সাধককে বৈরাগ্যবান ও উদাসীন করিয়া তুলে। প্রায়ই দেখা যায় যে, দিব্যসঙ্কেত পাইবার পর হইতেই সাধকগণের এক নূতন অবস্থা হয়— যে অবস্থায় তাহাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অহোরাত্র সেই সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকে ও তৎপ্রাপ্তির আশায় অতিরিক্ত ভজনানন্দে মাতিয়া নিজ নিজ দেহ-মন-বুদ্ধিকে ক্লিষ্ট ও খিন্ন করিয়া তুলে। দক্ষিণেশ্বরে সাধক-লাটুরও ঠিক সেইভাবে হইয়াছিল। অতিরিক্ত নাচুনী-কাঁদুনীতে লাটুকে আপন শক্তিক্ষয় করিতে দেখিয়া তিনি (ঠাকুর) একদিন বলিলেন— 'ওরে! বেশী নাচুনী-কাঁদুনী ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাবভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে ভাব অন্তর্মুখী হতে চায় না।'

ঠাকুরের এই সাবধান-বাণীতে লাটু তাহার বহিঃপ্রকাশমান ভাব-লক্ষণগুলিকে যথাসম্ভব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু, শেষে সমর্থ হইলেও, তখনই তাহা পারিল না। যাহারা ভাবের ভান করিয়া থাকে, তাহারা ইচ্ছা করিলে ভাবকে গোপন করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের ভাব ভান নয়, তাহারা ইচ্ছামাত্রেই পারে না। ঠাকুর বলিতেন — 'ভাব যেন মাতামাতি! ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ ক'রে (দেহ) তোলপাড় করতে থাকে।' সাধক-লাটুর তৎকালীন অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে কখনও ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়িতে আবার কখনো বা চঞ্চল অস্থির হইতে দেখা যাইত। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও লাটুর মত ভাবপ্রবণ সাধক আপনার ভাবসংবরণ করিতে পারিত না।

সেই সময়ে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন— 'ওরে! তোরা একঘেয়ে হোস্‌নি। একঘেয়ে হওয়া ইখান্‌কার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব— এই ভাব।' এবং সেই ভাবটি যথাযথভাবে

তদীয় অন্তরঙ্গগণের মধ্যে সংক্রামিত করিবার জন্য ঠাকুর প্রত্যেককে সাধন-কালে বিভিন্ন সাধনায়— যেমন ভক্তিযোগের ভজনে, জ্ঞানযোগের বিচারে, কর্ম্মযোগের সেবায় ও যোগের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত রাখিতেন। যাহার যেরূপ ভাব দেখিতেন, তাহাকে সেইরূপ সাধনায় নিযুক্ত করাইয়া তিনি প্রত্যেকের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন— "কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হোলে যোগ, ভোগ, প্রেম এ সবই হয়।" লাটুর মত সাধককে নানাপ্রকার রসাস্বাদন করাইবার জন্য ঠাকুর একদিন কৃপা করিয়া তাঁহার কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত করিয়া দিলেন। নিম্ন-লিখিত প্রসঙ্গটি রাখাল মহারাজের নিকট শুনিয়াছি।

"একদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুললে। তখনো ভোর হয় নি। ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে তাঁর ঘরে এসে বসতেই তিনি আমাদের বললেন —'আজ তোরা খুব জপ করতে থাক।' আর তিনি 'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগলেন। তিনি গান করছেন আর আমরা জপ করছি। হঠাৎ কি জানি কেন দেহটা কেঁপে উঠ্‌লো! আর লেটো উঁহু ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। তা' শুনে ঠাকুর তার কাঁধ দুটো চেপে ধরে বললেন— 'ঠিক বসে থাকবি, আসন থেকে উঠতে পাবি নি।' বেশ দেখতে পেলুম লেটোর আসনে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর তাকে উঠতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, লেটো যেন বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুর তখনো সেই গানখানি গাইতে লাগলেন। সেইদিন ঐ গানখানিকে তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গেয়েছিলেন। এমনি কোরে গানের মধ্য দিয়েও তিনি (ঠাকুর) আমাদের মধ্যে ভাবসংক্রমণ করে দিতেন।"

উক্ত প্রসঙ্গটি হইতে আমরা অনুমান করিতেছি যে, ঠাকুর সেইদিন গানের মধ্য দিয়াই লাটুর কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া দিলেন। শাস্ত্রে পড়িয়াছি যে, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি দিব্য অনুভূতির প্রকাশদ্বার। ঐ শক্তির জাগরণ ব্যতীত অলৌকিক দিব্য-দর্শনাদি সম্ভব নয়। ঠাকুর বলিতেন— "অনেক সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর এই সব পথ ক্রমে পার হ'য়ে) হৃদয়মধ্যে অনাহত পথ— সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক অবাক হয়ে জ্যোতিঃ দেখে, আর বলে—এ কি ! এ কি !"

সাধক-লাটুরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি আমরা রামলাল দাদার নিকট হইতে শুনিয়াছি।— "একদিন দুপুরের পর ঠাকুর লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠালেন। ধ্যান করতে করতে লাটু বিভোর হোয়ে পড়লো। বিকেল হয়ে এলো, তখনও লাটু সেখান থেকে বেরুল না। তাই, ঠাকুর লাটুর খোঁজে আমাকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি— লাটু একগা ঘেমে গেছে, আর নিথর নিশ্চলভাবে ধ্যান করছে। তাকে বিরক্ত না করে আমি ওনার কাছে এসে সব কথা বললুম। তিনি একখানা পাখা হাতে করে শিবমন্দিরে চললেন, আর আমায় বললেন এক-গেলাস জল নিয়ে যেতে। জল নিয়ে গিয়ে দেখি ঠাকুর লাটুকে বাতাস করছেন। পাখার বাতাসে লাটুর দেহ কাঁপতে লাগলো—ঠিক তুলো যেমন কাঁপে তেমনি। তখন ঠাকুরকে বলতে শুনলুম— 'ওরে ! বেলা যে গড়িয়ে এলো, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে লাটুর চৈতন্য ফিরে এলো। লাটু ধীরে ধীরে চোখ চাইলে। ঠাকুর বাতাস করছেন দেখে কেমন যেন আশ্চর্য্য হোয়ে গেল ! তখন ঠাকুর বলতে লাগলেন— 'গরমে

বড্ড ঘেমে গেছিস্ ; আগে একটু সুস্থ হ, তারপর আসন থেকে উঠিস্।' ঠাকুরের কথায় লাটু এমন লজ্জিত হয়ে পড়লো, কি বল্‌বো ! বলতে লাগলো — 'আপুনি এ কী করছেন ! এতে হামার যে অকল্যাণ হবে। হামি কুথায় আপুনার সেবা করবে, তা না আপুনি হামার জন্ম কষ্ট করছেন।' ঠাকুর তখন সস্নেহে বললেন— 'ওরে ! তোর কে সেবা করছে ? তোর ভিতরে যে উনি (শিবলিঙ্গটিকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবো না, সে কি কথা রে ? এত গরমে ওঁনার যে কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা ! উনি (শিব) যে তোর ভিতরে এসেছিলেন, তুই বুঝ্‌তে পেরেছিলি ?' তখন লাটু বললে— 'হামি ত কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা জ্যোতিঃ দেখতে পেলুম, সেই জ্যোতিতে সব ঘরখানা ভরে গেলো আর কুছু হামার মনে নেই।' ঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন— 'বেশ ! বেশ ! এরকম আরো কতো দেখবি ! এখন এক-গেলাস জল খা দিকিনি।' আসন থেকে উঠে লাটু সেই জল পান করলে।"

তারপর হইতে লাটু জপধ্যানে বসিবামাত্র জ্যোতিঃ দেখিতে পাইত। একথা আমরা নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ হইতে অনুমান করিতেছি। প্রসঙ্গটি যোগীন মহারাজের নিকট শুনিয়াছি।

"একদিন সন্ধ্যাকালে আমি (যোগীন মহারাজ) ঠাকুরের ঘরে বসে আছি, দেখি লাটু ঘরের দিকে আসছে। ঘরে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। ঠাকুর তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কি রে ! এরই মধ্যে উঠে এলি যে ?' লাটু তখন বললে— 'আজ জপে মন বসাতে পারলুম না।' ঠাকুর বললেন—'কেন রে ?' লাটু বললে— 'কি জানি ! অন্য দিন ত জপে বসলেই কুছু দেখতে পাই, আর তাতে মন বেশ বসে যায় ; আজ কি জানি কেন— কুছুতেই মনকে বাগে আনতে পারলুম না।' তা' শুনে ঠাকুর

বললেন— 'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে!' লাটু তখন বললে— 'আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিলো— মা যদি বর দিতে আসেন, তবে হাম্‌নে কি চাইবে?' সেই কথা শুনে ঠাকুর বললেন— 'ঐ হয়েছে রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জপে মন বসে? ও সব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।' ঠাকুরের কথা শুনে আমি ত অবাক হোয়ে গেলুম। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই, এ আবার কি কথা? সকলেই ত ধ্যানে দেবদেবীর দর্শন পেয়ে বর চেয়ে নেন। তাই জিজ্ঞাসা করলুম— 'মা ত ধ্যানেই দর্শন দেন, তখন বর চাইতে দোষ কি?' ঠাকুর আমায় বললেন — 'না রে না, বর চাইতে নেই। একান্তই যদি মা তোকে কোন বর নিতে বলেন ত, তুই বল্‌বি— 'মা! আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। আমি ধন-জন-দেহ-সুখ এসব কিছুই চাই না। শুধু এই চাই যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।' "

জ্যোতিঃদর্শনই ধ্যানের শেষ কথা নয়। যতদিন না ধ্যানে জ্যোতিঃ-ঘন-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইতেছে, ততদিন সাধকের ধ্যান (অবশ্য সাকারবাদী সাধকের) সমাধিতে লীন হইতে পারে না। তাই অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ইষ্টদর্শন ব্যতীত ধ্যান পাকা হয় না। পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজও ঠিক এই কথা বলিতেন। তিনি ত আমাদের বুঝাইতেন— 'তুমি আছ আর তোমার ইষ্ট আছে, এ জগতে আর কেউ নেই— একেই বলে ধ্যান।' এইরূপ ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তবে সাধকের মনের উপর অধিকার আসে। তখন মনের চঞ্চলগতি সাধককে আর ঠকাইতে পারে না। মন ধ্যান ছাড়িয়া পালাইলেই সাধক বুঝতে পারে। সাধক তখন দেখিতে পায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মন কত রকম বদলাইতেছে, কত রকম খেলা খেলিয়া যাইতেছে!··· সেই অবস্থায় পৌঁছিলে মনের চাঞ্চল্যগুলি প্রকাশ হইবার

পূর্ব্বে মনের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। চাঞ্চল্যকারক প্রত্যেক স্পন্দনেই তখন সাধকের মন হুঁশিয়ার হয়। রাগ, দ্বেষ, বিরক্তিগুলি তখন আর বাহিরে প্রকাশ হইতে পারে না। হিংসা পাপ সব দেহমন হইতে মুছিয়া যায়।··· তখন ধ্যানীর মেজাজই আলাদা হইয়া যায়; দেহের গঠনও বদলাইতে থাকে।··· তখন সাধকের চোখ-মুখ দেখিলেই বা কথাবার্ত্তা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে ধ্যানী। যাহারা প্রকৃত ধ্যানী তাহাদের চোখের চাউনি আলাদা, চলন আলাদা, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আলাদা হইয়া থাকে।··· তখন সাধকগণের বায়ু স্থির হয়, প্রসন্ন থাকে, মনটিও খুব শান্ত থাকে।··· ধ্যানকালে মাঝে মাঝে দেহবুদ্ধি চলিয়া যায় আর মনের জড়তা কাটিতে থাকে।

উনি (ঠাকুর) বলিতেন— "ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, মাথায় পাখী বসবে জড় মনে করে··· গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যাবে—সাধক জানতে পারবে না, ওরাও জানতে পারবে না।··· আর একটি লক্ষণ হচ্ছে— সব সময়েই ধ্যান চলতে থাকবে— চোখ চেয়েও ধ্যান চলবে, কথা কইতে কইতেও ধ্যান চলবে। যেমন দাঁতের ব্যামো হোলে সব কাজ চলে, অথচ কনকনানির দিকে মন পড়ে থাকে, তেমনিভাবে ধ্যান চলতে থাকবে।" এমনভাবে, সকল কাজের মাঝে যদি কাহারও অন্তরে ধ্যান-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই তিনি যে জ্যোতিঃঘন-মূর্ত্তির দর্শন ও স্পর্শন পাইয়া সমাধিতে লীন হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি হইতে বলিতে ভরসা পাই যে, সাধক-লাটু ধ্যানে তেমনি তন্ময় হইয়া যাইত। প্রথমতঃ অদ্বৈতানন্দ (বুড়োগোপাল দাদা) কথিত 'তন্ময়তা'-প্রসঙ্গটি বলিতেছি—

"একদিন লাটু দিনের বেলায় গঙ্গার কিনারে বসে ধ্যান করছে। এমন সময় গঙ্গায় জোয়ার আসিয়া পড়িল। সাধারণতঃ লাটু যে জায়গায় বসে জপ করতো সেখানে জল উঠতো না। কিন্তু সেদিন জোর বান ডাকায় সেইখানেও জল উঠে গেল। জোয়ারের জল এসে গেলেও লাটুর হুঁশ হোল না দেখে, আমি ত ঠাকুরকে ডাকতে গেলুম। আমার কথা শুনে ঠাকুর সেইখানে তাড়াতাড়ি এলেন। এসে দেখেন যে, লাটুর চারদিকে জল ছেয়ে গেছে। তখন তিনি সেই জল ঠেলে গিয়ে লাটুকে ডেকে তুললেন।"

আর একটি প্রসঙ্গ— ইহাও বুড়োগোপাল দাদা-কথিত। "ধ্যান করতে করতে লাটু একদিন অজ্ঞান হোয়ে মাটীতে মুখ গুঁজ্‌রে পড়ে যায়। শেষে গোঁ গোঁ করতে থাকে। তাকে পড়ে যেতে দেখে আমার কেমন ভয় হোল। আমি তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে সেখানে ডেকে আনলুম। তিনি এসেই লাটুকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং বুকে হাঁটু দিয়ে ডল্‌তে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে লাটুর সহজ অবস্থা ফিরে এলো। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুই বুঝি আজ মা-কালীকে দেখেছিস্? চুপ কর শালা! চুপ কর। শুনতে পেলে এখনই একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে।' ঠাকুরের কথা শুনে লাটু চুপ করে রইল। কিন্তু তারপর থেকেই দেখতুম যে লাটুর চোখ-মুখ-বুক ধ্যান করবার সময় লাল রক্তবর্ণ হয়ে যেতো আর অনেকক্ষণ ধরে সেই লালচানি ভাবটা থাকৃতো।"

এইবার একটি বলরাম মন্দিরের কথোপকথন তুলিয়া দিতেছি। একদিন জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'সাধনকালে (ইষ্ট ব্যতীত) বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা ভাল কি না।'

লাটু মহারাজ— দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা সবসময়েই ভাল। ধ্যেনে একই ইষ্টের মূর্ত্তি নানা দেবদেবীর রূপ ধরে আসেন। সবই ইষ্টের লীলা।

একজনের ভিতরেই যখন সব, তখন দেবদেবীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন করবে কেনো?

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া ভক্তটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ! শাস্ত্রে বিভিন্ন মূর্ত্তিকে বিভিন্ন ভাবে ভাবিত করেছে। সেখানে (অর্থাৎ শাস্ত্রে) দেবদেবীগণের প্রত্যেক মূর্ত্তির ধ্যান আলাদা, পূজা আলাদা, প্রণাম-মন্ত্র আলাদা ও বীজ-মন্ত্র আলাদা বলেছে। তা' সত্ত্বেও একই ইষ্টের ধ্যানে বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শন পাওয়া যায় কেন? এবং সেইরূপ দর্শন সাধনার পক্ষে মঙ্গলকর কি না?'

লাটু মহারাজ— আরে! তোমরা ত সব আলাদা আলাদা ভাবো। বাকী সব দেবদেবী স্বরূপে ত এক। রূপে বহু হোলে কি হোবে? স্বরূপে ত কোনো গণ্ডগোল নেই; সেখানে সকল মূর্ত্তিই একের সহিত অভিন্। এই দেখো না— তুমি একটা মানুষ, তুমি যখন ক্রোধ কর তখন তোমার একরকম মূর্ত্তি হয়, যখন হাসো তখন অন্যরকম, যখন কাঁদো তখন আবার আর একরকম। তোমার মনের যেমন যেমন রঙ্ বদলায়, তোমার মূর্ত্তিরও তেমনি তেমনি অদলবদল হোতে থাকে, বাকী তুমি ত সেই একই থাকো। তুমি যখন যেভাবেই থাকো না কেনো, তোমার নাম ধরে কেউ ডাকলে তুমিই ত সাড়া দাও। তেমনি আর কি! উনি বলতেন—'বহুরূপী রং পাল্টায়; কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হল্‌দে, জরদা, বেগুনী, নীল এসব। যে যেমন দেখে, সে তেমন ভাবে। বাকী যে গাছতলায় বসে থাকে, সেই জানে যে একই চিড়িয়ার নানা রং।' তেমনি যে ইষ্টের ধ্যেনে পড়ে থাকে সে-ই বুঝ্‌তে পারে যে, নামরূপ আলাদা হোলেও স্বরূপে সব এক।

উক্ত কথোপকথনটি এখানে লিখিত হইবার একটি কারণ আছে। সাধক-লাটু ধ্যানে বিভিন্ন মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন, একথা বহু প্রসঙ্গের

মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা না দিয়া আমরা সংক্ষেপে তাহা জানাইয়া দিতেছি। ধ্যানে তিনি রামজীকে, মহাবীরকে, বিশ্বনাথকে, মা-কালীকে, কিষণজীকে ও যোগমায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন। এছাড়া আরো কত মূর্ত্তি হয়ত দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহা আমাদের জানা নাই।

এইখানে যোগমায়া-সম্বন্ধীয় দর্শনের কথা বলিতেছি। ইহা দক্ষিণেশ্বরের ব্যাপার। কিয়দংশ রাখাল মহারাজের মুখে শ্রুত ও কিয়দংশ রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

"একদিন ঠাকুর আমাদের গভীর রাত্রে ঠেলে তুলে দিলেন। বললেন —'তোরা ঘুমুবি কি রে? ঘুমুবার জন্য এখানে এসেছিস্?' সকলকে উঠিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে ধ্যান করবার জন্যে আমাদের সব নানা স্থানে পাঠালেন। লাটুকে সেদিন বেলতলায় পাঠিয়েছিলেন। বেলতলা থেকে লাটু ফিরে এলে ঠাকুর আমাদের বললেন—'ওরে! আজকে লেটোর পুনর্জন্ম হয়েছে।'"

রাখাল মহারাজের নিকট হইতে এইটুকু শুনিয়াছি। ইহার মধ্যবর্ত্তী অংশটি বিহারী বাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছি। 'মাসিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় তিনি যাহা দুই লাইনে লিখিয়াছেন, মুখে সেই কথাগুলি বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারই বর্ণনা অনুযায়ী আমরা সাধক-লাটুর বেলতলায় সাধনার কথা বলিতেছি।

"সিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে ধ্যান করা যার-তার কর্ম্ম নয়। দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে এবং দেহ-মন শুদ্ধ পবিত্র না হোলে কার সাধ্য সেখানে বসে জপধ্যান করে? নানা অশরীরী মূর্ত্তি ধ্যানকালে ভয় দেখাতে থাকে, বসতে দেয় না, আসন থেকে উঠিয়ে দিতে চেষ্টা করে। নির্ভীক সাধক

না হোলে, সিদ্ধ আসনে বসে জপধ্যান করতে পারে না। সেই জন্মে বেলতলায় ধ্যান করতে ঠাকুর যাকে-তাকে পাঠাতেন না। নিজের বাছা বাছা অন্তরঙ্গদের পাঠাতেন। সেই আসনে বসে একদিন লাটুর মত জোয়ান সাধকেরও বুক কেঁপে উঠেছিল। ধ্যানের শেষে লাটু আসন ছেড়ে উঠতে পারে নি— চারিদিকে নানা বীভৎস মূর্ত্তির নানা বিভীষিকা দেখে ভয়ে তার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঠাকুর তাকে রক্ষা করেছিলেন— দূর থেকে জোরে হেঁকে বলেছিলেন— 'কিরে! বড্ড ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয়! আমার সঙ্গে চলে আয়।' ঠাকুরের গলার আওয়াজ শুনে লাটুর প্রাণে সাহস জেগেছিল। ঐ আসনে বসা কি চাড্ডিখানিক কথা! ওখানে বসে ঠাকুর সিদ্ধ হয়েছিলেন। সিদ্ধপীঠের শক্তি যাবে কোথায়?"

সেইকালে ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেন— "ওরে! যোগমায়া তোদের পরীক্ষা করছেন। এসময় খুব সাবধানে থাকবি। তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারলে, মায়ার গ্রন্থি সব একে একে কেটে যাবে। তখন দেখবি— সাকার নিরাকার সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।" শুনিয়াছি, ঠাকুর যোগমায়ার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ঠাকুরের ঐ কথাগুলি কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। লাটু মহারাজকে বহুবার আমরা ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি প্রতিবারেই আমাদের বলিয়াছেন— "ওসব শুনে কি হোবে? সাধন কোরে বুঝো না। যোগমায়ার কথা কে বলতে পারে? তাঁর (যোগমায়ার) কতো সব সিদ্ধাই আছে! সিদ্ধাই দেখলে মা বসুন্ধরা ভয় পান, কেঁপে উঠেন— মানুষ ত কোন্ ছার!"

সাধক-লাটুর আর একটি ধ্যানের চিত্র আমরা অঙ্কিত করিতে চাহি।

এ ঘটনাটিও বেলতলায় ঘটিয়াছিল। সেদিনও সাধক-লাটু গভীর ধ্যানে মগ্ন, একেবারে তন্ময়। সেই সময় ধ্যানপ্রসূত নিদ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। যোগনিদ্রার সাহায্যে নানা ঐশ্বরিক মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সেই ঈশ্বরী-মূর্ত্তিসমূহ সর্ব্বাভিষ্টপ্রদায়িনী। তাঁহাদের আবির্ভাবে সাধকের বাহ্যজ্ঞান থাকে না— সাধক নিশ্চল, নিস্পন্দ, নিথর হইয়া ধ্যানে বিভোর হইয়া যায়। লাটুরও সেদিন সেই অবস্থা। মধ্যরাত্রে যে আসনে বসিয়াছিল, সেই আসনে বসিয়াই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল— তখনও লাটুর যোগনিদ্রা ভাঙ্গিল না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আপন সেবককে নিজগৃহে অনুপস্থিত দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং লাটুর সন্ধানে গিয়াছিলেন। বেলতলায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, দুইটি কুকুর অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন আর অগ্রসর হইলেন না। ক্রমে ক্রমে উষার আলোকে দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল। যোগনিদ্রাভিভূত লাটু ধীরে ধীরে সেই আলোকস্পর্শে জাগিয়া উঠিল। উঠিয়াই দেখে যে, সম্মুখে ঠাকুর। তাঁহাকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া দিব্যানন্দে পুলকিত লাটু আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতে ঠাকুর তাঁহাকে (লাটুকে) বলিলেন— "ওরে! কুকুরের বেশ ধরে দু-দুটো ভৈরব তোর আশেপাশে আজ পাহারা দিচ্ছে দেখলুম। তোর মহাসৌভাগ্য! তোকে রক্ষা করবার জন্য মা তাঁর ভৈরবদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।" (এই প্রসঙ্গটিও রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি)।

দক্ষিণেশ্বরে লাটু সারারাত্রি ধ্যান-ধারণায় বিভোর থাকিত। এক একদিন দিবাকালেও সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ধ্যানে বসিত। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে বিরাট ধ্যানযজ্ঞ চলিতেছিল। একদিকে নরেন, রাখাল,

বাবুরাম, শশী, শরৎ যোগীন, কালী, তারক, লাটু প্রভৃতি ভাবী সন্ন্যাসিগণ আর অপরদিকে রাম, রামমোহন, গিরিশ, বলরাম, স্থরেশ, মাষ্টার প্রভৃতি গৃহিগণ। একদল দিনে সৎকথার স্রোত প্রবাহিত করিতে থাকেন, আর অপর দল রাতে সৎসাধনার স্রোতে ভাসিতে থাকেন। সেই-হেন কালে একদিন ঠাকুর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বলিলেন— "লেটো চড়েই রয়েছে (সর্ব্বদা ভাবেতে রয়েছে), ক্রমে লীন হবার যো।" (শ্রীম— 'কথামৃত')।

একদিন দুপুরে লাটুকে ডাকিবার জন্ম বিষ্ণুঘরের পুরোহিতকে (রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে) ঠাকুর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি ত আসিয়া দেখেন যে, লাটু নিশ্চল, নিথর, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বহুবার ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাইলেন না, গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিলেন, তবু তাহার হুঁশ আসিল না। অগত্যা সেইখান হইতে ফিরিয়া ঠাকুরকে সব কথা জানাইলেন। ঠাকুর তখন নরেনকে তথায় পাঠাইলেন (নরেন সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন)। তিনিও তাহার সেই অবস্থা দেখিলেন এবং তাহার ধ্যানের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্ম অদূরে জোরে জোরে গাছের ডালে আর একখানি কাঠ লইয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই আওয়াজ শুনিয়া ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং সেইখানে আসিয়া বলিলেন— 'থাক্ ! ওকে আর বিরক্ত করিস নি।' নরেন তাহাতে বলিয়াছিলেন—'হুঁশ থাকলে ত বিরক্ত কর্‌বো। একেবারে বেহুঁশ !' তখন ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'এই রকম বেহুঁশ না হোতে পারলে কি ধ্যান জমে রে ?' জানিনা— ঠাকুর কেন সেদিন নরেনকে দিয়া লাটুর খোঁজ করাইলেন ! অন্যান্য দিন লাটুকে দিয়াই তিনি নরেন্দ্রনাথের সন্ধান করিতেন।

যাহা হউক, তৎকালে লাটুর বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভবশূন্যতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সামান্য উদ্দীপনেই তাঁহার দেহ জড়বৎ স্থির হইয়া যাইত।

বিহারী বাবু (রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকার) একদিনের ঘটনা যেমন বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ('মাসিক বসুমতী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া) আপনাদিগের নিকট লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি ধ্যানসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকিবার সময় এক একদিন তিনি এমত সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, ঠাকুরকে তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া ডলিয়া জ্ঞান করাইতে হইত। যদু মল্লিকের বাগানে পাতা কাটিতে গিয়াছেন— সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ঠাকুর যাইয়া তাঁহার পায়ের উপর পা দিয়া চাপা দিলে, তবে জ্ঞান হইল।" বিহারী বাবু এইগুলিকে সমাধি বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, উহা উচ্চতর ধ্যানের অবস্থা। কেননা আমরা পরবর্তী কালে লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি যে, কাশীপুরের বাগানে তাঁহার প্রথম সমাধি হইয়াছিল। যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে।

ঠাকুরের মহাসমাধি

দক্ষিণেশ্বর হইতে দুর্গাচরণ ডাক্তারের নিকট গমন ও লাটুর নিকট সেবক হৃদয়ের প্রসঙ্গ-উত্থাপন, ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন, বাড়ী পছন্দ না হওয়ায় বলরাম মন্দিরে গমন, রামলাল দাদার কথা, ঠাকুরের চিকিৎসা ও মহেন্দ্র সরকারের প্রসঙ্গ, কীর্ত্তনে ভাবোন্মত্ত লাটু, শ্রীম-কথিত লাটুর ভাবাবেশ, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ভক্তগণের পূজা, ধ্যানের বিভিন্ন ধারা ও জনৈক ভক্তের কথোপকথন, শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত-কথিত লাটুর ভাবাবেশ-প্রসঙ্গ, লাটুর সংসারত্যাগের ইচ্ছা, শ্রীম-কথিত লাটুর অবস্থা, কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে গমন, হিসাবরাখা-প্রসঙ্গ ও লাটুর কথা, শ্রীশ্রীমায়ের পা-মচকানোর কথা ও রাম বাবুর বামুন-পাঠানোর কথা, 'হাম্‌নে ত আপুনার মেন্তর আছি', উপাসনার ইঙ্গিত, ঠাকুরের রোগভোগের কারণ কি? দেহীর কোন কষ্ট নাই, রোগশয্যায় আনন্দবিভোর ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কথিত কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ, কাশীপুরে লাটুর বিরাট পরিবর্ত্তনের কথা, সমাধিতে দিব্যজীবনলাভ, ভাবে ও সমাধিতে পার্থক্য কি? নূতন মুল্লুকের সন্ধান, শশী মহারাজ-কথিত প্রসঙ্গ, লাটু মহারাজ-কথিত সমাধির প্রকারভেদ, সাধক-লাটুর অন্তর্যামিত্ব ও অনাগত জ্ঞাতৃত্বের শক্তিলাভ, নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, ঠাকুরের নিকট হইতে গৈরিকলাভ, কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব, ঠাকুরের ফটোপূজার কথা, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক—আশীর্ব্বাদ-কাহিনী, দোলের দিন ভক্তগণ, শিবরাত্রিপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের তারকেশ্বরগমন, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা, ভক্ত রাম বাবুর জন্য নিরঞ্জনভায়ের সহিত লাটুর বচসা ও ঠাকুরের উপদেশ, ভক্ত গিরিশ বাবুর কথা, নিত্যগোপালকে উপদেশদান, সুরেশ বাবুর অভিমান ও ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা 'আজ কাউকে আসতে দিবি নি' ও পাগলীর আগমন, রামলাল দাদার প্রসঙ্গ, নাস্তিকের প্রসঙ্গ, নরেন্দ্রনাথপ্রসঙ্গ, কোন গুরু-ভায়ের মাছধরা-প্রসঙ্গ ও লাটুর কথা, যোগীনভায়ের অসুস্থতার সংবাদে ঠাকুরের সাবধানবাণী, শশধর পণ্ডিতের কথা, ফুল-তুলসী দিতে বারণ করার কথা, নাগ মশায়ের আমলকী-খোঁজার বৃত্তান্ত ও ঠাকুরের প্রসাদদান, জামরুল খাইবার ইচ্ছা, শ্রীশ্রীমায়ের সেবাপ্রসঙ্গ ও ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে সকলকে উৎসাহদান, ঠাকুরের মহাসমাধির পূর্ব্বের ঘটনা, দলাদলি করিতে নিষেধকরণ, 'আমি গোমড়া মুখ দেখতে ভালবাসি না', শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়-কথিত প্রসঙ্গ, লাটু মহারাজের ভাষায় ঠাকুরের মহাসমাধি ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা, লাটু মহারাজের বৃন্দাবনগমন

দক্ষিণেশ্বর ছাড়িবার তিনদিন পূর্ব্বে ঠাকুর নিজেই দুপুরবেলা তালতলার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গমন করেন। সেখানে

তিনি সেবক লাটুকে ও যোগীন-মাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ডাক্তার দুর্গা-চরণ ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তিনি রোগনির্ণয় করিতে অসমর্থ হন। ঠাকুর তাঁহাকে যতবার জিজ্ঞাসা করেন—'রোগ সারবে ত?' ডাক্তার ততবারই বলেন—'এ ওষুধটা খেয়ে দেখুন।' শ্যামপুকুরে আসিয়া তিনি লাটুকে বলিলেন—'রোগ সারবে কি-না সে খোঁজ নেই, শুধু বলে ওষুধ খাও। ও ওষুধ আমি খাবো না।'—'তবে সেখানে গেলেন কেনো?'—ঠাকুর বললেন, "ওরে! ও যে দক্ষিণেশ্বরে যেতো। এতবার গিয়েছিল, একবার না গেলে কি ভাল দেখায়? কখনো তো ডাকলে না, তাই একবার নিজেরই যেতে হোলো। ও (দুর্গাচরণ ডাক্তার) রাত্তির দশটার সময় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 'হৃদে হৃদে' করে ডাকতো। ওর গলা শুনে তখনই হৃদেকে বলতুম 'ওরে! দোর খুলে দে।' হৃদে দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটি কথাও না বলে বসে থাকতো। যাবার সময় হৃদেকে বলে যেতো—'ওখানে যেও।' অর্থাৎ কিছু দেবো। ডাক্তারই জানে, কি চোখে আমায় দেখেছিলো।" কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পরে বলিলেন—"হৃদে যেন শেষে আমায় কি পেয়েছিল। তার দৌরাত্ম্য আর সহ্য করতে পারতুম না। সে কেবল বড়লোক ধরে নিয়ে আসতো আর বলতো—'মামা! তুমি এদের সঙ্গে মেশো, ওদের ছাড়ো। দেখবে, কত বাগান বাড়ী তোমার হবে!' তাইত মাকে একদিন বললুম—'মা! ওকে সরিয়ে দাও।' ত্রৈলোক্য যখন তাকে মন্দির থেকে চলে যাবার হুকুম দিলে তখন ও আমাকে বললে—'মামা! তোমায় যদি পেতুম, তাহলে আবার একটি কালীবাড়ী জাঁকিয়ে তুলতুম। তা' তুমি আসবে না।' হৃদেটা ছিল ভাল, খুব সেবা করতো, সে না থাকলে আমার দেহ থাকতো কিনা সন্দেহ; কিন্তু জমিজমা, বাগানবাড়ী,

টাকাপয়সার লোভেতে শেষে মাটী হ'লো। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়াড়ীর ঠেঙ্গে দশহাজার টাকা নেবার মতলব করেছিল; সেটা ওঁর (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের) জন্য ভেস্তে গেল। মন্দির ছেড়ে চলে যাবার পর আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে এল। যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে দেখা করলুম। সেখানেও ঐ কথা বললে। তারপর থেকে আর দেখা করতে আসে নি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাম বাবু, গিরিশ বাবু, বলরাম বাবু প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণ ঠাকুরকে (দক্ষিণেশ্বর হইতে) কলিকাতায় আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগের কথায় সম্মত হইয়া কলিকাতার বাড়ীতে আসেন। লাটু মহারাজ আমাদের বলিয়াছিলেন— "বাগবাজারে যে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো, ঠাকুর সে বাড়ী পছন্দ করলেন না। বললেন, 'এত ছোট ছোট ঘর, এখানে থাকলে দম বন্ধ হোয়ে যাবে! তোমরা বাপু! অন্য বাড়ী দেখ।' ঠাকুরের কথা শুনে, বলরাম বাবু ওনাকে সেইদিনই (সেইখান হইতে) নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে উনি সাত দিন ছিলেন। সাত দিনের মধ্যে দানাকালী তাঁর পল্লীতে একখানা বাড়ী ভাড়া কোরে ফেললেন।··· বলরাম মন্দিরে একদিন রামলাল (দাদা) দক্ষিণেশ্বর হোতে তাঁর খাটখানি (ক্যাম্পখাট) নিয়ে এলেন। রামলাল (দাদা)কে খাট আনতে দেখে উনি ভারী বিরক্ত হোলেন, বললেন — 'তোরা কি পাঁজি-পুঁথি দেখে বেরুতে ভুলে গেছিস্? এ খাট এখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়ে নিয়ে যা, দরকার হোলে আমি খবর পাঠাব।' তাঁর কথা শুনে রামলাল (দাদা) খাটখানিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। শেষে যেদিন যোগীনভাই মাকে (শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে) দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুরে আনলেন, সেইদিন সেই খাটখানিকে মা গাড়ীতে কোরে নিয়ে এলেন।"

"শ্যামপুকুরে অনেক ডাক্তার এসেছিলো, তার মধ্যে দাড়িওয়ালা একজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ওষুধে ঠাকুরের শরীর গরম হোয়ে গেলো, গলা দিয়ে খুব বেশী রক্ত আউর পুঁজ বেরুতে লাগলো। তখন গিরিশ বাবু ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের নাম করলেন। মহেন্দ্র বাবু দেখতে আসতেন; দু-চার ঘণ্টা থেকে যেতেন; তাঁর সঙ্গে অনেক কথা কইতেন। তিনি ত প্রথমে ঠাকুরকে মানতে চান নি, শেষে যখন তাঁর যুক্তিতে পেরে উঠলেন না, তখন তিনি তাঁকে মেনে নিলেন।"

শ্যামপুকুরে সাধক-লাটুর একটি প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে মহেন্দ্র ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকারের ধারণা ছিল যে, ভাবাবেশ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত একপ্রকার রোগবিশেষ। ঠাকুরের সমক্ষেও তিনি সেই কথা বলিলেন। তাঁহার সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য ঠাকুর একদিন একটি লীলা করিলেন। জনৈক ব্যক্তির গানে সমবেত ভক্তমণ্ডলী একদিন ভাবাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। (শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', প্রথমভাগ, ১৬ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত অংশটি গৃহীত)—

"গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—'আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।' বিজয় (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) সর্ব্বপ্রথম আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁশ নাই, ডাক্তারেরও হুঁশ নাই। ছোট নরেনের ভাবসমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার science (বিজ্ঞান) পড়িয়াছেন কিন্তু অবাক হইয়া

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই; সকলেই স্থির, নিস্পন্দ। ভাব-উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন— যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে!"

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—"এই যা' ভাবটাব দেখলে, তোমার সায়েন্স (science) কি বলে? তোমার কি এসব ঢং বোধ হয়?" ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—"যেখানে এত লোকের হচ্ছে, সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়; ঢং বোধ হয় না।"

শ্রীম-লিখিত আর একটি প্রসঙ্গ তুলিয়া দিতেছি। তাহাও শ্যাম-পুকুরের ব্যাপার। সেইদিন শ্রীশ্রী৺কালীপূজা। "দুপুরবেলা গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া ঠাকুরকে গান শুনাইতেছে।··· গান শুনিতে শুনিতে দুই-তিনটি ভক্তের ভাব হইয়া গেল — খোকার (মণীন্দ্রের), লাটুর। লাটু নিরঞ্জনের পার্শ্বে বসিয়াছিল।"

সেইদিন রাতের কথা আমরা লাটু মহারাজের মুখে এরূপ শুনিয়াছি —"সন্ধ্যার পর হামায় ধূপধুনা সব ঠিক রাখতে বললেন। ঘরে তখন অনেক ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর তাদের সকলকে ধ্যান করতে বললেন। এমন সময় গিরিশ বাবু 'জয় মা' 'জয় মা' বলতে বলতে ঠাকুরের পায়ে ফুলের মালা দিয়ে দিলেন। ঠাকুরের তখন সমাধি-অবস্থা। সেই অবস্থায় মুঠোমুঠো ফুল নিয়ে সকলে তাঁর পায়ে দিতে লাগলেন। হামনেও একটা ফুল তাঁর পায়ে দিয়ে দিলুম। অনেকক্ষণ পরে তিনি সকলকে সুরেন্দর বাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন। হামার আর সেদিন যাওয়া হোলো না। ··· সে রাতে উনি হামাকে কতো কথা বলেছিলেন! সাকার-ধ্যেনের

কথা বলতে বলতে নিরাকার-ধ্যেনের কথাও হামায় জানিয়ে দিলেন। সেদিন বলেছিলেন—'ধ্যেন কি এক রকম রে? এক রকম ধ্যেন আছে, যেখানে নিজেকে ভাবতে হয় একটা মাছ আর ব্রহ্ম যেন অগাধ সমুদ্দুর—তাতে খেলে বেড়াচ্ছি। আর এক রকম আছে, যেখানে নিজের শরীরকে ভাবতে হয় সরা আর মনবুদ্ধি হচ্ছে জল, সেই জলে সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যের ছায়া পড়ছে। ন্যাংটা (অর্থাৎ তোতাপুরী) এক-রকম ধ্যেনের কথা বোলতো। জলে জল, উপর-নীচে জল, তার ভিতরে যেন একটা ঘট রয়েছে—বাহিরে ভিতরে জল। আর একরকম আছে সেখানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে (আত্মারূপ) পাখী আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব হচ্ছে জ্ঞানীর ধ্যেনের কথা। এসব ধ্যেনে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।"

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—'মহারাজ! জ্ঞানীর ধ্যানে আর ভক্তের ধ্যানে পার্থক্য কিছু আছে কি?'

লাটু মহারাজ— আছে বই কি! ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। বাকী যা' নিয়েই ধ্যেন কর না কেনো, শেষে দু'জনাই এক জায়গায় পৌঁছায়। জান্‌বে—ধ্যেন যখন জমে যায় তখন নামও ছুটে যায়, সম্বন্ধের জ্ঞানও ছুটে যায়। তখন একটা রেশ থাকে, বাকী সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। একদিন ত তিনি হামাদের বলেছিলেন—'ধ্যেন জমে গেলে অখণ্ডের বোধ এসে যায়।'

ভক্ত— অখণ্ডের বোধ বলতে কি বোঝায়, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— সে কি মুখে বলা যায়? সে বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সংকল্প-বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধি ভি চলে যায়; তখন শুধু বোধে বোধ থাকে।

শ্যামপুকুরে সাধক-লাটুর আর একটি প্রসঙ্গ আছে। "সেদিন তিনি ভাবাবেশে গায়ের জামা ছিঁড়িতে থাকেন। ঠাকুর তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলিয়া দেন এবং তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে লাটুর ভাব শান্ত হয়।" উপরোক্ত কথাগুলি ভক্ত শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ গুপ্তের (যিনি সেইদিন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন) নিকট শুনিয়াছি।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে সাধক-লাটু শুনিলেন—'কাজলের ঘরে থাকতে গেলে (অর্থাৎ সংসারে থাকতে গেলে) যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।' এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে সংসারত্যাগ করিবার ইচ্ছা জাগিতে থাকে। ঠাকুর তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"ওরে! রামচন্দ্রের যখন বৈরাগ্য হোলো, দশরথ বড় ভাবিত হোয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হলেন— যাতে রাম সংসারত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন— অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বললেন— 'রাম! তুমি সংসারত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার কর।' রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে— তাই চুপ করে রইলেন।" তার পরেই বললেন— 'বুড়ি ছুঁয়ে সংসারের খেলায় থাকবি, তোদের আবার ভয় কি? তোরা কি যে-সে লোক! তোরা জগৎ-কারণকে জেনে জগতে থাকবি, তোদের গায়ে কালী লাগবে কেন?' " (শ্রীম-কথিত)

"এসব ছোকরাদের ভালবাসি কেন জানো? এদের আধার খুব ভাল, ভগবানলাভের জন্য এদের প্রাণে ব্যাকুলতা জেগেছে। এরা একেবারে বেদাগ খই। খই যখন ভাজা হয়, দু-চারটে খই খোলা থেকে

টপটপ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলো যেন মল্লিকেফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। এদেরও তাই। এরা ছেলেবয়স থেকেই মনের বাজে খরচ হোতে দেয় নি।" (যে-সকল যুবকসম্বন্ধে ঠাকুর এই কথাগুলি শ্রীম-কে বলিয়াছিলেন, লাটু মহারাজ তাহাদের মধ্যে অন্যতম)।

"শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর প্রায় তিন মাস ছিলেন। সেখানে হামাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্টো হোতো না। যত ভক্ত আসতেন, তানারা সঙ্গে করে চাঙড়া চাঙড়া খাবার নিয়ে আসতেন। অনেক সময় তিনি সেই সব খাবার, গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতে বলতেন। সে সময় উনি বিশেষ কুছু খেতে পারতেন না, সকালে ভাতের মণ্ড আর বিকেলে একটু সুজীর পায়েস। (শ্রীশ্রী) মা নিজে হাতে সে সব তৈরী করতেন।" (লাটু মহারাজ-কথিত)

শ্যামপুকুরে তিন মাস থাকিয়াও রোগের কোন উপশম হইল না দেখিয়া ডাক্তার সরকার তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে কোন উন্মুক্ত স্থানে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া ভক্তগণ কাশীপুরে একটি উদ্যানবাটী মনোনীত করিলেন এবং সেইখানে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে লইয়া গেলেন।

"ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে হামাদের কাশীপুরে যেতে হোলো। (শ্রীশ্রী) মাও গেলেন। সেখানে লোরেনভাই, রাখালভাই, শরোট্‌ভাই, শশীভাই, (বুড়ো) গোপাল দাদা, ছোটগোপাল, নিরঞ্জনভাই, কালীভাই, বাবুরামভাই—এরা সব বাড়ী ছেড়ে রয়ে গেলো। আর রাম বাবু, সুরেন্দর বাবু, মাষ্টার মশায়, বলরাম বাবু, গিরিশ বাবু, কালী বাবু—এনারা সব খরচখরচা করতে লাগলেন। সুরেন্দর বাবু বাড়ীভাড়া দিতেন, বলরাম বাবু ঠাকুরের পথ্য দিতেন, রাম বাবু হামাদের সব খরচখরচা দিতেন। একদিন টাকাপয়সার

হিসেব রাখা নিয়ে কথা উঠলো। লোরেনভাই বললে, 'এত হিসেব রাখা-রাখি কেন? এখানে কেউ ত চুরি করতে আসে নি?' বাকী হাম্‌নে বললুম, 'তবু একটা হিসেব রাখা ভালো।' হামার কথা রাখালভাই মেনে নিলো। গোপাল দাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার পড়লো।"

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত কৌতূহলপরায়ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি সেদিন কি বলেছিলেন, মহারাজ?'

লাটু মহারাজ— আরে! হাম্‌নে আর কি বলবে। বললুম— দেখো ভাই! গেরস্থর পয়সা ঠাকুর বেফজল খরচ হোতে দিতেন না। একটা হিসেব রাখলে যদি গণ্ডগোল মিটে যায়, সেই ত ভালো। হিসেব রাখতে আপুনাদের আর কতো সময় যাবে? বাকী না রাখলে শেষে কথা উঠতে পারে। তারপর ভক্তটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— তিনি এমন হিসেবী ছিলেন, কি বলবো! একদিন ত দক্ষিণেশ্বরে একজন ভক্তকে একটি পিদ্দীম্ জ্বালতে বললেন। ভক্তটি তিন-চারটে কাঠি নষ্ট করলে, তবু পিদ্দীম্ জ্বালতে পারলে না। তখন তিনি তক্তা থেকে নেমে নিজেই দেশ্‌লাই ধরালেন আর বললেন— 'ওগো! গেরস্থরা অনেক কষ্ট করে পয়সা বাঁচিয়ে তবে সাধুকে দেয়। সে পয়সার বাজে খরজ হতে দেওয়া উচিত হয় কি?' আর একদিন হাম্‌নে তামাক সাজতে যেই দেশ্‌লাই জ্বালতে গেছি অমনি উনি বকে উঠলেন, বললেন— 'যা রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে আয়।' তিনি এমনি ভাবে গেরস্থর পয়সা হিসেব করে খরচ করতে বলতেন।

"কাশীপুরে গোড়াগুড়ি মা (শ্রীশ্রীসারদাদেবী) ঠাকুরের সব পথ্য আর আহার নিজের হাতে তৈরী করতেন। বাকী একদিন তিনি দুধের বাটী নিয়ে সিঁড়ি উঠতে উঠতে পড়ে গেলেন। দুধ ত গেলই, আউর মায়ের পাও মচ্‌কে গেলো। বাবুরামভাই আর লোরেনভাই দু'জনে ধরে মাকে ঘরে

নিয়ে গেলো। মায়ের পা খুব ফুলে উঠলো। তখন হামাদের বড় মুশ্‌কিল হোলো। ওনার পথ্য কে রাঁধবেন? রাম বাবু একজন বামুন পাঠিয়ে দিলেন; সেই-ই ঠাকুরের পথ্য তৈরী করতে লাগলো আর হামাদের সব রান্না-বান্না করতে লাগলো। সেই সময় ঠাকুর হামাকে বললেন— 'স্তাখ! তুই 'ইথানকার সব জিনিস (অর্থাৎ অন্নব্যতীত আহার ও পথ্যাদি) নিয়ে আসবি।' আর বললেন— 'আমার মলমূত্র সাফ্ করবি।'— 'হুকুম হোলেই সাফ্ করবো— হাম্‌নে ত আপুনার মেস্তর আছে'— এই কথা বলিয়া সেবক-লাটু সেই দিন হইতে সেই কাজে লাগিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মহারাজ! কাশীপুরে আপনারা সারাদিন তাঁর সেবাই করতেন, উপাসনা করতেন না?'

ভক্তের এই প্রশ্নটিতে লাটু মহারাজ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হন, বললেন— "আরে! তাঁর সেবাই ত হামাদের উপাসনা। হামাদের কি আর অন্য উপাসনা আছে? তোমরা ভাবো উপাসনা না-জানি কেমন একটা ব্যেপার —এমনভাবে বসতে হবে, অমনভাবে নিশ্বেস ফেলতে হবে, অমুক দিকে মুখ রাখতে হবে, এতোগুলো মন্তর বলতে হবে, বাকী এসবে আস্‌লি উপাসনা হয় না। আস্‌লি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি বলতেন— 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (অর্থাৎ ইষ্ট) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাঁকে নাওয়াচ্ছো, তাঁকে খাওয়াচ্ছো, তাঁকে হৃদয়ে বসাচ্ছো, তাঁকে সাজাচ্ছো, গোজাচ্ছো, এমন কি, তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করছো'। হামাদের ত সেথানে তাই হোতো।"

সেবা-অন্তঃ-প্রাণ এই নিরক্ষর সাধকটি যে ভাব লইয়া ঠাকুরের সেবা করিতেন, উপরোক্ত কথা কয়টিতে সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। তৎকালে

যে কয়জন যুবক আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক ঠাকুরের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অন্তরে এই ভাব ছিল।

জনৈক ভক্ত একদিন বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন —'মহারাজ! ঠাকুরের মত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির, যিনি অনুক্ষণ সমাধিতে থাকিতেন, তাঁর এরূপ রোগভোগের কারণ কি?'

লাটু মহারাজ— হামি তার কি জানে? মাষ্টার মশায়কে বলতে শুনেছি যে, অশুদ্ধ লোকের দর্‌শন-পর্‌শনের জন্য তাঁর অসুখ হয়েছিল। গিরিশ বাবু বলতেন, 'এ তাঁর লীলা, মানুষের দুঃখ হরণ করবার ছল করেছেন।' রাম বাবু বলতেন— 'এমন অসুখ না হোলে ঠাকুরকে চিনতো কে? সুস্থ শরীরে সবাই ত ভগবানে মন রাখতে পারে। বাকী অসুস্থ শরীরে যিনি অনুক্ষণ নির্ব্বিকল্পে থাকতে পারেন, তিনিই অবতার।' লোরেন-ভাই বলতো— 'ওরে! আমাদের সেবা নেবেন, তাই তিনি এমন অসুখ করেছেন। ভাবছিস কেন? তাঁর অসুখ না হোলে আমাদের কি সেবা করবার এমন সুযোগ হোতো? ওরে! এমন সুযোগ ছাড়িস নি। সবাই মিলে এমন সেবা লাগিয়ে দে, যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে না পারেন।' রাখালভাই বলতো— 'তিনি ত আমাদের বিড়ে নিচ্ছেন।' শরোট্‌ভাই বলতো— 'আমরা বুঝি আর না বুঝি, এরই মধ্য দিয়ে একটি মহান উদ্দেশ্য সফল হোচ্ছে।' শশীভাই বলতো 'জগতের দুঃখু দেখে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুঃখে রোগ ভোগ করছেন।' আর কেদার বাবু ত হাতজোড় কোরে ঠাকুরের সামনে বলতেন —'প্রভু! আর কত ছলনা করবেন!' বলরাম বাবু বলতেন— 'আর যে শুনতে পারি নি, দয়াময়! তোদের ঠাকুরের অসুখ করেছে শুনতে শুনতে যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।' ঠাকুর তাতে বলেছিলেন— 'ওগো!

যে রয় সেই সয়, যে সয় সেই মহাশয়।' নানা লোকে নানা কথা বল্তো। সব হামার মনে নেই।

ভক্ত— আপনার কি মনে হয় মহারাজ?

লাটু মহারাজ— আরে! মনুষ্যদেহে জন্ম নিলেই শরীর ছাড়তে হয়, এ ত জানা কথা। তিনিও তাই করেছেন।

ভক্ত— তিনি ত সমাধিতে লীন হোতে পারতেন— চৈতন্য মহাপ্রভুর মত?

লাটু মহারাজ— তা' পারতেন! বাকী তাতে তাঁর ভক্তদের কষ্ট হোতো। ভগবান ভক্তদের মনে দুঃখু দেন না, জানো ত?

ভক্ত— আপনাদের মনে রোগের কষ্ট দেখে দুঃখ হোতো না, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— তাঁর কি কষ্ট ছিলো? তিনি ত বলতেন— 'দেহ জানে আর রোগ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।' তাঁর কষ্ট কুছু ছিল না। এক এক সময় তাঁর এমন অবস্থা হোতো যে সারা দেহে পুলক ঝরে পড়তো। হামনে ত দেখেছে যে তিনি তখন কেমন আনন্দে থাকতেন। যখন কথা বলতে পারতেন না তখনও দেখেছে যে, তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন। এমন আশ্চর্য্য ব্যেপার হোতো যে কী বলবো! বাহিরের লোক এসে বলতো তাঁর কত কষ্টই না হচ্ছে আর সেই সময় হামাদের কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝাতেন, তাঁর ক্যোন কুছু কষ্ট নেই। সত্যি যদি তাঁর দুঃখু কষ্ট হোতো, তাহলে কি তিনি হামাদের এতো আনন্দ দিতে পারতেন? এক একদিন ত তিনি হামাদের কীর্ত্তন করতে বলতেন। কীর্ত্তনে ভুল হোলে আবার আখর্ বোলে দিতেন। হামাদের ত কেবল বলতেন— "ওরে! ব্রহ্ম অলেপ। তিনগুণ তাঁতে আছে, বাকী তিনি তাদের থেকে আলগ্, যেমন বায়ু— গন্ধ ছড়ায়, বাকী নিজে আলগ্

থাকে।” কোন কোন দিন বা বলতেন— “ওরে! ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, সেখানে শোক, দুঃখ, জরা, মরণ, ক্ষয়, বৃদ্ধি কুছু নাই।” আবার কোন কোন দিন বলতেন— “ওরে! দেখছি এঁরই ভিতর সব কুছু। তিনি আর হৃদয়মধ্যে যিনি, সব এক অখণ্ড।” যিনি রোগে পড়ে এমন ভাবে থাকতে পারেন তাঁর আবার কষ্ট কুথায়? বাকী তোমরা (সংসারীরা) বুঝবে তাঁর ভারী কষ্ট হোতো। তোমরা দেহকে বোঝো, তাই দেহের কষ্ট দেখে আঁতকে উঠো। বাকী তিনি (ঠাকুর) তা' বুঝতেন না— তিনি সব দেহী দেখতেন। আরে! তা' না হোলে (তিনি আনন্দে রয়েছেন না দেখলে) লোরেনভাই, কালীভাই, তারকভাই—যারা তাঁকে এতো ভালবাসতো, তারা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতো?

জনৈক ভক্ত— ওনারা কোথায় গিয়েছিলেন, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— জানো না? তারা সব একবার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে গাছের (বোধিবৃক্ষের) তলায় বসে ধ্যেন করেছিলো। শুনেছি, লোরেনভাই নাকি ধ্যেন করতে করতে কেঁদে উঠেছিলো আর পাশে তারক দাদাকে জড়িয়ে ধরেছিলো। সেখানে ত লোরেনভাই তারক দাদার দেহে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করতে দেখেছিলো। কালীভাই ত সেইখানে ধ্যেনে কাঠ হয়ে বসে থাকতো। আবার তাই কি? তারা এখানে ফিরে এসেও (প্রায়ই) দক্ষিণেশ্বরে রাত কাটিয়ে আসতো। এক একবারে সাত-আট দিন সেখানে থেকে যেতো। যারা তাঁকে এত বুঝতো, এতো ভাল-বাসতো—সেই লোরেন, রাখাল, শরোট্, কালীভাই তাঁর দুঃখু-কষ্ট দেখলে কখনো কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে চাইতো, না থাকতে পারতো? কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় বললেন— ‘তুমি না বেদান্ত পড়েছো?’

ভক্ত— কিছু কিছু পড়েছি, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— সেখানে কি বোলেছে ? যিনি সচ্চিদানন্দকে দেখেন, তিনি সচ্চিদানন্দই হোয়ে যান,— এ কথা ত লিখা আছে ? তিনি (ঠাকুর) ত বলতেন, '(সচ্চিদানন্দ) পরশমণি ছুঁলে সব সোনা হোয়ে যায়।' তবু তোমাদের সংশয় ছুটবে না ?

এর পর সেই ভক্তটির সহিত নানা কথা চলিতে থাকে। 'বলরাম মন্দিরে' অধ্যায়ে এই কথোপকথনের কিয়দংশ আবার দেওয়া হইয়াছে।

এইবার আমরা কাশীপুরের কথায় ফিরিয়া যাই। কাশীপুরে নরেন, রাখাল, বাবুরাম প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতেন। লাটু তাহাতে যোগ দিত। একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কীর্ত্তনীয়াদলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন — 'তোরা ত বেশ রে! কেউ মরে আর কেউ হরি হরি বোল বলে।' উপস্থিত ভক্তটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পরক্ষণেই অতি আহ্লাদের সহিত বলিলেন— 'ওরে! সুরটা এই রকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে ঐ কলিটা দিতে হয়।' উপস্থিত যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন। ··· তখন তাহারা উদ্দাম কীর্ত্তন শুরু করিলেন। (শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী হইতে সংগৃহীত)।

অতিরিক্ত কীর্ত্তন করিলেও তৎকালে সাধক-লাটু আপন ভাবোন্মাদনাকে বাহিরে প্রকাশিত হইতে দিত না। এই কথাগুলি ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয় (আমাদের অনুরোধে যে লিখিত নোট পাঠাইয়াছেন তাহাতে) লিখিয়াছেন—

কাশীপুর বাগানে অবস্থানকালে ছাপ্‌রা জেলার এই নিরক্ষর সেবকটির মধ্যে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) একটি

নূতন ভাব দেখিয়াছিলেন। তাহা তিনি তাপস-লাটু মহারাজের অনুধ্যানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন— "যাহা হউক লাটুকে দেখিলাম যে, সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া আছে এবং সমানভাবে কথা কহিতেছে। আগে যেমন সকলকে বাবু বলিয়া ডাকিত, যথা নরেন বাবু, তখন দেখিলাম, সে ভাবটা নেই। 'হ্যাঁরে লোরেন!' 'হ্যাঁরে শোরোট!' 'হ্যাঁরে রাখাল'— এইরূপ কথা কহিতেছে। প্রথমটা শুনিয়া আমি একটু চমকিয়া উঠিলাম যে, লাটু আবার এরূপভাবে কথা বলিতেছে! এইজন্য ধীরে ধীরে তাহার উপর দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখনই আমার মনে আর একটি ভাব আসিল। দেখিলাম লাটুর মুখ যেন আর পূর্ব্বমত নয়—দীনতা, সঙ্কোচ, ভয় এসব ভাব নেই। মুখ যেন খুব প্রফুল্ল, হৃদয়ে যেন জোর এসেছে, গলার আওয়াজ পরিবর্ত্তিত, পূর্ব্বের জীবন যেন চলিয়া গিয়াছে এবং নূতন জীবন, নূতন লোক, নূতন প্রাণ, নূতন কণ্ঠস্বর হইয়াছে। এই দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কী পরিবর্ত্তন!"

শুনি, সমাধিতে নাকি মানুষের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে— তাই কি কাশীপুরে সাধক-লাটুর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল? আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে ভরসা পাই যে, সাধক-লাটু কাশীপুরে সমাধির প্রথম আস্বাদন পান। তাই মনে হয় তাঁহার স্বভাব ও প্রবৃত্তি মানবীয়তার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক দিব্য রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সমাধির অপূর্ব্ব আস্বাদনে আস্বাদকের যে দিব্যজীবন লাভ হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ দীক্ষাকালে সাধকগণ দিব্যজীবনেরই বীজ পাইয়া থাকেন। সেই বীজ সাধনকালে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সমাধিতে পুষ্পিত হইয়া থাকে। সমাধিরূপ পুষ্পসৌরভে সাধকগণের মন দিব্য আনন্দে পরিপ্লুত

হইয়া উঠে। তখন সাধকগণ দিব্য হ্লাদিনী শক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া আপন মানবীয়তার মোহ ও সঙ্কোচ হইতে মুক্ত হন। তৎকালে প্রত্যেক সাধকেরই (সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বাবস্থায়) উদাসীন ও অভীঃ অবস্থা দেখা যায়। তখন তাঁহাদের পাপপুণ্য, ভালমন্দ, উচ্চনীচ-রূপ তারতম্য-জ্ঞাপক জাগতিক জ্ঞান তিরোহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাধিতেই সাধকগণ বুঝিয়া থাকেন—জ্ঞান কি? সত্য কি? আনন্দ কি? পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি? কারণ, সেইখানেই প্রত্যেকটি নিজ মহিমায় স্বতঃ-উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করে; সেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-সাপেক্ষ হইয়া জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, উভয়-নিরপেক্ষ জ্ঞানের যে স্বরূপ-অবস্থান তাহাতেই তখন সাধকগণ বাস করেন। এক কথায় মায়াবর্জ্জিত হইয়া তৎকালে সাধকগণ 'স্ব'স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন— 'সমাধির জগৎই আলাদা।··· সে জগতের খবর মুখে বলা যায় না।··· ব্রহ্মজ্ঞান যার হয়, সে খবর দিতে পারে না।' দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেন— 'চার বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে পাঁচিল-ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হোলো। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকি মেরে যা' দেখলে, তাতে অবাক হোয়ে হা! হা! হা! বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে, সেই হা! হা! হা! করে পড়ে যায়! তখন খবর আর কে দেবে?'

কাশীতে একজন ভক্ত একদিন লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—'মহারাজ! ভাবে ও সমাধিতে পার্থক্য কি?'

তদুত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—'ভাবে সাধক অবাক হোয়ে আনন্দের খেলা দেখতে থাকে, সেখানে সাধক নিজে স্বাধে আনন্দকে। বাকী সমাধিতে সাধক নিজে আনন্দময় হোয়ে যায়, দেখবার আর কেউ থাকে না।'

ভক্তটি আরো অনেক প্রশ্ন করিয়াছিল। সেগুলি যথাস্থানে বলা হইবে। সেইদিনকার কথোপকথনের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"জানো! সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখাও কুছু নয়— ওসব দেখলে শুধু বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ পবিত্র হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক আছে— যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধিবিচার দিয়ে জানা যায় না আর মুখেও তা' বলা যায় না। একদিন ত কাশীপুরে ওনার মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম, তখন ত হামার সাম্‌নে সেই মুল্লুক খুলে গেলো। সেই মুল্লুকে যা' দেখেছি তা' চোখ ধরতে পারে নি, যা' আস্বাদন করেছি তা জিব্ নিতে পারে নি। কিন্তু প্রত্যেকটি অনুভব করেছি।"

ভক্ত— এর আগে কি কোনদিন সেই মুল্লুকের খবর পেয়েছিলেন, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— না, হামনে এর আগে সে মুল্লুকের খবর পাইনে।

ভক্ত— এর আগেও ত জ্যোতিঃ দেখেছিলেন, মূর্তি দেখেছিলেন, সে-সব থেকে কি সেদিনকার দর্শন পৃথক্ হোয়েছিল?

লাটু মহারাজ— দেখো! এসব কথা জিগ্‌গেস করতে নেই, আর কারুর কাছে বলতেও নেই। তোমার যদি সে মুল্লুকের খবর জানবার ইচ্ছে থাকে, এখন থেকে নাম-জপে, ধ্যেন-ধারণায় লেগে যাও। একদিন না একদিন গুরুকৃপায় তোমারও সমাধি হয়ে যাবে। তখন তুমিই সব বুঝবে, হামাকে কোন কুছু জিগ্‌গেস করতে হবে না।

সাধক-লাটুর সম্বন্ধে শশী মহারাজ-কথিত একটা প্রসঙ্গ আছে, মনে হয় উহা ঐদিনেরই প্রসঙ্গ—

"একদিন লাটুকে ঠাকুর মাথায় হাত বুলোতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি লাটুর হাত থেমে গেছে, দেহ স্থির, গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি দু-চার বার তাকে ডাকলুম, কোন উত্তর পেলুম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম তাতেও কোন সাড়া পেলুম না। তখন ঠাকুর বললেন—'ওকে এখন বিরক্ত করিস নি। ওর মন কি এ জগতে এখন আছে?' ঠাকুরের কথামত আমি আর তাকে (লাটুকে) বিরক্ত করি নি। তারই পাশে বসে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম।"

এইখানে বলরাম মন্দিরের একটা কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে সমাধির প্রকার-ভেদ জানা যাইবে।

জনৈক ভক্ত—মহারাজ! জড়-সমাধি বলতে কি বোঝায়?

লাটু মহারাজ— উনি বলতেন— "যে সমাধিতে 'আমি' মুছে যায় তা' জড়-সমাধি, যেমন জ্ঞানীর। আর একরকম সমাধি আছে, এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে, রস-রসিকের 'আমি' থাকে, আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি' থাকে। এর নাম চেতন-সমাধি। চেতন-সমাধিতে ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। চেতন-সমাধিতে নির্ব্বিকল্প হয় না।"

ভক্ত— নির্ব্বিকল্প সমাধি কি, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— তোমার মত ছেলে-মানুষ ত হামি দেখি নি। সমাধির কথা মুখে বলা যায় কি যে, হাম্‌নে তোমাকে নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা বোঝাবে, ওসব কেউ কাউকে বলতে পারে না। উনি বলতেন— "নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মানুষ একুশ দিন থাকতে পারে, তার পর দেহত্যাগ হয়। সেখান থেকে ফিরে আসতে প্রায় কেউ পারে না। যাঁরা অবতার বা ঈশ্বরকোটি তাঁরাই শুধু নির্ব্বিকল্প হবার পর (জীবের উপকারের জন্য বা লোকশিক্ষার

জন্য) নেমে আসতে পারেন।" একবার ত কাশীপুরে লোরেনভায়ের ঐ রকম সমাধি হোয়েছিল। নিরঞ্জনভাই তাই না দেখে ঠাকুরকে এসে বললেন— 'লোরেন বাবু মারা গেছেন। তাঁর দেহ ঠাণ্ডা হোয়ে গেছে।' উনি (ঠাকুর) ত নিরঞ্জনভায়ের কথা শুনে হেসে ফেললেন। যখন আবার লোরেনভায়ের হুঁশ হোলো তখন নিজের দেহ নিজেই খুঁজে পেলে না। সামনে একজনকে দেখে বললে— 'আমার শরীর কোথায় ?' সেই লোকটি তখন গায়ে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে— 'এই যে।' তখন লোরেনভায়ের বিদেহ আত্মা নিজের দেহে আবার ফিরে পেলে। আর একবার মায়ের (শ্রীশ্রীসারদাদেবীর) এমন ভাব হোয়েছিল (বৃন্দাবনে)— সেখানে তিনিও নিজের দেহ খুঁজে পান নি। শেষে সব ঠিক হোয়ে যায়।

সমাধির এই সব প্রকারভেদ শুনিয়া এবং পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজের স্বমুখের কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হয় যে, লাটু মহারাজ কাশীপুরে চেতন-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে কোন সমাধি (চেতন বা জড়)-প্রাপ্তির পথে সাধকের কতকগুলি অলৌকিক শক্তি (শাস্ত্রে যেগুলিকে সিদ্ধাই বা যোগবিভূতি বলে) জন্মায়। তন্মধ্যে অন্তর্য্যামিত্ব ও অনাগত-জ্ঞাতৃত্ব প্রধান। মনে হয়, সেইকালে তাঁহার সেইসব শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল।

একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে (কাশীপুরের বাগানে) বলিলেন— "দেখ ভাই লোরেন! কিশুব বাবু টাউন হলে কিমন লিকচার কোরে! তুই ভাই ইমন লিক্‌চার করবি। আর হামি তোর জন্য এক কুঁজো জল লিয়ে বসে থাক্‌বো।" এই কথাগুলি ভবিষ্যৎকালে সফল হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে একখানি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন— 'তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি; আমি এখানে লেক্‌চার দিয়ে বেড়াচ্ছি। দুঃখু এই যে

লেকচারের সময় লাটু এখানে হাজির থাকিতে পারিল না।' (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কথিত)। কলিকাতায় লেক্‌চারে লাটুর ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল।

কাশীপুরের বাগানে একদিন বুড়োগোপাল দাদার বাসনা হইল যে, তিনি সাধুসন্ন্যাসিগণকে গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষমালা দান করিবেন। তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন— "এখানে এই যুবক-সেবকেরা হাজারি অর্থাৎ প্রত্যেকেই হাজার সাধুর সমান। তুমি এদের সৎকার কর।" গোপাল দাদা তাহাই করিলেন এবং গোপাল দাদার দেওয়া বস্ত্র হইতে ঠাকুর নিজ হাতে তদীয় সেবকগণকে একখানি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও একগাছি করিয়া রুদ্রাক্ষের মালা দান করিলেন। সেবক লাটু তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া সেইদিন হইতে আপনার মন গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। (এই প্রসঙ্গটি বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়-কথিত)।

পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজের কথোপকথন হইতে কতকগুলি প্রসঙ্গ পাইয়াছি, যাহা কাশীপুরের ঘটনা।

"কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিলো। সেদিন লোরেনভায়ের গান হোলো আর সুরেন্দর বাবু একছড়া ভালো গোড়েমালা ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। বলরাম বাবু ও মাষ্টার মশায় একখানা কাপড় ও আংগা দিলেন, আর একজোড়া চটিজুতো কে এনেছিলো জানি না। সেটা আবার চুরি যায়। তখন যে জুতো-জোড়া আনা হয়েছিলো তা এখনও মঠে পূজো হয়।"

"জানো! নিজের একখানা ফটো দেখে একদিন তিনি বললেন— 'এ যে দেখ্‌ছি মহাযোগীর মূর্ত্তি। এর পূজা করবো, ফুল নিয়ে আয়।' ভবনাথভাই ঠাকুরের হাতে ফুল দিলেন আর তিনি (ঠাকুর) নিজের ফটো

নিজেই পূজা করলেন। (এই ঘটনাটি দক্ষিণেশ্বরে হইয়াছিল, কিন্তু লাটু মহারাজ নিম্নলিখিত কাশীপুরপ্রসঙ্গের সহিত ইহা বলিয়া যান)। আর একদিন তিনি নিজের একখানা ফটো (শ্রীশ্রী) মাকে দেখিয়ে বললেন—'ঘরে ঘরে এর একদিন নিত্য পূজা হবে, দেখ্‌বে।' এখন ত দেখতে পাচ্ছি যে তাঁর কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ··· একদিন তিনি রামলাল দাদার সঙ্গে উপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন। নীচে তখন গিরিশ বাবু, রাম বাবু, অতুল বাবু, অক্ষয় মাষ্টার, হরিশভাই—ইনারা সব ছিলেন। হামি আর শরোট্‌ভাই তখন উপরে তাঁর বালিশ, বিছানা, লেপ, তোশক সব রোদে দিচ্ছিলুম। শুনেছি, সেদিন তিনি সকল ভক্তকে—'তোমাদের চৈতন্য হউক' বোলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, আর তাদের ছুঁয়ে দিয়েছিলেন।" (কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে এখনো ১লা জানুয়ারীতে সেই উৎসব হয়)। জনৈক ভক্ত এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি সেদিন উপর থেকে নেমে এলেন না কেন? শুনেছি, সেদিন তিনি 'কল্পতরু' হয়েছিলেন—যে যা' চাইছিলো তাকে তাই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।' তাহাতে লাটু মহারাজ উত্তর দেন—"তিনি ত আশীর্ব্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর কোরে দিয়েছেন। আবার কি চাইবো তাঁর কাছে? ··· দোলের দিন সকলে মিলে তাঁর (ঠাকুরের) পায়ে আবীর দিলুম। তিনি হামাদের সব আশীর্ব্বাদ করলেন। সেদিন লোরেনভাইকে তিনি বললেন—'তুই যে জন্য কাঁদছিস্, তোকে তাই দেবো। কিন্তু তুই আগে আমার জন্য খাট্‌। তোর জন্য আমি (ঠাকুর) এতোদিন দুঃখ করলুম, তুই এদের (গুরুভাই ও সর্ব্বসাধারণের) জন্যে একটু দুঃখ কর। আমি (ঠাকুর) ষোলো-আনা খেটেছি, তুই এক আনা খাট্—তোকে গদি করে দেবো।'

তাইতো লোরেনভাই তাঁর অন্তর্দ্ধানে হামাদের লিয়ে মঠ বানালে। ··· শিবরাত্রির দিন ঠাকুর রাতভোর শিবনাম শুনলেন। সেদিন লোরেন-ভাই ধুনি জ্বেলে কাশীপুরের বাগানে বসে গেলো। সেইখানে সবাই মিলে রাতভোর শিবপূজা আর কীর্ত্তন করেছিলো! সে রাতে তিনি বলেছিলেন — স্থাথ্! শিব হচ্ছেন মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক আবার মহা-ত্যাগী। সচ্চিদানন্দ-সাগরের তিন গণ্ডুষ জল তিনি পান ক'রেছিলেন, তাই তাঁর নাম ভোলা মহেশ্বর। শুকদেব মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, সন্ন্যাসীর রাজা। তিনি সেই সাগরের জল স্পর্শ করেছিলেন আর দেবর্ষি নারদ দূর থেকে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর দেখেছিলেন, তাই তিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ। সেখানকার এক কণা বাতাস জীবের গায়ে লাগলে জীব গলে যায়। দরশন-পরশন ত দূরের কথা! ... তাঁর (ঠাকুরের) জন্য (শ্রীশ্রী) মা একদিন তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেলেন। সেখানে যাবার সময় তিনি (শ্রীশ্রী) মাকে আঙ্গুল নেড়ে দেখিয়েছিলেন যে কুছু হোবে না। ··· একদিন ত লোরেনভাই ধ্যানে বসে একজন গুরুভাইকে বললে— 'আমায় ছোঁ তো।' যেই সে ছুঁলে অমনি তারও দেহের মধ্যে কেমন হোতে লাগলো। ঠাকুর উপরের ঘর থেকে সে ব্যেপার বুঝতে পারলেন। বললেন— 'ওকে (অর্থাৎ লোরেনভাইকে) উপরে ডেকে নিয়ে আয় ত।' লোরেনভাই তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন— 'কি হচ্ছিল গো? আগে কিছু জমাও, তবে ত খরচ করবে। জমাবার আগেই খরচ করছো, এমন করলে চলবে কেন?' ··· একদিন ত কালীভাই (স্বামী অভেদানন্দ) ঠাকুরকে বুদ্ধদেবের কথা জিগ্গেস করলেন। কালীভায়ের তখন ধারণা ছিল যে, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানতেন না। একদিন তাই নিয়ে খুব তর্ক হোলো। তাতে তিনি বললেন—'বুদ্ধদেব নাস্তিক কেন হবেন গো।

তিনি যে স্বরূপকে দেখেছিলেন, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।' ··· রামবাবু একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যেতে চাইলেন। নিরঞ্জন-ভাই তাকে যেতে দিল না। তখন তিনি (রাম বাবু) হামার হাতে কুছু মিষ্টি আর মালা দিয়ে বললেন—'ওরে! এগুলো ওপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।' এমন করে বলতে শুনে হামার মনে বড় দুঃখু হোলো। হামি ত নিরঞ্জনভাইকে বললুম—'ওনাকে উপরে যেতে দাওনা, ভাই। আপনা আপনির মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে? হামার কথা নিরঞ্জনভাই তখন কানে তুললে না। হাম্‌নে তাই বললুম—'শ্যামপুকুরে সেদিন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসে-ছিলো, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে আর আজ এনার মত লোককে ছাড়তে চাইছো না!' নিরঞ্জনভায়ের তখন কি মনে হোলো, রাম বাবুকে বললে—'আপুনি উপরে যান।' সেদিন উপরে যেতে উনি (ঠাকুর) হামায় বললেন—'গ্যাখ! কারুর কখনও দোষ দেখবি নি, লোকের কেবল গুণ দেখবি।' তাঁর কথা শুনে হামার বড় দুঃখু হোলো, হাম্‌নে ফিন্ তাঁর (নিরঞ্জন স্বামীর) কাছে এসে বললুম—'ভাই! হামার মত মুখ্যুর কথায় দুঃখু করিস নি।' ··· একদিন ত ঠাকুর কাশীপুরে হামায় বললেন—'ওরে! গিরিশ এসেছে, তামাক সেজে খাওয়া।' পরে বললেন—'যা শীগগীর ফাগুর দোকান থেকে গরম কচুরী ভাজিয়ে নিয়ে আয়।' হাম্‌নে তাই করলুম। সেদিন তিনি নিজে গিরিশ বাবুকে এক-গেলাস জল গড়িয়ে দিলেন। গিরিশ বাবুর ভারী ইচ্ছে ছিল—এক বছর তাঁর (ঠাকুরের) সেবা করবেন। পাকা এক বছর তিনি (ঠাকুর) তাঁর সেবা নিয়েছিলেন। হামাদের ত গিরিশ বাবু বলতেন—'ঠাকুর আমায় বুড়ো বয়সে কৃপা করলেন।* জোয়ান বয়সে যদি তাঁর কৃপা

পেতুম তাহ'লে সন্ন্যাস কি জিনিস একবার দেখিয়ে দিতুম।' যার পাঁচ-সিকে পাঁচ-আনা বিশ্বাস তার মুখে একথা সাজে! বাকী তোমার-আমার মুখে সে কথা সাজবে কেনো? ··· একদিন তিনি (ঠাকুর) হামায় বললেন— 'হরিশের খবর কি? এখানে আসে না কেন? একবার তার বাড়ী গিয়ে খবর নিস্। আর আসবার পথে নিত্যগোপাল, তারক এদের সব আসতে বলবি।' (তখন তারক বাবু কাঁকুড়গাছির বাগানে থাকিয়া সাধনা করিতেন)..··· নিত্যগোপালকে ঠাকুর উপদেশ দিতে বললেন। নিত্য-গোপাল ভয় পেয়ে রাজী হচ্ছিল না। তা' দেখে ঠাকুর বললেন— 'আমায় দেখে তোমার কষ্ট হয় না? আমি বকৃতে বকৃতে গেলাম। তুমি উপদেশ (দীক্ষা) দাও; কোনও ভয় নেই। যদি কুছু দোষ হয় তো আমার।' ··· এই রকম একটা কথা তিনি বিজয় (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে) বাবুকেও বলেছিলেন— 'তুমি ত অদ্বৈতবংশের, তুমি উপদেশ দিলে কোন দোষ হবে না।' ···একদিন ত সুরেন্দর বাবু তাঁর কাছে অভিমান জানালেন, বললেন— 'অপরের কাছে টাকা চাইবার এদের (অন্যান্য ভক্তদের উপলক্ষ করিয়া) কি দরকার ছিলো? আমাকে ত এরা জানাতে পারতো?' তাতে ঠাকুর বললেন— 'তুমি ত দিচ্ছই।' তারপর সুরেন্দর বাবু নেমে গেলে কেদার বাবুকে (বৃদ্ধ ভক্ত কেদার চাটুজ্জেকে) তিনি বললেন— 'যাও একবার সুরেশকে বুঝিয়ে বলো, বকাবকি করতে মানা করো।' ··· একদিন ত তিনি শশীভাইকে বড় আদর করলেন, বললেন— 'গ্যাখ! তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস; তোরা যদি বলিস তাহলে একবার সেখানকে দেখে আসি।' একথা (শ্রীশ্রী) মার কানে গেলো। তিনি যোগীনভাইকে দিয়ে হামাদের বলে পাঠালেন আজ বাহিরের কাউকে যেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে না

দেওয়া হয়। সেদিন দুপুরে কোন বাহিরের লোককে ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া হোলো না। বাকী একটা পাগলী (এই মেয়েটি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত ঠাকুরের কাছে আসিত; অতিরিক্ত সাধন-ভজন করায় তাহার মাথা গরম হইয়া যায়।) এসে সেদিন ভারী বিরক্ত করতে লাগলো। নিরঞ্জনভাই তাকে ত উপরে যেতে দেবে না, বাকী সেও উপরে যাবে। উপর থেকে খবর এলো যে, ঠাকুর পাগলীকে ডাকছেন; তখন শশীভাই তাকে উপরে নিয়ে গেলো। ··· একদিন রামলাল (দাদা) সঙ্গে কোরে একজনকে আনলেন। তিনি ঝাড়ফুঁকে ওস্তাদ ছিলেন। দেখে শুনে বললেন— ওনাকে আবার ঝাড়ফুঁক করতে হবেক কেন। ইচ্ছে করলেই ত উনি ভাল হয়ে যেতে পারেন। রামলাল (দাদা) তবু একবার তাঁর (ঠাকুরের) গা-টা ঝেড়ে দিতে বললেন। বাকী যেই তিনি ঝাড়ফুঁক করতে যাবেন, অমনি ঠাকুর তাকে মানা করলেন, বললেন— 'এমন কোরে শক্তিক্ষয় করতে নেই।' ··· একদিন ত জব্বলপুর থেকে একজন লোক এলেন। তিনি ভারী নাস্তিক, কখন কারও কাছে প্রার্থনা করতেন না, বলতেন— 'ঈশ্বর নেই, তা' আবার কাকে ডাকবো।' তার কথা শুনে ঠাকুর বললেন— 'গ্যাখ! এই বলে প্রার্থনা করতে ত আপত্তি নেই— যদি কেউ থাকেন, তাহলে আমার কথা শুনুন। ঠাকুরের কথা শুনে তিনি বললেন— 'আচ্ছা! আপনার কথামত তাই বলবো।' জানো? পরে সেই লোকই ঠাকুরের মহাভক্ত হয়ে উঠলো। ঠাকুরের কাছে এসে যে তাঁর কথামত চলেছে, সেই পরে একজন ভক্ত হয়ে উঠেছে।··· কাশীপুরে লোরেনভাই একদিন ঠাকুরের কাছে বললে— 'আমায় এমন করে দিন, যাতে দিনভোর সমাধিতে থাকতে পারি।' তিনি (ঠাকুর) তা' শুনে বললেন— 'তুই ত ভারী

হীনবুদ্ধি।'... কাশীপুরের বাগানে কোন গুরুভাই মাছ ধরবার জন্তে একদিন পুকুরে ছিপ ফেলেছিলো। তা' দেখে হাম্‌নে তাকে জিগ্‌গেস করি — 'হ্যাঁ ভাই ! তুই ত বেদান্ত পড়েছিস, তোর কোন্ বেদ-বেদান্তে মাছকে ধরে এমন যন্ত্রণা দিতে বলেছে, বল্‌তো ?' হামার কথা শুনে গুরুভায়ের বড় লজ্জা হোলো। হামার সামনে মাছটাকে জলে ছেড়ে দিলে আর ছিপটাকে ভেঙ্গে ফেললে।... একদিন ত কাশীপুরে যোগীনভায়ের অসুখের কথা শুনে তিনি ভারী দুঃখিত হোলেন, বললেন— 'সেবার ত্রুটী হবে ব'লে তোমরা নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ না ; তোমাদের শরীর ভেঙ্গে গেলে আমার যত্ন কর্‌বে কে ? তোমরা বাপু অসময়ে খাওয়া-দাওয়া কোরো না।' তারপর থেকে তিনি হামাদের মধ্যে কাউকে অসময়ে খেতে দেখলে বড় বক্‌তেন। শশীভাইকে কতো দিন বলেছেন— 'ওগো ! নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এখন ভালো আছি, আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এসো।' তিনি কতো দিন তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে আমায় দিয়েছেন। ... বুড়ো-গোপাল দাদা ওষুধ খাওয়াতেন। ওষুধ খাবার সময় চলে যাচ্ছে দেখে তিনি একজনকে হাত নেড়ে জিগ্‌গেস করলেন— 'সেই বুড়ো লোকটা কোথায় ? বুড়োগোপাল দাদা ঘুমুচ্ছেন শুনে ভারী খুশী হোলেন, বললেন— 'আহা ! কত রাত জেগেছে ! একটু ঘুমুক, তাকে আর জাগিও না। তুমি বরং ওষুধটা ঢেলে দাও !'... একদিন ত শশধর পণ্ডিত ওনাকে দেখতে এলেন। তিনি এসে তাঁকে (ঠাকুরকে) বললেন— 'সমাধির সময় একবার দেহের উপর মনটা ফেলবেন। তাহলে সব রোগ সেরে যাবে।' তিনি (ঠাকুর) তার কথা শুনে বললেন— 'সমাধির সময় দেহের উপর মন ফেলতে পারবো না গো।' " এইখানে লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরের একটি প্রসঙ্গ বলেন—"শুনেছি একবার হৃদয় ঠাকুর ওনাকে

(পরমহংসদেবকে) মা-কালীর কাছ থেকে কিছু সিদ্ধাই চেয়ে নিতে বলেন। ওনার তখন এমন অবস্থা যে কেউ কিছু বললে অম্‌নি তাতেই বিশ্বাস করতেন। মা-কালীকে তিনি সেকথা জানালেন; অমনি মা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে একটি তিরিশ বছরের র৺াড় সামনে বসে হাগ্‌ছে। এসব দেখে শুনে মার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধাই চাইতে পার্‌লেন না। ফিরে এসে হৃদয় ঠাকুরকে খুব ধমকে দিলেন। ··· দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামলাল (দাদা) বিষ্ণুঘরের পুরোহিতকে ঠাকুরের (ব্যাধিমুক্তি-কামনায়) জন্য তুলসী দিতে বললে। সেই তুলসী আর চন্নামেত্যার দক্ষিণেশ্বর থেকে রোজ তিনি পাঠিয়ে দিতেন। এমন পনের-ষোল দিন পাঠানোর পর ঠাকুর বললেন— 'ওরে! রামলালকে আমার দেহের জন্য তুলসী দিতে মানা করে আয়। ঠাকুরের কাছে ওরকম মানত নিয়ে তুলসী দেওয়া ভালো নয়, বলে আয়।' ··· একদিন ত (দেওভোগের) নাগ মশায় কাশীপুরে ঠাকুরকে দেখতে এসে শুনলেন আমলকী খেতে তাঁর (ঠাকুরের) ভারী ইচ্ছা হয়েছে। সেই ইচ্ছা শুনে নাগ মশায় তখনই আমলকীর খোঁজে বেরুলেন। তিন দিন পরে আমলকী নিয়ে বাগানে এলেন। শুনেছি, তিন দিন ধোরে তিনি কলকাতার সব বাজার ঢুঁড়েছেন, স্নান করেন নি, খান নি, এমন কি, ভালকোরে ঘুমুন নি। অসময়ে টাট্‌কা আমলকী দেখে ঠাকুর বললেন— 'এ আমলকী কে আনলে?' নাগ মশায় চুপ করে রইলেন। নাগ মশায়ের নাওয়া-খাওয়া হয় নি জেনে তখুনই তিনি তাঁকে স্নান করে কুছু খেতে বললেন। তাঁকে ভাত দেওয়া হোলে, তিনি তা নিয়ে বসে রইলেন, বললেন— 'আজ একাদশী। আজ আর কিছু খাবো না।' ঠাকুর এই কথা শুনে হামায় বললেন— 'থালাটা ইখান্‌কে নিয়ে আয়।' তিনি সে থালা থেকে একটি কণা তুলে নিলেন। অন্নপ্রসাদ হোয়েছে শুনে নাগ মশায় আর কোন আপত্তি করলেন

না। একাদশীর দিনও তাই খেলেন। তাঁর মত বিশ্বাস খুব কম লোকের দেখেছি। তিনি ত ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতেন; কখনো তাঁর আসন ছুঁয়ে বসতেন না। একবার ত দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে শালপাতায় কোরে প্রসাদ দেওয়া হয়েছিলো। তিনি পাতাসুদ্ধ খেয়ে নিলেন, প্রসাদী পাতা ফেললেন না। ··· একদিন ত ঠাকুরের জাম্‌রুল খেতে ইচ্ছে হোলো, তখন শীতের শেষ, জাম্‌রুল পাওয়া যায় না। কলকাতার বাজারে কেউ জামরুল পেলো না। দেখো! কেমন ব্যাপার হোলো! একজন ভক্ত সেইদিনই কোন এক বাগানে জামরুলের ফুল দেখতে পেয়ে শশীভাইকে সে খবর জানালে। শশীভাই সেইদিন সেই বাগান হোতে জাম্‌রুল পেড়ে নিয়ে এলো। জাম্‌রুল দেখে তিনি ত অবাক হোয়ে বললেন— 'এমন সময় জামরুল কোথায় পেলি রে?' বাকী ঠাকুর তা' খেতে পারলেন না। ··· একদিন ত রাম বাবু হাসপাতালের (মেডিক্যাল কলেজের) বড় সাহেব-ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। সাহেব-ডাক্তার ত দেখে শুনে বলে গেলো— 'এ সব হচ্ছে পাদ্রীদের রোগ। এ সারবে না।' ··· সময় সময় তিনি (ঠাকুর) কুছু খেতে পারতেন না, তখন (শ্রীশ্রী) মা পল্‌তে কোরে তাঁর গলাটা সাফ কোরে দিতেন। সাফ কর্‌বার সময় একদিন কেমন লেগে গেলো। (শ্রীশ্রী) মা ত শিউরে উঠলেন। তিনি শুধু বললেন— 'পল্‌তে দিচ্ছ? আচ্ছা দাও।' ··· (শ্রীশ্রী) মা জানতেন যে, তাঁর (ঠাকুরের) শরীর এবার থাকবে না। তিনি নাকি (শ্রীশ্রী) মাকে বলেছিলেন—'যখন দেখবে সকলেই আমায় ছুঁচ্ছে, আর সকলের ছোঁয়া খাবার আমি খাচ্ছি তখন জানবে আমার দেহ আর বেশীদিন টিক্‌বে না।' (শ্রীশ্রী) মা আরো বলতেন—'একবার দেশে তাঁর দাদার বিকার হোয়েছিলো, তিনি (ঠাকুর) তাঁকে রোগের সময় জল খেতে দিতেন না। তাই তিনি বলেছিলেন— মরবার সময় তোমার গলা দিয়ে জল গলবে

না, দেখো।' বড় ভায়ের কথা তিনি মিথ্যে হতে দিলেন না।" ইহারই সঙ্গে তিনি হলধারী দাদার কথা বলিয়া যান। "একবার হলধারী দাদা দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন— 'তোর গলা দিয়ে রক্ত উঠবে।' শুনেছি, ঠাকুরের গলা দিয়ে সিমপাতা-রঙের রক্ত বেরিয়েছিলো। দেখেছি, নিজে ভুগেও তিনি তাঁর আত্মীয়স্বোজনের কথা মিথ্যে হোতে দিতেন না। সত্যে আঁট থাকলে এমনি হয়। ... (শ্রীশ্রী) মায়ের মত এমন বুদ্ধিমান মেইয়া লোক হাম্‌নে দেখলুম না। তাঁর সেবা করতে করতে হামাদের মধ্যে কেউ হতাশ হোয়ে পড়লে তিনি (শ্রীশ্রীমা) তা' বুঝতে পারতেন। যোগীনভাইকে দিয়ে বলে পাঠাতেন —'ওকে হতাশ হোতে মানা কোরো। তাঁর শরীর ত আজকাল একটু ভালো রয়েছে, এখন ত ঘায়ের মুখ বাহিরের দিকে হয়েছে।' এমনি কোরে (শ্রীশ্রী) মা হামাদের সব সাহস দিতেন। ... কাশীপুরে একদিন ঠাকুর সকলকে ডেকে বললেন— 'দ্যাখ্‌! দলাদলি করিস নি। মিলেমিশে থাকলে সকলেই আনন্দ পাবি আর দলাদলি করলে দুঃখকষ্টে পড়বি।' সেদিন সব নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছিলো, তর্কের পর হাত তোলাতুলি করেছিলো। তর্ক করতে ঠাকুর কাউকে মানা করেন নি, বাকী তর্ক কোরে দল পাকাতে খুব নিষেধ কর্‌তেন।"

ঠাকুরের মহাসমাধির একদিন পূর্ব্বের ঘটনা।— "দুপুরবেলা একটা (বাজপড়ার মত) আওয়াজ হয়েছিলো। (শ্রীশ্রী) মা ও লক্ষ্মীদিদি সেই আওয়াজ শুনে ঠাকুরের ঘরে এসে গেলেন—লক্ষ্মীদিদি বড্ড ভয় পেয়েছিলো। তাকে ভয় পেতে দেখে ঠাকুর বললেন— 'আমি গোম্‌ড়া মুখ দেখতে ভালবাসি নি, জান তো!' তাঁর কথা শুনে লক্ষ্মীদিদি হাসতে লাগলো।"

এইবার ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয়-কথিত একটি প্রসঙ্গ বলিতেছি।— "সন্ধ্যাবেলা ভাতের পায়েস আনা হইলে তিনি বললেন

— 'আমায় বসিয়ে দাও ; বসে বসে আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' ঠাকুরের ইচ্ছামত আমরা কয়জনে মিলিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিলাম। আমাদের মধ্যে লাটু ও বুড়োগোপাল দাদা ছিল। নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর ইঙ্গিতে জানাইলেন — 'ওদের (লাটু ও বুড়োগোপালকে দেখাইয়া) বিছানাটা ঝেড়ে দিতে বল।' তাহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ একটা কি বললেন ; তাহাতে ঠাকুর জানাইলেন— 'ভাত যে রে !' নরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বলেন, 'আপনি ত বিধিনিষেধের পার।' ঠাকুর তখন নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিতে বুঝাইলেন—'ওরে, ব্রাহ্মণ-শরীর যে রে ! এটার ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয়।' ইতোমধ্যে লাটু ও বুড়োগোপাল দাদা ঠাকুরের বিছানা ঝাড়িয়া দিয়াছিল। ঠাকুর তখন আঙ্গুলে করিয়া একটু পায়েস মুখে দিলেন। তারপর বললেন— 'ভিতরে এত ক্ষিধে যে হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খেতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।' "

এইবার লাটু মহারাজ-কথিত ঠাকুরের মহাসমাধির কথা বলিতেছি।— "শোবার সময় যেমন ঠাকুর রোজ বলিতেন— 'হরি ওঁ তৎ সৎ'— সেদিনও তিনি সেই কথা বললেন। হাম্‌নে তখন পাখার বাতাস করছিলুম। রাত প্রায় এগারটার সময় তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপরেই মনে হোলো যেন তাঁর সমাধি হয়েছে। লোরেনভাই তখন হামাদের সব 'হরি ওঁ তৎ সৎ' নাম-কীর্ত্তন করতে বললেন। অনেকক্ষণ নাম-কীর্ত্তনের পর রাত একটার সময় তাঁর সমাধি ভাঙ্গলো। তখন একটু সুজীর পায়েস খেলেন। শশীভাই তা' খাইয়ে দিলে। তারপর হঠাৎ তাঁর সমাধি হোলো। তা' দেখে লোরেনভায়ের কেমন সন্দেহ জাগলো। (বুড়ো) গোপাল দাদাকে ডেকে বললেন— 'একবার রামলাল দাদাকে ডেকে আনতে পারো ? গোপাল দাদা হামাকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাতে দক্ষিণেশ্বরে গেলো। রামলাল

(দাদা) সেই রাতে হামাদের সঙ্গে এলেন, দেখে শুনে বললেন— 'এখনো ব্রহ্মতালু গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে (শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে) খবর দাও।' ভোর সকালে মহিন্দর ডাক্তারকে আনা হোলো। তিনি দেখে শুনে বললেন— 'ঠাকুর দেহরক্ষা করেছেন।' একটু পরেই ঠাকুরের ভক্ত (নেপালরাজের প্রতিনিধি) উপাধ্যায় এলেন। তিনি ঠাকুরের গায়ে মাথায় ঘি মাখাতে বললেন। শশীভাই ঠাকুরের গায়ে ঘি মাখালেন আর বৈকুণ্ঠ বাবু ঠাকুরের পায়ে ঘি মালিশ করতে লাগ্‌লেন। তাতেও কুছু হোলো না। তখন (শ্রীশ্রী) মা থাকতে না পেরে ঠাকুরের ঘরে এলেন এবং 'মা কালী গো ! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো !' বোলে কাঁদতে লাগলেন। মাকে কাঁদতে দেখে বাবুরাম আর যোগীনভাই সেখানে গেলো আর গোলাপ-মা মাকে ধোরে ঘরে নিয়ে গেলো। এরই মধ্যে কলকাতার ভক্তেরা সব খবর পেয়ে গেছিলো। শুনেছি অক্ষয় মাষ্টার আর হুট্‌কো গোপাল সেই রাতে কলকাতায় খবর দিয়েছিলো। কলকাতার ভক্তেরা সব একে একে আসতে লাগলো। তাদের নিয়ে ঠাকুরের একটি ফটো তোলা হোলো। এ সব করতে বেলা পড়ে গেলো। তখন সেই ফুল-দেওয়া সাজানো খাটে (কীর্ত্তন করতে করতে) তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোলো। ··· রাম বাবু হামাকে বললেন— 'তুই বাগানে এখন কিছুক্ষণ থেকে যা, পরে অক্ষয় বাবু (কোন্ অক্ষয় বাবু জানি না) এলে তুই ওখানে যাস্।' হাম্‌নে তাই বাগানে রয়ে গেলুম। (শ্রীশ্রী) মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ কর্‌লেন আর তাঁর গলার আওয়াজ শুনা গেলো না। মেইয়া মানুষের এমন ধৈর্য্য হাম্‌নে জীবনে দেখে নি। ··· রাতে হাম্‌নে শ্মশানে গেলুম, সেখানে দেখি অনেকেই গঙ্গার ধারে চুপ কোরে বসে আছেন। শশীভাই একখানা পাখা হাতে নিয়ে চিতার কাছে বসে ছিলো, তার পাশে শরোট্‌ভাই ছিলো। শশীভাইকে

হাম্‌নে ত হাত ধরে তুললুম, শরোট্‌ভাই আর লোরেন ভাই তাকে কত বুঝালে, বাকী শশীভাই একটা কথাও বললে না। ··· জানো! তাঁর অস্থি আর ভসম্‌ একটা কলসীতে পুরে শশীভাই মাথায় কোরে বাগানে এনেছিলো। যে বিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কলসীটি রেখে দেওয়া হোলো। ··· পরের দিন গোলাপ-মা এসে খবর দিলো—(শ্রীশ্রী) মাকে উনি (ঠাকুর) দেখা দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন—'আমি কি কোথাও গেছি গো? এই ত রয়েছি; শুধু এঘর থেকে ওঘরে এসেছি।' গোলাপ-মার কথা শুনে যারা সব দুঃখ করছিলো তাদের সন্দেহ মিটে গেলো। তারা তখন সকলে মিলে বললে—'সেবা যেমন চলছিলো তেমনি চলবে।' সেদিনে ত নিরঞ্জনভাই, শশীভাই, বুড়োগোপাল দাদা আর তারক দাদা সেইখানে রইলো। হাম্‌নে আর যোগীনভাই (শ্রীশ্রী) মায়ের কথামত ঠাকুরের ভোগের ব্যেবস্থা করতে কলকাতায় গেলুম। দুপুরে সেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হোয়েছিলো। সবাই মিলে তাঁর ঘরে কীর্ত্তন কোরেছিলো। রাতে সুজীর পায়েস কোরে তাঁকে নিবেদন করা হোলো। ফিন্‌ রামনাম শুনানো হোলো। তারপর সব যে যার বাড়ী চলে গেলো। হাম্‌নে, গোপাল দাদা আর তারক দাদা সেইখানে রয়ে গেলুম। ··· তিন-চার দিন পরে (শ্রীশ্রী) মা হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সন্ধ্যের আগেই তিনি কাশীপুর বাগানে ফিরে এলেন। ··· শুনেছি সেদিন বিকেলের দিকে রাম বাবু বাগানে এসেছিলেন। দুপুরে শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, লোরেনভাই, রাখালভাই ও বাবুরামভাই এসেছিলো। রাম বাবু নাকি আশ্রম (অর্থাৎ কাশীপুরের বাগানবাড়ী) তুলে দিতে চেয়েছেন আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন। একথা শুনে নিরঞ্জনভায়ের আর শশীভায়ের

ভারী দুঃখু হয়েছিলো। তাদের ইচ্ছে, যেমন চলছে ঠাকুরের সেবা তেমনি রোজ রোজ চলুক। নিরঞ্জনভাই ত সেই রাতে বলরাম বাবুর বাড়ী গেলো। পরের দিন বলরাম বাবু (শ্রীশ্রী) মাকে নিয়ে আসবার জন্য কাশীপুরে নিজে গিয়েছিলেন। (শ্রীশ্রী) মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কাপড়চোপড় সব বলরাম বাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। ... (শ্রীশ্রী) মা বলরাম মন্দিরে চলে গেলেন। হামি, গোপাল দাদা আর তারক দাদা বাগানে রয়ে গেলুম। দুপুরে সবাই আসতো আর রাত হোলে চলে যেতো। রাম বাবুর বড় ইচ্ছা ছিলো যে, সেই (ঠাকুরের অস্থিপূর্ণ) কলসীটিকে কাঁকুড়গাছির বাগানে (যোগোদ্যানে) সমাধি দিয়ে মঠ বানাবেন। রাম বাবুর সে কথায় শশীভাই, নিরঞ্জনভাই রাজী হোলো না। তারা বললে 'আমরা কলসী দেবো না।' লোরেনভাই তখন তাদের কতো বুঝালে, বললে— 'ছাখ! কলসী নিয়ে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি করা উচিত হবে না। আমরা কে কোথায় থাকি তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। রাম দাদা ত তাঁর বাগানখানি ঠাকুরের নামে লিখে দিতে চাচ্ছেন। সেই ত ভাল। সেইখানে না হয় আমরা তাঁর পূজা করলুম। আমি ত বুঝি যে তাঁর (ঠাকুরের) আদর্শে জীবন গড়ে নিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।'"

... "জন্মাষ্টমীর আগের দিন আম্‌নে রাম বাবুর বাড়ী গেলুম, সেখান হোতে কাঁকুড়গাছির বাগানে গেলুম। পরের দিন সকালবেলা রাম বাবুর বাড়ী থেকে কীর্ত্তন করতে করতে সকলে মিলে কাঁকুরগাছিতে গেলুম। শশীভাই নিজে মাথায় কোরে কলসী নিয়ে গেলো। সেখানে কলসীর উপর মাটি ফেলতে দেখে শশীভাই কেঁদে উঠ্‌লো, বললে— 'ওগো! ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।' শশীভায়ের কথা শুনে সকলের চোখে জল এসেছিলো। ... শ্মশান হোতে ফের্‌বার সময় ওপেন বাবুকে ('বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়কে) সাপে কেটেছিলো। নিত্যগোপাল বাবু (জ্ঞানানন্দ অবধূত) সেই জায়গায় লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছিলো। সেই ঘা তখনো শুখোয়নি। তবু ওপেন বাবু কাঁকুড়গাছিতে কীর্ত্তন করতে করতে গিয়েছিলেন। তিনি সাধুসঙ্গ করতে বড় ভালবাসতেন। বই বগলে কোরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পায়ে হেঁটে যেতেন, কাশীপুরেও যেতেন। ঠাকুর তাই দেখে বল্‌তেন— 'তুমি রথও দেখবে আবার কলাও বেচবে।' ·· কাঁকুড়-গাছির উৎসবের পর রামলাল (দাদা) দক্ষিণেশ্বরে একটা ভাণ্ডারা দিলেন, সেখানেও কীর্ত্তন হয়েছিলো। (শ্রীশ্রী) মাকে নিয়ে যাবার জন্যে রামলাল দাদা বলরাম বাবুর বাড়ী এসেছিলেন। বাকী 'মা' সেখানে যেতে চাইলেন না। দক্ষিণেশ্বরে রামলাল দাদার দেওয়া ভাণ্ডারায় হাম্‌নে গিয়েছিলুম। ··· (ঠাকুরের মহাসমাধির পর) কাশীপুর বাগানে হামার মন টিক্‌তো না। হাম্‌নে মাঝে মাঝে রাম বাবুর বাড়ীতে চলে যেতুম। সেখানেও মন টিকতো না, লোরেনভায়ের বাড়ী যেতুম। লোরেনভাই কতো কথা বলতো। হামি জিগগেস করতুম— 'হ্যাঁ ভাই লোরেন! তোমাকে ত ঠাকুর এতো ভালোবাসতেন যে, হক্ বলছি, তোমাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পার্‌বেন না।' লোরেনভাই হামার কথা শুনে হাসতো আর বলতো— 'ওরে তিনি তোদেরও ছেড়ে থাকতে পারবেন না। তোকে, শশীকে, রাখালকে তিনি কতো ভালোবাসতেন। তোরাই ত তাঁর সেবা করেছিস্, আমি আর কি করেছি?' দেখো তো! লোরেনভায়ের কেমন বিনয়! ··· একদিন ত একজন গুরুভাই হামার সামনে দুঃখু করতে লাগলো, বললেন— 'তিনি (ঠাকুর) আমাদের এমনি কোরে ফাঁকি দিয়ে গেলেন।' তাঁর কথা শুনে হামার ভারী দুঃখু হোলো, বলে দিলুম— 'অবিশ্বাসীর লেগে তিনি মরে গেছেন। বাকী বিশ্বাসীর লেগে তিনি বেঁচে আছেন। দেখলে না— তিনি

(শ্রীশ্রী) মাকে দেখা দিলেন। তেমন বিশ্বাস থাকলে, তিনি তোমাকেও দেখা দিতেন।' ”

“... শুন্‌লুম (শ্রীশ্রী) মাকে ও লক্ষ্মীদিদিকে বলরাম বাবু তীর্থে পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে যোগীনভাই আর কালীভাই যাবে। (শ্রীশ্রী) মা তীর্থে যাচ্ছেন শুনে, তাঁর সঙ্গে হামার যাবার ইচ্ছে হোলো। (শ্রীশ্রী) মা তা' বুঝে নিলেন। তিনি হামাকেও সঙ্গে নিলেন। মাষ্টার মশায় তাঁর পরিবারকেও মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন আর গোলাপ-মাও তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। দেখো তো! মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে যাওয়া হোলো। এমন ভালবাসা দিয়ে (শ্রীশ্রী) মা হামাদের সব বেঁধে রেখেছেন!”

বৃন্দাবনে

লাটু মহারাজের বৃন্দাবনগমন, পথে বৈদ্যনাথজী-দর্শন, কাশীদর্শন ও ভাস্করানন্দ স্বামীর উপদেশ-শ্রবণ. অযোধ্যাগমন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান, লাটু মহারাজ-কথিত বৃন্দাবনপ্রসঙ্গ, সাধু সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত বৃন্দাবনপ্রসঙ্গ, যোগীন মহারাজ-কথিত (বৃন্দাবন ?) লাটু মহারাজের প্রসঙ্গ, লাটু মহারাজের বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা-আগমন

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির একমাসের মধ্যে শ্রীশ্রীমা তীর্থ-গমনে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মীদিদি, নিকুঞ্জ দেবী (মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী), গোপাল-মা (শ্রীশ্রীমায়ের সহচরী), যোগীন মহারাজ ও কালী মহারাজ। আমাদের লাটু মহারাজও সেই সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে তাঁহারা দেওঘরে নামিলেন। সেইখানে বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজা করিয়া সকালে কাশীধামে গমন করেন। কাশীতে মাত্র তিন দিন ছিলেন। শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথজীর পূজা দিয়া তাঁহারা কাশীক্ষেত্রদর্শন করেন ও তত্রস্থ সাধুসন্ন্যাসিগণের সঙ্গ করেন। সেখানে সকলে মিলিয়া একদিন ভাস্করানন্দ স্বামীর আশ্রমে যান। সেইদিন ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত লাটু মহারাজের অনেক কথা হইয়াছিল। তাহা যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিখিতেছি—

"ভাস্করানন্দ স্বামী বললেন— 'কোথাও ঘুরো না, ঘুরলে কিছু পাবে না। এক জায়গায় বসে তাঁকে ডাকো, ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের দয়া করবেন। জানো, ছেলেবয়সে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেকের সঙ্গ করেছি। পায়ে হেঁটে চারধাম গিয়েছি— কেদারবদরী, জগন্নাথ, দ্বারকা, রামেশ্বর। তখন রেল ছিল না, কি কষ্ট বুঝ্‌তে পারছো ! এত ঘুরেও আমার কিছু মিলে নাই— যে দুঃখ, সেই দুঃখই রয়ে গেলো। তখন এইখানে এই বাগানে

বসে প্রতিজ্ঞা করলুম— হয় ভগবান লাভ হবে, না হয় শরীর যাবে। যা' হোক, এখন আমার কিছু আনন্দলাভ হয়েছে।' তিনি হাতে ছড়ি নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ঐ কথা বল্‌ছিলেন; মন্দিরে তখন তাঁর মূর্তির পূজা হচ্ছিলো। তাই খুব খুশী মনে আমাদের জিগ্‌গেস করলেন— 'ওখানে কি হচ্ছে, বলতো? আমি (লাটু মহারাজ) বললুম— আপ্‌ নারায়ণ হ্যায়, আপকো পূজা হোতা হ্যায়।' তখন তিনি হেসে বললেন— 'কেয়াবাৎ।' যেন বালকের ভাব।"

"একদিন রাতে বিশ্বনাথের আরতি দেখে (শ্রীশ্রী) মা খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন— হামাদের চেয়েও জোরে। বাসায় এসে তিনি সেই যে শুয়ে পড়লেন, আর কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। শুনেছি, সেদিন অনেক রাতে উঠে তিনি আবার ধ্যেনে বসেছিলেন। গোলাপ-মা তাঁকে কত ডাকাডাকি করেছিলো, তবু সেদিনকার ধ্যেন ভাঙ্গে নি।"

কাশীতে তিন দিন থাকিয়া সকলে অযোধ্যাদর্শন করিতে গেলেন। সেইখানে একদিন মাত্র থাকিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনযাত্রা করেন। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাসা ঠিক করা ছিল, ট্রেণ হইতে নামিবার সময় লাটু মহারাজ নিজের একটি জিনিস গাড়ীতে ফেলিয়া নামিয়া পড়েন। শ্রীশ্রীমা তাহা দেখিতে পান এবং জনৈক ব্যক্তিকে উহা নামাইয়া লইতে বলেন। বাসায় যোগীন্‌-মাকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিয়া উঠেন এবং তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন।

সেইখানকার কয়েকটি ঘটনা পরে লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি। নিম্নে সেইগুলি দেওয়া হইল। "একদিন (শ্রীশ্রী) মা, হামাকে, লক্ষ্মীদিদিকে আর গোলাপ-মাকে সঙ্গে নিয়ে রাধারমণ জীউর মন্দির দেখতে গেলেন। সেখানে তিনি ভাবে— (বুড়ো) নবগোপাল বাবুর পরিবারকে রাধারমণজীর

পাশে দাঁড়িয়ে চামর ডুলাতে দেখলেন। সেই না দেখে কত খুশী হোলেন, বললেন— 'ওর ঠিক ঠিক সেবিকার ভাব কিনা, তাই।'"

"একদিন ত গোলাপ মা হামাদের সঙ্গে মাধবজীর মন্দিরে গেলো। সেখানে মন্দিরের চত্তরে নোংরা রয়েছে দেখে গোলাপ-মা নিজের কাপড় ছিঁড়ে তা পরিষ্কার করে দিলো। দেখো তো, তার কেমন ভাব? মন্দির শুদ্ধ পবিত্র রাখবার জন্তে তার কেমন আগ্রহ! মায়ের মন্দিরও সে এমনিভাবে রোজ পরিষ্কার কোরে রাখতো! জানো, আগে তার কত না শুচিবাই ছিল, বাকী তাঁকে দেখবার পর, আর কিছু মানতো না।"

"বৃন্দাবনে (শ্রীশ্রী) মা আর লক্ষ্মীদিদি কোন কোন দিন যোগীনভাইকে আবার কোন কোন দিন হামাকে সঙ্গে নিয়ে যমুনার ধারে বেড়াতে যেতেন। তখন কালীভাই বনে বনে ঘুরতে (অর্থাৎ বনপরিক্রমায়) বেরিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে কালীভাই মাষ্টার মশায়ের পরিবারকে নিয়ে কলকাত্তায় চলে এলো।"...

"যোগীনভাইকে দীক্ষা দেবার জন্তে ঠাকুর (শ্রীশ্রী) মাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। (শ্রীশ্রী) মা কাউকে মন্তর দিতে চাইতেন না। তিনি বারে বারে আদেশ করায় (শ্রীশ্রী) মা যোগীনভাইকে দীক্ষা দিলেন।... বৃন্দাবনে ঠাকুরের ছবিতে ফুল দিয়ে (শ্রীশ্রী) মা রোজ পূজা করতেন আর একটা (অস্থির) কৌটা নিজের মাথায় ছুঁইয়ে রেখে দিতেন। একদিন সেই কৌটা তিনি হামাদের মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন।... তিনি খুব কীর্ত্তন শুনতে ভালবাসতেন। হামাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভগবানজীর আশ্রমে মাঝে মাঝে নাম শুনতে যেতেন। (এই ভগবানজী গঙ্গামায়ীর আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে মথুরবাবুর সহিত আসিয়াছিলেন, তখন গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে তাঁহার আশ্রমে থাকিতে

বলেন; ঠাকুর সেইখানে কিছুদিন ছিলেন। শেষে আপন জননীর কথা স্মরণ করিয়া গঙ্গামায়ীর আশ্রম ত্যাগ করতঃ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন)।··· বলরাম বাবুর খুড়ো মশায় বৃন্দাবনে থাকতেন, আর বৈষ্ণবসেবা করতেন। তিনি হামাদের খুব যত্ন করতেন আর এক একদিন এক এক ঠাকুরের প্রসাদ আনিয়ে হামাদের খাওয়াতেন।"

সাধু সিদ্ধানন্দ-সঙ্কলিত একটি প্রসঙ্গ এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। "বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীযুত লাটুর পূর্ব্ববৎ আহারাদির কিছুই ঠিক থাকিত না। তদুপরি প্রায়ই তাঁহার ভাগের রুটী বানরদিগকে খাওয়াইয়া অসময়ে শ্রীশ্রীমা বা তাঁহার সঙ্গিনীদের নিকট খাইতে চাহিতেন। ইহাতে অনেকেই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই বালকবৎ আচরণে বিরক্ত না হইয়া সকলকে ভর্ৎসনা করিতে নিষেধ করিতেন এবং স্নেহার্দ্রহৃদয়ে তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন। মা জানিতেন— তাঁহার আব্দারে ছেলে লাটু বড় অভিমানী। তাঁহাকে যে যাহাই বলুক না কেন, তাঁহার যত অভিমান— সরল বালকদের মত তাঁহার উপরেই হইয়া থাকে। এজন্য তিনি সঙ্গিনী-দিগকে শ্রীযুত লাটুর খাবার আলাদা করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার সেবক লাটু নিজ ইচ্ছামত আহারাদি করিতে পারে এবং তাঁহার বালকোচিত ব্যবহারাদিতে কোনও বিঘ্ন না হয়।"

যোগীন মহারাজের মুখ হইতে লাটু মহারাজ সম্বন্ধে একটি প্রসঙ্গ শুনিয়াছি। তাহা কোথাকার প্রসঙ্গ ঠিক বলিতে পারি না; তবে আমাদের অনুমান হয় যে, ইহা বৃন্দাবনের ঘটনা। "একবার লাটু মহারাজ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে ডুব্ মারলে আমরা তার কোন পাত্তা পেলুম না। শ্রীশ্রীমা তার জন্য বড় ভাবিত হোলেন। তিনদিন পরে নিজে

এসে হাজির হোলো। চুল উস্‌কো, চোখ মুখ লাল, যেন বিকারের রোগী। সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করলুম— 'কোথায় ছিলি?' কোন উত্তর দিলে না, শুধু হাসতে লাগলো! শেষে (শ্রীশ্রী) মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বললে— 'নদীর ধারে ছিলুম!' তারপর ঠিক ছেলেমানুষের মত বললে— 'বড় খিদে পেয়েছে মা, কুছু খাবার দিন।' (শ্রীশ্রী) মা তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এলেন। খেয়েদেয়ে কাউকে কিছু না বলে আবার চলে গেল। এসব দেখে (শ্রীশ্রী) মা বলতেন— 'লাটুর সবই অদ্ভুত।' "

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের একটি কন্যা আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। সেই সংবাদ ক্রমে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পৌঁছায়। ভক্তপালকের এহেন দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি তদীয় সেবক লাটুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

সন্ন্যাস ও তপস্যা

বরানগর মঠে বসবাসের পূর্ব্বে, নরেন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন, বিরজাহোম-প্রসঙ্গ, মঠের উৎপত্তি সম্বন্ধে লাটু মহারাজের কথা, ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্য-অপহরণের বৃত্তান্ত, লাটু মহারাজ-কথিত সুরেশ বাবুর প্রসঙ্গ, গুরুভাইগণের প্রসঙ্গ, যোগীন মহারাজের আগমন, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কথিত মঠবাড়ী, জনৈক ছাপরাবাসী ও লাটু মহারাজের কথা—'সন্ন্যাসীকা খুড়া মরগিয়া', কালী-তপস্বীর সহিত রাম বাবুর কথোপকথন ও লাটু মহারাজের কথা, মঠে ঠাকুরঘরের কথা এবং নরেন্দ্রনাথ ও শশী মহারাজের প্রসঙ্গ, জনৈক গৃহী ভক্তের বিদ্রূপে লাটু মহারাজের কথা, শশী মহারাজের আরতি ও পূজাপ্রসঙ্গ, জনৈক গুরুভ্রাতাকে লাটু মহারাজের কড়া কথা বলা ও বাবুরাম মহারাজের প্রসঙ্গ, মঠে গুরুভাইগণের ভালবাসার কথা, শরৎ মহারাজের কথা, মহাপুরুষ মহারাজের কথা, গঙ্গাধর মহারাজের কথা, দক্ষ মহারাজের কথা, নিরঞ্জন মহারাজের কথা, মঠে গুরুভাইগণের পড়াশুনা দেখিয়া লাটু মহারাজের কথা, মঠে কীর্ত্তনাদির কথা, বলরাম বাবুর কথা, মঠে কালীপূজার কথা, ঠাকুরের জন্মোৎসব-বৃত্তান্ত, বরানগর মঠে লাটু মহারাজের অসুস্থতার কথা, সেখান হইতে রাম বাবুর বাড়ীতে আগমন ও শিবরামের কথা, পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন, শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে গমন, বাজার করার প্রসঙ্গ, পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, বুড়ো-বাবার প্রসঙ্গ, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ-কথিত প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আঁটপুরগমন এবং পরে জয়রামবাটীগমন, বলরাম বাবুর দেহত্যাগের কথা, সুরেশ বাবুর দেহত্যাগের কথা, নরেন্দ্রনাথের তীর্থে গমন, ঘুষুড়িতে লাটু মহারাজ, হরিপদ মহারাজ-কথিত লাটু মহারাজপ্রসঙ্গ, স্বামী তুরীয়ানন্দ-কথিত প্রসঙ্গ, ভগবান খামখেয়ালী কি না, লাটু মহারাজের বাংলা প্রবাদ বলিবার চেষ্টা ও সকলের হাস্যধ্বনি, রাম বাবুর গৃহে পুনরায় আগমন ও হরিপদ মহারাজ-কথিত প্রসঙ্গ

কলিকাতায় আসিয়া লাটু মহারাজ প্রথমে ভক্তপালক রামচন্দ্র দত্তের গৃহে গমন করেন এবং সেইখানে দুই-চারি দিন থাকিয়া পরে বরানগর মঠে চলিয়া যান। কলিকাতায় রাম বাবুর গৃহে থাকিবার সময় তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করেন। সেইখানে নরেন্দ্রনাথের মাতাকে বলিলেন—'দেখুন মা, লোরেনভায়ের মনটা যেন ময়দার তালের মতন। যেরকম ভাবে গড়ুন, সেইরকম ভাবেরই হয়। মহাশক্তি

ভিতরে রয়েছে। যেদিকে যখন মন লাগাইতেছে তখন সেই দিকেই নূতনত্ব দেখাইতেছে।' (শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কথিত)

সেই সময় একদিন নরেন্দ্রনাথ (তখন স্বামী বিবিদিষানন্দ, পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী সচ্চিদানন্দ, শেষে উভয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ নাম হয়) তাহাকে বলেন— 'ওরে! আমরা সব বিরজাহোম ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছি, তুইও নিয়ে নে।' নরেন্দ্রনাথের কথায় লাটু মহারাজ বিরজাহোম করিয়া যথারীতি সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে সম্মত হন। বিরজাহোম করিবার পূর্ব্বে পিণ্ডদান করিতে বসিয়া লাটু মহারাজ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। আমাদের দেশাচার মতে উহা অদ্ভুত দেখাইলেও ছাপ্‌রা জেলার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার পিণ্ডদান এখনও প্রচলিত আছে। বিশেষ কোন মন্ত্রপাঠ না করিয়া লাটু মহারাজ আপনার পিতৃপুরুষগণকে এই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন— 'এ মেরা বাপ্‌জী! হিয়া আয়। হিয়াপর (আসন দেখাইয়া) বৈঠ্‌। এই পূজা লে, এই পিণ্ডা লে, এই পানি লে।' এইরূপ সহজ সরল অনাড়ম্বরভাবে পিতৃপুরুষগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের পিণ্ডাদি প্রদান করতঃ তিনি বিরজাহোম করিতে বসিলেন। "চিরদিনই লাটুর অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাব, ধ্যানধারণায় অদ্ভুত অনুরাগ ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ স্মরণ করিয়া স্বামীজী তাহাকে অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত করেন।" (শরৎ মহারাজ-লিখিত 'সৎকথা'র ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত)।

সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া লাটু মহারাজ বরানগর মঠে একাদিক্রমে দেড় বৎসর ছিলেন। সেই সময় তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের সহিত কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে লাটু মহারাজের সাধনপ্রসঙ্গগুলি দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে আমরা বরানগর-মঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে চাহি।

বরানগর মঠবাটী যখন প্রথম ভাড়া লওয়া হয়, তখন লাটু মহারাজ বৃন্দাবনে ছিলেন। অথচ প্রত্যেক পুস্তকে দেখিতে পাই যে, "শ্রীশ্রী-ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন ত্যাগী যুবক শিষ্যগণ ভাবিতেছেন—কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন, কি এখনই সংসারত্যাগ করতঃ সাধনভজনে রত থাকিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে চলিবেন, এই সংশয়দোলায় দোদুল্যমান, তখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুত লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল এই তিন জনের বাড়ীঘরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান না থাকায় তাঁহাদের থাকিবার জন্য বরাহনগরে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহাই হইল বরাহনগর মঠের সূত্রপাত।"— শরৎ মহারাজ-কথিত উল্লিখিত বাণীরই প্রতিধ্বনি।

বলরাম মন্দিরে একদিন জনৈক ভক্ত বরানগর মঠের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"হাম্‌নে ওসব খবর জানে না। বিবেকানন্দভায়ের মুখে শুনেছি যে মঠ্‌ফঠ্‌ যা' দেখছিস, সব ঐ সুরেশ মিত্তিরের জন্য হোলো। ...একদিন সুরেন্দর বাবু নাকি লোরেনভাইকে মেলবার একটা আড্ডা করতে বলে। তাতে লোরেনভাই দুঃখু কোরে বলেছিলো—'আড্ডাখানা কোরে কি হবে? আমাদের (অর্থাৎ গুরুভাইদিগের) মধ্যে এমন লোক ত রয়েছে, যাদের ফিরে যাবার কোনো জায়গা নেই, তাদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করতে পার ত ভাখ। দরকার হলে আমরা সেখানে গিয়ে থাকতে বা সাধনভজন করতে পারব।' লোরেনভায়ের কথা শুনে সুরেন্দর বাবু নাকি বলেছিলেন—'এমন একটা আশ্রম করতে কত টাকা লাগবে?' লোরেনভাই তাতে বলেছিলো—'কাশীপুরের বাগানের জন্যে যা দিতে, তা যদি দিতে পারো, তাহলে একটা

আশ্রম হোয়ে যায়।' সব কথা শুনে সুরেন্দর বাবু মাসিক কুছু টাকা দিতে রাজী হোলেন। ভবনাথভাইকে সেকথা জানানো হোলে তিনি মুন্সীদের ভূতের বাড়ীখানা ১০৲ টাকায় ভাড়া কোরে দিলেন। আর শুনেছি, (হুটকো) গোপাল আর ভবনাথভাই দুজনে মিলে বাড়ীখানা সাফ্‌সুফ্‌ কোরে লোরেনভাইকে ডেকে এনে দু-চার মাসের মধ্যে মঠ বানিয়ে ফেললে।"

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজ দুঃখ করিয়া একদিন একজন ভক্তকে বললেন—"দেখো! চুরি করতে করতে এমন স্বভাব হোয়ে যায় যে, সে ভালমন্দ বুঝতে পারে না। ঠাকুরের গায়ের গয়না নিতেও চোরের মনে একটু দ্বিধা ভয় থাকে না—মনটা এমনি অসাড় হোয়ে যায়! একদিন ত বৃন্দাবনে চিঠি গেলো যে, বলরাম বাবুর বাড়া থেকে তাঁর (ঠাকুরের ব্যবহৃত) জামা-কাপড়, শাল-আলোয়ান সব চোরে নিয়ে গেছে। তখন (শ্রীশ্রী) মা যোগীন স্বামীকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠালেন—'চোরে যা নিয়ে গেছে তা আর পাওয়া যাবে না জানি; যেগুলো এখনও আছে তা' একটু দেখবেন।' শুনেছি (শ্রীশ্রী) মায়ের সেই চিঠি পেয়ে বলরাম বাবু তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) জিনিসগুলো মঠবাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি—"মঠ জমাবার জন্তে হুট্‌কো গোপাল খুব চেষ্টা করতো। কলকাতার সব ভক্তদের সঙ্গে সে প্রায়ই দেখা কোরতো; সেই ত লোরেনভাইকে নিয়ে আড্ডা জমালে। লোরেনভাই তাদের বলতো—'তিনি তোদের যে ভালবাসতেন, সে কি সংসার করবার জন্তে?' এমনি কোরে লোরেনভায়ের টানে একে একে সবাই মঠে এসে রইল। লোরেনভাই মঠে না থাকলে মঠ জমতো না।"

আর কয়েকটি প্রসঙ্গ এইখানেই বলিয়া যাই। "বরানগর মঠে হামাদের

মধ্যে বেশ গল্প চলছে। এমন সময় সুরেশ বাবু এসে হাজির হোলো। অমনি স্বামীজী গল্প ছেড়ে ছাদে উঠে গেলো। সুরেশ বাবু বলতো— 'তোমরা আমায় দেখে এতো সঙ্কোচ কর কেন? তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) দয়া কোরে দেওয়াচ্ছেন বলে কিছু দিচ্ছি; তা' না হোলে আমার দেবার সাধ্য কি?' দেখো! সুরেশ বাবুর কেমন ভাব—তিনি দেওয়াচ্ছেন, তাই দিচ্ছি! এমনটি প্রায় দেখা যায় না! ··· আর একদিন স্বামীজী তাকে (সুরেশ মিত্রকে) আসতে দেখে হামাদের বললে—'যা, সব ছাদে চলে যা; কে এখন ওর সঙ্গে বসে বসে খোস্ গল্প করে।' তার কথায় সকলে উপরে চলে গেলো। সুরেন্দর বাবু এসে দেখলেন কেউ কুথাও নেই; তখন কেঁদে ফেললেন, বললেন—'দুদণ্ড তোদের কাছে জুড়োতে আসি, তোরা যদি এরকম করিস্ তো কোথায় যাব?' দেখলে তাঁর দিলটা! সে ত মঠবাড়ীর খরচা দিতো, জোর করলেও তার সাজতো, বাকী একটুও জোর করলে না, শুধু দেখা না করার জন্তে অভিমান জানালে। ··· প্রথম প্রথম মঠে লোরেনভাই থাকতো না। শরোটভাই, শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, বাবুরামভাই তখন বাড়ী থেকে মঠে যাতায়াত করতো। শুনেছি, আঁটপুর থেকে এসে সন্ন্যাস নেবার পর (সম্ভবতঃ মার্চ্চ মাসে) তারা সব সেখানে রয়ে গেলো। ··· শুনেছি, লোরেনভায়ের বাড়ীতে তখন খুব গণ্ডগোল ছিল, তাই তখন সে আসতে পারতো না। সব গণ্ডগোল (মকদ্দমা) মিটিয়ে লোরেনভাই (বরানগর মঠে) যখন (১৮৮৭ মে মাসে) এলো তখন অনেকে (অর্থাৎ গৃহিভক্তগণ) বললেন— 'নরেন ছোঁড়াটার জন্তে ছোঁড়াগুলো বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, ঐ ত পালের গোদা। কারুর বাপ ভাই মঠে এসে লোরেনভাইকে গালাগালি দিয়ে গেলো। লোরেনভাই তাদের বললে—'আমাকে দুষ্ছেন কেন?

আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে যান না। আমি কি তাকে আটকে রেখেছি?' তিনি (ঠাকুর) যেমন সারদাভায়ের বাপকে বলেছিলেন, লোরেনভাইও তাদের তেমনি বলে দিলো। রাখালভাই ত তার বাপকে বলেছিলো শুনেছি—'আপনি আর আস্‌বেন না, আমি এখানে ভাল আছি।' বাড়ীর কেউ এসেছে শুন্‌লেই শশীভাই মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তো, কারুর সঙ্গে দেখা করতো না। সারদাভায়ের সেই অবস্থা, বিরক্তিতে সে ত মঠ ছেড়ে রম্‌তা সাধু হোয়ে গেলো। ··· যোগীনভাই আসবার পর মঠবাড়ী জম্‌জমাট হোয়ে উঠলো। তখন বলরাম বাবু মঠে সাহায্য দিতে লাগলেন। মাষ্টার মশায়ও মাঝে মাঝে কুছু সাহায্য দিতেন। মঠে হামাদের সব মাধুকরী করতে হোতো।"

তৎকালে বরাহনগর মঠবাড়ীর যে সুস্পষ্ট চিত্রটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ভাষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। কারণ লাটু মহারাজের মুখ হইতে আমরা বরাহনগর মঠবাড়ীর বিবরণ কিছু শুনি নাই।—"মঠের বাড়ীটি অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটীতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে, শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে ত দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা, জানলার তক্তাগুলির খানিকটা আছে, খানিকটা নাই, ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ী ত সত্যই ভূতের বাড়ী। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তরদিকে অর্থাৎ দক্ষিণহাতে যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ (কালী বেদান্তীর ঘর)। তারপর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ।

আর একটু ঢুকিলে বাঁ দিকে একখানি ঘর (ঠাকুরের ঘর) এবং সম্মুখে একটি লম্বা দালান ও দালানের পশ্চিমে একটি বড় ঘর (দানাদের ঘর)। বড় ঘরের ভিতর দিয়া যাইলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছোট একটি ঘর; সেইখানে জল থাকিত ও সকলে বসিয়া খাইত। তাহারও উত্তর-পশ্চিম দিকে পাইখানা। পূর্ব্বোক্ত ভোজনগৃহের পূর্ব্বদিকে একটি গৃহে রান্না হইত। ... কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে শয্যা, বালিশ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ছিল তাহা ঠাকুরঘরে সংরক্ষিত হইল। মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালঙ্ক তখন একটাও ছিল না। দানাদের ঘরে বালান্দা পটপটীর থান দুই-তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ থাকিত। অপর এক জায়গায় সতরঞ্চী থাকিত— চোরেরও বিশ্বাসী, কোন জায়গায় টানাটি রহিয়াছে, অপর জায়গায় পড়েনটি রহিয়াছে— জেলের জালবৎ। মাথার বালিশ— বালান্দা চ্যাটায়ের নীচে নরম ইট দেওয়া। ... এই তাহাদের ঘর-সজ্জার আসবাব ছিল।"

এই মঠে দানাদের ঘরে লাটু মহারাজ থাকিতেন।

একদিন জনৈক ছাপ্‌রা-দেশবাসী (অনেকে অনুমান করেন যে তিনি লাটু মহারাজের খুল্লতাত) তাঁহাকে স্বগ্রাম দর্শন করিতে যাইবার জন্য বলিতে থাকেন। তাহা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলেন—"তুম্‌হারা কাম তুম্ করো; মেরা পথ হাম্ জানে।" এমন তেজের সহিত তিনি এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন যে, ভদ্রলোকটি দুঃখিত হইয়া মঠবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার পর গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি তাঁহার খুড়ো কি না। তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "সন্ন্যাসীকা খুড়া মর্ গিয়া।"

সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর লাটু মহারাজ মুণ্ডিতমস্তকে গেরুয়া পরিধান

করিয়া একদিন কালীতপস্বীর সহিত ভক্তপালক রামচন্দ্র দত্তের গৃহে গমন করেন। সেখানে স্বামী অভেদানন্দের সহিত রাম বাবুর সাধন বিষয়ে কিছু কথোপকথন হয়। সেই কথোপকথনটি পরে নানা লোকের মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে কালীতপস্বীকে বাক্যবানে বিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ একজন গৃহীভক্তকে লাটু মহারাজ বলেন—"যাকে যেমন তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) বুঝিয়েছেন, সে তেমনি ত বলবে। কালীভাইকে তিনি যেমন বুঝিয়েছেন, কালীভাই তেমনি বলেছে। সে কি দোষ করেছে যে আপুনারা তাকে হাম্‌বড়িয়া বলছেন?" আর কোন গুরুভাই অযথা রাম বাবুকে বিদ্রূপ করিতেছেন শুনিয়া লাটু মহারাজ তাহাকে বলেন—"তোমাদের কেমন এক হয়েছে! রাম বাবুর কথা তোমাদের মনমাফিক্ হয় নি বোলে তোমরা ওনাকে দুষবে, এ তো ভাল নয়। হাম্‌নে ত সেখান্‌কে ছিলুম, কই তিনি ত এমন কুছু বলেন নি, যাতে তাঁর কথা (শ্রীশ্রী) ঠাকুরের কথা থেকে বেফাঁস হয়ে পড়েছে। তিনি ত নিজের মনের ভাব সেদিন গান গেয়ে বুঝিয়ে দিলেন—'ষড়-দর্শনে না পায় দর্শন।' (ইত্যাদি ইত্যাদি) এ গানখানি ত ঠাকুর গাইতেন।"

"বরানগর মঠে একদিন গুরুভাইদের মধ্যে ঠাকুরঘর নিয়ে বড় কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। সেদিন (গৃহী) ভক্তদের মধ্যে কে নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলো—'শালারা আর করবি কি? যেমন শীতলাঠাকুর বসায়, তেমনি ঠাকুরের ছবি বসিয়ে ঘণ্টা বাজাবি আর পূজুরিগিরি করবি।' (গৃহী) ভক্তটির ঐ কথা শুনে শশীভাই বড্ড চটে উঠে বলেছিলো,—'এমন যে শালা বলে, তার পয়সায় আমি মুতে দিই।' শশীভাইকে চটতে দেখলে লোরেনভাইয়ের বড় আমোদ লাগতো, তাই হাসতে হাসতে

বললে,— 'যাঃ শালা ! ভিক্ষে কোরে তোর ঠাকুরকে খাওয়াগে যা।' লোরেনভাইকে ঐ কথা বলতে শুনে শশীভায়ের মনে বড্ড দুঃখু হোলো, বললে— 'বেশ ! তোমাদের এক পয়সা চাই না, আমি ভিক্ষে কোরে ঠাকুরকে খাওয়াবো।' তাতে লোরেনভাই হাসতে লাগলো, বললে— 'কিরে ! ভিক্ষে কোরে তোর ঠাকুরকে লুচি ভোগ দিতে পারবি ত ?' শশীভাই (উত্তেজিত হইয়া) বললেন— 'হাঁ পারবো, সেই ভোগের লুচি আবার তোকে খেতে দেবো।' তখন স্বামীজী (উত্তেজনার ভান করিয়া) বললে— 'তা কখনই হোতে পারে না ; আমরা শালা খেতে পাচ্ছি না, আর তোর ঠাকুর লুচিভোগ খাবে ? ফেলে দেবো এমন ঠাকুরকে, জানিস্ ? তুই যদি ফেলতে না পারিস আমি নিজের হাতে সে ঠাকুরকে ফেলে দেবো ?' এই বোলে (কৃত্রিম রোষভরে যেন) লোরেনভাই তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে যেতে লাগলো। শশীভাইও লাফিয়ে উঠে ইংরেজীতে কি বললেন। হাসিঠাট্টার ব্যেপারে এমন তক্‌রার্ হোতে দেখে হামার মনে বড্ড দুঃখু হোলো। হাম্‌নে লোরেনভাইকে বললুম— 'কেনো ভাই ! শশীর সাথে তুমি বাদ্ সাধছো ? তোমার মতে তুমি চলো, শশীভাইকে তার মতে চলতে দাও।' লোরেনভাই হামাকেও দাবড়ি দিয়ে উঠলো। দাবড়ানি শুনে যেই একটা কড়া কথা বলতে গেছি, অমনি লোরেনভাই হেসে উঠলো। এমন হাসলে যে, শশীভাইও হেসে ফেললে। দু'মিনিটের মধ্যে সব গলাগলি বসে ঠাকুরপূজোর ব্যবস্থা করতে লেগে গেলো।"

"একদিন একজন প্রবীণ গৃহীভক্ত বরানগর মঠে এসে বেশ মাতব্বরী চালে লম্বা লম্বা বচন ঝেড়ে যুবক-সন্ন্যাসিগণকে খোঁচা মারিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, সেইজন্য কেহই তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করেন নাই। শেষে লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া যেই

তিনি বলিয়াছেন—'কিরে! পেট বৈরাগী হয়েছিস্?' লাটু মহারাজ তখন কি মুডে (কি মেজাজে) ছিলেন জানি না, অমনি তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন—'কিশুব বাবুর কাছে ঠাকুর একটা ('আঁসচুপড়ীর গন্ধ না হোলে ঘুম হয় না') গল্প বোলেছিলেন। এখন দেখছি আপুনারও সেই অবস্থা। আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগবৈরাগ্যের কথা কি বুঝেছেন? জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন! বাকী জনক রাজা কি সবাই হোতে পারে?' লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া প্রাচীন ভক্তটি চুপ করিয়া যান। (শ্রীহরমোহন মিত্র-কথিত)।

পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজ বরানগর মঠে গুরুভাইদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রসঙ্গ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গ শুনিয়াছি। এইখানে একত্রে তাহাই সন্নিবেশিত হইল। "বরানগর মঠে শশীভাই এমনি আরতি করতো, কি বলবো! ঠাকুরঘরটা তখন গম্ গম্ করতো। শশীভাই মুখে 'জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব!' বলতো, আর কালীভাই একটা স্তোত্র পাঠ করতো। কুছুদিন পরে কালীভাই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) পূজার মন্তর সব তৈরী কোরে ফেললে। তখন থেকে সেই মন্তর পড়ে পূজো হোতে লাগলো।... হামাদের আর কুছু ছিলো না, বাকী ঠাকুরের ভোগে সব ভালো ভালো ফল দেওয়া হোতো। এই না দেখে ওখানকার (বরানগরের) লোক সব বলতো—এরা মাটির ভেতর থেকে ঘড়া ঘড়া মোহর পেয়েছে; নৈলে এতো ফূর্ত্তি কোরে ভোগ লাগায়? হর্‌বখৎ শশীভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোনটা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে কর্‌তো।... হামাদের বলতো—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধন-ভজন নিয়ে পড়ে থাক্।

এঁর (অর্থাৎ ঠাকুরের) দৌলতে সব জুটে যাবে। ··· একদিন যোগীনভাই মাধুকরী থেকে ফিরে এসে একটা মজার গল্প বলেছিলো। আলমবাজারে এক বাড়ীতে ভিক্ষে করতে গিয়ে কি শুনে এসেছিলো, মঠে এসে তা' ভঙ্গী কোরে বলতে লাগলো— 'মাগীটার আছে কি, একখানা খোড়ো ঘর, দুখানা ছেঁড়া কাঁথা আর একটি তামার ঘটি। হায়রে! বলে কিনা তারই বাড়ীতে চুরি করতে গেছি!' ··· একদিন রাখালভাইকে কে যেন একজন কি একটা কাজ করতে বলেছিলো; তাতে লোরেনভাই হুকুম দিয়ে দিলো—'রাখালভাইকে কেউ কোন কাজ করতে বলবে না।' সেই হুকুম হামাদের সকলে মেনে চল্‌তো। ··· বাবুরামভাই মঠ ছেড়ে মাঝে মাঝে তার আত্মীয়ের বাড়ী থাকতো। তাই কেউ কেউ বলতো—'সাধু হোয়ে কোথায় ভিক্ষে কোরে খাবে, তা না, আপনার লোকের বাড়ীতে তোয়াজ করছে।' একথা শুনে হাম্‌নে বললুম— 'সাধু হোয়ে কুথায় তুমি দিনভোর জপধ্যেন করবে, তা না কে কুথায় গেলো, কি করলো, তার খোঁজ রাখছো।' হামার কথা শুনে গুরুভাইটা মুষড়ে পড়লো। তখন হাম্‌নে তাকে বললুম—'দেখো ভাই! বাবুরাম ত পেটের দায়ে সাধু হয় নি; ভগবানলাভের জন্য সাধু হয়েছে। সেখানে থেকে সে ত জপধ্যেন করছে, তবে আবার কি চাও? সবাই কি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ হোতে পারে? আত্মীয়স্বজন যে দুদিনের, সে ত বাবুরামভাই খুব ভালো জানে, আবার তাকে বলবে কি? ··· তখনকার দিনে (অর্থাৎ বরাহনগর মঠে বাসকালে) হামাদের মধ্যে এমন একটা ভালবাসা ছিলো যে, কেউ কারুর কথায় রাগ পুষে রাখতো না। ভিক্ষে কোরে কেউ কোন ভাল জিনিস পেলে, তা' ঠাকুরের সেবায় লাগিয়ে দিতো। ··· হামেশা ঠাকুরের ভালবাসা নিয়ে কথা উঠতো! কেউ বলতো—'ঠাকুর হামায় বেশী ভালবাসেন;' আর

একজন অমনি বলতো— 'না, হামায় বেশী।' এই রকম করতে করতে শেষে তক্‌রার হোতে থাকতো। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, সবাই মনে করতো তাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। একদিন এমনি তকরার করতে দেখে বললুম— 'তিনি (ঠাকুর) কুছু রেখে যান নি, তাতেও তোমাদের সব ঝগড়া হচ্ছে, আর যদি কুছু রেখে যেতেন, তাহলে, তোমরা ত কোর্টে মকর্দ্দমা লড়তে যেতে।' হামার কথা শুনে সবাই হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো। ··· মঠে দেখতুম কালী-ভাই কোন কুছু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাইতো না। রাতদিন কেবল পড়াশুনা করতো। ফুর্‌সৎ পেলে লোরেনভায়ের সাথে তর্ক জুড়ে দিতো। লোরেনভাই তার তর্কগুলো কুচ্‌কুচ্‌ কোরে কেটে দিতো। বাকী একদিন লোরেনভাইকে সে এমন কোণঠেসা করলে যে কুছুতেই আর লোরেন-ভাই তার উত্তর দিতে পারলে না। তখন লোরেনভাই বললে— 'আজ এই পর্য্যন্ত, কাল আবার এখান থেকে শুরু করবো।' কালীভায়ের সেদিন ভারী ফুর্ত্তি হোলো। বাকী পরের দিনে লোরেনভাই এমন সব যুক্তি দিতে লাগলো যে, কালীভাইয়ের সব কথা কেটে গেলো। তখন কালীভাই দুঃখু কোরে বললে— 'লোরেনকে একদিনও যুক্তি দিয়ে হারাতে পারলাম না।' কালীভায়ের কথা শুনে হাম্‌নে বললুম— 'এ ত হোবেই; লোরেনভাই হামাদের লিডর (নেতা), তাকে ছাপিয়ে তুমি যেতে পারবে কেনো?' ··· একদিন লোরেনভাই দুপুরে হামাকে খুব ফায়ার করছে। তাই শুনে হাম্‌নে বললুম— 'হ্যাঁ ভাই লোরেন! তুমি এমন ফায়ার করতে শিখলে কেমন কোরে?' তখন লোরেনভাই বলে গেলো—'আরে! আমি কি ফায়ার করতে জানি? উনি জানতেন। ত্যাখ না, এতোগুলো ছেলেকে

উনি এমন ফাস্নার কোরে দিয়ে গেলেন যে, সবাই ঘরবাড়ী ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, ভাল খাওয়া, ভাল পরা ছেড়ে, একেবারে বাউণ্ডেলে হ'য়ে পড়লো।' ··· এক জায়গায় দল বেঁধে থাকতে গেলেই খুঁটিনাটি বাধে, পরস্পর মনকষাকষি হোতে থাকে। বাকী মঠবাড়ীতে হামাদের মধ্যে মন কষাকষি ছিলো না। যার যা' মনে হোতো, বলতো; বাকী তার পরেই সব গোল মিটে যেতো। এমন সব কথা বলতো, যা' শুনলে রক্ত গরম হোয়ে যায়, বাকী জপধ্যেন করায় তখন সকলার মধ্যে একটা সংযম-ভাব এসেছিলো —কেউ কারুর কথা গায়ে মাখ্‌তো না। শরোট্‌ভায়ের এমন সংযম ছিলো যে, লোরেনভাই বলতো— 'ওটার ত বেলেমাছের রক্ত, ও আবার চট্‌বে কি?' ···হামাদের মধ্যে তারক দাদা ছিলো ভারী আমুদে, কেবল লোকেদের নকল করতো আর বোলতো— 'তোদের নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করি বলে তোরা রাগ করিস নি ভাই!' বাকী হামার ওসব ভাল লাগতো না। হামি মাঝে মাঝে তাদের বলতুম— 'তোমরা এসব করবার জন্যে কি বাড়ী ছেড়ে এসেছো?' হামার কথা শুনে রাখালভাই বলতো— 'ওরে! আমরা আর কি করছি? উনি (ঠাকুর) যে আমাদের চেয়েও আমুদে ছিলেন। এক একদিন এমন হাসাতেন যে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হোতো, আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করতুম, 'একটু থামুন, হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়িভুড়ি সব ছিঁড়ে গেল যে!' এক একদিন ত হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেতো। রাখালভায়ের কথা শুনে হামারও সেইসব কথা মনে পড়তো। হামি চুপ কোরে যেতুম। ··· হামাদের মধ্যে গঙ্গিস্‌ (গঙ্গাধর মহারাজ—স্বামী অখণ্ডানন্দ) ছিল খুব চট্‌পটে। একবার ত রম্‌তা সাধু হোয়ে তিব্বত চলে গেলো। তার ইচ্ছে ছিলো সেখানে গিয়ে মহাপুরুষের সঙ্গ করবে।

আরে! মহাপুরুষেরা কি অমনি ধরা দেন? তাঁরা লোক দেখে বুঝতে পারেন কে কোন ঘরের সাধু। নিজের ঘর না হোলে তাঁরা কাউকে ধরা-ছোঁয়া দিতে চান না। তাঁরা কৃপা কোরে লোকের কাছে ধরা না দিলে তাঁদের চিনতে পারা যায় না। ··· একদিন দক্ষ মহারাজ মঠে এসে খুব তর্ক জুড়ে দিলো। তাতে লোরেনভাই বলেছিলো— 'কি পাগলার মত তর্ক করছিস? তর্ক করলেই হোলো? তর্ক করতে গেলে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে হয় জানিস্? তুই পড়েছিস্, যে বেদান্তের তর্ক তুলছিস্? লোরেন ভায়ের কথা শুনে সে চুপ কোরে গেলো। বাকী ও (দক্ষ মহারাজ) যা বলতো সব বেদান্তের কথা। ··· শুনেছি, আঁটপুরে ধুনি জ্বালিয়ে বসে সবার সন্ন্যাস নেবার খেয়াল হোয়েছিলো। সেখানে চান করতে গিয়ে সারদাভাই ডুবে গেছিলো। নিরঞ্জনভাই তাকে সেবার বাঁচিয়ে দিলো। এসব কাজে নিরঞ্জনভায়ের খুব দিল (উৎসাহ) ছিলো। হাঙ্গামা পোয়াতে পারতো। একবার শশীভাই মঠ ছেড়ে চলে গেলো— পথে তার জ্বর হোলো; নিরঞ্জনভাই খবর পেয়ে তাকে মঠে নিয়ে এলো। আর একবার যোগীনভায়ের অসুখ শুনে এলাহাবাদ চলে গেলো। কারুর অসুখ শুনলে দৌড়ঝাঁপের কাজ নিরঞ্জনভাই নিজের মাথায় নিতো আর শরোটভাই সেবার ভার নিতো। ··· মঠে সকলকে খুব পড়াশুনা করতে দেখতুম, তাই একদিন শরোটভাইকে বললুম— 'হ্যাঁরে! তোরা এতো পড়াশুনা করিস কেনো? স্কুলকলেজ ছেড়ে দিয়ে আবার গাদাগাদা বই পড়িস্, তোদের কি পাশের পড়া পড়েছে?' তাতে শরোটভাই বলেছিলো— 'ভাই! পড়াশুনা না করলে এসব বিষয় (অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়) জানবো কেমন করে?' তাতে হাম্‌নে বলেছিলুম— 'উনি (ঠাকুর) ত এতো কথা বলতেন, বাকী উনাকে ত পড়াশুনা করতে

দেখতুম না!' তাতে শরোট্‌ভাই বলেছিলো— 'আরে! ওনার মত সবাই কি হোতে পারে? ওনাকে মা রাশি রাশি জ্ঞান ঠেলে দিতেন। আমাদের ত সে অবস্থা নয়! আমাদের পড়াশুনা করতে হবে বই কি!' তার কথা শুনে ফিন্ বলেছিলুম—দেখো ভাই! তিনি বল্‌তেন—'বই পড়ে একরকম বুঝা যায়, আর অনুভবে একরকম।' হামার কথা শুনে শরোটভাই বললে— 'দেখ! যারা আচার্য্য হোয়ে জগৎকে শিখাবে, তাদের পড়াশুনা করতে তিনি মানা করতেন না, জানিস ত?' হামনে বুঝলুম যে, তিনি যার যেমন ভাব তাকে তেমনি বুঝিয়েছেন। ··· মঠে এক একদিন এমন কীর্ত্তন হোতো কি বল্‌বো! যোগীনভাই বৃন্দাবন থেকে তিলকমাটী এনেছিলো। একদিন সকলে মিলে লোরেনভাইকে সেই তিলকমাটী দিয়ে সাজালে। তাতে লোরেনভায়ের ভাব এসেছিলো। সেদিন এমন কীর্ত্তন করলে যে মঠবাড়ীতে ভীড় জমে গেলো। এক একদিন আবার এমন গান হোতো যে রাজ্যের লোক এসে শুনতো। মাঝে মাঝে আবার বাবুরাম আর গঙ্গিস্‌ভাই নাচতো। সবাই মিলে তখন এমন হট্টগোল করতো যে, হাম্‌নে বরদাস্ত করতে পারতুম না। ··· কটক থেকে ফিরে এসে বলরাম বাবু হামেশা মঠে আসতেন। হামাদের কি কি দরকার সব বাবুরামের কাছে জেনে নিতেন। মাঝে মাঝে দুঃখু কোরে বলতেন— 'হামার কুছু হোলো না।' একবার তিনি রাখালভাইকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে গেছিলেন। ··· একদিন লোরেনভাই এসে বললে— 'কালী-পূজা করবো।' অমনি সুরেন্দর বাবু কালীপূজার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। ··· তখন মঠে ঠাকুরের তিথিপূজা হোতো, আর দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ উৎসব হোতো। হরমোহন বাবু উৎসবের জন্য খুব খাটতো। সকলে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতো আর তাঁর বিষয় নিয়ে আলাপ-

আলোচনা করতো। … একবার লোরেনভাই ঠাকুরের তিথিপূজা করতে বসে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে দিলো। শশীভাই ত পূজা দেখে অবাক হোয়ে গেলো। শুনেছি, লোরেনভাই ধ্যেনে বসে সেদিন মানসপূজা করেছিলো।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ বরানগর মঠে একাদিক্রমে প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে (সম্ভবতঃ ১৮৮৮ শীতকালে) তাঁহার একবার নিউমোনিয়া-রোগ হয়। তখন শরৎ মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। অসুখে পড়িয়াও তিনি প্রায় ডাক্তারদের কথা শুনিতেন না। এই সময়ের একটি প্রসঙ্গ শরৎ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি (তাহার এক অংশ 'তাপস-জীবন' এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "ডাক্তারের পরামর্শ মত একদিন লাটুর ঘরে মালসা করিয়া আগুন দেওয়া হইলে তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন— 'হামাকে মেরে ফেললে রে বাপ্! যাও বা পরাণ্‌টা একটু আসছিলো তাও এরা আসতে দেবে না রে বাপ্! এতো গরম কি হামার সহ্য হয়? হামি আর কারুর কথা শুনবো না, ছাদে গিয়ে শুবো।' এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া সত্যই লাটু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। লাটুর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমি ঘরের দরজা-জানালা সব খুলিয়া দিলাম এবং নিরঞ্জনভাইকে আগুনের মালসা সরাইয়া লইতে বলিলাম; তাহার পর তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। মাথায় হাত বুলাইবার সময় লাটু আমাকে বলিল— 'ঘরের দরজা-জানালা আর বন্ধ করে দিস নি, ভাই! তা'হলে আর বাঁচবো না!' এইটুকু আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, তাহার পর হইতেই লাটুর অসুখ ভালদিকে আসিতে লাগিল।"

আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, নিউমোনিয়া-রোগের

পর পথ্য পাইলে লাটু মহারাজ মাস তিনেকের জন্য ভক্তপালক রাম বাবুর গৃহে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে মায়ের (রাম বাবুর স্ত্রীকে লাটু মহারাজ মা বলিতেন) তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লাটু মহারাজ অল্পদিনেই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠেন। এই সময়কার একটি কথা যোগোদ্যানের শিবরামের নিকট শুনিয়াছি। তিনি প্রায়ই রাম বাবুর বাড়ীতে আসিতেন। তাহারই বর্ণনামত বলিতেছি— "লাটু মহারাজের দেহের ভিতর হইতে তখন যেন একটি উজ্জ্বল আভা বাহির হইত। তাঁহার চক্ষু দুটি তৎকালে প্রায়ই অর্দ্ধমুদ্রিত হইয়া থাকিত এবং ওষ্ঠাধর প্রায়ই কম্পিত হইতে থাকিত। কদাচ কাহারো সহিত তখন তিনি কথা বলিতেন। মাঝে মাঝে গ্রীবা বক্র করিয়া এমন একটি ভঙ্গীতে বসিতেন যে, দেখিলেই মনে হইত যেন কাহার সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনুক্ষণ তাঁহার গায়ে কম্বল বা চাদর থাকিত। সারা দুপুরটি তিনি রৌদ্রসেবন করিতেন এবং মালা লইয়া বসিয়া থাকিতেন।"

সেই বৎসরের ফাল্গুন মাসে (সম্ভবতঃ ১৮৮৮) বরানগর মঠে খবর আসিল যে, যোগীন মহারাজ এলাহাবাদে ভীষণ বসন্তরোগে পীড়িত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মঠ হইতে প্রায় সকলে (কেবল শশী মহারাজ ও অদ্বৈতানন্দ ব্যতীত) প্রয়াগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। মঠে লোকাভাব হইবে ভাবিয়া জনৈক গুরুভাই লাটু মহারাজকে মঠে যাইয়া থাকিতে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ সেইদিনই রাম বাবুর গৃহ হইতে মঠে আসিলেন এবং সেইখানে প্রায় তিন-চারি মাস রহিলেন। পরে পুনশ্চ মঠে স্থানাভাব হওয়ায় তিনি বেলুড়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট চলিয়া যান। শ্রীশ্রীমা তখন গয়া হইতে ফিরিয়া বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

একদিন নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা লাটু মহারাজকে বাজার করিয়া আনিতে বলিলেন ; সেদিন যোগীন মহারাজ কোথায় গিয়াছিলেন। লাটু মহারাজ আমাদের বলিয়াছেন, "মায়ের কথা শুনে হাম্‌নে বললুম— 'এখন হামি যেতে পারবো না ; তার চেয়ে বরং যাই, যোগীনকে ডেকে দিই গে। হামার এখন ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে মন যায় না।' দেখো ! (শ্রীশ্রী) মা হামার মনের ভাব ঠিক বুঝে নিলেন, বললেন—'তোর গিয়ে কাজ নেই, থাক তুই যোগীনকে ডেকে দে।' এরকম কতো যে উৎপাত মায়ের কাছে করতুম ! বাকী মা কখনো তাতে বিরক্ত হোতেন না। (শ্রীশ্রী) মায়ের সহ্যশক্তির কি তুলনা আছে ? তাই যেখানে-সেখানে ওনার কথা বলি না ; সকলে বুঝবে না, বাকী উল্টা বুঝে সব গরবর্ কোরে ফেলবে।"

নীলাম্বর বাবুর বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীমা ৺পুরীধামে গমন করিলে লাটু মহারাজ পুনরায় বরানগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেইখানে চারি-পাঁচ মাস রহিলেন। আমরা দুইটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি, মনে হয় সেই দুইটিই ঐ সময়কার ঘটনা। কারণ এই সময়ে বুড়ো বাবা (সচ্চিদানন্দ) মঠে আসিয়াছিলেন। দুইটি ঘটনার মধ্যে একটি লাটু মহারাজ-কথিত— "একদিন শশীভাই বুড়ো বাবাকে ঠাকুরের দাঁতনকাঠি দিতে বললে। বুড়ো বাবা জানতো না যে, ঠাকুরের দাঁতনকাঠি থেঁতো কোরে দেওয়া হয়। তাই সে একটা আস্ত দাঁতনকাঠি ঠাকুরের ঘরে দিয়ে এলো। বাল্যভোগ দেবার সময় শশীভাই তা' দেখে বুড়ো বাবাকে কি বকুনীটাই দিলে !— 'শালা ! আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের কোরেছিস ; আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।' এই বলে শশীভাই তার দিকে ছুটে এলো। হাম্‌নে ত তখুনই বুড়ো বাবাকে বললুম— 'পালিয়ে যা, দেখছিস কি ?' হামার কথা শুনে বুড়ো বাবা পালিয়ে গেলো। তাকে ধরতে না

পেরে শশীভাই আবার একটা দাঁতনকাঠি খুব থেঁতো কোরে ঠাকুরঘরে দিয়ে এলো। দেখো তো, শশীভাই কেমন মন নিয়ে তাঁর পূজা করতো!"

অপর ঘটনাটি 'উদ্বোধন,' অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ হইতে উদ্ধৃত —"একবার খুব মজা হয়েছিল। সকালে ঠাকুরের বাল্য-ভোগের জন্য হালুয়া তৈরী করতে গিয়ে শশী মহারাজ দেখেন— কড়া অপরিষ্কার। রাত্তিরে লাটু মহারাজ ছোলা সিদ্ধ কোরে রেখেছিলেন, তা' আর পরিষ্কার করা হয় নি। কড়া মেজে হালুয়া তৈরী করে ঠাকুরকে বাল্যভোগ দিতে দেরী হয়ে যাবে, এই জন্য সেদিন শশী মহারাজ লাটু মহারাজকে যা-তা বলে গালি দিয়েছিলেন। কারণ ঠাকুরের সেবার কোনরূপ ত্রুটী হোলেই তিনি অধৈর্য্য হয়ে পড়তেন। গালাগালি খেয়ে লাটু মহারাজ বললেন— 'হামি মাকে পত্র দিব'; তোমার বাবা-মা আউর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে?' "

প্রায় পাঁচ মাস মঠে থাকিয়া লাটু মহারাজ পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। পুরী হইতে ফিরিয়া শ্রীমা দিনকয়েকের জন্য বাবুরাম মহারাজের দেশ আঁটপুরে গিয়াছিলেন। সেইবার (শ্রীশ্রী) মায়ের সহিত মঠের বিবেকানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, মাষ্টার মশায়, বৈকুণ্ঠ বাবু প্রভৃতি অনেকেই সেইখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আঁটপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন আর লাটু মহারাজ, কালী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীমাকে লইয়া তারকেশ্বর হইয়া জয়রামবাটীতে গমন করিলেন। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিয়া লাটু মহারাজ স্বামী অভেদানন্দের সহিত ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে গিয়াছিলেন এবং দুইজনে একসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও পরিচিত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের সেবক শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিয়া দুইজনেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া গেল। সেই বৎসর মঠের দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু হয়। প্রথমে ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে বলরাম বাবু দেহত্যাগ করেন এবং একমাস না যাইতে যাইতে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উদরীরোগে পরলোকগমন করেন। যাঁহাদের অর্থসাহায্যে বরানগর মঠের খরচ চলিত, তাঁহারা দুইজনেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে লীন হওয়ায়, মঠের গুরুভাইগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। সেইসময়কার দুই-একটি ঘটনা পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি। — "বলরাম বাবুর অসুখে হাম্‌নে প্রায় তাঁকে দেখতে যেতুম; মাঝে মাঝে দু-চার দিন সেখানে থেকেও যেতুম। (শ্রীশ্রী) মাকে কোন কোন দিন মাষ্টার মশায়ের বাড়ী থেকে (তখন মাষ্টার মহাশয় কম্বুলিয়াটোলায় থাকিতেন) বলরাম বাবুর বাড়ীতে নিয়ে আসতুম্। সে সময় মহাপুরুষ মহারাজ, নিরঞ্জন-ভাই আর গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) প্রাণ ঢেলে বলরাম বাবুর সেবা করেছিলো। তাঁর অসুখের সময় রাম বাবু, গিরিশ বাবু, সুরেশ বাবু, মাষ্টার মশায়, মনমোহন বাবু—এনারা সব আসতেন। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন তাঁর মুখে কেবল ঠাকুরের কথা শুনেছি। তিনি সেদিন অন্য কোন কথা বলেন নি, জানো! ··· সুরেশ বাবুর অসুখ শুনে শশীভাই একদিন হামাকে নিয়ে মঠ থেকে গাড়ী কোরে তাঁকে দেখতে গেলো। শশীভাইকে দেখে সুরেশ বাবু বললেন—'দেখ্! তোর হাতে ৫০০৲ টাকা দিচ্ছি, তুই সেই টাকায় একটা ঠাকুরঘর বানাস।' সেকথা শুনে শশীভাই তাঁকে বললে— 'তুই কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই! আগে অসুখ থেকে বেঁচে ওঠ, তারপর টাকা দিস্, এখন তোর টাকা আমি নেবো না।' সুরেশ বাবু অনেকবার বললেন, বাকী শশীভাই টাকা নিলো না। আর তিনিও ভাল হোলেন না। শুনেছি, সে টাকা তিনি মরবার আগে কার

কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, পরে সেই টাকা দিয়ে ঠাকুরঘরেতে (বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরের সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন) মার্ব্বেলপাথর বসান হোলো। সুরেশ বাবুর দিলটা দেখলে ! মরবার সময়ও তাঁর (ঠাকুরের) কাজের কথা ভেবেছে। ··· বলরাম বাবু আর সুরেন্দর বাবু মারা যাবার পর লোরেনভাই (শ্রীশ্রী) মায়ের অনুমতি নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেলো, একেবারে সাত-আট বছর বাদে আলমবাজারে ফিরে এলো। সেই সময় লোরেনভাই বিলেত, আমেরিকা গিয়েছিলো। লোরেনভায়ের সঙ্গে অনেকে মঠ থেকে বেরিয়ে গেলো (অর্থাৎ তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন)। শশীভাই সেখানে (অর্থাৎ বরানগর মঠে) রয়ে গেলো, হাম্‌নে ঘুসুরিতে মায়ের বাড়ীতে চলে গেলুম।"

বলরাম বাবুর দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমা কিছুদিন ঘুসুরিতে ছিলেন। সেইখানে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় ভক্তগণ তাঁহাকে বরানগরে (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) একখানা ভাড়াবাড়ীতে লইয়া আসেন। সেইখানে লাটু মহারাজ যান নাই। তখন তিনি বরানগর মঠে থাকিতেন।

হরিপদ মহারাজের (স্বামী বোধানন্দ) প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লাটু মহারাজ মঠে ছিলেন। তিনি একটি লিখিত নোটে বলিয়াছেন— "ইংরেজী ১৮৯০ সনের শেষভাগে লাটু মহারাজের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। সেদিন তিনি অসুস্থ * ছিলেন। তাঁহার আসনের পার্শ্বে দুই-তিন জন গৃহস্থ ভক্ত বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কবিরাজ মহাশয় ছিলেন। তাঁহার আসল নাম আমার স্মরণ হইতেছে না। তাঁহার চিকিৎসায় লাটু মহারাজের শ্রদ্ধা থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা

* হরিপদ মহারাজ প্রথম দর্শনে যাহাকে অসুখ বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অসুখ নহে। উহা ধ্যানকালীন স্তব্ধভাব। পরে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।

করিলেন। পরীক্ষাকালে লাটু মহারাজ কবিরাজের কোন প্রশ্নের দেন নাই। লাটু মহারাজ সে সময় একভাবে থাকিতেন, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না। সেদিন আমাদের সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী একটি বাটিতে করিয়া ঝোল বা ডালের মত এক পথ্য আনিয়া দিবামাত্র লাটু মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি খাইতে গিয়া উহার কতক ভাগ তাঁহার কাপড়ে পড়িয়া গেল ও কতকটা মুখের চারিদিকে লাগিয়া রহিল। এরূপ নিঘৃণ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে একটা ধাঁধা লাগিল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমি সে-দিনের মত বিদায় লইলাম। তাঁহার সহিত আমার পুনরায় দেখা হয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কলিকাতাস্থ মধু রায় লেনের বাড়ীতে।"

সেই সময়কার আর একটি প্রসঙ্গ বলিতেছি। ইহা স্বামী তুরীয়ানন্দ-কথিত—"স্বামীজীরা একে একে মঠ থেকে বাহিরে তপস্যা করতে গেলেন দেখে আমারও মনে হোলো— যাই, দিন কতক বাহিরে সাধুসঙ্গ করে আসি। মনে মনে সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ কে যেন বলে দিলে— 'ওরে! এমন সাধু ছেড়ে কোথায় যাবি?' সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম লাটু মহারাজ গায়ে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে ধ্যান করছেন। অমনি আমার ম'ন হোলো সত্যই ত এমন সাধু ছেড়ে কোথায় ঘুরবো! সেই সময়ে লাটু মহারাজও আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— 'কোথায় এধার-ওধার ঘুরবে, তার চেয়ে এখানে থেকেই জপধ্যান কর না।' সে-যাত্রায় আমার আর মঠ থেকে বেরুনো হ'ল না।"

আর একটি প্রসঙ্গ আমরা শুনিয়াছি। তাহাও তুরীয়ানন্দ স্বামীর মুখ হইতে। এই প্রসঙ্গটি বরানগর মঠের এই পর্য্যন্ত জানি, সময় ঠিক বলিতে

পারি না।— "একদিন আমি জনৈক ভক্তকে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষ নাই। লাটু মহারাজ তখন চুপচাপ আমার কথা শুনিয়া গেলেন। সে লোকটি চলিয়া যাইবার পর বলিলেন— 'তোমার ভাবটা ত বেশ, ঈশ্বর যেন শিশু আর তোমরা তাঁকে আগলে আগলে রাখবার চেষ্টা করছো— মায়ের মত।' সেই কথা শুনে উৎসাহভরে আমি আমার স্বপক্ষের যুক্তি দেখাইয়া বলিলাম — 'ভগবান যদি যা-খুশী তাই করেন, তা' হোলে ত তিনি একটি despot (খামখেয়ালী) হোয়ে গেলেন। তিনি কি রুশিয়ার জারের মত স্বেচ্ছাচারী? তিনি ন্যায়বান, দয়ালু, মঙ্গলময়।' লাটু মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন— 'সে ভাল, তুমি তোমার ভগবানকে সে-সব দোষ থেকে রক্ষা করছো, বাকী এটাও ত মানো যে, তিনি রুশিয়ার জারের মত স্বেচ্ছাচারীকেও চালাচ্ছেন।' দেখ! কি চমৎকার মীমাংসা করে দিলেন! কথাটা আমার মনে খুব লাগলো।"

বরানগর মঠের আর একটি প্রসঙ্গ আছে। প্রসঙ্গটি শরৎ মহারাজ-কথিত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রকাশিত। "কোন একদিন মঠের বড় ঘরটিতে শিবানন্দ মহারাজ কোন ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি কৌতুককটাক্ষ করিয়া রসিকতা করিতেছিলেন। লাটু মহারাজ মধ্য হইতে দু-একটা কথা শুনিয়া বলিলেন— 'দেখো শরোট্! হামি ত আগেই বলেছি, শ্যালারা মাস্তুতোয় মাস্তুতোয় চোরে ভাই।' সকলেই সেই কথা শুনিয়া তুমুল হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল এবং পরে এই কথা লইয়া লাটু মহারাজকে ক্ষেপাইতে লাগিল।"

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তপালক রামচন্দ্র দত্তের বড় বাড়াবাড়ি অসুখ হয়। তাহার দিন পনর পর অর্থাৎ আষাঢ় মাসে তিনি রাম বাবুর

গৃহে আসিয়াছিলেন এবং সেইখানে পূজার পর পর্য্যন্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে দু-চার-দশ দিনের জন্য তিনি এধার-ওধার চলিয়া যাইতেন, কিন্তু সেইখান হইতে পুনরায় রাম বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। সেই সময়কার দু-একটি কথা জানা গিয়াছে।

একদিন রাম বাবুর বাড়ীতে লাটু মহারাজ আপন মনে বলিতেছেন—'মন মিলে তো মেলা, চিৎ মিলে তো চেলা, সব্‌সে ভালা একেলা একেলা।' সেই সময়ে বৃদ্ধ কিশোরী বাবু (স্বামী বিবেকানন্দ যাহাকে আবদুল বলিতেন) আসিয়া উপস্থিত হন। বৃদ্ধ কিশোরী বাবুর তৎকালে স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তিনি রাম বাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত ভগবৎ-আলোচনা করিতেন। কিশোরী বাবু নিজে লীলাবাদী ছিলেন, রাম বাবুও তাই; উভয়েই পরমহংসদেবকে অবতার বলিতেন। কিশোরী বাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছি, "রাম বাবুর বাড়ীতে লাটুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'একেলা ত সংসারে থাকা চলে না।' তাহার উত্তরে লাটু বলিয়াছিল—'সংসারীদের চলে না, বাকী সন্ন্যাসীদের একেলা একেলা থাকবারই নিয়ম।'"

সেই-সময়কার একটি কথা হরিপদ মহারাজ লিখিয়াছেন—"বোধ হয় ১৮৯১ সনের মাঝামাঝি লাটু মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়। রাম বাবুর বাড়ীর নিম্নের তলায় একটি ঘরে একখানি তক্তাপোশের উপর তিনি শুইয়া ছিলেন। সেদিন তাঁহার জন্য আমি একখানি কম্বল লইয়া গিয়াছিলাম। কম্বলখানি পাইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। সেদিন তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল (অবশ্য ধর্ম্মবিষয়ক কথা)। লাটু মহারাজের বালকের মত সরলতায় এবং তাঁহার ভক্তি ও জ্ঞান-পূর্ণ বাক্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট বার বার বিদায় লইবার ইচ্ছা জানাইলেও

তিনি প্রতিবারই অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আমাকে আর একটু বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে অনুরোধ এড়াইয়া বিদায়গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমার কেন— কাহারও ছিল না। এইভাবে তিন-চার ঘণ্টা পর সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে অল্পকিছু খাওয়াইয়া তবে বিদায়দান করেন।"

স্বামীজীর সহিত ভ্রমণ

আলমবাজারের মঠবাড়ীর বর্ণনা, ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত লাটু মহারাজের অবস্থানের কথা, শিবরাত্রিতে শিবপূজা, অভেদানন্দ মহারাজের সেবা, ঠাকুরের স্তোত্র লইয়া অভেদানন্দকে ঠাট্টা করা, লাটু মহারাজ-কথিত শশীভায়ের প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লাটু মহারাজ, হরমোহন বাবুর বাটীতে গমন, কেদার ঘোষের গৃহে আহার, শালকিয়ার জনৈক মুদির পাকাসিধা পাঠানোর কথা, উপেন বাবুর অনুরোধ ও লাটু মহারাজের কথা, রাখাল মহারাজের সহিত দেখা করিতে যাওয়া, টাউন হলের সভায় যাওয়া, লাটু মহারাজের পুরীগমন ও নিতাই বাবুর কথা, জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা-প্রসঙ্গ, অক্ষয় মাষ্টারের নিকট 'রামকৃষ্ণপুঁথি'-শ্রবণ, লাটু মহারাজের পুরাণশ্রবণ, গজু ভট্টাচার্য্যের নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে লাটু মহারাজের আগমন, লাটু মহারাজের বলরাম মন্দিরে অবস্থান, অভেদানন্দ স্বামীকে জাহাজে তুলিতে যাওয়া, স্বামীজীর কলিকাতায় আগমন ও পশুপতি বসুর গৃহে গমন, লাটু মহারাজের কথা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে গমন, শশীভায়ের মাদ্রাজ-গমন ও মঠের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-স্থাপনার সম্বন্ধে লাটু মহারাজের কথা, স্বামীজীর সহিত লাটু মহারাজের ভ্রমণ, কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া যায়। আলমবাজার মঠে লাটু মহারাজ বিশেষ থাকেন নাই— মধ্যে মধ্যে আসিতেন মাত্র। স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন— "যতদূর মনে পড়ে তিনি আলমবাজার মঠে এবং স্বামীজীর আগমনের পর বেলুড় মঠ স্থাপন হোলে তথায় ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চলেও যেতেন, ঘুরেফিরে আবার আসতেন।" আমাদের কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আলমবাজার মঠবাড়ীর ছবিখানি দিতে চাহি—

"মোটাথামওয়ালা বাটী, সদর দোর দিয়ে ঢুকে, দুটো ছোট ছোট রক্, সামনে উঠান ও তার পশ্চাতে তিন ফোকর ঠাকুরদালান। উঠানের এক পাশে ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে দুটো বারাণ্ডা। পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার পশ্চাতে একটা বড় ঘরের সামনে একটা

ছোট ঘর। দক্ষিণের বারাণ্ডা দিয়ে তিনখানা ঘরে যাওয়া যায়। বাঁ-দিকের ঘরটি ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরের পাশ দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পূর্ব্বকোণের ঘরটিতে ভাঁড়ার থাকতো। দক্ষিণের আর একখানি ঘরে সকলে থাকতো। এছাড়া বাড়ীটার পশ্চিমদিকেও তিনখানা ঘর ছিল। তার একটিতে শশী মহারাজ থাকতেন। তার পাশের ঘরটিতে কালী মহারাজ থাকতেন আর একখানিতে তুলসী মহারাজ থাকতেন। নীচে রান্নাঘরের সুমুখে একটা গলি, তার পরে বাঁধান পুকুর। পূর্ব্বদিকেও আর একটি পুকুর ছিল। লাটু মহারাজ মঠে আসিয়া দোতলার পূর্ব্বদিকের বড় ঘরখানিতে থাকতেন।"— শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কথিত।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লাটু মহারাজ কখন যে কোথায় অবস্থান করিতেন তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই সময়ের মধ্যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। কলিকাতাস্থ নানা ভক্তের গৃহে যাওয়া-আসা করিতেন, মাঝে মাঝে কলিকাতার বাহিরেও নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। ঠিকমত বলিতে গেলে, ১৮৯১ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত তাঁহার নিবাস অধিকাংশ সময়ই গঙ্গাতীরে ছিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্য ভক্তগৃহে। ইচ্ছা হইল ত দু'দশ দিন মঠেও থাকিতেন। কখনো তিনি বাগবাজারে খোড়ো কেদারের বাড়ীতে, গিরিশ বাবুর বাড়ীতে অথবা বলরাম বাবুর বাড়ীতে, কখনো বা সিমলায় রাম বাবুর বাড়ীতে কিম্বা দর্জ্জিপাড়ায় হরমোহন বাবুর বাড়ীতে, কখন কখন পটলডাঙ্গায় শ্রীযুত খগেন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে যাইতেন। মাঝে মাঝে শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতেন। আহিরীটোলায় তিনি উপেন মুখুজ্জের বাড়ীতে মাঝে মাঝে অন্নাদি গ্রহণ করিতেন এবং কখন কখন বিডন ষ্ট্রীটে 'বসুমতী' প্রেসে থাকিতেন। এই সময়ের ঠিক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত

দেওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন বৎসরের মাত্র একদিনের ঘটনা আমরা জানিতে পারিয়াছি— অন্য তিনশো-চৌষট্টি দিন কোথায় ছিলেন জানিতে পারি নাই। যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই দিলাম।

১৮৯২ খ্রীঃ ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির দিন তিনি যে আলমবাজার মঠে শিবপূজা করিয়াছিলেন, সেকথা কালী মহারাজের মুখে শুনিয়াছি। তার-পরের দিন জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন— "দেখছ! লাটু কেমন শিবরাত্রি করেছে!"

১৮৯২ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ যখন 'থ্রেড্ ওয়ারম্' পীড়ায় অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন লাটু মহারাজ তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন— "লাটু মহারাজের গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ভালবাসাও ছিল অত্যদ্ভুত। আলমবাজার মঠে যখন আমার অসুখ হয়, তখন লাটু মহারাজ আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময় ডাক্তারগণ বলিয়াছিলেন যে, এই পীড়ার বীজ অন্য কাহারও দেহ-স্পর্শ করিলে তাহারও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে; তত্রাচ তিনি প্রত্যহ শরৎ মহারাজের সহিত আমার ক্ষতস্থান ধুইয়া দিতেন।"

এইকালে লাটু মহারাজ প্রত্যহ সকালে আলমবাজার মঠে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পর মঠ হইতে বাহির হইয়া অন্য স্থানে তপস্যা করিতে বসিতেন। এই কথাগুলি তুলসী মহারাজের মুখে শুনিয়াছি।

১৮৯৩ খ্রীঃ প্রথম দিকে তিনি মঠে আসিতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেন— "তখন মঠে অভেদানন্দ স্বামীজী-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রটি সন্ধ্যা-রতির সময় পাঠ হইত:

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং।
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ॥

ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং।
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥'

—তিনি এই শ্লোকটির মধ্যে 'ঈশাবতারং' এই পদটি শুনে মনে মনে বিরক্ত হয়ে শ্রীশরৎ মহারাজকে বলেন— 'এ শরোট্! তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভুলে গেলে দেখছি? ঈশাকে পূজা কর্ছো! তোমরা সব কি হোলে?' " ইত্যাদি ···। স্বামী অভেদানন্দজী এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন— "এই শ্লোকটি শুনিয়া লাটু মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন! আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন— 'তুই শেষে ঠাকুরকে যীশুখ্রীষ্টের অবতার কোরে দিলি?' তখন তাঁহাকে শ্লোকের যথার্থ ভাব বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে লোকের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রচারিত হয় তাহার জন্য উত্তরকালে চেষ্টাও করিয়াছিলেন।"

এই বৎসরের আর একটি ঘটনা জানিতে পারিয়াছি। একদিন জনৈক ভক্ত কোন উৎসব উপলক্ষে লাটু মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্তের সহিত বাগবাজারে ৺কেদারচন্দ্র দাসের (খোড়ো কেদারের) বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়া দেখেন যে, লাটু মহারাজ এক-খানা চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। নিবারণ বাবু লাটু মহারাজকে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার সারা না পাওয়ায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ধ্যান ভাঙ্গিলে তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণের কথা জানান। লাটু মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন— "এখানে কেনো? আলমবাজারে যাও। সেখানকার সাধুদের সব নিমন্ত্রণ কোরে এসো, শশীভাই গেলেই ঠাকুরের যাওয়া হবে, জানবে।"— ঠাকুরের ভক্ত শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্তের মুখ হইতে শ্রুত।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীমা পুনরায় বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসেন। সেখানে লাটু মহারাজ গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছেন— "দেখো, নীলাম্বরের বাড়ীতে মা কঠোর পঞ্চতপা করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনিও এমন কঠোর করলেন। তপস্যা না থাকলে কারুর কুছু হবার যো নেই, জানো!"

এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লাটু মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশ-গমনের কথা জানিতে পারেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বলিয়াছেন— "হাম্‌নে ত মায়ের মুখে শুনে জানতে পারি যে, লোরেনভাই ওদেশে (আমেরিকা) গেছে। লোরেনভায়ের খবর শুনবার জন্য হামার মন কেমন করতো! ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলেই বলতে লাগলো— 'ঠাকুর কি পাগলাপনা কোরে গেলেন!' বাকী হাম্‌নে সে কথা মানতে চাইতুম না। সকলকেই বলে দিতুম—'তিনি (ঠাকুর) যখন বলেছেন, তখন একদিন না একদিন লোরেনভাই হামাদের সবাইকে উঁচিয়ে যাবে— তখন দেখবে।' তিনি বলতেন— 'ওর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে,' আর তোমরা কিনা তাঁর কথায় সংশয় আনছো! তাঁর কথা কি কখনও মিথ্যা হোতে পারে? ··· শেষে যখন স্বামীজীর কর্ম্মটি ওদেশে প্রকাশ পেলো তখন হামার যে কি আনন্দ হোলো কী বল্‌বো!" সেই সময়ের একটি কথা গিরিশ বাবুর মুখে আমরা শুনিয়াছি— "লাটু এখানে এসে মাঝে মাঝে ঠিক বালকের মত উদ্‌গ্রীব হোয়ে স্বামীজীর জয়যাত্রার কথা শুনতো। আমি যখন তাকে জানালাম যে, স্বামীজীর বক্তৃতা সকলের চেয়ে ভালো হয়েছে. তখন লাটু ঠিক বালকের মত হেসে বলেছিল— 'হবে না! ঠাকুর বলতেন, লোরেনের আঠারটা শক্তি আছে। সে-সব শক্তি যাবে কুথায়? ওতো হোবেই হোবে। তাঁর কথা কি মিথ্যে হোতে পারে?' একদিন এমন উচ্ছ্বসিত হোয়ে

উঠলো যে আমার বললে, 'ওকে লিখে দিন— কোন ভয় নেই, ঠাকুর তোমায় রক্ষে কর্‌ছেন।'" ··· আর একজনকে তিনি তৎকালে বলিয়াছিলেন —'দেখলি, ঠাকুর যাকে বড় বলেছেন, সে কি কখনও চাপা থাকতে পারে ?' এই কথা জনৈক গুরুভায়ের মুখে শ্রুত।

উক্ত সনে লাটু মহারাজ কয়েকদিনের জন্য হরমোহন বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে দুপুরে থাকিতেন না, প্রায়ই কিছু ছোলা ও চিড়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। ইহা হরমোহন বাবুর নিকট শুনিয়াছি।

আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৮৯১ খ্রীঃ শেষভাগ হইতে ১৮৯৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লাটু মহারাজ ৺কেদারচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে রাত্রে প্রায়ই আহার করিতেন। দিনের বেলা তিনি অযাচিত ভিক্ষালব্ধ পয়সা লইয়া চানাভাজা ছোলাভাজা খাইয়া দিন কাটাইতেন। কোন কোন দিন রাম বাবুর বাড়ীতে দুপুরে আহার করিতেন। সেই সময় তিনি মায়ের (রাম বাবুর স্ত্রীর) নিকট হইতে গেরুয়াবস্ত্র লইয়া আসিতেন। কম্বলাদির প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময় গিরিশ বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতেন। রাম বাবুর নিকট হইতে একবার মাত্র তিনি একখানি কম্বল চাহিয়াছিলেন শুনিয়াছি। সেই সময় মাঝে মাঝে ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি খাওয়াইতেন। শুনিয়াছি, একবার মনোমোহন বাবু তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া ভূরিভোজন করাইয়াছিলেন।

এই সময় শালকিয়ার কোন এক মুদি তাঁহাকে কাঁচাসিধার পরিবর্ত্তে পাকাসিধা দিয়া আসিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে, সেই মুদি তাঁহার খুল্লতাত, কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, সে ব্যক্তি

লাটু মহারাজের খুল্লতাত নহেন। সেই মুদিটি ছাপরা জেলারই অধিবাসী ছিলেন না। পশ্চিম-দেশীয় এক সম্প্রদায়ের মুদি আছে, যাহারা যথারীতি বিরজাহোম করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর সেবায়— বিশেষতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ী সাধুদের সেবায়— জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুদির দোকান করিয়া যে লাভ হয় সেই লাভের পয়সায় সন্ন্যাসীদের কাঁচাসিধা দিয়া থাকেন। এখনো অনেক স্থানে এরূপ মুদি দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালে আমরা লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি— "একজন মুদি হামাকে বাগবাজারের পোলের তলায় মাঝে মাঝে গরম রোটী আউর তরকারী দিয়ে আসতো। সাত-আট মাস সে এমনি দিয়েছিলো। তারপর আর আসতো না।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি—"যোগানন্দ স্বামী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে আমি লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতে থাকি। (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া যোগানন্দ স্বামী তীর্থভ্রমণে বাহির হন। মনে হয়, উপেন বাবু এই সময়কে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন)। তৎকালে লাটু মহারাজ কোন গৃহস্থবাটীতে অন্নগ্রহণ করিতে চাহিতেন না। একদিন তাঁহাকে আমার বাটীতে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ তখনকার মত রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই সময় তিনি আমায় বলিয়াছিলেন— 'আরে! তোমারই ত পয়সায় পূরী কিনে খাচ্ছি, ও তো একই কথা হোলো। বাড়ীতে খাওয়াবার আবার কি দরকার আছে?' "

১৮৯৪ খ্রীঃ প্রথমভাগে লাটু মহারাজ আলমবাজার মঠে একদিন রাখাল মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন না। সেইদিনকার কথা শশী মহারাজের মুখে

শুনিয়াছি— "রাজাকে দেখতে না পেয়ে লাটু চলে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম— 'আজ এখানে থেকে যা না, ভাই! তুই ত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্, এখানে এসে থাকলেই ত পারিস্।' আমার কথার জবাবে সে হাসতে হাসতে বললে, 'আবার একদিন আস্‌বো।' তখন তাকে বললুম— 'দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে যাস্, জানিস্।' ঘার নেড়ে সে চলে গেল।"

এই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে লাটু মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত লাটু মহারাজ অনেকক্ষণ কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন। সে বৎসর ভক্তপালক রাম বাবু সেখানে গিয়াছিলেন, একথাও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি।

১৮৯৪ খ্রীঃ ৫ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর পাশ্চাত্য-বিজয় উপলক্ষে টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়— যে সভায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ও 'ইণ্ডিয়ান নেশানে'র সম্পাদক মিঃ এন, এন, ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন— সেই সভায় লাটু মহারাজ উপেন বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন।

স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ মহারাজ) বলেন— "সেই সময় তিনি মাঝে মাঝে পটলডাঙ্গার শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। গড়পারের গোপালচন্দ্র ঘোষও (ছুটকো গোপাল) সেখানে আসতেন। উভয়ের মধ্যে খুব কথা-কাটাকাটি হোতো।"

১৮৯৫-১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় লাটু মহারাজ জাহাজে করিয়া পুরী যান। এই কথাটি শ্রীযুত নিতাইচরণ বসু (৺বলরাম বসুর ভাইপো) মহাশয় বলিয়াছেন, "আমি তখন স্কুলে পড়ি, বয়স ১০।১১ বছর। সেই সময় একদিন একখানা গাড়ী কোরে একজন সন্ন্যাসী ও আর একটি লোক পুরীতে 'শশী নিকেতনে' এসে নামলেন। জ্যেঠামহাশয় তখন পুরীতেই

ছিলেন। লাটু মহারাজকে দেখে জ্যেঠামশায় (হরিবল্লভ বাবু) খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তখনই সরকার মশায়কে বলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ও পাঁচ জায়গা দেখা-শুনার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমার মনে পড়ে যে, তিনি সেই সময় ভুবনেশ্বর দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমাদের কটকের বাড়ী চলে যান। অনেকদিন তিনি কটকে ছিলেন। তারপর কটক থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। আসবার সময় তিনি জাহাজে করেই এসেছিলেন।"

উপেন বাবু একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন— "লাটু মহারাজ একবার পুরী গিয়েছিলেন, তাঁহার জাহাজভাড়া আমি দিয়েছিলুম।"

আর একবার তিনি পুরী গিয়াছিলেন—তাহা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেবার তিনি রেলে করিয়া গিয়াছিলেন। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বাগবাজারের শশী ডাক্তারের ভাগনে ননী বাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পুরীতে একমাস ছিলেন।

প্রথমবারের পুরীগমনকে ঘিরিয়া দুইটি প্রসঙ্গ আছে। দুইটিই লাটু মহারাজ-কথিত। বলরাম মন্দিরে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "আরে! পুরীতে জগন্নাথদেব ত দারুব্রহ্ম হোয়ে রয়েছেন। ভারী জাগ্রত দেবতা। যার যেমন ভাব, যেমন সংস্কার, তাকে তিনি তেমন রূপে দর্শন দেন। হাম্‌নে ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম— 'যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি দয়া কোরে সেই রূপটি একবার দেখান্। হাম্‌নে আপুনার তত্ত্ব কি জানে?' এমন কোরে তাঁর শরণ নিয়ে সেখানে পড়ে থাক্‌তুম। একদিন তিনি হামার প্রার্থনা পূরণ করলেন। ··· সেখান থেকে চলে আসবার সময় তাঁর (জগন্নাথদেবের) কাছে দুটি জিনিস চেয়ে নিলুম — 'বেশী ঘুরতে-টুরতে পারবো না, (অর্থাৎ

এক জায়গায় বসে যেন তাঁকে ডাকতে পারি) আর যা' খাই তা' যেন হজম হোয়ে যায়।' " শেষের প্রার্থনাটি শুনিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'এরূপ প্রার্থনা কেন করলেন, মহারাজ?' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—'দেখো! সাধু-সন্ন্যাসীর যেখানে যা মিলে তাই খেয়ে তাকে দেহের পোষণ করতে হয়। ভিক্ষান্নের কোন ঠিক ত নেই, জানো ত! হজমশক্তি ভালো না হোলে দেহ ভেঙ্গে যায়। শরীর ভেঙ্গে পড়লে সাধনভজনে মন লাগে না; তাই হাম্‌নে এমন প্রার্থনা করেছিলুম।'

শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের সম্বন্ধে তিনি পরবর্ত্তী কালে আমাদের বলিয়াছেন —"এমন তীর্থ আর কোথায় পাবে, বল! সব একাকার, জাতিভেদ নেই—একি কম কথা! সেখানে কত সুবিধা —প্রসাদ কিনে লোককে খাওয়াতে পারো, নিজে আনতে পারো, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। টাকা দিলে তোমার বাড়ীতে প্রসাদ পৌঁছে দেবে— এমন ব্যবস্থাও আছে। সেখানে সাধন-ভজন করবার কত সুবিধা। অতো বড় মন্দিরের যেখানে হোক বসে যাও, কেউ দিক্ করতে আসবে না। আরো নির্জন চাও তো সমুদ্রের ধারে চলে যাও। সেখানে কত সাধু-মহাপুরুষ রয়েছেন—শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মহাপ্রভু, এনারাও সেখানে সাধনা করেছিলেন। এমন পবিত্র স্থান জগতে আর কটা আছে, বল!"

মনে হয়, নিম্নলিখিত কথাগুলি ১৮৯৫-৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে:

"কল্‌কাতায় (কোন দিন ভিক্ষা না মিলিলে) ওপেনঠাকুরের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পুরি আর আলুর তরকারী কিনে খেতুম। তাঁর দয়ায় বেশ হজম হোয়ে যেতো, কোন বখেড়া ছিল না। ভক্ত গৃহস্থদের বাড়ীতে

খেলে তাদের সময়মত যেতে হোতো, না গেলে তারা বিরক্ত হোতো—এই সব দেখে তাদের বাড়ীতে খাওয়া একদম ছেড়ে দিলুম্। ··· তখন ঐ রকম পয়সা নিয়ে কিনে খেতুম, খুব স্বাধীন ছিলুম, কারোর কথা শুনতে হোতো না। সারাদিন নিজের আনন্দে নিজে থাক্‌তুম্।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-প্রণেতা ভক্তিমান শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি, যে বৎসর তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 'পুঁথি' পাঠ করিয়াছিলেন, সেই বৎসর লাটু মহারাজ তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পাঠ শুনিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, ১৮৯৫ খ্রীঃ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের যে জন্মোৎসব হইয়াছিল তাহাতে অক্ষয় বাবু সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে স্বরচিত 'পুঁথি' পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আরও শুনিয়াছি যে, লাটু মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' শুনিয়া অতীব প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন— 'আপুনি সাধারণের বড় উপকার করলেন, অক্ষয় বাবু! এমন সুন্দর কোরে তাঁর কথা লিখেছেন যে, মেইয়া লোকেরাও তাঁকে বুঝতে পারবে।'

১৮৯৬ খ্রীঃ একাদিক্রমে আট মাস প্রত্যহ বৈকালে লাটু মহারাজকে বড়বাজারের মীরবহর বা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে দেখা গিয়াছিল। যিনি আমাদের নিকট এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহার নাম গজু ভট্টাচার্য্য। গজা গ্রামে বাস করিত বলিয়া ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁহাকে গজু বলিত। তিনি প্রথম প্রথম লাটু মহারাজকে চিনিতে পারেন নাই। তৎকালীন লাটু মহারাজের মাথায় ঝাকড়া-ঝাকড়া চুল হওয়ায় এবং বড় খোঁচাখোঁচা দাড়ি হওয়ায় তাঁহাকে চেনা যাইত না। আমাদের নিকট তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি: "বড়বাজার মীরবহর ঘাটে একজন সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ পাঠ শুনিতে দেখিতাম এবং পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আসিতাম। তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না,

চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া থাকিতেন। কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। কাহাকেও কোনদিন কোন উপদেশ দিতেও দেখিতাম না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার বন্ধু পটল বাবুকে এই সন্ন্যাসীর কথা বলি। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পাঠ হইতেছিল। সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য তিনি আমার সহিত একদিন তথায় যাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পটল বাবুর মনে কেমন সন্দেহ হইল, বলিলেন— 'এ যে দেখছি আমাদের লাটু মহারাজ!' পাঠ শেষ হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন— 'আপনি এখানে কেন, মহারাজ! আমাদের সঙ্গে চলুন। স্বামীজী যে শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন।' পটল বাবুর কথায় লাটু মহারাজ প্রশ্ন করিলেন— 'কবে আসছেন?' ঠিক কবে যে স্বামীজী কলিকাতায় আসিতেছেন তাহা আমরা কেহ জানিতাম না। আমাদের নিরুত্তর দেখিয়া লাটু মহারাজ আপনমনে কিছুক্ষণ কি বিড়্‌বিড়্ করিয়া শেষে বলিলেন— 'চলো, তোমাদের সঙ্গে যাবো।' অতীব প্রীত হইয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের নন্দরাম সেন গলির বাড়ীতে লইয়া আসি। পরদিন নাপিত ডাকাইয়া তাঁহার ক্ষৌরকার্য্যাদি করাইয়া দিলাম। আমাদের বাড়ীতে দু-চার দিন থাকিয়া তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতে চলিয়া যান।"

লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি যে, বলরাম মন্দিরে বাস করিবার জন্য শান্তিরাম বাবু তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন।— "যখন গঙ্গার ধারে থাকতুম আর দোকানের পুরি-তরকারী খেয়ে দিন কাটাতুম, তখন একদিন শান্তিরাম বাবু বিশেষ কোরে বললেন, 'আমাদের এখানে থাকুন না, মহারাজ!' হাম্‌নে তখন শান্তিরাম বাবুকে বলেছিলুম, 'হামার খাওয়া-দাওয়ার কুছু ঠিক নেই, কেনো আপুনি হামার জন্য এতো ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন? হামার ত পুরি-তরকারী আর চানাভজা খেয়ে বেশ দিন কেটে

যাচ্ছে।' তাতে শান্তিরাম বাবু কি বললেন, জানো?— 'আমাদের এত বড় সংসার, এত খরচ হচ্ছে! একপোয়া চালের অন্ন আর একপোয়া আটার রুটী না হয় ফেলাই যাবে। আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার ঘরে দুপুরে ও রাত্রে খাবার রেখে আসবে—যখন ইচ্ছা হয়, খাবেন।' একথা শুনবার পর আর তাঁর কথা এড়াতে পারলুম না। শান্তিরাম বাবু ঠিক ভায়ের মত ভালবাসা দেখালেন। তাঁর ভালবাসায় আটকে পড়ে সেইখানেই রয়ে গেলুম।"

এই বর্ষের শেষভাগে তিনি যে বলরাম মন্দিরে থাকিতেন তাহা আরও একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়। অক্টোবর মাসে স্বামীজীর আহ্বানে শ্রীঅভেদানন্দজী ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখন লাটু মহারাজ বলরাম মন্দিরে থাকিতেন এবং সেইখান হইতে তিনি যে অভেদানন্দজীকে জাহাজে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন এবং পরে জেঠী হইতে ফিরিয়া বলরাম মন্দিরে আসিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছি।

১৮৯৭ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী কলিকাতায় আসেন এবং সেইদিন দুপুরে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যান। সেইখানে স্বামীজীর সহিত সকলে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু লাটু মহারাজ যান নাই। তাই তাঁহার কথা তিনি জনৈক গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করেন। গুরুভায়ের মুখে তাঁহার উপস্থিতির কথা শুনিয়া স্বামীজী তাঁহাকে সেই জনতার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজের মুখে কাশীতে বিভূতি বাবু শুনিয়াছেন—"যখন স্বামীজী ওদেশ থেকে ফিরে এলো, তখন কয়েকজন সাহেব শিষ্য তাঁর সঙ্গে ছিলো। সাহেব শিষ্য হওয়াতে স্বামীজীর অহঙ্কার হয়েছে মনে করে আমি তাঁর সঙ্গে আর দেখা করলুম না। বাকী স্বামীজী হামাকে খুঁজে বের করে আলাপ করলেন। জিগ্‌গেস করলেন— 'সকলে

এলো, তুই এলি না কেন?' হামি তাতে বলেছিলুম— 'ওদেশে সাহেব-মেমেদের সাথে মিশে তোমার কি আর হামার কথা মনে আছে! সেই ভেবে দেখা করি নি।' সে কথা শুনে স্বামীজী হামার হাত ধরে বললে— 'তুই আমার সেই লাটুভাই, আর আমি তোর সেই লোরেনভাই।' তখন বুঝতে পারলুম যে, স্বামীজী এখনো হামাদের মনে রাখেন, ওদেশে যাওয়ায় তার ভালবাসার কুছু কম্‌তি হয় নি। ... সেদিন তথায় আহার করিতে যাইবার সময় স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন— 'চল, আমরা বসে খাইগে, তুইও আমার সঙ্গে বসে খাবি।' তাঁর কথায় হামি সেইখানে তাঁর পাশে বসে খেয়ে নিলুম। খাওয়ার সময় শুনি যত বাজে কথা— এতো লোক ত এক সঙ্গে বসেছিলো, সবাই ঐদেশের যত বাজে খবর জানতে চাইলে। কেউ কি তাঁর খোঁজ নিলে—যাঁর দোহাই দিয়ে এতো সব কাজ হোলো! স্বামীজীও সেই কথা বলেছিলো— 'এরা কেমন হুজুগে দেখেছিস! সবাই ওদেশের খবর নিলে, কিন্তু কেউ জানতে চাইলে না— কোন্ শক্তিতে এসব সম্ভব হোলো! সবাই ভাবছে, এসব কাজ বুঝি আমি করেছি। আরে! তাঁর কৃপা না থাকলে আমার দ্বারা এত কাজ কখনও সম্ভব হোতে পারে!' বেশ বুঝতে পারলুম যে, স্বামীজীর মনে তখনো 'অহং' ঢুকে নি।... বিলেত থেকে আসবার পরই দেখলুম যে, স্বামীজী সাহেবী পোশাক ছেড়ে সেই ২৲ টাকা দামের চাদর আর ২৷৷০ টাকা দামের জুতো পরতে লাগলো। এতো যে মানসম্ভ্রম— সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো।" সেই বৈকালেই স্বামীজী গুড্‌উইন ও সেভিয়ার দম্পতিকে লইয়া কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। আর তিনি বলরাম মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।

"স্বামীজী আসবার দিন দশেকের মধ্যে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭) শোভাবাজার রাজবাটীতে একটা বড়ো সভা হয়েছিলো, জানো! সেখানেই

স্বামীজীর লিক্‌চার প্রথম শুনলুম। বেশ দেখতে পেলুম স্বামীজীর ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে লোকগুলোর দিল্ (উৎসাহ) যে বেড়ে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারলুম।"

১৮৯৭ খ্রীঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবে লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। সেই দিনের বৃত্তান্ত তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি— "স্বামীজী ওদেশ থেকে এসেছে শুনে বহুৎ লোক সেবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলো। উৎসবের দিন তাকে দেখবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এতো ভীড় হোলো যে, মন্দিরের অতো বড় চত্তর আর বাগান লোকে ভরে গেলো। সেখানে দেখি, গিরিশ বাবু পঞ্চবটীর তলায় বসে আছেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে (সাহেব শিষ্যগণের সমক্ষেই) দণ্ডবৎ হোলো। গিরিশ বাবুও স্বামীজীকে প্রণাম করলেন। গিরিশ বাবুকে দেখিয়ে একজন সাহেব শিষ্যকে তিনি কি বললেন। ওসব ইংরেজী কথা হাম্‌নে বুঝলুম না। স্বামীজী চলে যাবার পর, কে যেন স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি টিপ্পনী কেটেছিলো ; তাতে গিরিশ বাবু বিরক্ত হোয়ে বলেছিলো— — 'শালারা নিজেরাও ভাল হ'বে না, আবার পরের ভালও দেখতে পারবে না। এসব শালাদের কোনকালে কোন গতি হবে ভেবেছো ?' ·· তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'ওরা (অর্থাৎ নরেন প্রভৃতি) হচ্ছে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাথন ; ওরা কি আর জলে মেশে ? ওদেরকে যদি নিজের চোখেও কিছু অন্যায় করতে দেখি, তাহলে বলবো—ওরা অন্যায় করে নি, করতে পারে না— আমার নিজের চোখেরই দোষ হয়েছে ; চোখ উপড়ে ফেল্‌তে রাজী আছি তবু ওরা অন্যায় করেছে, বলতে পারবো না।' জানো ! লোরেনভাইর উপর গিরিশ বাবুর এমন বিশ্বাস ছিলো !"

"বিবেকানন্দভাই আলমবাজার মঠে বসে একদিন শশীভাইকে

বলেছিলো, 'শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস্— না?' শশীভাই যেই বললে— 'হাঁ, তোমাকে খুব ভালবাসি।' অমনি স্বামীজী তাকে বললে— 'যা বলবো তাই কর্‌বি?'— 'হ্যাঁ'। 'তবে চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানার মোড় থেকে ভাল টাট্‌কা নরম পাউরুটী নিয়ে আয়।' বিবেকানন্দভায়ের ইচ্ছে হোল শশীভাইকে পরীক্ষা কোরবে। সে ত বামুনের ছেলে! তার ছুঁই ছুঁই ভাব আছে কি না দেখবে। বাকী শশীভায়ের নিষ্ঠা থাকলেও শুঁচিবাই ছিল না। তাই সে হাসতে হাসতে বিকেল পাঁচটার সময় সব লোকের সামনে দিয়ে পাউরুটী কিনে আনলে। পাউরুটী দেখে বিবেকানন্দভাই ভারী খুশী হোলো। শেষে তাকে খুব আদর কোরে বললে— 'ভাই! তোকে যে মাদ্রাজ যেতে হবে।' কোন ওজর-আপত্তি না কোরে শশীভাই মাদ্রাজ চলে গেলো। সাধু হয়ে কাশী পর্য্যন্ত দেখবার অপেক্ষা করলে না। লোরেন-ভায়ের উপর এমন তার ভালবাসা!"

"আলমবাজার মঠ হোতে শশীভাই মাদ্রাজ চলে গেলে বাবুরামভাই ঠাকুরসেবার ভার নিয়েছিলো আর তুলসীভাই মঠের সব আনা-নেওয়া করতে লেগে গেলো। সে-সময় মহাপুরুষ মহারাজও স্বামীজীর কথায় কোথায় চলে গিয়েছিলো ঠিক বলতে পারি না।" বোধ হয় শিবানন্দ মহারাজের সিংহল-যাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

গোপাল শীলের বাগান হইতে স্বামীজী যেদিন দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন, সেইদিন লাটু মহারাজও আলমবাজার মঠ হইতে বলরাম মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। বলরাম মন্দিরে রামদয়াল বাবু যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে লাটু মহারাজ কিছুদিন রহিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া ৺বলরাম বাবুর বাটীতে বসিয়া স্বামীজী যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন, সেইদিন লাটু মহারাজ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। একথা তিনি আমাদের

নিকট বলিয়াছেন। পরে এই মিশনের উদ্দেশ্য লইয়া গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে বহু কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল। লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি—"একদিন ত যোগীনভাই স্বামীজীকে বলেছিলো, 'সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করবো অভিমান করা— এ সব ত বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এইরূপ ছিল?' তাতে স্বামীজী বড় গম্ভীর হোয়ে বলেছিলো— 'তুই কি করে জানলি যে, এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ রাখতে চাস্? তা হবে না। আমি ঐ গণ্ডী ভেঙ্গে তাঁর ভাব জগতে ছড়িয়ে দিয়ে যাবো। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি; ধ্যানধারণা আর ধর্ম্মের যেসব উঁচু উঁচু কথা আমাদের তিনি শিখিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি কোরে আমাদের জগতকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করেছিস যে আমি আর একটা নূতন দল করতে বসেছি; তা নয়। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। তাঁর ভাবসমূহ লোকদের দেবার জন্যই আমাদের জন্ম। ত্যাখ্! প্রভুর দয়ার নিদর্শন এ জীবনে অনেকবার পেয়েছি, বেশ অনুভব করেছি তিনি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সা সম্বল নেই অথচ ওদেশে যাব মনে করেছি, তখনও দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে গেছি সেখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য ওদেশের রাস্তায় মেয়ে-মদ্দর গাঁদি লেগে যেতো, তখনও তাঁর দয়ায় সেসব মানসম্ভ্রম অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে।' এ কথা শুনে যোগীনভাই বলেছিলো—

'আমরা ত চিরদিনই তোমার কথা মানি। তবু কি জান, মাঝে মাঝে কেমন খট্‌কা আসে— ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না? মনে হয়, বুঝি বা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলেছি। তাই তোমায় সাবধান করে দিই।' এসব শুনে স্বামীজী যোগীনভাইকে বলেছিলো— 'তোরা তাঁকে যতটুকু বুঝেছিস্ তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন্। তাঁর লীলা অদ্ভুত— ভাব অসংখ্য। তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর অনন্ত অসীম ভাবের ইয়ত্তা হয় না। তিনি মনে করলে কটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। আমি কি তাঁর কাজ করবো না বললেই পারি? আমার ভিতর দিয়ে তিনি যদি তাঁর কার্য্যসাধন করতে চান, তবে আমি কি করতে পারি বল?' যোগীনভায়ের সঙ্গে স্বামীজীর এসব কথায় হামাদেরও চোখ ফুটলো। হামাদের মনে হোলো— তাইতো! অনন্ত মত, অনন্ত পথ!— হাম্‌রা তাঁর কি জানি? কি বুঝি? বিবেকানন্দভাই বুঝেছে, তাইত হামাদের বোঝাচ্ছে। আরে! তাঁর ভাব জগতকে বোঝাবার জন্যই ত তিনি বিবেকানন্দভাইকে রেখে গেছেন। তাইত তিনি বলে গেছেন— 'ওকে আমার কাজের জন্য টেনে এনেছি।' এসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো তাঁর সেই কথা— 'ওরে! আর সবাইকে দেখি—কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড় জোর কেউ একটা বড় তারা। বাকী নরেন আমার সূর্য্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হোয়ে যায়।'...'তবু একদিন স্বামীজীকে বললুম— 'ভাই! এতো ঝঞ্ঝাট কেনো আন্‌ছো? এতে যে ধ্যেনধারণা সব ঘুলিয়ে যাবে!' তাতে লোরেনভাই হাসতে হাসতে কি বলেছিলো, জানো?— 'এতো ঝঞ্ঝাট কেনো আনছি, তুই তার বুঝবি কি? তুই ত ঘোর মূর্খ, যেমন গুরু তেমনি তাঁর চেলা। প্রহ্লাদের মত 'ক' দেখলেই কেঁদে হন সারা। তোরা সব ভক্তের দল,

তোরা এ সবের কি বুঝবি? তোরা শুধু কচি খোকার মত নাকে কাঁদতে পারিস। মনে করেছিস— এতেই তোদের মুক্তি হবে? শেষের দিনে তিনি এসে তোদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন? আর সেখানে গিয়ে তোরা খুব মজা লুটবি? আর এখানে যারা জ্ঞানের চর্চ্চা, লোকশিক্ষা, আর্ত্ত-অনাথের সেবা নিয়ে থাকবে, তারা সব নরকে যাবে, কেন না এ সব মায়া! পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চা। ওসব ঝঞ্ঝাটে ভগবানলাভ করা যায় না। এই ত তোদের কথা? যেন ভগবানলাভ করা ভারী সোজা; মুখের কথায় তা মিলে যায়! একটা ছবি রেখে দুটো ফুল ফেলে পূজা করলেই ভগবান মুঠোর মধ্যে এসে যায়! কি বল্?' এ-সব কথা শুনে হামি তো থ হোয়ে গেলুম। হামার কথার রেশ টেনে একজন গুরুভাই কি একটা বলতে গেলো, তাতে বিবেকানন্দভাই গরম (উত্তেজিত) হোয়ে বললে— 'ওরে! তোরা যাকে ভক্তি বলিস— সেটা ত একটা দারুণ আহাম্মুকী, কেবল মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র। তোদের ওরকম ভক্তি কে চায়? যে ভক্তি স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পরের জন্য প্রাণে ব্যথা পায় না, সে ভক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। পরকে মানুষ কোরে তোলবার জন্য আমি হাসতে হাসতে হাজার বার নরকে যেতে রাজি আছি, তবু তোদের ওরকম ভক্তিমুক্তিতে আমার আগ্রহ নেই। ওরকম মুক্তি আমি গ্রাহ্যই করি না। যে রামকৃষ্ণ অমন মুক্তির কথা বলে, সে রামকৃষ্ণ-টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুনতে চাই না, জানিস্! একদিন তোদের এই ভক্তিমুক্তি চেয়েছিলুম্ বলে তিনি আমাকে হীনবুদ্ধি স্বার্থপর বলেছিলেন। আমি কি তোদের ওসব কথায় ভুলি? আমায় তিনি (ঠাকুর) যা বুঝিয়েছেন, আমি সেই মতলব অনুসারে কাজ করতে চাই। যে নিজের মুক্তি গ্রাহ্য না কোরে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, আমি তারই দাস।' এই বলে বিবেকানন্দ-

ভাই কেঁদে ফেললে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। তখন হামাদের মনে বড্ড দুঃখু হোলো— কেন বিবেকানন্দভাইকে এসব কথা বলতে গেলুম? তাকেই ত ঠাকুর হামাদের লিডর কোরে দিয়েছেন। তার কথা মেনে চল্‌বো—এই আমাদের কাজ। আর তার সাথে তর্ক করবো না বলে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, জানো! তারপরের দিন তাকে একা পেয়ে বললুম— 'ভাই! হামি একটা মুখ্যুসুখ্যু লোক। হামার কথায় দুঃখু কোরো না।' হামার কথা শুনে স্বামীজী বললে— 'এতো ঝঞ্ঝাট কেনো করতে চাই, জানিস্? তোর-আমার উপকার হবে বলে এসব করা নয়। আমাদের পরে যারা আসবে, তাদের জন্যে এসব করা। আমাদের জীবনে যেসব কষ্ট পেয়েছি, আমাদের পরে যারা আসবে, তাদের যাতে এসব দুঃখকষ্ট ভুগতে না হয়, সেইজন্যই এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজী হয়েছি। এখানে এলে যাতে তারা চাড্ডি ডাল-ভাত খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে জপধ্যান করতে পারে আর সদাসর্ব্বদা সৎকাজে সৎচিন্তায় সৎসঙ্গে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে চাই। তাঁর কৃপায় সব ঠিক হোয়ে যাবে, জান্‌বি!' এখন ত দেখ্‌ছি বিবেকানন্দভায়ের মঠ করার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম মন্দিরে জনৈক ভক্তের সহিত লাটু মহারাজের এই কথাগুলি হইয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রীঃ মে মাসে স্বামীজী উত্তরভারত-ভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় তিনি লাটু মহারাজকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত তিনি আলমোড়া, আম্বালা, অমৃতসর, কাশ্মীর, লাহোর, দেরাদুন, দিল্লী, আলোয়ার, খেতড়ি ও জয়পুর গিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানেরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন সময়ে শুনিয়াছি। এইখানে সেইগুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

"স্বামীজী যখন পরিব্রাজক-অবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

সেই সময় তিনি আলমোড়া পাহাড়ে অন্নাভাবে একবার কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হন। তখন জনৈক মুসলমান ফকির (আলমোড়ার কবরস্থানের রক্ষক) তাঁহাকে কাঁকড়ি (শশার মত দ্রব্য) খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। ঘটনাচক্রে প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন তিনি আলমোড়া-ভ্রমণে যান তখন সেই ফকিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।" লাটু মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— "স্বামীজী এতটুকু উপকারকেও মস্ত কোরে দেখতেন, সামান্য উপকার কখনও ভুলতেন না। আলমোড়ায় বদরী সাহের বাটীতে যখন ছিলুম তখন স্বামীজী এক মুসলমান ফকিরকে দেখে দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দুটো টাকা দিলো। হামি ত অবাক হয়ে গেলুম। জিগগেস করলুম— 'ও লোককে টাকা দিচ্ছ কেনো?' স্বামীজী বললে— 'ঐ ফকিরটি আমার প্রাণরক্ষা করেছিল। আমি যখন এখানে অনাহারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম তখন ঐ আমাকে কাঁকড়ি খাইয়ে বাঁচিয়েছিল। তুই কি বলছিস রে লেটো! ওর ঋণ কি টাকা দিয়ে শোধা যায়? অসময়ের উপকারের মূল্য দেওয়া যায় না!'"

লাটু মহারাজ আমাদের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন— "বিবেকানন্দ-ভায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেভিয়র সাহেব সিমলা পাহাড় থে:ক নেমে এসেছিলেন।" এই ঘটনা আম্বালায় ঘটিয়াছিল বলিয়া স্বামীজীর জীবনে লিখিত হইয়াছে, তাই লাটু মহারাজ যে আম্বালায় গিয়াছিলেন তাহা বলিতে ভরসা পাইয়াছি।

তিনি আরো বলিয়াছিলেন— "শিখেদের মন্দিরের চূড়াগুলো সব সোনা দিয়ে বাঁধানো। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়াও বাঁধানো দেখেছো ত! এখন লোকের পয়সা নেই, তাই আর সোনা দিয়ে বাঁধাতে পারে না; বাকী তখনকার লোকের যেমন পয়সা ছিলো, তেমনি ধর্ম্মের জন্য খরচও করতো।"

এই কথাগুলি হইতে আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি যে, অমৃতসরের গুরুদ্বার দেখিয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

কাশ্মীর-ভ্রমণকালে তিনটি ঘটনা ঘটে। স্বামীজী কাশ্মীরে হাউস-বোট ভাড়া করিয়াছিলেন। হাউস্‌বোটের মাঝিরা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সেই বোটেরই একপাশে থাকে— তাহাদের ঘরসংসার সব ঐ বোটে। লাটু মহারাজ নৌকায় উঠিয়াই দেখেন— স্ত্রীলোক। আর কোথায় আছেন! তৎক্ষণাৎ বোট হইতে লাফাইয়া পড়েন। স্বামীজী তাহার ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ তখনও বলিতে লাগিলেন— "'হামি মেইয়া মানুষের সঙ্গে একবোটে থাকবো না।' শেষে স্বামীজী যখন বলিলেন, 'আমি আছি, তোর ভয় কিসের! আমি থাকতে তোর কিছুই হবে না।' তখন তিনি রাজী হন এবং বোটে উঠেন।" (শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-কথিত)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ— "একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের কোন এক দোকান হইতে লাটু মহারাজকে ভাত ও মাংস আনিতে বলেন। লাটু মহারাজ নিজে তখন মাংস-আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই পাছে স্বামীজী তাহাকেও খাইতে বলেন এই ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিলেন,— 'হামি তোমাকে ভাত মাংস এনে দেবো, বাকী হাম্‌নে খাবে না।' তাহাতে স্বামীজী বিস্মিত হইয়া বলেন— 'তুই খাবি নি কেন?'— 'হাম্‌নে এখন ও সব খায় না।' তখন স্বামীজী তাহাকে বলিলেন— 'থাক্, তোকে আর যেতে হবে না।' কিন্তু লাটু মহারাজ স্বামীজীর নিষেধ মানিলেন না— তাঁহার জন্য ভাত ও মাংস কিনিয়া আনিলেন।" কাশীতে লাটু মহারাজের মুখ হইতে শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মৈত্র মহাশয় এই কথা শুনিয়াছিলেন।

তৃতীয় ঘটনাটি— "একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের কোন এক স্থানে

হিন্দুদের এক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন— 'ঐ মন্দিরটি দু'তিন হাজার বছরের পুরাতন মন্দির।' লাটু মহারাজ সেই কথা শুনিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন— 'দু'তিন হাজার বছরের মন্দির! তুমি বুঝলে কেমন করে? হামায় বুঝাও— ওখানে কি সেকথা লিখা ছিল?' তাহার কথা শুনিয়া স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন— 'ওরে! তোকে সেকথা বোঝাতে পারবো না, যদি তুই লেখাপড়া শিখতিস তা হলে হয়ত তোকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।' লাটু মহারাজ সেই কথায় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন— 'ওঃ বুঝেছি! তুমি এমন বিদ্বান যে, হামার মতন গণ্ডমূর্খ্যুকে বুঝাতে পারো না!' লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া অন্যান্য সকলে হাসিয়া উঠিয়াছিল।"

নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ হইতে লাহোর-গমনের কথা বুঝা যায়— "একদিন একজন লোক (লোকটি স্বামীজীর সহিত এক স্কুলে পড়িয়াছিল) স্বামীজীকে জিগ্‌গেস করলেন— 'ভাই! এখন তোমায় কি বলে ডাকবো?' সেই কথা শুনে স্বামীজী তাকে বললে— 'হ্যাঁরে মতি! তুই পাগল হোয়েছিস নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।' স্বামীজীর কথায় মতি বাবুর সঙ্কোচ দূর হোয়ে গেলো। মতিবাবু ত একদিন হামাদের সার্কাস দেখিয়ে আনলেন।"

"দেরাদুনে তাঁহারা দশ-পনের দিন ছিলেন।" স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য খেতড়ি হইতে সেখানে লোক আসিয়াছিল। এ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ লাটু মহারাজের নিকট শুনি নাই।

"দিল্লীতে স্বামীজী এক গরীব বাঙ্গালীর বাড়ী উঠেছিলো; সেখানে একজন লোক তাকে যেই বলেছে— 'স্বামীজী! আমি এতো জপধ্যান করি, তবু কিছু 'লাইট' (আলো) পাচ্ছি না কেন?' তাতে স্বামীজী বলেছিলো

— 'যার মানে বোঝ না, এমন সব স্তোত্রগুলো ছেড়ে দিয়ে তোমার নিজের ভাষায় তাঁকে ডাকো না ; দেখবে লাইট্ পাচ্ছ।' " লাটু মহারাজ-কথিত কোন একটি প্রসঙ্গের মধ্যে ইহা আছে।

"আলোয়ার ইষ্টিশানে নেমে একজন লোককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বামীজী কাউকে কোন কথা না বলে তার দিকে এগিয়ে গেলো। এধারেই ইষ্টিশানে সব বড় বড় লোক তাকে নিতে এসেছিলো। স্বামীজী তাদের সঙ্গে গেলো বটে, বাকী তাদের বাটীতে রইল না। একদিন একজন বড়লোকের বাড়ী থেকে হামাদের সব নিমন্ত্রণ করতে এলো, আর সেইদিনে একটা বুড়ীও এসেছিলো। স্বামীজী বুড়ীকে বলে দিলো— 'আজ তোর বাড়ীতে আমরা খাব। সেবারের মত মোটা চাপাটী করবি।' বড় লোকের বাড়ী থেকে যে লোকটি নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলো তাকে অন্ত দিন যাবে বলে দিলো। দেখো তো, বিবেকানন্দ ভায়ের কেমন ভালবাসা! এই বুড়ী আগের বারে (অর্থাৎ স্বামীজী যখন পরিব্রাজক-অবস্থায় আলোয়ারে আসিয়াছিলেন তখন) স্বামীজীকে আশ্রয় দিয়েছিলো, এখান থেকে খবর পেয়ে তবে আলোয়ারের রাজা তাকে রাজবাড়ীতে থাকতে বলেছিলো। এবারও তাই বুড়ীর মান আগে রাখলো। আগে বুড়ীর ইচ্ছা পূর্ণ করলো, তারপর ওখানকার বড়লোকদের আদরযত্ন নিলো।"

"রাজপুতানায় খেতড়ি মহারাজের সহিত লাটু মহারাজ এমনি বুদ্ধিমত্তার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে একেবারে নিরক্ষর তাহা মহারাজ বুঝিতে পারিলেন না। বরং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া খেতড়ির রাজা স্বামীজীর নিকটে তাঁহার বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন।"— ('উদ্বোধন' হইতে গৃহীত)। কৃষ্ণলাল মহারাজের মুখ হইতে ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে শুনিয়াছি— "খেতড়ির মহারাজ একদিন একটি গ্লোব

দেখাইয়া লাটু মহারাজকে নানা দেশ দেখাইতে থাকেন। লাটু মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে গ্লোব দেখেন নাই। তাঁহাকে সেই সম্বন্ধে অনেক কথা খেতড়িরাজ বলিতেছেন ইহা স্বামীজী দেখিতে পাইলেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ লাটু মহারাজের অবস্থা বুঝিয়া লইয়া নিজে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এমন ভাবে লাটু মহারাজকে বাঁচাইয়া দিলেন যে, খেতড়িরাজ বুঝিতে পারিলেন না স্বামীজীর গুরু ভাইটি একটি নিরক্ষর সাধু।"

আশ্চর্য্যের বিষয় লাটু মহারাজ রাজ-অতিথি হইয়াও একদিনের জন্য রাজ-অন্ন গ্রহণ করেন নাই। "তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'রাজার অন্ন সাধুর খেতে নেই।' তাই চুপি চুপি বাহিরে গিয়ে খেয়ে আস্তুম। রাজা জিগ্‌গেস্ কর্‌লে বলতুম্—'খেয়েছি।' একদিন রাজার দারোয়ানের কাছে জোর ক'রে বেগুনপোড়া আর রুটী চেয়ে খেয়েছিলুম। সে কিছুতেই দিতে চায় না—ভয়, পাছে রাজা জানতে পেরে কিছু বলেন।"

"তাঁহার নিজস্ব এইরূপ অনেক ভাব ছিল যাহার সহিত অনেকের মিল হইত না। এই জন্য তিনি সঙ্ঘের মধ্যে থাকিতে পারেন নাই। একপ্রকার স্বতন্ত্রভাবেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।"—'উদ্বোধন' হইতে গৃহীত।

খেতড়ি ত্যাগ করিয়া সকলে জয়পুরে আসিলেন। সেইখান হইতে লাটু মহারাজ আরো কয়েকজন গুরুভায়ের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

গঙ্গাতীরে তপস্যা

লাটু মহারাজের অদ্ভুত তপস্যা ও বিবেকানন্দের কথা, ঠাকুরের উপর লাটু মহারাজের নির্ভরতা-প্রসঙ্গ, জনৈক ভক্তের সহিত কথোপকথন, সমাধিপ্রসঙ্গ, শশী-মহারাজ কথিত প্রসঙ্গ, শরৎ মহারাজ-কথিত প্রসঙ্গ—'লেটো শালা ঘুমায় না', শুদ্ধানন্দ-কথিত প্রসঙ্গ, আহার-ত্যাগের কথা, হয় সর্ব্বস্ব পাইব—না হয় সর্ব্বস্ব হারাইব—অল্পে সন্তুষ্ট হইব না, সাধনজগতে বিবেকানন্দের সহিত পাল্লা দেওয়ার কথা, লাটু মহারাজের সহিত বিহারী বাবুর কথা, লাটু মহারাজের সাধনার ধারা, মহেন্দ্র দত্ত-কথিত স্তব্ধভাব, নবগোপাল ঘোষ মহাশয়-কথিত আপ্তকামভাব, গিরিশ ঘোষ-কথিত গীতার সাধু, গঙ্গাতীরে সাধনার গভীরতার কথা, ছোলা-ভিজানোর প্রসঙ্গ, মালগাড়ীতে ধ্যানের প্রসঙ্গ, খোড়ো নৌকায় ধ্যানের প্রসঙ্গ, মহাশান্তিপূর্ণ আলোকপ্রাপ্তির কথা, জ্যোতিঃসমুদ্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কথা

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ঠাকুরের দেহাবসানের পর অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লাটু মহারাজের সাধকজীবনের কথা অতি অল্পই শোনা গিয়াছে। অথচ এই বার বৎসর ধরিয়া তিনি যে কঠোরতম সাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল গুরুভ্রাতাই স্বীকার করেন যে, এইকালে তিনি অদ্ভুত তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ত বলেন— "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে হইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি— এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যানধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটিমাত্র ভাব-অবলম্বনেই চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র

ধ্যানধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"— 'সৎকথা' গ্রন্থে সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।

সত্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্যতীত লাটু মহারাজের অন্য কোন অবলম্বন ছিল না। সমগ্র জীবনটাই তিনি তাঁহারই মুখাপেক্ষী হইয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন— শুধু কথার সর্ব্বস্ব নয়— কর্ম্মে, প্রেরণায়, ধর্ম্মে, ধারণায়, প্রেমে, উন্মাদনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। যতদিন ঠাকুর জীবিত ছিলেন, ততদিন সাধক-লাটু তাঁহারই নির্দ্দেশমত চলিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানে তাঁহার সেই একই ভাব — তখনও তিনি তাঁহাকেই মানিয়া চলিলেন, অন্য কাহারও নির্দ্দেশকে জীবনযাত্রার অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়া যে তখনও তিনি ঠাকুরের নির্দ্দেশ বুঝিয়া লইতেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তবে তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, 'তিনিই (ঠাকুরই) হামায় চালাচ্ছেন, তা' না হোলে হামার মত মুখ্যু কি সাধন করতে পারে? হামি সাধনার কি জানে? হামাকে তিনিই ত পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।' ঠাকুরের উপর এইরূপ নির্ভরতাই তাঁহার সমগ্র জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, লাটু মহারাজ বরাবরই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় অটুট বিশ্বাস রাখিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দেহাবসানের পরদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন— 'আমি আবার গেছি কোথায়? এই ত রয়েছি! শুধু ওঘর থেকে এঘরে এসেছি।' উক্ত

কথা কয়টিকেও তিনি অতি বড় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই যখনই যে-কোন সমস্যায় পড়িতেন, তখনই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহারই নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেন। যতক্ষণ না তাঁহার নিকট হইতে স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ পাইতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই সমস্যাবহুল কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। এমন কতদিন কাটিয়া গিয়াছে যখন তাঁহার নির্দ্দেশ পাইবার জন্য তাঁহাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। বলরাম মন্দিরে তিনি একদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন— "তোমাদের আবার নির্ভরতা! দুদিন তাঁকে ডেকে সাড়া না পেলে অমনি নিজের মতে কাজ করতে লেগে যাও, যেন ভগবানের চেয়ে তুমি বেশী বোঝ! তাঁর উপর নির্ভর করা মানে তাঁর আদেশে চলা— তাঁর হুকুম না পেলে কোন কুছু করতে যাবে না, এমন কি, তাতে যদি তোমাদের হাজারো ক্ষতি হয় তাতেও টলবে না। তবে ত তাঁর উপর নির্ভর করেছো বলতে পারো। বিবেকানন্দভাই একটা কথা বলতো— 'রামকে পেলুম না বলে শ্যামের সঙ্গে ঘর করবো— এত ভাল নয়! না হয়, একটা জীবন তাঁরই জন্যে বাজে বাজে যাবে।' দেখো তো তাঁর উপর কেমন সে নির্ভর করতো! একটা জীবন তাঁর জন্য বাজে বাজে দিতেও রাজী ছিলো। এমনভাবে তাঁকে (ঠাকুরকে) ধরতে হয়। তবে ত তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ভক্তটি বলিয়াছিলেন— 'মহারাজ! আমাদের সে নির্ভরতা আসে না কেন?'

"তোমরা যে তাঁর চেয়েও নিজের বুদ্ধি ও অভিমানকে বেশী কোরে মানো। তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হও না, একটুতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলো, তাই।"

এই কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লাটু মহারাজ ঠাকুরের দেহাবসানের পর কতখানি ধৈর্য্য লইয়া তাঁহার (ঠাকুরের) আদেশের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের কৃপায় লাটু মহারাজের নিকট সমাধির জগৎ খুলিয়া গিয়াছিল। অনেকের ধারণা যে, সমাধির পর বুঝি আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে ধারণা সাধকমাত্র নহে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, সাধক-মাত্রেই সমাধির স্পৃহা করিয়া থাকেন এবং সেই অবস্থা পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন না। আমরা লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি—"সমাধি কি মুখের কথা! কতো ধ্যেনধারণা কোর্‌লে তবে একটু তাঁতে মন বসে; তাঁতে মন বসলে তবে তাঁর ভাব আর ঐশ্বর্য্য বুঝতে পারা যায়। অনন্ত ভাব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য—তাকে কাটিয়ে উঠবে কি করে? ভাব আর ঐশ্বর্য্যের সাধনা নিয়েই ত হাজার হু'হাজার জীবন কেটে যেতে পারে। বাকী তাতে কি? ভাব আর ঐশ্বর্য্য পেলেই ত তাঁকে সমগ্র-ভাবে পাওয়া হোল না। তাঁকে পাওয়া মানে— তাঁর ভাব আর ঐশ্বর্য্যের পারে গিয়ে তাঁকে ধরা। ভাব আর ঐশ্বর্য্যের পারে যাওয়া ত চাড্ডিখানিক কথা নয়! তিনি যদি কৃপা কোরে সাধককে আপনার ভাব আর ঐশ্বর্য্যের পারে নিয়ে যেতে চান, তবেই সাধক তাঁতে পৌঁছতে পারে— তাঁর কৃপা হোলেই সাধকের মনের নাশ হয়ে যায়, বুদ্ধির নাশ হয়ে যায়; তা' না হোলে কার সাধ্য যে, নিজের চেষ্টায় নিজের মনবুদ্ধির নাশ করতে পারে? নিজের মনবুদ্ধির নাশ হোলে তবে সমাধি হয়, জানো।"

এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—'মহারাজ! সাধক নিজের চেষ্টায় সমাধিতে পৌঁছাতে পারেন না— কি

বলছেন? আমরা ত জানি— ধ্যানধারণা করতে করতে সমাধিতে পৌঁছান যায়।'

লাটু মহারাজ— তোমরা যা জানো তা' ঠিক বটে, বাকী ধ্যেনধারণায় যে সমাধি হয় তাকে তিনি (ঠাকুর) বলেছেন চেতন-সমাধি। সেখানে ভাব আর ঐশ্বর্য্যের খেলা চলে। আর এক প্রকার সমাধির কথা তিনি (ঠাকুর) বলতেন। সে সমাধিতে মনের লয় হয়, 'আমি' থাকে না। সাচ্ বলছি, তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ কখনও সে সমাধিতে পৌঁছাতে পারে না।

জনৈক ভক্ত— সকলেই ত বলেন, মহারাজ! সাধনা করলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! সিদ্ধিলাভ হয়, বাকী সমাধিলাভ হয় না। শক্তি পেলে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়; ঐশ্বর্য্য পেলে ঋদ্ধিলাভ হয়; আর সমাধিতে গেলে তাঁকে লাভ হয়। তাই সমাধির কথা মুখে বলা যায় না। তাঁর শক্তির কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলা যায়, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথাও ভাবে প্রকাশ করা যায়; বাকী তিনি ত তাঁর শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের মাঝে ফুরিয়ে যান না। অনন্ত শক্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য—ফুরোবার যো কি? তবুও অনন্ত শক্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। সবের মাঝে থেকেও তিনি সবের অতীত বস্তু। যেমন তোমার বহু গুণ আছে — তুমি কাজ করতে পার; বহু ঐশ্বর্য্য আছে— তুমি দেখাতেও পার, লুকোতেও পার, বাকী তাতেই তোমার স্বরূপ ধরা পড়বে না। তোমার স্বরূপ গুণের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও নেই। তেমনি আর কি। ভগবানের শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের আভাস সাধক বুঝতে পারলেও তাঁকে বুঝবার ক্ষেমতা সাধকের হাতে নেই। ভগবান জানিয়ে দিলে তবেই সাধক বুঝতে পারে। তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'একবার যো সো কোরে

মালিকের সঙ্গে দেখা হোলে আর তার ঐশ্বর্য্যের কথা জানবার ভাবনা থাকে না।' বাকী মালিকের দেখা ত অম্‌নি পাওয়া যায় না। আগে দ্বারোয়ানের খোসামদ কর্‌তে হয়, তারপর নায়েব-গোমস্তার খোসামদ করতে হয়, তখন মালিকের কাছে কথা পৌঁছায়। তখন মালিক ইচ্ছে করলে নায়েব-গোমস্তার মার্‌ফৎ কথা বলতে পারেন, আর চাই কি, তোমাকে নিজের কাছে ডেকেও পাঠাতে পারেন, আবার এমনও হয় যে মালিক কৃপা কোরে তোমার কাছে এসে তোমার সঙ্গে দেখা কোরেও যেতে পারেন। সাধনপথেও ঠিক এই ব্যেপার হয়, জানো? ভগবান ইচ্ছা করলে কৃপা কোরে নিজে সাধককে দেখা দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে সাধককে নিজের কাছে ডাকিয়ে আনাতে পারেন (বোধ হয়, এখানে সালোক্য, সামীপ্যের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন) আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর নায়েব-গোমস্তা দিয়ে খবর পাঠাতেও পারেন (বোধ হয়, ধ্যানে যে দেবদেবীর দর্শন হয়, তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়াছেন)। এই সবই ভগবানের ইচ্ছা। এর মধ্যে তোমার চেষ্টা কতটুকু! না, দ্বারোয়ান থেকে গোমস্তা পর্য্যন্ত প্রার্থনা জানানো। এ পর্য্যন্ত তোমার সাধনা, এর পর আর তোমার সাধনা যেতে পারে না; তখন ভগবানের দয়ার উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। এই সময়টা সাধকের পক্ষে বড়ো কষ্টের সময়, জানো।

অনৈক ভক্ত— কষ্টের সময়! একথা কেন বলছেন, মহারাজ! নায়েব-গোমস্তায় কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করলে প্রায়ই ত দেখা যায়, মালিক তার কিছু না কিছু মঞ্জুর করেন— একেবারে নাকচ ক'রে দেন না।

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! তা বটে, বাকী তখনও ত কাজ হাঁসিল হয় না। তাই মনটা বড় অশান্তিতে থাকে।

জনৈক ভক্ত— এত সাধনা করবার পরও মনের অশান্তি দূর হয় না, এসব কি বলছেন, মহারাজ ! এসব শুনলে যে মনের ভরসা মনেই লোপ পেয়ে যায়।

লাটু মহারাজ— কি জানো ! সাধনপথে সন্তোষ এসে গেলেই উন্নতি বন্ধ হোয়ে যায়।

জনৈক ভক্ত— এ কি কথা বলছেন, মহারাজ ! জীবনে শান্তি পাবার জন্তই ত সাধনার প্রয়োজন। আর বল্‌ছেন কি না— শান্তি পেলেই সাধক-জীবনের উন্নতি বন্ধ হোয়ে যায় !

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ ! শান্তি পাবার জন্তই সাধনা। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) বাকী দেখো ! যে সাধক শান্তি পেয়ে ভুলে যায়, তাঁর আর উন্নতি কিসে হবে ? অশান্তি না থাকলে আকাজ্ক্ষা জাগবে কেনো ?

জনৈক ভক্ত— শান্তি পাবার পরের অবস্থাও কিছু আছে নাকি, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— আরে ! শান্তিই কি সাধনার শেষ অবস্থা ? এর পরেও আরো অনেক অবস্থা আছে— তবে সে-সব অবস্থা পেতে গেলে সাধকের প্রথম দরকার শান্তি। এ শান্তি কেমন জানো ?—আপুনাতে আপুনি ভরপুর। বাহিরের কোন দুঃখুকষ্টে মনের ভাব টলবে না, এমন যে অবস্থা তাকেই বলে শান্তি। ভিতরে বাহিরে এই শান্তিতে ভরপুর না হোলে সাধনপথের দরোজা খুলে না। আবার যেই সাধনপথের দরোজা খুলে গেলো তখন থেকে আবার অশান্তি আরম্ভ হোলো। সে একরকম অশান্তি তা' তোমায় বুঝাতে পারবো না। সেখানে সাধক চুপ কোরে বসে থাকতেও পারে না, বাকী তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যেতেও পারে না।

জনৈক ভক্ত— আপনার কথা ত কিছু বুঝছি না, মহারাজ ! একটু সহজ কোরে বলুন।

লাটু মহারাজ— এসব বুঝ্তে গেলে একটু সাধন করার দরকার। তপস্যা না করলে এসব বুঝা যায় না। তোমাদের তপস্যা কম, তাই হাজার বললেও তোমাদের ওসব কথা বুঝাতে পারবো না।

বলরাম মন্দিরের উক্ত কথোপকথন হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, সমাধি সাধনাসাপেক্ষও বটে, আবার সাধনাসাপেক্ষ নয়ও বটে।

তাই মনে হয়, কাশীপুরের বাগানে সমাধি হওয়ার পর লাটু মহারাজ পুনরায় সমাধিস্থ হইবার জন্ত যে তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজন ছিল। (১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে) সেই সময় তিনি যে কঠোর করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসঙ্গ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। শশী মহারাজের মুখে শুনিয়াছি— "লাটুকে ডেকে না খাওয়ালে তার খাবার হুঁশ থাকতো না। এমন কতো দিন হয়েছে যে, আমাদের সকলকার খাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পাওয়ায় ঘরে তার খাবার দিয়ে আসা হয়েছে; দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেছে, সেই রাত্তে তাকে পুনরায় খেতে ডাক্তে গেছি; গিয়ে দেখি দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে আর লাটু সেই একইভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি, হাঙ্গামা-হুজ্জত কোরে তবে তাকে খাওয়ান হোতো।"

শরৎ মহারাজ শ্রীযুত মহেন্দ্র দত্তকে বলিয়াছেন— "রাত্রে লেটো শালা ঘুমায় না। জানো মহিম! সে প্রথমরাত্রে ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকায় আর জপের মালাটা লুকিয়ে রেখে দেয়। সকলে ঘুমিয়ে পড়্লে, উঠে মালা জপ করতে বসে। একদিন খুট্খুট্ আওয়াজ শুনে মনে করলুম যে, ঘরে ইঁদুর এসেছে; যেই তাড়া দি অমনি আওয়াজ বন্ধ হোয়ে যায়; খানিক পরে আবার শুনি খুট্ খুট্ খুট। আবার তাড়া দিলুম; আওয়াজ বন্ধ হোয়ে গেল। মনে কেমন সন্দেহ হোলো; পরের দিন ওৎ পেতে

রইলুম, যেই আওয়াজ হয়েছে অমনি আলো জেলে দেখি— লেটো শালা মালা জপ কর্ছে। এসব দেখে বললুম— 'তবে রে শালা! আমাদের ফাঁকি দেবে! আমরা ঘুমিয়ে রাতটা কাটাব আর তুমি শালা জপ কোরে মজা মারবে। তা' হবে না!' "

উপরোক্ত ঘটনা দুইটি বরানগর মঠের ব্যাপার; আলমবাজার মঠেও ঠিক একই ভাব। সেখানেও লাটু মহারাজ সম্বন্ধে সুধীর মহারাজ (শুদ্ধানন্দ) যে-কথা বলিয়াছেন তাহাতে ঐ ভাবেরই প্রগাঢ়ত্ব দেখা যায়— "সেইদিন সেই প্রথম আমরা আলমবাজার মঠে গেছি। দেখি—একজন টান্ হোয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, তাঁকে দু'জনে টানাটানি কর্ছেন। আমরা সেই প্রথম গেছি, তাই ঐরূপ ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। কিন্তু তার কারণ কি তখন জিজ্ঞাসা করি নি। অনেকদিন পরে তাঁকে ঐরূপ শুয়ে থাকবার কারণ আর তাদের ঐরূপ টানাটানি করবার উদ্দেশ্য কি ছিল জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন— 'মনে করেছিলুম আর খাব না, অন্নত্যাগ করবো; তাই পড়েছিলুম।' "

এই তিনটি প্রসঙ্গই তাঁহার কঠোরতাকে মূর্ত্ত করিয়াছে। তিনি অন্যূনপক্ষে প্রায় ছয় বৎসর এইভাবে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। শুধু আহার-নিদ্রার অনাসক্তিই তাঁহার সাধনাকে তীব্রতর করিয়া তুলে নাই, তিনি সেইকালে অনুক্ষণ জপে, ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "সেই সময় লাটুর ভাব ছিল— হয় সর্ব্বস্ব পাইব, নয় সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিব, অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া লাটু মহারাজ যেন সাধনায় বসিয়াছিলেন। ··· সে সময় গুরুভাইগণের মধ্যে পরস্পর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল।"

পরবর্ত্তী কালে লাটু মহারাজও আমাদের নিকট বলিয়াছেন— "হামার ত

একবার ইচ্ছা হোলো বিবেকানন্দভায়ের মত বড় হবো ; বাকী, তখন ত বুঝি নি, বিবেকানন্দভাই হামার থেকে কতটা এগিয়ে গেছে ! হাম্‌নে ত উঠে পড়ে লাগলুম, বাকী দেখলুম কি জানো—যতই তার কাছে যাই, ততই সে আরো এগুতে থাকে। এক জায়গায় গিয়ে ভাবলুম যে, এবার তাকে ধরে ফেলেছি। বাকী সেখানেও দেখলুম— না, বিবেকানন্দভাই এখনো এগিয়ে চলেছে। হাম্‌নে চেষ্টা করলে কি হোবে ? এ তো চেষ্টার ব্যেপার নয় ; এখানে তাঁর কৃপার ব্যেপার চলেছে ! হাম্‌নে ত সাধনপথে ডবল জোরে যেতে পারবে না, আর বিবেকানন্দভাই ত চলতে চলতে থেমে যাবে না ; তবে আর হামাদের মধ্যে বরাব্বর হোবে কি কোরে ?”

জনৈক ভক্ত এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন— ‘মহারাজ ! সাধনার শেষে ত তুজনেই বরাবর হোয়ে গেছেন।’

লাটু মহারাজ— আরে ! তা হবার যো কি আছে ?

জনৈক ভক্ত— কেন মহারাজ ! সাধনপথের ত একটা শেষ আছে, যেখানে পৌঁছে সব এক হোয়ে যায়।

লাটু মহারাজ— দুর্‌ পাগল ! সাধনার কি শেষ আছে ? না শক্তিরই শেষ আছে ? না আত্মারই ইতি আছে ? এ তিনের শেষ কোথাও নেই। যেখানে কোন শেষ নেই, সেখানে কে সাহস করে বলতে পারে— ‘ব্রহ্মের স্বরূপ এই !’

বলরাম মন্দিরে একদিন বিহারী বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘মহারাজ ! আপনি ত বলেন— শক্তির শেষ নেই, সাধনার শেষ নেই, অনুভূতির শেষ নেই, আত্মার ইতি নেই ; তবে শাস্ত্রে যে মুক্তির কথা আছে —সেটা কি ?’

এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বিহারী বাবুকে যাহা বলিয়াছিলেন

তাহা আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিতেছি— "আপনারা মুক্তির মানে বুঝেন — ছাড়া পাওয়া, বাকী সাধনপথে মুক্তি মানে ছাড়া পাওয়া নয়, মিশে যাওয়া। নদীর জল যেমন সাগরজলে মিশে যায়, তেমনি সাধকের ভিতর যে আত্মা আছে তা' আত্মার সাগরে মিশে যায়। এক কথায় সাধক তখন নিজেকে আত্মার সাগরে হারিয়ে ফেলে মুক্তি পায়। বাকী হারিয়ে গেলেই কি সাধনার শেষ হয়ে যায় মনে করেন ? ভগবানের লীলার এমনি ব্যেপার যে হারিয়ে গিয়েও নিস্তার নেই। তখন আবার খুঁজে পাবার সাধনা করতে হয়। এই যেমন নদীর জল সাগরে মিশলেই, তার কর্ম্মচক্রের শেষ হয় না — আবার তাকে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার কাজে লাগতে হয়, তেমনি। সাধনার মজা এমনি যে, একবার সাধককে খুঁজে পাবার সাধনা করতে হয়, আর একবার তাকে হারিয়ে যাওয়ার সাধনা করতে হয়। তাই সাধনার শেষ কুথাও নেই জানবেন। সাধনার যদি শেষ না থাকে, তাহলে শক্তির শেষ থাকতেই পারে না, কেনো না, শক্তি ছাড়া সাধনা চলবে কিসে ? তখন আবার প্রশ্ন উঠে— কার সাধনা ? কার শক্তি ? সবই ত আত্মার সাধনা—আত্মার শক্তি, তাই আত্মারও ইতি নেই জানবেন !"

সেদিন বিহারী বাবু আর একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন— 'মহারাজ ! এই যদি সাধনার ব্যাপার হয়, তাহলে নিজেকে হারাবারই বা কি প্রয়োজন, আর হারিয়ে খোঁজবারই বা কি দরকার ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলেন— "জানবেন ! ভগবানের লীলায় এমনি খেলাই চলতে থাকে। বুড়ী ছোঁওয়াও আছে আবার বুড়ী ছুঁয়ে খেলাও আছে। জানবেন, এ খেলায় তিনিই সব সেজেছেন, তিনিই জীব হোয়ে সাধন করছেন, মুক্ত হচ্ছেন আবার লীলায় এসে কাজ করছেন। এ অচিন্ত্য ব্যেপার ! তিনি না বুঝালে, কারোর বুঝবার সাধ্য নেই।"

এইসব কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, লাটু মহারাজের সাধনার ধারা কি। তিনি শুধু ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেন না; তিনি ব্রহ্মলীলায় বাস করিতেও চাহিতেন। এই জন্য তাঁহার সাধনায় দুটি ভাব বর্ত্তমান দেখা গিয়াছিল। এক ভাবের চরমে তিনি স্তব্ধ—যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আর অপর ভাবের চরমে তিনি যেন বালক—সদা হাস্যময়, আনন্দ-বিভোর। এক ভাবের সাধনায় তিনি তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন — 'ব্রহ্ম ছাড়া সব অবস্তু।' আর অন্য ভাবের সাধনায় তিনি দেখিয়াছিলেন — 'তিনিই সব হয়েছেন।' এই জন্য তাঁহার উপদেশের মধ্যে দুই ভাবেরই কথা পাওয়া যায়।

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাপস-লাটুর অনুধ্যানে লিখিয়াছেন — "কয়েক বৎসর লাটুর এমন একটি অবস্থা আসিয়াছিল, যখন সে জগতে বাস করেও জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল। সে কাহারও সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিশিতে পারিত না। (প্রায়ই) স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রচলিত পন্থায় তাহার মনোবৃত্তি চলিত না। সর্ব্ব বিষয়ে হাঁ-ও বটে, না-ও বটে। ··· জগতের কারুর উপর তাহার ঘৃণা, অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছিল না। কাহারও উপর আসক্তি, অনুরাগ বা প্রীতি ছিল না।··· কাহাকেও অভিসম্পাত দিত না বা কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিত না। এক কথায় তার কাছে না ছিল জগতের আবাহন, না বিসর্জ্জন। ··· সেই সময় জগৎ যেন তাহার নিকট একটি ভ্রাম্যমান চক্র— চক্রের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুকে সে দেখিতে পায় কিন্তু কোনটির উপর তাহার মনোযোগ থাকে না। এক কথায় সে তখন স্তব্ধ।"

শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় লাটু মহারাজের একটি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছিলেন।— "এক সময় লাটু মহারাজ আমাদের বাড়ীতে যেতেন।

তখন তাঁকে দেখে মনে হোতো, তিনি যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে সব লেনাদেনা শোধ করে বসে আছেন। সেই সময়ে তাঁহার কোন নিজস্ব কামনা ছিল না, কিম্বা কাহারও প্রতি কোন কর্ত্তব্যবোধ ছিল না। তখন তাঁহার আহারে রুচিবোধ ছিল না, অনাহারেও দুঃখবোধ ছিল না। দেখিলেই মনে হইত সর্ব্বতোভাবে আপ্তকাম।"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ বাবু জনৈক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন— 'গীতার সাধু দেখতে চাও ত লাটুকে দেখ গে।' উক্ত ব্যক্তিটি গীতার সাধু বলিতে কি বোঝায় তাহা সম্যক বিদিত ছিলেন না। তাই গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তার মানে?'— 'ওঃ! তুমি বুঝি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলি পড় নি। সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ আছে, তাহার সহিত লাটুর হুবহু মিলে যায়।' এই বলিয়া গীতার শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। (শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত)।

১৮৯৩—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে জনৈক ভক্ত যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সাধু সিদ্ধানন্দ 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারী বাবুও 'বসুমতী'তে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে উহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সাধু সিদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন, "কোন ভক্ত বলেন—সে সময় তিনি গামছার খোঁটে ছোলা বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে বসে থাকতেন। ছোলা ফুললে খাবেন— এই ভাব। একদিন গামছায় বাঁধা ছোলা একটা ইট চাপা দিয়ে গঙ্গায় ভিজিয়ে রেখেছেন, তখন ভাঁটা ছিল। ইতোমধ্যে জোয়ার এসে গেছে! তাঁর অতটা খেয়াল ছিল না। নিজের ভাবে বসে ছিলেন। যখন খেয়াল হোল, দেখলেন জোয়ার এসে গেছে; ছোলা সমেত গামছা আছে কি গেছে তার ঠিক নেই। কি করেন, সেখানেই বসে

রইলেন। জোয়ার নেমে গেলে দেখেন যে—যেখানকার জিনিস সেইখানেই রয়েছে। তখন তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন।"

নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটিতে তাঁহার ধ্যানের গভীরতার কথা বুঝা যায়। প্রসঙ্গটি স্বমুখ-কথিত :*

"একদিন বাগবাজারের এক খেড়ো নৌকায় বসে আছি। কখন যে নৌকো ছেড়ে দিলো বুঝতে পারি নি, আর মাঝিরাও হামাকে দেখতে পায় নি। নৌকো চলতে চলতে দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে গেলো, তখন হামার হুঁশ হোল। হামি মাঝিদের নামিয়ে দিতে বললুম। তখন মাঝিরা নামিয়ে দেয়। আসবার পথে সেদিন দক্ষিণেশ্বর দেখে এলুম। রামলাল খুব যত্ন করে খাওয়ালো।"

এই ধরনের আর একটি প্রসঙ্গ আছে, ইহাও গঙ্গাতীরে বাসকালীন ঘটনা; জনৈক ভক্তের নিকট তিনি বলিয়াছেন—"দুপুরবেলা শ্মশানেশ্বরের পাশের ঘাটে বসে থাকতুম আর রাতটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে কাটাতুম। রাত এগার-বারটার সময় চাঁদনীর ছাদে চলে যেতুম। সেখানে বসে জপধ্যেন করতুম।"

ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'বৃষ্টি হোলে কি কোরতেন, মহারাজ?'

লাটু মহারাজ—কেনো? ঘাটের পাশেই ত রেলের লাইন দেখেছো, সেখানে অনেক মালগাড়ী থাকতো, একখানা খালি গাড়ীতে উঠে বসতুম। বৃষ্টি থামলে আবার চলে আসতুম। একবার ত মালগাড়ীতে উঠে নামবার কথা ভুলে গেলুম। কখন যে গাড়ীটিকে ইঞ্জিনে টেনে নিয়ে গেলো বুঝতে পারলুম না। তার পরদিন দেখি, বহুত কুলী এসে হামাকে গাড়ী ছেড়ে

---

* কোন্ সময়ের ঘটনা জানি না, তবে গঙ্গাতীরে বাসকালে ইহা ঘটিয়াছিল। সেইজন্য অনুমান হয় ইহা ১৮৯৩—১৮৯৬-এর মধ্যের ঘটনা।

চলে যেতে বলছে। তাদের জিগগেস করে জানলুম যে, গাড়ী চিৎপুরে চলে এসেছে। কি করি? সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বাগবাজারের ঘাটে এলুম। তারপর থেকে বৃষ্টি হোলে আর গাড়ীতে গিয়ে বসতুম না, ছাদ থেকে নেমে ঘাটের এক কোণে বসে থাকতুম। ঘাটের পাহারাওয়ালা আমাকে চিনে গেছিলো, কুছু বলতো না।

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে শুনিয়াছি, "লাটুর শুদ্ধভাব প্রায় আড়াই বৎসর ছিল। এর পরই লাটু মহাশান্তিপূর্ণ লোক প্রাপ্ত হইল। কথা-বার্ত্তায় গম্ভীর ও মাধুর্য্যপূর্ণ। (আধা হিন্দি আধা বাঙ্গলায়) ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় অনেক নূতন তত্ত্ব সে বলতে লাগলো। নানা ভাবের নানা উচ্চাঙ্গের কথা তার মুখ হতে নির্গত হতে লাগলো।"

মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের সাত-আট বৎসর পরে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথা হইতে এইরূপ অনুমান করা যায়। জনৈক ভক্তের নিকট তিনি একবার বলিয়াছিলেন— "একবার সমাধি হোলেই যে সাধকের বারে বারে সমাধি হবে তার কোন মানে নেই। এমন অনেক সাধক আছেন, যারা জীবনে একবার মাত্র সমাধির আস্বাদ পেয়েছেন। আবার এমন সাধকও আছেন, যারা জীবন-ভোর সমাধিতে পৌঁছতে পারলেন না। হামার উপর তাঁর অশেষ কৃপা, তাই সাত-আট বছর খাটিয়ে তিনি ফিন্ হামাকে সেই অবস্থায় তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে আছি, দেখি গঙ্গা থেকে একটা জ্যোতি উঠলো, সেই জ্যোতি বড় হোয়ে আকাশ-বাতাস সব ছেয়ে ফেললে। সেই জ্যোতির মাঝে আবার অসংখ্য জ্যোতি দেখলুম। তারপর নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। তখন যে কি হোলো কুছু বুঝতে পারলুম না। বাকী সে মুল্লুক থেকে ফিরে ভারী আনন্দে রইলুম। এতো আনন্দ যে কী বলবো!

দিলের বোঝা যেন কুথায় চলে গেল। দেখলুম, সব আনন্দে আনন্দময় হয়ে রয়েছে।”

অনুমান হয় যে, উপরোক্ত অনুভূতির পর তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। সমাধির পর সাধকগণের তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়।

জগন্নাথক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া তিনি গঙ্গাতীরে পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাকে লীলাগ্রন্থাদির পাঠ শুনিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে আট মাস পাঠ শুনিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠে ও ভক্তগৃহে

নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে লাটু মহারাজ, যোগীন মহারাজের অসুখে লাটু মহারাজের সেবার কথা, রাম বাবুর অসুখে লাটু মহারাজের সেবার কথা, মঠে কালীপূজার দিন মায়ের আগমন, হরিপর্ব্বত ব্রহ্মচারীর কথা, বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে, রাম বাবুর মহাপ্রয়াণ ও লাটু মহারাজের সেবা, যোগীন মহারাজের মহাপ্রয়াণে লাটু মহারাজের মঠে বাস, উপেন বাবুর ছাপাখানায় বাস ও সেইখানকার ঘটনাবলী, প্রেসের কম্পোজিটারদিগকে উপদেশদান, 'বাপমায়ের সেবা কর তাহলেই ধর্ম্ম হবে,' শ্রীযুক্ত শরৎ চক্রবর্ত্তীকে উপদেশদান, লাটু মহারাজের হুগলীগমন, শরৎ মহারাজের বক্তৃতা শুনিতে যাওয়ার কথা, লাটু মহারাজের সহিত স্বামীজীর মিলন, বেলুড় মঠের প্রসঙ্গ, গীতাশ্রবণ, উপনিষদশ্রবণ, সূর্য্যদেবকে প্রণামপ্রসঙ্গ, মঠের নিয়মে লাটু মহারাজের কথা, বাবুরাম মহারাজের প্রসঙ্গ, ডামবেলভাঁজা-প্রসঙ্গ, পৃথিবী-পূজার প্রসঙ্গ, শিবরাত্রিতে উপবাসপ্রসঙ্গ, স্বামীজীকে দাগা বুলানোর কথা বলা, কাশ্মীরী আলোয়ানের প্রসঙ্গ, স্বামীজীর দেহত্যাগ ও লাটু মহারাজের কথা, হরমোহন বাবুর সহিত ধর্ম্মপ্রচারপ্রসঙ্গ, সুরেশ দত্তের কথা, জনৈক সন্ন্যাসীকে উপদেশ, রাম বাবুর স্ত্রীর সেবা-প্রসঙ্গ, পুরীযাত্রা-প্রসঙ্গ, কাশী-প্রয়াগ-বৃন্দাবন-ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপদেশ

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি লাটু মহারাজ জয়পুর হইতে ফিরিয়া বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সে সময় স্বামীজী তাঁকে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীর মঠে থাকিতে বলেন, কিন্তু তিনি সেখানে রহিলেন না। বলিলেন—'এখানে ত বেশ আছি। তোমাদের ওখানে এতো লোক ধরবে কেনো ?'

লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি—"বিবেকানন্দভাই ওদেশ থেকে ফিরে এলে নবগোপাল বাবু স্বামীজীকে দিয়ে নিজের বাড়ীতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করালেন। সেইখানে বসে স্বামীজী একটা শ্লোক বানিয়ে ফেললে। (শ্লোকটি— স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥)

"সেবার ঠাকুরের উৎসব দু'জায়গায় হোলো। দক্ষিণেশ্বরে উৎসব করলেন কিশোরী বাবু, হরমোহন বাবু তার জন্য টাকা তুলতে লাগলো; আর দাঁয়েদের রাসবাড়ীতে যে উৎসব হোলো তার সব ভার নিলো যোগীনভাই আর বুড়ো বাবা। যোগীনভাই সেবার খুব খেটেছিলো। উৎসবের পর অসুখে পড়লো।

"যোগীনভায়ের অসুখ শুনে হাম্‌নে ত তাকে দেখতে গেলুম। হামাকে দেখে যোগীনভাই বললে—'এই যে অসুখ দেখছিস এ আর সারবে না; তবু ডাক্তারেরা কি বলে জানিস্? বলে—বেদানার রস খাও, লুচির ফুলকো খাও, মাগুরমাছের ঝোল খাও। শালাদের একটুও হুঁশ নেই যে, সন্ন্যাসীরা এসব যোগাড় করে কি কোরে! এসব হচ্ছে ভোগীর খাদ্যে, তাদের টাকা আছে, কোরে দেবার লোক আছে। সন্ন্যাসীর ভগবান ছাড়া আবার আছে কে? ভিক্ষে করে যাদের খাওয়ার যোগাড় করতে হয়, তাদের অতশত শোভা পায় না। কি বলিস?' "

লাটু মহারাজ— ও কি বলছো ভাই? অসুখ হোলে পথ্যি চাই; ওসব ত পথ্যি, ওতে কোন দোষ নেই।

যোগীনভাই— তাতো জানি। কিন্তু এসব যোগায় কে?

লাটু মহারাজ— কেনো, হামাদের ত বললেই পার, হামরা সব কোরে কর্ম্মে দেবো।

যোগীনভাই— তা' ত মানি; কিন্তু একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি—এসব যোগাড়যন্তর কোরে দেবার জন্য মা ওকে (অর্থাৎ যোগীন স্বামীর স্ত্রীকে) আনাতে বলছেন। তোর কি মত? সন্ন্যাসী হোয়ে শেষে পরিবারের সেবা নিতে হবে? এতে আমি মত দিতে পারছি নি। আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না।

লাটু মহারাজ— (শ্রীশ্রী) মা যখন বলছেন তখন আবার কথা কি? ওতে কোন দোষ হবে না।

যোগীনভাই— না রে না; তুই বুঝছিস নি। এতে লোকেরা বলবে কি জানিস্? ঠাকুরের সেবকেরা সন্ন্যাস নিয়েও মাগের সেবা নেয়। একথা উঠতে দেওয়া ভাল নয়।

লাটু মহারাজ— আরে! রেখে দাও লোকের কথা— ওরা সব বলে। ওদের কথায় কী এসে যায়? ধর্ম্মে যদি কেউ খাঁটি থাকে, ওরা হৈ হৈ করলে কি হবে? ওদের কথা বিশ্বাস করবে কে? তুমি ভাই, মায়ের কথা শুনে তাকে আনাও।

যোগীনভাই— যাকে জিগ্‌গেস করি সে-ই এই কথা বলে। তুইও সেই কথা বললি। কেউ আমার দিকের কথা ভাবলি নি। তোদের আর কি বলবো! বুঝতে ত পাচ্ছি এ অসুখ সারবে না, যে যতই চেষ্টা করুক আর যার যতই সেবা নি।

লাটু মহারাজ— না ভাই! এমন কথা বলতে নেই। তাঁর ইচ্ছেয় সব হবে। তিনি যদি তোমায় টেনে নিতে চান, হামাদের সাধ্য নেই তোমায় ধরে রাখি। আর তিনি যদি তোমায় তাঁর কাজের জন্য এখানে রাখতে চান, তোমার সাধ্য নেই যে তাঁর ইচ্ছেয় বাধা দাও। তবে কেনো তুমি এসব ভেবে মন খারাপ কচ্ছো?

হামার কথা শুনে যোগীনভাই কি বললে জানো?—"ঠিক বলেছিস ভাই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্— আমি কোথাকার কে?"

"যোগীনভায়ের পরিবার তার সেবা করতে এলে হামনে ত সেথান থেকে চলে এলুম। যোগীনভায়ের অসুখ ত দিন দিন খারাপের দিকে যেতে লাগলো। বিবেকানন্দভাই ত বিদেশ থেকে ফিরে এসে তার

চিকিৎসার বন্দোবস্ত কোরে দিলো। বাকী, তাতেও কুছু হোল না। তখন তাকে নিয়ে বাহিরে যেতে চাইলো। যোগীনভাই গেলো না, শেষে ঠিক হোলো যে সকাল-সন্ধ্যে নৌকো করে গঙ্গার উপর বেড়াবে। এক একদিন সে নৌকায় হামনে যোগেনভায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। কতো কথা হোতো! একদিন ত বিবেকানন্দভাই তাকে নৌকো থেকে মঠের ঘরবাড়ী সব দেখিয়ে দিলো।"

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে লাটু মহারাজ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে থাকিতেন। সেই সময় একদিন স্বামীজী অসুস্থ রাম বাবুকে দেখিতে যান। রাম বাবু তখন বাগানের দোতলার ঘরখানিতে ছিলেন। লাটু মহারাজের মুখে শুনিয়াছি—"রাম বাবুর সহিত স্বামীজীর অনেক কথা হচ্ছিল। এমন সময় রাম বাবু একবার বাহিরে যাবার জন্য উঠতে চাইলেন। তখন স্বামীজী তাঁর জুতা জোড়াটি এগিয়ে দিলো। এই না দেখে রাম বাবু বললেন—'ওরে বিলে! করিস্ কি? করিস কি? তুই না সন্ন্যাসী, তোকে এসব কাজ করতে নেই!' স্বামীজী তার উত্তরে বললে—'রাম দাদা! আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছো, তা' কি আমি ভুলে গেছি?'"—('সৎকথা' হইতে সংগৃহীত)

সেই বৎসর নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রী৺কালীপূজার দিন লাটু মহারাজকে নীলাম্বর বাবুর বাগানের মঠে দেখা গিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা সেদিন নূতন বেলুড় মঠে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া তিনি জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন— "শ্রীশ্রীমা ত মঠে গিয়ে সেদিন নিজের হাতে ঠাকুরের পূজা করলেন। সেদিন মঠের সকলে মিলে তাঁর পায়ের ধূলি

নিয়েছিলো ; এখনও মঠে সে ধূলি পূজা হয়। মা ত মঠবাড়ী দেখে খুব খুশী হোয়েছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখে বলেছিলেন—'বাঃ বেশ হয়েছে ! এখানে এলেই ওখানকার কথা মনে পড়বে।' "

হরিপর্ব্বত ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "নীলাম্বরের বাগানে লাটু মহারাজকে আমি দু-চার দিন দেখেছি। তখন শরৎ মহারাজ ওদেশ থেকে ফিরে এসে মঠে বাস করছেন। শরৎ মহারাজের সব কাজই তখন কেতাদুরস্ত। যেখানে যেটি থাকা উচিত, সেখানে তিনি সেই জিনিসটি রাখতেন। প্রায়ই দেখতাম যে, লাটু মহারাজ শরৎ মহারাজের ঘরে ঢুকে জিনিস-পত্তর হেণ্ডেল-মেণ্ডেল করে রেখে দিতেন। হয়তো বইটি বিছানার উপর রেখে আসলেন, না হয় কালীর দোয়াতটি টেবিলের এক কোণে লুকিয়ে রাখলেন। এমনি করে শরৎ মহারাজের সহিত লাটু মহারাজ খুনসুড়ি করতেন। প্রায়ই দেখতাম যে, শরৎ মহারাজের শুভ্র বিছানার উপর লাটু মহারাজ ধূলাসুদ্ধ পায়ে উঠে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে থাকতেন। লাটু মহারাজের আচরণ দেখে শরৎ মহারাজ কখন কখন বলতেন—'কি হচ্ছে ভাই ?' তাহাতে লাটু মহারাজ উত্তর দিতেন—'কি আর হবে ? দেখছি তোমার সে কথা মনে আছে, কিনা।'—'কি কথা রে ?' —'এরই মধ্যে ভুলে গেলে ভাই !' লাটু মহারাজের এই কথা শুনে শরৎ মহারাজ আরো চিন্তিত হতেন, তখন তাঁর নিকট হতে 'কথাটি কি' শুনবার জন্য জেদ ধরতেন। শরৎ মহারাজের কথায় লাটু মহারাজ প্রায়ই বলতেন —'দেখছি, ওদেশ থেকে এসে তুমি কতোখানিক সাহেব বনেছো !' একথা শুনে শরৎ মহারাজ হেসে ফেলতেন।"

"আর একদিনের ঘটনা বেশ মনে আছে—মঠ থেকে নৌকা করে কোথায় যাবার নিমন্ত্রণ ছিল, সকলেই এসেছেন, শুধু স্বামীজী আর শরৎ মহারাজ আসেন নাই। স্বামীজীকে মাঠের উপর দেখে, নিত্যানন্দ মহারাজ নৌকা থেকে চীৎকার করে বললেন—'বড় সাহেব এসে গেছেন, এখন ছোট সাহেব এলেই হয়।' লাটু মহারাজ তাহাতে কি একটি কথা বললেন। তাহা শুনে স্বামীজী বললেন—'কি বলছিস রে? বড় সাহেব, ছোট সাহেব যাই হই না কেন, জানবি, আমরা এখনো ভুলি নি যে আমরা গাছতলার সাধু।' স্বামীজীর কথা শুনে লাটু মহারাজ আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলেন।"

১৮৯৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে যেদিন বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়াছিল, সেই দিন লাটু মহারাজ সেইখানে গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছেন—"দেখো— আচার্য্য হোতে গেলে লোক চিনবার ক্ষমতা থাকা চাই। কাকে দিয়ে কি কাজ হোবে, বুঝতে না পারলে কোন আশ্রমই ভালভাবে চলতে পারে না। বিবেকানন্দভাই কাজের লোক দেখলেই চিনতে পারতো; কাকে দিয়ে কোন্ কাজ হোতে পারে, বেশ বুঝতো। তাই ত হরিপ্রসন্নভাইকে মঠে নিয়ে এলো, তার উপর মঠের বাড়ী তৈরী করবার ভার দিলো। আট মাসের মধ্যে যেখানটায় জলা ছিলো, সেখানে কেমন মঠ বানিয়ে দিলো। উৎসবের দিনে ত সবাই গেলো, বিবেকানন্দভাই নিজে সেদিন পূজোয় বসলো, কাঁধে কোরে (ঠাকুরের অস্থিপূর্ণ) কৌটাটি নিয়ে এলো। পূজার শেষে সবাইকে উদ্দেশ কোরে বলেছিলো—'আজ থেকে এই মঠে তাঁকে (ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) এনে বসালাম। তিনিই আমাদের চালাবেন। দেখিস্ ভাই! তাঁর

চালনায় তোরা যেন সবাই চলতে পারিস। তিনি চান পবিত্রতা, সরলতা আর উদারতা। তোরা এ তিনটে জিনিসের অমর্য্যাদা করিস নি। এখানে সকল মতের, সকল ভাবের মিল রাখতে হবে, কাউকে ছোট কাউকে বড় করা হবে না।' "*

ঐ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি লাটু মহারাজ ভক্তপালক রাম বাবুর বাটীতে ছিলেন। এই সংবাদটি রাম বাবুর মধ্যমা কন্যার নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনি আরো বলিয়াছিলেন—"লাটু দাদা শেষ চব্বিশ দিন (১৭ দিন বাড়ীতে ও সাত দিন যোগোদ্যানে) বাবার কি সেবাটাই না করেছেন! বাবা তো রাতে ঘুমোতে পারতেন না। রাতে তাঁর কষ্ট বাড়তো—মা সে কষ্ট দেখতে পারতেন না। তাই লাটু দাদা রাত্রে মাকে বাবার সেবা করতে দিতেন না, মাঝে মাঝে মাকে ধমক দিয়েও অন্য ঘরে শুতে পাঠাতেন। আর নিজে সমস্ত রাত ধরে বাবার সেবা করতেন। বাবা চব্বিশ ঘণ্টা হাওয়া চাইতেন, পাখার বাতাস চাইতেন, পাখার বাতাস না হোলে তাঁর চলতো না, তাই দিনরাত কেউ না কেউ তাঁকে বাতাস করতো। রাতে ত লাটু দাদা পাখা নিয়েই বসে থাকতেন, মাঝে মাঝে কালী দাদার (যোগবিনোদ স্বামীর) হাতে পাখা দিতেন। যেদিন বাবা যোগোদ্যানে যেতে চাইলেন, সেদিন লাটু দাদা বাবাকে কতো নিষেধ করলেন, কিন্তু বাবা কারুর কথা শুনলেন না। বাবার গোঁ শুনে মা ত কাঁদতে লাগলেন। তখন লাটু দাদা আবার মাকে কত সান্ত্বনা দিলেন। ২৮শে পৌষ বাবা যোগোদ্যানে গেলেন আর ৪ঠা মাঘ

* বিবেকানন্দের জীবনী-লেখকগণের লিখিত কথাগুলির সহিত লাটু মহারাজের কথিত কথাগুলির আক্ষরিক মিল নাই, কিন্তু ভাবের মিল আছে।

(ইং ১৯শে জানুয়ারী ১৮৯৯) বাবার দেহত্যাগ হোলো। বাবা মারা যাবার আগের দিন রাখাল মহারাজ এসেছিলেন। তার অনেকদিন বাদে স্বামীজীও আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। বাবা মারা যাবার পরও লাটু দাদা আমাদের বাড়ীতে (অর্থাৎ সিমলা মধু রায় গলির বাড়ীতে) কিছুদিন ছিলেন। ৫ই ফাল্গুন যোগোদ্যানে বাবার ভাণ্ডারা হোলো, সেদিন লাটু দাদা খুব খেটেছিলেন। সেই যে চলে গেলেন তারপর দু-চার মাস আর তাঁর দেখা পাই নি।"

লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—"রাম বাবুর শরীর ছাড়বার দু-তিন মাস পর (অনুসন্ধানে জানিয়াছি ১৫ই চৈত্র ১৩০৫, ইং ২৮শে মার্চ্চ ১৮৯৯) যোগীনভাই দেহ রাখলে। যোগীনভাই দেহ ছাড়বার সময় নির্ব্বাণ চাইছে শুনে গিরিশ বাবু তাকে বলেছিলো—'দ্যাখ যোগে! তাঁর কাছ থেকে ওসব চাস নি, তুই ও আকাঙ্ক্ষাটা ছেড়ে দে, তোর কষ্ট কমে যাবে।' গিরিশ বাবুর কথা যোগীনভাই খুব মানতো, তাই বললে—'আচ্ছা জি-সি! তোমার কথাই মানবো, কিন্তু কি চাইবো আমায় বলে দিতে হবে।' গিরিশ বাবু তখন কি বললে জানো? 'ওরে, তোরা ঠাকুরের সন্তান, তোদের তিনি নির্ব্বাণ দেবেন না, দিতে পারে না। তোদের যদি নির্ব্বাণ দিয়ে দেন তাহলে তাঁর লীলা চলবে কি করে? যতবার তিনি আসবেন, ততবার যে তোদের আসতে হবে, তোরা যে তাঁর অন্তরঙ্গ; তাই বলছি ওসব চাওয়া-টাওয়া ছেড়ে বল— চাই রামকৃষ্ণকে, চাই রামকৃষ্ণকে, চাই রামকৃষ্ণকে।' গিরিশ বাবুও বল্লেন, যোগীনভাইও সায় দেয়। এমন সময় কে যেন জিগ্‌গেস করলে— 'কি দেখ্‌ছিস ভাই?' তাতে যোগীনভাই কি বললে। তখন স্বামীজী চটে গিয়ে, যে ঐ কথা জিগ্‌গেস করেছিলো তাকে বললে, 'তোরা ত আচ্ছা'!

ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দে-না, জি-সির মত ওকে তাঁর নাম শোনা না।' নাম শুনতে শুনতে যোগীনভাই শরীর ছেড়ে দিলো। তারপর স্বামীজী নিজ হাতে তার মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে দিলো আর তাকে ভজন-গান শোনাতে লাগলো।"

যোগীন স্বামীর মহাপ্রস্থানের পর লাটু মহারাজ বেলুড় মঠে আসিয়া মাসখানেক কি মাস-দেড়েক ছিলেন। সেই সময় দেওভোগের নাগ মহাশয়কে মঠে দেখিয়াছিলেন। "নাগ মশায় নূতন মঠ দেখতে এলেন, স্বামীজীকে দেখে বললেন—'আজ সাক্ষাৎ শিবদর্শন হোলো।' হামাদের সবাইকে উদ্দেশ কোরে সেদিন স্বামীজী বলেছিলো—'ওরে! ইনি গৃহস্থ বটে, কিন্তু ত্যাগে, বৈরাগ্যে ও ইন্দ্রিয়জয়ে অনেক সন্ন্যাসীকেও ইনি হারিয়ে দেন। এনার কেমন ভাব দেখেছিস? জগৎটা আছে কিনা, সে বোধ নেই; সব সময়েই তন্ময় হোয়ে রয়েছেন।' ··· আর একবার (শ্রীশ্রী) মায়ের বাড়ীতেও (শ্রীশ্রীমা তখন সরকার-বাড়ী লেনে গুদামওয়ালা বাড়ীতে থাকিতেন— ১৮৯৫ খ্রীঃ) নাগ মশায়কে দেখেছিলুম, সেদিনও তাঁর ঐ ভাব। এমন বিনয় এমন আর্ত্তি খুব কম লোকের দেখেছি!"

"বিবেকানন্দভাই মঠ থেকে চলে গেলো, হামার আর সেখানে মন টিকলো না, হামি সেখান থেকে চলে এলুম!"—'কোথায় গেলেন, মহারাজ?'—'কেনো? 'বসুমতী'র ওপেন-ঠাকুরের কাছে গেলুম। ওপেন-ঠাকুর ত হামাকে তার ছাপাখানায় থাকতে বললে, হাম্‌নে সেখানে রয়ে গেলুম।'

—এত জায়গা থাকতে শেষে কিনা ছাপাখানায় রইলেন?

—কেনো? তাতে হয়েছে কি? ছাপাখানায় ত বেশ সুখে রাত কাটাতুম। কাগজের বাক্সের উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে থাকতুম।

— ছাপাখানায় গোলমাল হোতো না, মহারাজ ?

— তা একটু-আধটু হোতো, বাকী তাতে ধ্যেনের কোন বাধা হোত না। ওখানকার দু-চারজন লোক হামার খুব সেবা করতো আর ওপেন-ঠাকুর হামায় খুব ভালবাসতো ; তাইতো ওখানে রয়ে গেলুম।

— ছাপাখানার লোকেদের সঙ্গে মিশতেন বলেই ত আপনার নিকট কোন ভাল লোক আসতো না। —র মুখে শুন্‌লুম যে, আপনি যত নচ্ছার লোকের সঙ্গে মিশতেন !

— হ্যাঁ ! মিশ্‌তুম। বাকী তারা যে নচ্ছার একথা সে লোক জানলে কেমন করে ?

— মহারাজ ! এ কথা ত সবাই জানে, যারা চরিত্রহীন, নেশাখোর, জুয়াড়ী তাদেরকে সকলে নচ্ছার বলে। আপনি সেইসব লোকের সঙ্গে মিশতেন কেনো ?

— বাকী তারা ত কপট ছিল না।

লাটু মহারাজের এইসব কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত (যিনি উক্ত প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন) অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত নোটে বহু মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহার মধ্যে শুধু নিম্ন-লিখিত মন্তব্যটি দিলাম—

"লাটু মহারাজ মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন— কপট আর অকপট। অকপট সরল ব্যক্তিকে তিনি কোল দিতেন, কিন্তু কপট শিক্ষিত ব্যক্তিকে তিনি আমল দিতেন না।"

যখন তিনি 'বসুমতী' প্রেসে থাকিতেন সেই সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। —"একদিন গভীর রাত্রে তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন — 'চোপ্‌রাও শালা ! হামাকে তুই কি হুমকি দেখাবি ? হাম্‌নে রামকৃষ্ণের

সন্তান, হামার কাছে ওসব চালাকী চলবে না!' এই ভাবের গর্জ্জন শুনিয়া ছাপাখানার লোকেরা (যাহারা পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল তাহারা) ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মহারাজের ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল। আসিয়া দেখে যে, লাটু মহারাজ বীরের মত আসন গ্রহণ করিয়া স্থিরনেত্রে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁহার উগ্রভাব দর্শনে ছাপাখানার জনৈক কম্পোজিটার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'মহারাজ, রাতদুপুরে কার উপরে এমন খেপ্পাই হোয়ে উঠলেন, কেউ ত এখানে নেই।' লাটু মহারাজ সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই।" এই ঘটনাটি আমরা 'বসুমতী'র ম্যানেজার পটল বাবুর নিকট শুনিয়াছি।

এই ঘটনাটি শুনিয়া জনৈক পণ্ডিতব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন—"জানেন—! এরূপ ঘটনা প্রত্যেক সাধকের জীবনেই দেখা যায়। বুদ্ধদেব যখন গভীর তপস্যায় নিমগ্ন, তখন তাঁহাকে বিচলিত করিবার জন্য 'মার' নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে বিচলিত হন নি। এইসব প্রলোভনে যাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন তাঁহারা সাধনপথে মহাসিদ্ধিলাভ করেন। দেখুন না, মুনিঋষিদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ কত না চেষ্টা করিত! তাহাদের দেখিয়া সাধকগণ যদি ভুলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইন্দ্র হাসিতে থাকিতেন। আর যিনি ভুলিতেন না, ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া কাঁপিতে থাকিতেন। আমাদের পুরাণেও এসব কথা আছে।"

লাটু মহারাজ ছাপাখানার কর্ম্মচারিগণকে খুব খাওয়াইতেন। "ছোলাসিদ্ধ রাঙা-আলুসিদ্ধ, চা, মোহনভোগ—এ সব তিনি প্রায়ই স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। মাঝে মাঝে দোকান হইতে হিং-এর কচুরী আনাইতেন। সব

নিজের পয়সায়। দিনের বেলা তিনি গঙ্গার ধারে থাকিতেন। সেই সময় যিনি যাহা দয়া করিয়া দিতেন, তাহা লইয়া সেইদিনকার মত বন্দোবস্ত করিতেন। নিজে বিশেষ কিছু খাইতেন না,— দু-তিন কাপ চা আর কতকগুলো ছোলাসিদ্ধ; অনেক বলা-কহায় দু-একদিন এক-আধখানা হিং-এর কচুরী লইতেন, পরে তাহাও খাইতে চাইতেন না, বলিতেন— ওসব ভোগীর খাদ্য, সন্ন্যাসীকে খেতে নেই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁহার সঙ্গে খুব ফাজলামী করিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায়ই কোন কথা বলিতেন না। ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন— 'আগে উপায়-সুপায় কোরে মা-বাপকে সাহায্য কর; তাদের মুখে হাসি ফোটাও, তারপর ধর্ম্ম করতে এসো। কলিকালে মা-বাপের সেবা করাই ধর্ম্ম।' তিনি আরো বলিতেন— 'মা-বাপকে কাঁদিয়ে আসতে নেই। মা-বাপের অনুমতি নিয়ে ধর্ম্মসাধন করিতে হয়। এই দেখ না, শঙ্করাচার্য্য মায়ের অনুমতি নিয়ে তবে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিলেন, মহাপ্রভু মাকে তুষ্ট করবার জন্য বিয়ে পর্য্যন্ত করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।' এরূপ দৃষ্টান্তই তিনি আমাদের দেখাইতেন। একদিন আমাদের মধ্যে একজন তাঁহার কাছে দীক্ষা নিতে চাইলে তাহাকে লাটু মহারাজ বলেন— 'ওসব আচার্য্যের কাজ— হামি ত আচার্য্য নয়! যাও না স্বামীজীর কাছে; ভাল বুঝলে তিনি তোমায় দীক্ষা দেবেন।' এমনি কোরে তিনি আমাদের ভুলিয়ে রাখতেন!" ('বসুমতী'র পটল বাবুর নিকট শ্রুত)।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি 'বসুমতী' প্রেস বিডন বাগানের পূর্ব্ব দিক হইতে গ্রে ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়। গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে লাটু মহারাজ থাকিতেন না, এ সংবাদ 'বসুমতী' ছাপাখানার লোকেদের মুখে আমরা শুনিয়াছি।

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগ দিতেন। একদিন সাপ্তাহিক সভায় বেদের বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলরাম মন্দিরে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন— "ও শরোট্ বাবু! আপুনি বেদের লিক্‌চার দিবার অনেক সময় পাবেন, বাকী এমন মহাপুরুষ চলে গেলে আফসোস করতে হবে। আজই দেওভোগ চলে যান। নাগ মশায়ের ভারী অসুখ হয়েছে। যান— তাঁর সেবা করে ধন্য হউন।" লাটু মহারাজের এই কথা শুনিয়া শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই রাতেই দেওভোগ যাত্রা করিলেন। ঠিক এক মাস পরে নাগ মশায়ের দেহত্যাগ হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন — "লাটু মহারাজের ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা ছিল; তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন নাগ মশায়ের অসুখ সারবে না, তাই আমাকে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে বললেন।"

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লাটু মহারাজ খোড়ো কেদারের বাড়ীতে ছিলেন। ভক্ত নিবারণচন্দ্র দত্তের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার কোন বন্ধু ফুলদোল উপলক্ষে ঠাকুরের সেবকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাটু মহারাজকে বলিবার জন্য তিনি সে সময় খোড়ো কেদারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

নভেম্বর মাসে লাটু মহারাজ জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে একবার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বগাণ্ডা গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে দিন তিন-চার ছিলেন। "সেখানে গ্রামের যত ছোট ছোট ছেলে নিয়ে লাটু মহারাজ সারাদিন হৈ চৈ করতেন। কখনও তাদের ভয় দেখাচ্ছেন,

কখনো তাদের তাড়া করছেন, কখনো বা তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন, আবার কখনও তাদেরই একজন হোয়ে আবোল-তাবোল বকছেন। তাকে পেয়ে গ্রামের ছেলেরা ভারী খুশী, সারাদিনটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো-ফিরতো। দু-তিন দিনের মধ্যে ছেলেরা তাঁর এতো আপনার হোয়ে গেছিলো যে, তাঁর ঘাড়ে চড়তে, পিঠে উঠতে, কোলে বসতে ভয় খেতো না।" হরিপদ মহারাজের মুখে ইহা শ্রুত। তিনি কোন সময় উল্লেখ করেন নাই; খগেন মহারাজের অনুমান মত বৎসর উল্লেখ করিলাম।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লাটু মহারাজ বেলুড় মঠে ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।'

হরিপদ মহারাজ বলেন— "স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশে চলিয়া গেলে লাটু মহারাজ শরৎ মহারাজের সহিত খুব মিশিতেন। সেই সময় শরৎ মহারাজ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় বক্তৃতা দিতে যাইতেন। এক-দিন কোন এক সভায় শরৎ মহারাজ প্রায় দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু তখনও সভার লোকেরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন দেখিয়া লাটু মহারাজ সভামধ্যে বলিয়া উঠিলেন— 'আরে শরোট্! ব্যস্ ব্যস্, ঢের হয়েছে। আর কতো বলবি?' লাটু মহারাজের কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া জনৈক শ্রোতা অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং সভামধ্যে দু'এক কথা বলিতে থাকেন। তাহাতে লাটু মহারাজ বলেন— 'আপুনারা ত খুব দরদ দেখাচ্ছেন মানি, বাকী এতো লিক্‌চার দিয়ে কাল যখন ওর গলা ভেঙ্গে যাবে তখন কি আপুনি ওকে দেখতে যাবেন, না ওর সেবা করবেন। কষ্ট ত ওকেই ভুগতে হবে।' এমন দরদ দিয়ে লাটু মহারাজ এই কথাগুলি বলিলেন যে, সভাস্থ সকলেই বুঝিলেন— একদিনে এত প্রশ্ন করিয়া কোন বক্তাকে উত্যক্ত করা উচিত নয়।"

এই বৎসর ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে স্বামীজী কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া একাকী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক গৃহিভক্ত, যিনি সেইদিন মঠে ছিলেন, তিনি এই প্রসঙ্গটি যেরূপ বলিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি —

"রাতে একদল খেতে বসেছেন ও আর একদলের খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় মালী এসে বললে— 'বাবু! এক সাহেব আউচি।' সাহেব শুনিয়া সকলেই ত জল্পনা করিতে বসিলেন— এত রাত্রে কে আসিতে পারে? বোধ হয় স্বামীজীর কোন শিষ্য আসিয়াছেন—এইরূপ ভাবিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য রাখাল মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে ও জনৈক ভক্তকে পাঠাইয়া দিলেন। ততক্ষণে সাহেব মঠের গেট ডিঙ্গাইয়া বাগানের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছেন। মাঝ পথে সাহেবের সহিত উভয়ের দেখা হইয়া গেল। সাহেব তখন ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গলা বুলি ধরিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীকে দেখিয়া বলিলেন— 'একটা খবর দিয়ে আসতে পার নি, ভাই!' যাহা হউক, সকলেই ত স্বামীজীর সহিত দেখা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। লাটু মহারাজকে এই সংবাদ দিবার জন্য সেই গৃহী ভক্তটি গঙ্গাতীরে (যেখানে তিনি ধ্যান করিতেছিলেন) আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন— 'মহারাজ! স্বামীজী এসেছেন। চলুন, দেখা করবেন না?' স্বামীজীর আগমন-সংবাদ শুনিয়াও লাটু মহারাজ কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না— অধিকন্তু সেই গৃহিভক্তটিকে বলিলেন— 'আরে! বসো বসো, এখানে এমন রাতে একটু ধ্যেন কর।' লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া সেই গৃহিভক্তটি বড় মুশকিলে পড়িলেন— তাঁহার কথাও অমান্য করিতে পারিলেন না অথচ স্বামীজীর কথা শুনিবার আগ্রহও প্রবল হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে স্বামীজী আহারাদি শেষ করিয়া লাটু মহারাজের সহিত

গঙ্গাতীরে দেখা করিতে আসিলেন। তখন উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর স্বামীজী লাটু মহারাজকে বলিলেন—'হ্যাঁরে! আমি যে অনেকক্ষণ এসেছি। সবাই দেখা করলে, তুই যে বড় এখানে বসে রইলি, তোর কি অভিমান হয়েছে?' লাটু মহারাজ তাহাতে বলিলেন—'অভিমান আবার কিসের? এখানে হামার মন বসে থাকতে চাইলে, তাই গেলুম না।' তাহাতে স্বামীজী বলিলেন—'হ্যাঁরে! শুনলুম তুই ত মঠে থাক্‌তিস নি, এদিক ওদিক বিগ্‌ড়ে বিগ্‌ড়ে থাকতিস্। তোর চলতো কিসে?' তাহার উত্তরে লাটু মহারাজ বললেন—'কেনো? ওপেন-ঠাকুর সাহায্য কর্‌তো। যেদিন কুছু জুটতো না, সেদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পার্‌তো, সিকিটা-দুয়ানীটা দিয়ে দিতো।' এই কথা শুনিয়া স্বামীজী ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বলিলেন—'ঠাকুর! উপেনের কল্যাণ করুন।' সকলেই জানেন, সেই অমোঘ আশীর্ব্বাদ কি বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছে। জ্যোৎস্নাধৌত তরঙ্গ দেখিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন—'এই যে দৃশ্য দেখছ, এর সঙ্গে ইজিপ্টের নীলনদের দৃশ্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তায় অল্পক্ষণ কাটাইয়া স্বামীজী উপরে বিশ্রাম করিতে যাইলেন। লাটু মহারাজ কিন্তু সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।"

পরদিন প্রভাতে (ভোর চারি ঘটিকার সময়) সেই গৃহীভক্তটি যখন রাখাল মহারাজের পত্র লইয়া বলরাম মন্দিরে আসিবার জন্য (বাজারের) নৌকার সন্ধান করিতেছিলেন তখনও তিনি দেখিলেন যে, লাটু মহারাজ গঙ্গাতীরে সেইস্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লাটু মহারাজ বেলুড় মঠে ছিলেন। মঠ যখন রেজিষ্ট্রী করা হয় (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খ্রীঃ) তখন স্বামীজী লাটু

মহারাজকে মঠের একজন ট্রাষ্টী করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— 'হামার ওসব ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। হামাকে ভাই ওর মধ্যে জড়িও না।' তাহাতে স্বামীজী বলেন— 'তুই থাক্‌না। তোকে কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না; তোর নামটা দিয়ে দি। ওতে আপত্তি করিস নি।' শুনিয়াছি, রাখাল মহারাজও লাটু মহারাজকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন— 'হামনে ওসবের মধ্যে থাক্‌বে না।'

এই সময়কার কতকগুলি ঘটনা শুনিয়াছি। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেন— "লাটু মহারাজ নিজে পড়তে না জানলেও তাঁর শাস্ত্রাদি শোনবার খুব আগ্রহ ছিল; তিনি অপরকে দিয়ে পাঠ করাতেন। একদিনের কথা আমার মনে পড়ে— মঠে তখন একঘরে দু'জনে শুই। অনেক রাত্রে উঠে বললেন— 'এই সুধীর! সুধীর! গীতা পাঠ কর।' আমি তাঁকে সেই রাতে গীতা পাঠ ক'রে শুনালাম।"

আর একটি ঘটনা। ইহা শরৎ মহারাজ কথিত। "একদিন মঠের জনৈক সাধু তাহাকে কঠোপনিষদ শুনাইতেছিলেন। যেমন তিনি পাঠ করিলেন—

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।'

তখন তিনি, 'প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ' অর্থাৎ ধানের শিষ যেমন অতি সন্তর্পণে ধৈর্য্য সহকারে খড় হইতে পৃথক করিতে হয়, সেইরূপ ধৈর্য্য সহকারে অন্তরাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিবে, এই কথা কয়টি শুনিয়া বড়ই খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই ঠিক বলেছ।' তাঁহার ঐরূপ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সহজে (ব্যাখ্যা শুনিবার পূর্ব্বেই) এই দুর্ব্বোধ্য কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।"

বেলুড় মঠে প্রত্যহ তিনি সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেন। সাধারণতঃ প্রণাম অত্যন্ত দীর্ঘ হইত। তাহা দেখিয়া জনৈক গুরুভাই তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন— 'কি সাধু, কাকে প্রণাম জানাচ্ছ?' গুরুভাইটির বলিবার ধরনে ব্যঙ্গ করিবার আভাস বুঝিতে পারিয়া লাটু মহারাজ খুব তেজের সহিত বলিলেন— 'কেনো? প্রত্যক্ষ দেবতাকে প্রণাম করছি।' ইহা শুনিয়া গুরুভাইটি পুনরায় বলিলেন— 'প্রত্যক্ষ দেবতা আবার কোনটি? আমি ত দেখতে পাচ্ছি নি।' তাহাতে লাটু মহারাজ বলেন— 'ঐ ত সুরজ নারায়ণ (সূর্য্যদেবতা) রয়েছেন। ঐ ত প্রত্যক্ষ দেবতা। এমন প্রত্যক্ষ দেবতা আর পাবে না। আমি ওনাকেই মানি, অন্য কোন দেবতাকে প্রত্যক্ষ বলে মানি না।' সেই অবধি ঐ গুরুভাইটি লাটু মহারাজকে দেখিলেই প্রায়ই ঐ প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিতেন— 'তোমার প্রত্যক্ষ দেবতার খবর কি?'

মঠে একবার হুকুম হোলো— ভোর চারটায় উঠে সবাইকে ধ্যান কর্‌তে হবে। হুকুম হবার পরের দিনই ঘণ্টা নেড়ে সকলের ঘুম ভাঙানো গেলো। লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, 'ও নিয়ম হামার ভাল লাগলো না, তাই কাউকে কুছু না বলে হামি মঠ থেকে চলে যেতে চাইলুম। পরদিন সকালবেলা গামছা কাপুড় নিয়ে চলে যাচ্ছি দেখে স্বামীজী বললে— 'কোথায় যাচ্ছিস?' বললুম— 'কলকাতায় যাচ্ছি!'— 'কেন?' তখন স্বামীজীকে বললুম— 'তুমি ওদেশ থেকে এসেছো, কতো নতুন নিয়ম করছো, হাম্‌নে ওসব মানতে পারবে না। হামার মন এখনও এমন ঘড়ি ধরা হয়নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর হামার মন অমনি ধ্যানে বসে যাবে। ধ্যেনে মন কখন বসবে তা' কে জানে? হামার ত এখনো এতোটা হয়নি, তোমার যদি হোয়ে থাকে ভালই!' তাতে স্বামীজী বললে— 'তবে তুই যা।' কিন্তু

ফটক পার না হোতে হোতেই স্বামীজী হামাকে ফিরিয়ে এনে বললেন— 'তোকে এ নিয়ম মানতে হবে না, তুই যেমন ইচ্ছে থাকবি। তোর জন্ম ওসব নিয়ম নয়। যারা নূতন এসেছে তাদের জন্য এ নিয়ম করা হয়েছে।' তখন বললুম— 'তাই বল!' (শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মৈত্রের নোট অবলম্বনে লিখিত)।

"একদিন ত বাবুরামভাই ঠিক সময় মত উঠতে পারলে না। স্বামীজী সে খবর পেয়ে একজনকে বললে— 'যা, তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।' সে তাই করলো, বাকী তাতেও বাবুরামভাই উঠলো না। তখন স্বামীজী নিজে গিয়ে তাকে তুলে দিলো। চা খাবার সময় স্বামীজী বাবুরাম-ভাইকে বললো— 'দেখ! তোরা হচ্ছিস মঠের চালক, তোদের বেশী কোরে নিয়ম মানতে হবে। নিয়ম করে তোরা যদি সে নিয়ম না মানিস, তাহলে অপরে তোদের নিয়ম মানবে না। নিজে মেনে অপরকে শেখাতে হয়।' স্বামীজীর মুখে এই কথা শুনে বাবুরামভাই নিজে থেকে বললে— 'আজ উঠতে পারি নি, আমার জন্যে সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি; তা' তুমি ভাই এর জন্য একটি নিয়ম কর— যে উঠতে পারবে না তার শাস্তি হবে।' বাবুরামভায়ের কথা শুনে স্বামীজী গম্ভীর হয়ে বললে— 'তোকে আমি শাস্তি দেবো, একথা তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম!' স্বামীজীর চোখে জল দেখে বাবুরামভাইও কাঁদতে লাগলো। রাজার কাছে এ খবর গেলো, রাজা (অর্থাৎ রাখাল মহারাজ) ত ভেবেই অস্থির। সেখানে এসে বললে— 'তোমাদের এত কান্নাকাটি কেন? সেদিন ত নিয়ম হয়েছে —ঘণ্টা বাজলে যে বিছানা থেকে উঠবে না, তাকে সেদিন মঠে খেতে দেওয়া হবে না— মাধুকরী কোরে খেতে হবে।' একথা শুনে বাবুরামভাই ভারী খুশী, বললে— 'রাজা ঠিক কথা বলেছে। আমি আজ মাধুকরী

করবো।' দেখো তো ওদের মধ্যে কেমন ভালবাসা ছিলো— একজন নিয়ম ভাঙ্গলে বলে শাস্তি চাইলে, আর একজনের সেই কথা শুনে চোখে জল এলো। শেষে আর একজন শাস্তি দিলো, তাতে যে নিয়ম ভেঙ্গেছিলো, সে খুশী হোলো। এমনি ভালবাসা না থাকলে কি একটা মঠ চলে? তোমাদের মধ্যে সে ভালবাসা কই? যে নিয়ম ভাঙ্গে সে কি যেচে শাস্তি নিতে চায়? না, শাস্তি পেলে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে? এখন ত দেখতে পাই— শাস্তির কথা উঠলেই দুঃখে সে মঠ ছেড়ে দিচ্ছে। এ ত ভাল নয়! মঠে থাকলে নিয়ম মানতেই হবে। সেখানে থেকে নিয়ম মানবো না, এমন ভাব ত ভাল নয়! ওতে সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায়।" এক সময় কলিকাতার কোন একটি মঠ হইতে কোন একজন সাধুকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কথা উঠে। সেই সাধুটি কাশীতে লাটু মহারাজের নিকট আসিয়া সেই মঠাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে থাকে। তাহা শুনিয়া লাটু মহারাজ তাহাকে ধমক দেন এবং তাহার নিকট উক্ত প্রসঙ্গটি বলেন। লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া সাধুটি সেই মঠের অধ্যক্ষের নিকট যাইয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় মঠাধ্যক্ষের নিকট হইতে শাস্তি গ্রহণ করেন। এইভাবে মঠাধ্যক্ষের সহিত সেই সাধুটির পুনর্মিলন হয়।

বাংলা ১৩০৬ সনের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯০০-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে জন্‌সন নামে কোন এক বিদেশী সাহেব লাটু মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন। তাঁহার সহিত লাটু মহারাজের কি কথা হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

লাটু মহারাজ কাশীতে একদিন বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মঠের সন্ন্যাসীরা হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ হউক। তাই তিনি মঠে সকলকে ডাম্‌বেল ভাঁজতে বলতেন। তখন হামি মঠে আছি, স্বামীজী নিয়ম

করলেন, সকলকে ডাম্‌বেল ভাঁজতে হবে। তার কথা শুনে হাম্‌নে বললুম— 'এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই! এ বয়সে হামাদের ডাম্‌বেল ভাঁজতে হবে নাকি? হামি ত তোমার ডাম্‌বেল ভাঁজতে পারবো না।' হামার কথা শুনে স্বামীজী শুধু হাসতে লাগলো।" ('সৎকথা' হইতে)।

একদিন মঠে গুরুভায়েদের সামনে স্বামীজী নানা দেশের নানাবিধ পূজার কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় লাটু মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'হ্যাঁ ভাই! তুমি ত এতো দেশ ঘুরেছো, কতো দেখেছো, কতো শুনেছো, বাকী কোথাও কি পৃথিবী-পূজোর কথা শুনেছো?'

স্বামীজী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কেন বল তো?'

লাটু মহারাজ— কি জান ভাই! হামি ত দেখছি যে, এই মাটী থেকে যা কুছু সব হয়েছে; ইথান্‌কার এতো ঐশ্বর্য্য, সবই ঐ মাটীর বুক চিরে বের কোরে নেওয়া হচ্ছে; ইথান্‌কার জিনিস সবাই খাচ্ছে, পরছে, ভোগ করছে; ইথানকার জিনিস নিজের ঘরে তুলে সবাই নিজেকে বড় ভাবছে! তাই জিগগেস করছি— যেথান থেকে লোকেরা এতো জিনিস পাচ্ছে, সেই পৃথিবীকে তারা পূজো করে কি না।

স্বামীজীর পাশেই শরৎ মহারাজ বসিয়াছিলেন। লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া স্বামীজী শরৎ মহারাজকে বলিলেন,— 'দেখেছিস! লেটো কেমন প্লেটোর মতন কথা কইছে।' তারপর লাটু মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন— 'ওরে! এদেশ (ভারতবর্ষ) ছাড়া আর কোথাও বসুমতীর পূজা নেই।'

সকলার সামনেই লাটু মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আচ্ছা

ভাই! ওদেশের লোকেরা বসুমতীর পূজো করে না, তবু এতো বড় হোয়ে উঠলো আর এদেশের লোকেরা বসুমতীর পূজো কোরেও এতো গরীব হোয়ে রইল, এর কারণ কি বলতে পারো?'

স্বামীজী উত্তর দিলেন—'ওরে! আমরা পূজা করলে কি হবে, আমাদের পৃথিবীর উপর টান কোথায়? আমরা ফুল তুলসী দিই বটে, কিন্তু মনে এক তিল ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখি না। ওরা পৃথিবীর পূজা করে না, কিন্তু একে এত ভালবাসে যে, এর জন্য প্রাণ দিতে পারে। আমাদের দেশে ক'জন তেমন পারে? তাই ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে।'

স্বামীজীর কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ চুপ করিয়া যান। শরৎ মহারাজ তখন স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লাটু মহারাজকে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার সময়ে মঠে দেখা গিয়াছিল। সেইবার মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইয়াছিল। পূর্ব্বে মঠে ঘটে ও পটে পূজা হইত। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলেন—'যে বিবেকানন্দভাই আগে দেবদেবীকে মানতো না, ভগবানের এমনি লীলা দেখো যে, সেই বিবেকানন্দভাই শরীর ছোড়বার আগে প্রতিমা আনিয়ে মঠে পূজো কোরলো। আরে! প্রতিমা পূজো কি একেবারে ভূয়ো? তা নয়! ওর মধ্যেও বস্তু আসেন, ওকে ধরেও সাধনপথে এগোনো যায়। সেই বুঝেই ত বিবেকানন্দভাই মঠে প্রতিমা আনালে। জানো! ··· মঠে যে বার দুর্গা-পূজো হোলো, সেবার স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে মঠে নিয়ে এলো। পাশের বাগানবাড়ীতে মা রইলেন; মায়ের আদেশে বলি দেওয়া বন্ধ হোলো। মা পূজোর সময় মঠে আসতেন, আবার পূজো হোয়ে গেলে চলে যেতেন। শরোটের

জ্যেঠামশায় সেবার পূজো করেছিলো। সেবার ভারী ধূমধাম হোয়েছিলো, বহুত লোক প্রসাদ পেয়েছিলো।'

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শিবরাত্রির দিন লাটু মহারাজকে মঠে দেখা গিয়াছিল। সেখান হইতে লাটু মহারাজের সঙ্গে গ্রন্থকার, মোক্ষদা সামধ্যায়ী ও নিবারণ দত্ত কল্যাণেশ্বরে শিবপূজা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে জনৈক ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি বলেন— 'ওরে! তোর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি, কুছু খেয়ে নে!'

তাহাতে ভক্তটি বলেন— 'পূজা না করে খাব না।'

লাটু মহারাজ— এমন জেদ থাকা ভাল। বাকী জেদ রাখতে গিয়ে যেন মন খিঁচড়ে না যায়।

ভক্তটি— কেন, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— আরে! সে জেদ ভাল নয়। ভক্তির সঙ্গে পূজো করবার জেদ রেখো, বাকী পূজো ভুলে গিয়ে, না-খাবার-জেদকে বড় বড় কোরো না। সে জেদে কোন লাভ নেই। মন যদি খাবার দিকেই রইলো, তাহলে আর ভক্তির পূজো করবে কেমন করে? মন ঠাণ্ডা (শান্ত) না থাকলে ভক্তির উদয় হয় না।

এই সম্বন্ধে আরো দুটি প্রসঙ্গ আছে। একবার নকুলেশ্বরতলায় পূজা দিতে গিয়া (১৯০৬ খ্রীঃ) দেখেন যে, জনৈক সহযাত্রী অনাহারে মূর্চ্ছাপন্ন অথচ উপবাস ভঙ্গ করিতে চাহিতেছেন না। তাহাতে লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলেন— "আরে! দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থেকে শরীরকে কষ্ট দিলেই বুঝি ধর্ম্মলাভ হয়? ধর্ম্ম এমন ব্যেপার নয়। ধর্ম্ম হচ্ছে আনন্দের ব্যেপার। যদি আনন্দই না মিললো তো উপোস করা মিছে। খিদেতে শরীর যদি জীর্ণ হোয়ে পড়লো, আর মন যদি

খিচ্‌ড়ে (অশান্ত) রইলো. তাহলে পূজো করবে কে ? বেশী খেলে মনের চঞ্চলতা বাড়ে, তাই ঋষিরা কম খেতে বলেছেন, যাতে মনটা শান্ত হয়ে ইষ্টে লাগতে পারে। এখন দেখছি ত তাঁদের কথা উল্টো বুঝে তোমরা শরীর-মনকে কষ্ট দিয়ে ভাবছো ধর্ম্ম হচ্ছে। তিনি বলতেন কি জানো ?—'কুছু খেয়ে দেয়ে পূজা করায় কোন দোষ হয় না।' "

কোন এক সময়ে (১৯০২ খ্রীঃ) স্বামীজী লাটু মহারাজকে বলিয়াছিলেন — 'ওরে ! দেখছিস কি ? যা করে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি— এই ত সবে আরম্ভ। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা তাঁর নাম নিতে সবে আরম্ভ করেছে। দু-দশ বছর বাদে দেখবি ওদেশের লোকেরা আমাদের ঠাকুরের ভাব নেবে। এখন ত দু-চারজন দেখছিস, তখন দেখবি হুদো হুদো লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি করে গেছে।'

স্বামীজীর মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "ভাই ! তুমি আর কি নোতুন করেছো ? শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেব যা করে গেছেন, তুমি ত তার উপর মাত্র দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছো কি ?"

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন— 'ঠিক বলেছিস প্লেটো। শুধু দাগা বুলিয়েছি।' এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী প্রাচীন আচার্য্যগণের উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন।

মঠে একদিন স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন— 'দেখ বাবুরাম ! চেলাচেলা করিস নি। শেষে চেলায় চেলায় ঝগড়া হয়ে কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। এখন থেকে রাজাই সকলকে দীক্ষা দেবে, আমরা আর কাউকে দীক্ষা দেবো না।' যে সময় এই কথা হইয়াছিল সেই সময় লাটু মহারাজ

তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও স্বামীজীর কথায় সায় দিলেন। মনে হয় সেইজন্যই তিনি কাউকে শিষ্য করিতে চাহিতেন না।

কাশ্মীর ভ্রমণকালে স্বামীজী লাটু মহারাজকে একখানি ভাল কাশ্মীরী আলোয়ান দিয়াছিলেন। সেইখানি গায়ে দিয়া তিনি একদিন দুপুরে শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় গিয়াছিলেন। আলোয়ানখানি দেখিয়া শরৎ বাবু বলিলেন— 'বাঃ, বেশ আলোয়ানখানি ত!' এই কথা শুনিবামাত্র লাটু মহারাজ নিজের গাত্র হইতে আলোয়ানখানি খুলিয়া শরৎ বাবুর গায়ে জড়াইয়া দিলেন আর বলিলেন— 'তোমার এখানি গায়ে দেবার সাধ হয়েছে, তুমি নিয়ে নাও। হামাদের গায়ে এসব শোভা পায় না। শুধু গুরুভায়ের ভালবাসার দান বলে একদিন এখানা ব্যেভার করলুম।' এই কথা শুনিয়া শরৎ বাবু বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে 'মহারাজ! আমার গুরুর দেওয়া জিনিস আমি কি নিতে পারি?' এই বলিয়া তিনি আলোয়ানখানি ফিরাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদটি স্বামীজীর কানে উঠিল। তিনি শরৎ বাবুকে বলিলেন— 'আরে! তুই নিলি নি কেন? ও ত খামখেয়ালী মানুষ, ওর কি কোন ঠিক আছে? আর কাউকে বিলিয়ে দেবে। তোর কাছে থাকলে তবু জিনিসটা থাকতো।'

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়। লাটু মহারাজ সেদিন রাত্রে বলরাম মন্দিরে ছিলেন। কিন্তু সেই খবর শুনিয়া পরদিন ভোরে তিনি বলরাম মন্দির ত্যাগ করিয়া দর্জ্জিপাড়ায় নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটস্থ হরমোহন বাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। স্বামীজীর অসুস্থতার সময় যিনি দু'এক দিন মঠে গিয়াছিলেন, তিনি কেন যে স্বামীজীর মহাপ্রস্থানের সংবাদ শুনিয়াও মঠে গেলেন না, তাহার কারণ আমরা

জানি না। তাঁহার এইরূপ খেয়ালী ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া জনৈক ভক্ত (৬ই জুলাই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'মহারাজ! সকলেই মঠে গেলেন, শুধু আপনি যান নি, এতে যে কথা উঠেছে।'

—"আরে! উঠতে দাও। কথা তুলে আর কি দুঃখু দেবে? বিবেকানন্দভাই হামাকে যে কতো ভালবাসতো, তা' ওরা কি বুঝবে? এমন ভালবাসা হারালুম! তাঁর (ঠাকুরের) পর, যাওবা বিবেকানন্দ-ভায়ের ভালবাসা পেলুম, সেও চলে গেলো!" এমন করুণস্বরে তিনি এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন যে, প্রশ্নকর্ত্তার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, এই বৎসর সমগ্র শীতকালটাই তিনি হরমোহন বাবুর বাটীতে রাত্রে থাকিতেন। এই সময় হরমোহন বাবুর সহিত তাঁহার প্রায়ই মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা হইত। হরমোহন বাবু অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। শোনা যায় যে, তিনি পরের উপকারের জন্য নিজে ঋণগ্রস্ত হইতেও পশ্চাদপদ হইতেন না। কথিত আছে যে, রাস্তার কুকুর-বিড়ালকে পিছু পিছু যাইতে দেখিলে তিনি দোকান হইতে খাবার কিনিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার করিবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল, প্রায়ই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেন। বিক্রয়ের চেয়ে দানই ছিল বেশী। সেইজন্য শেষবয়সে তাঁহাকে অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

"একদিন কথায় কথায় ধর্ম্মপ্রচার কিভাবে করা উচিত সেই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সেদিন তথায় হরমোহন বাবু, বিহারী বাবু আর গিরীন বাবু উপস্থিত ছিলেন। হরমোহন বাবুতে আর গিরীন বাবুতে

কথা হইতেছিল। দু'জনকেই বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করার পক্ষপাতী দেখিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাদের কথার মধ্যে বলিয়া বসিলেন— 'ও গিরীন বাবু! ও কি বলছেন? ঢাক পিটে কি ধর্ম্মপ্রচার হয়? ধর্ম্ম কি বাহিরের জিনিস যে একজন বলতে থাকলেই আর একজন তা নিতে পারবে? ধর্ম্ম হচ্ছে উপলব্ধির ব্যেপার। হৈচৈ গোলতানির মধ্যে ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, যত হৈচৈ করবেন, তত লোকে বহির্ম্মুখ হোয়ে উঠবে। অন্তর্মুখ না হলে ধর্ম্ম হয় না। এই দেখুন না! দশ-পনের কি বিশ বছর আগে এই কলকাতা শহরে কেমন ধর্ম্মের ঢেউ উঠেছিলো, জানেন ত! রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদ্রীর দল (Salvation Army) লিক্‌চার দিতো। সমাজে ব্রাহ্মরা সব বক্তৃতা দিতো। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভায় কীর্ত্তন হোতো। তখনকার কথা মনে করুন। একদিন কোম্পানীর (বিডন) বাগানে কিশুব বাবু (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) বক্তৃতা দিলেন ত তার পরের দিন সেই বাগানে খ্রীষ্টান কালী (Rev. Kali Krishna Banerjee) লিক্‌চার দিলো। লোকে তাদের কথা শুনলো। আবার একদিন কৃষ্ণানন্দ স্বামী এলেন, তিনিও বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। লোকে তাও শুনলো। একদল বক্তা হিন্দুধর্ম্মকে গালাগালি দিলো, আর একদল সেই ধর্ম্মের স্তুখ্যেতি করলো। শশধর পণ্ডিতের দল ত ধর্ম্মের নোতুন ব্যাখ্যা লাগিয়ে দিলো। এতো জবরভাবে ধর্ম্মের প্রচার হোতে লাগলো। বাকী তার ফলে কি হোলো? যারা সভা কোরে বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করলো তাদের দল বাড়লো? না, যারা তপস্যা কোরে তাঁকে জেনে ত্যাগের পথে এগিয়ে গেলো, তাদের দলে লোক ভিড়তে লাগলো? এতো যে দল দেখেছিলেন, সেসব এখন কুথায় মিলিয়ে গেলো! তাদের আর তেমন জোর দেখতে পাচ্ছেন কি?

তখন ত দেখতেন, ছেলে বুড়ো যুবা সবাই ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক করছে, ঝগড়া করছে, হৈহৈ করছে। বাকী এখন সেসব কুথায় গেলো? আপনারা ঠিক জানবেন— ভিতরে বস্তু না থাকলে ফাঁকা কথায় কুছু হয় না। ভিতরে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম চাই-ই চাই, তবে লোকে বিশ্বাস করে। ভগবানের চক্র এমনি। এই দেখুন না, স্বামীজী কঠোর করবার পর যেই লোককে উপদেশ দেবার আদেশ পেলো, অমনি লোকে তার কথা গ্রহণ করে নিলো। স্বামীজীর এক লিক্‌চারে যে ফল হোলো, তাতে জগতের লোকের নজর তার দিকে গিয়ে পড়লো। সেই লিক্‌চারের আগে স্বামীজীকে জানতো কে? তারপরই ত চাকা ঘুরে গেলো। যা কেউ কখনো ভাবতে পারে নি, তাই হোয়ে গেলো।' " বিহারী বাবু আমাদের নিকট এই কথাগুলি বলিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় তিনি এই কথাগুলিরই চুম্বক ছাপাইয়াছেন।

আর একদিন এই বিষয়টির সম্বন্ধে হরমোহন বাবুর বাড়ীতে কথা উঠিয়াছিল। তখন তথায় হরমোহন বাবু, ডাক্তার নিতাই হালদার ও ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত ছিলেন। সেদিন লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "বক্তৃতায় যে কাজ হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয় সৎগ্রন্থপাঠে। কারণ, বক্তৃতায় বক্তার সহিত শ্রোতার ক্ষণিক সঙ্গ হয়, কিন্তু গ্রন্থে লেখকের সহিত পাঠকের সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। সদ্‌গ্রন্থপাঠ করিলে সাধুসঙ্গের ফল হয়, একথা তিনি সকলকেই বলিতেন।" সুরেশ বাবু নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন, তাই লাটু মহারাজের কথিত ভাষা হইতে উহা বিভিন্ন হইয়াছে।

বলরাম মন্দিরে তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইখানেই সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। কারণ পুস্তকের

মধ্যে একই প্রসঙ্গের বর্ণনা নানা স্থানে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।— "এখন ত দেখতে পাচ্ছি, বস্তুলাভ না কোরেই তোমরা লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যাচ্ছ। বাকী সে ধর্ম্ম নেবে কে? বই পড়ে কি ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝা যায়? ধর্ম্ম হচ্ছে উপলব্ধির ব্যেপার। আগে বস্তু উপলব্ধি করো, তারপর তাঁর যদি হুকুম পাও, তবে প্রচার করতে নেবো। বিনা চাপরাসে প্রচার করলে লোকে সে কথা মানবে কেনো? তিনি একটা গল্প বলতেন— 'ওদেশে হালদারপুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে করে রাখতো। যারা সকালবেলা আসতো তারা খুব গালাগালি দিতো। বাকী যে বাহ্যে করতো সে তাদের গালাগালিকে গ্রাহ্য করতো না, আবার পরদিন সেখানে রাতের বেলা বাহ্যে করে যেতো। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটি চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসীর লুটিশে সেখানকার বাহ্যে বন্ধ হোলো।' ··· তিনি (ঠাকুর) আরো কি বলতেন জানো— 'প্রচার! ওতো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। তাঁর প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি কোরে জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তাঁর প্রকাশ যখন মানুষের মধ্যে নামে তখন সে লোক তাঁকে প্রচার করবার শক্তি পায়। তোমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ হোলে তুমি যাকে যা বলবে, সে কথা সে লোক মানবেই মানবে।' "

কাশীতেও ঠিক এইভাবেরই কথা জনৈক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। — "আগে নিজের চরিত্র গড়ে তোলো। লোকে তোমার চরিত্র দেখে তোমার কাছে আসুক, তখন প্রচার করতে নেমো। এখন তোমার কথা কে শুনতে চাইছে? তুমি ত গায়ে পড়ে তোমার কথা অপরকে শুনাতে যাচ্ছ। এখন তারা বুঝছে তোমার গরজ। তাই তোমার কথা

দিবে না। বাকী যখন তারা বুঝবে যে, তোমার কোন গরজ নেই, তাদের গরজে তোমার এতো কথা বলা, তখন তুমি যা' বলবে তারা তা' মেনে নিবে। তোমার কথার কোন অন্যথা করবে না। তখন তোমার প্রচারে তাদের উপকার হোবে। তিনি বলতেন— 'পিদ্দীম জ্বাললে বাদুলে পোকা আপনি আসে, ডাকতে হয় না; অমুক সময় লিকচার হবে বলে খবর পাঠাতে হয় না। শক্তি পেলে মানুষের এমনি টান হয় যে, লোক তার কাছে আপনি আসে। চুম্বক কি লোহাকে বলে তুমি আমার কাছে এসো। ও কথা বলতে হয় না। পাথরের টানে লোহা আপনি ছুটে আসে। তেমনি আর কি।' "

প্রায় একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় মাস হরমোহন বাবুর বাড়ীতে রাত্রি-যাপন করিয়া সহসা একদিন লাটু মহারাজ ভক্তপালক ৺রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপস্থিত হন। সেথানে গিয়া দেখেন যে, মা (অর্থাৎ রাম বাবুর পরিবার) কঠিন মরণাপন্ন রোগে পীড়িত। মাসখানেক কি মাসদেড়েক তিনি সেইখানে ছিলেন। রাম বাবুর মধ্যমা কন্যা বলেন—"লাটু দাদা বাবার মৃত্যুর সময় যেমন সেবা করেছিলেন, মায়ের মৃত্যুর সময়ও তেমনি করেছিলেন। তিনি ত কালী দাদার (স্বামী যোগবিনোদের) সঙ্গে রাত জেগে মার সেবা করতেন, আমাদের কাউকে বেশী রাত জাগতে দেখলে বলতেন— 'ঘুমাওগে যাও, রাত জেগে শেষে অসুখে পড়বে।' ··· মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাদের বাড়ীতে আসা খুব কমিয়ে দিলেন। আর আমরাও পাঁচজনে পাঁচ জায়গায় চলে গেলুম।··· মায়ের মৃত্যুর পর লাটু দাদা পোষা ময়না পাখীটা উড়িয়ে দিলেন।" এই ময়না পাখীটিকে ঘিরিয়া একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। তাহা রাম বাবুর জীবিতকালের ব্যাপার। একসময়ে ঐ পাখীটি উড়িয়া যায়। লাটু মহারাজ তাহা জানিতেন না। একদিন

কাঁশারীপাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, বারাণ্ডা হইতে পাখীটি ডাকিয়া উঠিল— 'লাটু দাদা, লাটু দাদা।' পাখীটির চীৎকারে লাটু মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, রাম বাবুর বাড়ী হইতে পাখীটি এখানে উড়িয়া আসিয়াছে। তাই তিনি গৃহস্বামীর নিকট আসিয়া পাখীটি দাবী করিলেন; কিন্তু গৃহস্বামী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি রাম বাবুকে সেই কথা জানাইলেন। রাম বাবু স্বয়ং উক্ত গৃহস্বামীর নিকট হইতে পাঁচ টাকায় পাখীটি ক্রয় করিয়া লইলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ লাটু মহারাজ বলরাম মন্দিরে ফিরিলেন। সেখানে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকিয়া পুনরায় ননী বাবুর সহিত (ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের ভাগ্নে) তিনি পুরীতে ঝুলন দেখিতে গেলেন। সেবার পুরীতে একমাস ছিলেন।

এই বৎসর শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার পর তিনি পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হন। সে-যাত্রায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন নিবারণ দত্ত, নন্দলাল ব্রহ্মচারী, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পটল বাবু) এবং রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পটল বাবু ও রাজকুমার বাবু সমস্ত খরচ-খরচা দিয়াছিলেন। সে-যাত্রায় তাঁহারা কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পথে জনৈক ব্রহ্মচারীকে অযথা ক্রোধ করিতে দেখিয়া তিনি উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"দেখো! ব্রহ্মচারী হোয়ে রাগ দেখান উচিত নয়। কাম ক্রোধ লোভকে দমন করবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য নিতে হয়, বাকী তুমি কি করছো? ব্রহ্মচারী হোয়ে শাপাশাপি করছো? এ ত ভাল নয়! শাপাশাপি কোরে কারুর অকল্যাণ আনতে নেই। যে লোকের কল্যাণ চায় না, ধর্ম্মপথে তার উন্নতি হয় না।" (নন্দলাল ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত)।

উক্ত বর্ষের শেষাশেষি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তিনি সেই যে বলরাম মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল সেইস্থানে বাস করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশীতীর্থে যাত্রা করিলেন। এই নয় বৎসরের মধ্যে তিনি বার তিনেক শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিয়াছিলেন। একবার অনিদ্রারোগে মাস ছয়েক ভুগিয়াছিলেন। সে সময় গিরিশ বাবুর গল্পই তাঁহার অনিদ্রারোগের ঔষধ হইত। তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছেন — "চার-পাঁচ দিন ঘুম না হোলে হাম্‌নে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে গল্প শুনতে যেতুম। গল্প শুনতে শুনতে হামার ঘুম এসে যেতো। হামাকে ঘুম পাড়িয়ে গিরিশ বাবু বেড়াতে যেতেন।" (১৯০৪)।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অল্পবিস্তর বাতব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে প্রত্যহ দুই-তিনটি করিয়া পাতিলেবুর রস খাইতেন। বাতের জন্য উচ্ছেসিদ্ধও খাইতেন। গুরুভাইগণ তাঁহার এই খাওয়া দেখিয়া মশ্‌করা করিয়া বলিতেন— 'কি সাধু! আজ উচ্ছে-ফুটফুটি খাওয়া হয়েছে ত?' জনৈক ভক্ত ত বাঙ্গলার প্রবাদবাক্যটি প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতেন— 'উচ্ছে খেলে চোখটি যাবে দেখতে পাবে না।' জানি না এইজন্য তাঁহার চোখে ছানি পড়িয়াছিল কি না।

১৯০৯ ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চোখের ছানি একে একে কাটান হইয়াছিল। সেই সময় রাখাল মহারাজ তাঁহার যথাযথ তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হইতে প্রকাশ নামে একজন কম্পোজিটার তাঁহার সেবক হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় লাটু মহারাজের চা, ছোলা-সিদ্ধ, আলুপোড়া, উচ্ছে-ফুটফুটি প্রভৃতি খাদ্যগুলি প্রস্তুত করিয়া দিত। শেষে এই কাজের ভার পশুপতি

নামে একজন যুবকের উপর পড়িয়াছিল। সেই সেবকটি কাশীতে লাটু মহারাজের অক্লান্ত সেবা করিত।

পরবর্ত্তী অধ্যায় 'বলরাম মন্দিরে' আমরা লাটু মহারাজের প্রসঙ্গগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি।

বলরাম মন্দিরে

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজ কি ভাবে থাকিতেন, গরীবের বন্ধু কে? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কি? ক্ষমাসম্বন্ধে লাটু মহারাজের কথা, তিনি কি স্ত্রীলোক-বিদ্বেষী ছিলেন? গৃহী ও সন্ন্যাসীর পার্থক্য, রাজকুমার বাবুর সহিত কথোপকথন, ঠাকুর-স্বামীজীর কথা, স্ব স্ব ধর্ম্মে নিষ্ঠার কথা, নিরঞ্জন মহারাজ সম্বন্ধে কথা, পরের উপকার করা মানে নিজের উপকার করা, দুইটি মেয়ের সহিত কথোপকথন, মায়া ও কার্য্যকারণ-প্রসঙ্গ, পাপপুণ্য মায়া ও ভেদবুদ্ধি, সত্য-সম্বন্ধীয় কথা, নিজেকে নিজে ধমক দেওয়া প্রসঙ্গ, বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত অদ্ভুত আচরণ, অদোষদর্শী লাটু মহারাজের কয়েকটি আচরণ, জীব ব্রহ্মকে ধরে কেমন করে? আত্মা জ্ঞানের বিষয় কিনা, রহস্যপ্রিয় লাটু মহারাজ, ডাক্তারদের ব্যবসায়ে উন্নতি হউক— এইরূপ আশীর্ব্বাদ করতে পারবো না, কালী মহারাজের ঠাট্টা করা, রামদয়াল চক্রবর্তীর সহিত লাটু মহারাজের কথা, খেয়াল উঠতেও যেমন মিটতেও তেমন, বুড়োগোপাল দাদার সম্বন্ধে প্রসঙ্গ, শশী মহারাজ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ, গিরিশ বাবুর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ, কয়েকটি ভক্তকে উপদেশদান, বলরাম মন্দির ত্যাগ ও কাশীগমনের সঙ্কল্প

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ প্রায় নয় বৎসর একাদিক্রমে বলরাম মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। এই নয় বৎসর তিনি কিভাবে সেইখানে থাকিতেন, বিহারী বাবু তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। "শাস্ত্রে বলে, জ্ঞানী বিজন বাস করিবে, কিন্তু হিমালয় কি কলিকাতা— নিজের মনের মধ্যে। হিমালয় যাইয়া কলিকাতার স্বপ্ন লইয়া থাকিলে সে হিমালয়বাস নহে, সে কলিকাতাতেই বাস। কাশীতে দেহ রহিয়াছে, কিন্তু মন রহিয়াছে কলিকাতায় ছেলেপুলের উপর—সে কাশীবাস নহে, কলিকাতাবাস। লাটু মহারাজ এই জনপূর্ণ কলিকাতা মহানগরীতে থাকিয়া বিজন বাস করিতেন। একাকী গঙ্গায় কাশী মিত্রের ঘাটের উত্তরে গোঘাটায়, কি বিডন গার্ডেনের বেঞ্চির উপর, কি 'বসুমতী' প্রেসের কেসের উপর বসিয়া ধ্যানে দিনরাত্রি কাটান— বিজন বাস ছাড়া আর কি? এইরূপ কত বৎসর

তাঁহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ! কলিকাতায় থাকিবার অর্থ গুরু-স্থান দক্ষিণেশ্বর হইতে পঞ্চকোশীর মধ্যে থাকা। কেন যে তিনি কলিকাতা শহরকে গুরুস্থানের পঞ্চকোশী বলিতেন তাহা কাশীর একটি প্রসঙ্গে জানিতে পারা যায়। তিনি অনেক ব্যক্তিকে বলিয়াছেন— 'সেইখানে (দক্ষিণেশ্বরে) মা-কালী রয়েছেন, বিষ্ণু রয়েছেন, দ্বাদশ শিব রয়েছেন, মা-গঙ্গা রয়েছেন। তিনি (ঠাকুর) নিজে সেখানে কতো দিন তপস্যা করলেন, কত সাধু মহাত্মা সেখানে এসেছেন, কতো ভক্ত সেখানে সাধন করেছেন ! এমন স্থানকে তীর্থস্থান ছাড়া আর কি বলবে ?' যিনি এইরূপ দৃষ্টি লইয়া দক্ষিণেশ্বরকে দেখিতেন তিনি যে তার পঞ্চকোশীর মধ্যে তীর্থবাসীর মত নিয়ত জপধ্যান, সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ লইয়া দিনযাপন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"

বলরাম মন্দিরে বাস করিবার সময়ও তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই একাকী থাকিতেন। কেবল সকাল ও সন্ধ্যার পর ভক্তসঙ্গে নানাবিধ আলাপ ও আলোচনা করিতেন। আলাপ ও আলোচনার সময় লাটু মহারাজকে প্রায়ই আলাদা মানুষ বলিয়া বোধ হইত। সে সময় তিনি অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিতেন— একবার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি অপরকে কথা বলিবার আর সুযোগ দিতেন না। কিন্তু যেদিন তিনি কথা বলিতে চাহিতেন না, সেদিন অপরে হাজার প্রশ্ন করিলেও তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। সেই সময় তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বলিতেন যে, লাটু মহারাজ বড় dull and grave অর্থাৎ অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির সাধু। কিন্তু অপর সময় যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লাটু মহারাজের মতন প্রাণখোলা দরদী সাধু বিরল। আপনভাবে বিভোর থাকিলে লাটু মহারাজ গম্ভীর হইতেন সন্দেহ নাই,

কিন্তু যে কেহ সেই গাম্ভীর্য্যের বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতেন, তিনি লাটু মহারাজের অন্তরের প্রীতি ও করুণায় অভিস্নাত হইবার সুযোগ পাইতেন।

বলরাম মন্দিরে নন্দলাল ব্রহ্মচারী একদিন তাঁহাকে বলিলেন— 'মহারাজ! আপনার মত মহাত্মা লোকের ঐরূপ সঙ্গ করা উচিত নয়।' এই কথা শুনিবামাত্র লাটু মহারাজ তাহাকে বলিলেন— 'কোন্ শালা মহাত্মা হয়েছে? তুশালারা সব হামার কাছে এসে খোসামুদি জুড়েছিস্। হাম্‌নে মহাত্মা না বনা। তুশালারা মহাত্মা কাকে বলে জানিস?' ব্রহ্মচারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'জানি মহারাজ! যে গরীবের বন্ধু, সেই মহাত্মা।' লাটু মহারাজ বলিলেন— 'গরীবের বন্ধু কোন্ শালা হোতে পারে? ভগবান ছাড়া গরীবের আর কোন বন্ধু নেই। একমাত্র তিনিই ত জীবের দুঃখু বুঝেন, আউর কে বুঝে!' ব্রহ্মচারী বলিলেন 'সাধু সন্ন্যাসী আর ভগবানের ভক্ত— এনারাও জীবের দুঃখু বুঝেন, মহারাজ! এই যেমন স্বামীজী, পরমহংসদেব, যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, এমন কি আপনিও জীবের দুঃখু বুঝেন।'

লাটু মহারাজ উত্তরে বলিলেন— 'দুর্ শালা! হামাকে কেবল তোরা খোসামুদি করছিস্।'

এইরূপ একপালা বকুনীর পর সেইদিন লাটু মহারাজের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বাহির হইয়াছিল— "যে নিজে গরীব সেই ত গরীবকে ভালবাসতে পারে। যে নিজেকে বড়লোক ভাবে, সে কি কখনো গরীবের দুঃখু বুঝতে পারে? নিজে দুঃখুভোগ না করলে পরের দুঃখু বোঝা যায় না। তাই ত বিবেকানন্দভাই হরিভাইকে বলেছিলো— 'দেখ্! সন্ন্যাস নিয়ে আর কিছু না হোক প্রাণটা বেড়ে গেছে।'" সেদিন লাটু মহারাজ আরো বলিয়াছিলেন, "বড়লোক হোয়েও যার দানের

ইচ্ছা জেগেছে, তার প্রাণটা ত গরীবানার দুঃখু বুঝেছে। তাই ত সে নিজের টাকাপয়সা অপরের জন্য খরচ করতে পারছে। এ সংসারে ভগবান ঐশ্বর্য্য দিয়ে জীবকে পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষের পরীক্ষায় পার আছে, ফাঁকি আছে; বাকী ভগবানের পরীক্ষা ভারী কঠোর। সেখানে পাশ করা বড়লোকের পক্ষে বড় শক্ত। এই দেখো না— ভগবান কাউকে টাকা দিলেন, বাকী মায়া দিয়ে এমনি তাকে ভুলিয়ে রাখলেন যে, সারা-জীবনে তার দান করবার ইচ্ছা আর জাগলো না। আবার কাউকে দান করবার খুব ইচ্ছা দিলেন, বাকী তেমন টাকা দিলেন না। যেখানে দেখবে যে ভগবান টাকাও দিয়েছেন আবার তার দানের ইচ্ছাও দিয়েছেন, সেখানে জানবে যে তাঁর দয়া আছে। ... জানো তো, টাকা-পয়সা থাক্‌লেই মনের অহঙ্কার বাড়ে। যার যত অহঙ্কার, সে তত ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, আর যার মন যত ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, সে তত বড় গরীব। টাকা-পয়সার ঐশ্বর্য্য নিয়ে জীবের গরীবানার মাপ কোরো না, জীবের গরীবানার মাপ হচ্ছে ভগবানকে নিয়ে। যে যত ভগবানের দিকে চেয়ে থাকে সে তত ধনী, তত সুখী; আর যে যত ভগবানকে ভুলে থাকে, সে তত গরীব, তত দুঃখী।"

এই কথা শুনিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট গ্রন্থকার তাঁহাকে বলিলেন— 'মহারাজ! ভগবানকে নিয়ে আপ্‌নি ত বেশ সুখদুঃখের কথা বলে গেলেন। কিন্তু আমরা যে প্রত্যেক দিন দেখতে পাচ্ছি, টাকা-পয়সা নিয়েই গৃহীর সুখদুঃখের খেলা চলেছে। আমরা ত দেখছি, যে সংসারে টাকা নেই, সেই সংসারীর জীবনে সুখ বলুন, স্বস্তি বলুন, কিছুই নেই, আছে মাত্র দুঃখের বোঝা, বেঁচে মরে থাকা। আর যে সংসারে টাকা আছে, তার ধর্ম্ম আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, এমন কি ইহকাল পরকাল দুই-ই আছে।'

ইহার উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখো ! টাকা-পয়সা থাকলেই যদি ধর্ম্ম হোতো, সুখ হোতো, শান্তি হোতো, তাহলে কলকাতায় যতো বড়লোক আছে, তারা আগে সুখী হোতো, ধার্ম্মিক হোতো, আর কুছু না হোক জীবনে শান্তিলাভ করতো। বাকী তাদের অশান্তি গরীবের ঘরের চেয়ে বেশী কি কম, তুমিই বলো ? জানবে টাকা-পয়সায় ঘরবাড়ী, দাসদাসী, জমিনজরু এসব হয়, বাকী সুখ শান্তি আউর ধর্ম্ম হয় না। এ তিনই হচ্ছে অন্তরের ব্যেপার। সেখানকার (অর্থাৎ অন্তরের) অভাব না ঘোচাতে পারলে কেউ সুখী হোতে পারে না। ভগবানকে না পেলে অন্তরের অভাব ঘুচে না। তাই ত ভগবানের সঙ্গে সুঃখদুঃখের যোগাযোগ মানতেই হয়— প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও একটা যোগ যে আছে তাতে কোন সংশয় রেখো না।"

আর একদিনের কথা। জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে বলিলেন— "মহারাজ ! আপনি ভিক্ষাশিক্ষা করে যাহা পান, তাহা ত আমাদের পিছনেই খরচ করে ফেলেন। আপনার দরকার মত কিছুই রাখেন না। আমরা কোথায় সাধু-সন্ন্যাসীকে কিছু দেবো, তা নয়, আমরা আপনারই খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের জন্য ভিক্ষা মেগে আমাদের কেন প্রত্যবায়ের ভাগী করছেন ?"

লাটু মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তোমার কি ইচ্ছা শুনি ?'

তাহাতে ভক্তটি বলিয়াছিলেন— 'আপনি আর ভিক্ষা করবেন না, এই আমাদের ইচ্ছা।'

লাটু মহারাজ— সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করতে হয়, একথা ত জানো। তবে কেনো হামাকে এমন কথা বলছো ?

ভক্তটি— অনেক দুঃখে, মহারাজ ! আপনাকে একথা বলছি।

লাটু মহারাজ— কেনো, তোমাদের কি দুঃখু ?

ভক্তটি— আমাদের দুঃখু, মহারাজ? (এই কথা বলিয়া ভক্তটির চোখে জল আসিয়াছিল। পরক্ষণেই বলিলেন) আমাদের জন্য ভিক্ষা করতে গিয়ে আপনি কটু কথা শুনে আসবেন, এ আমরা সহ্য করতে পারি না।

লাটু মহারাজ— কেনো? কি হয়েছে? কে হামাকে কটু কথা বলেছে?

ভক্তটি— কাল কোথায় ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, মহারাজ? আমাদের জন্য কাল ত আপনাকে এত কথা শুনতে হোলো।

লাটু মহারাজ— এসব কথা তোমায় বললে কে?

ভক্তটি— কালকের ব্যাপারটি সব —মহারাজের নিকট শুনেছি।— দোকানী আপনাকে কত গালাগালি দিলে! আমাদের জন্যই ত আপনাকে সে গালাগাল মাথা পেতে নিতে হলো। আমরা কয়েক জনে ঠিক করেছি যে, আপনাকে ভিক্ষা করতে দেবো না— যা কিছু প্রয়োজন আমরা নিজেরা চাঁদা করে তুলে দেবো।

লাটু মহারাজ— সেটা কি ভিক্ষা হবে না?

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া ভক্তটি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়াও তিনি মোটেই ক্ষুণ্ণ হইলেন না, বরং বলিলেন— "দেখো! সন্ন্যাসীর একটি ধর্ম্ম আছে— সে ধর্ম্মও কি তাঁকে পালন করতে দেবে না? কারুর অভিমানে আঘাত লাগবে বলে সন্ন্যাসী তাঁর ধর্ম্ম ছেড়ে দেবে, এ তোমার কেমন কথা?"

ভক্তটি— সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কি শুধু ভিক্ষে করা, মহারাজ?

লাটু মহারাজ— না। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ভগবানে নির্ভর করা আউর তাঁর ভক্তদের পালন করা। গুরু ও ভক্তের জন্যে ভিক্ষা করতে সাধুর কষ্ট বোধ হয় না।

ভক্তটি— মহারাজ ! গালাগালি খেয়েও সন্ন্যাসীকে ভক্তপালন করতে হবে ? আপনার একথার কোন মানে বুঝতে পারি না ।

লাটু মহারাজ— তিনি বল্‌তেন, 'ভিক্ষা করতে গেলে কেউ গালা-গালি দেবে, কেউ বা পয়সা দেবে, সব নিবি।'

ভক্ত— মহারাজ ! আপনাকে কত কি বললে, তবু আপনি তারই কাছে হাত পেতে ভিক্ষা নিলেন। কি বলে নিলেন, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— বললুম, ভাই ! তুমি যা বললে সব ঠিক। হামাদের না আছে জটাজুট, না চিম্‌টে, না ছাইমাথা, না রুদ্রাক্ষের মালা। হাম্‌নে না পারি অসুখ ভালো করতে, না পারি হাত দেখতে, না পারি মাদুলী দিতে। বাকী হামাদের কেউ ত কখনো কারুর অকল্যাণ মাগে নি; সকলেই সুখে থাকুক এই ত হামাদের কামনা। আরো বললুম— 'দেখো ! তোমাদের ভরসায় হামাদের কেউ ভিক্ষায় বেরয় না। গুরুদেবের ইচ্ছা হোলে হামাদের ভিক্ষা মিলবে। তাঁর ইচ্ছা না হোলে তোমাদের দিল্‌ খুলবে কেনো ? তোমরা ত দেনেওয়ালা নও। দানের মালিক তিনি।' হামার এই কথা শুনে দোকানদারের হাত খুলে গেলো।

ভক্তটি (উত্তেজিতভাবে)— ও আর জানতে চাই না, মহারাজ ! আমাদের অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। আমরা আপনার ভক্ত, আমাদের সেবা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ।

লাটু মহারাজ— দেখো ! সন্ন্যাসীকে এমন অনুরোধ করতে নেই। শাস্ত্রের বিধানে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করতে হয়; সে বিধান হাম্‌নে মেনে চলবে ।.

ভক্তটি (উত্তেজিতভাবে)— আর ভক্তের বিধানে সন্ন্যাসীকে সেবা করতে হয়, সে বিধান মেনে আমরাও চলবো।

এসব কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'আরে! বলো তো এসব কথা কে তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে?'

ভক্তটি— আপনারই একজন গুরুভাই, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— ওঃ! তাই তোমাদের এতো জেদ! আচ্ছা! তারই কথা থাকবে। তোমাদের টাকা হাম্‌নে গ্রহণ করবে। রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়, জানো? মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষে করতে হয়। তাই সে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমার থ্রু দিয়ে। তার কথা রাখবো বইকি।

ইহার পর হইতে যদিও লাটু মহারাজ ভক্তগণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেন কিন্তু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও লইতেন না। প্রায়ই তিনি বলিতেন— "আস্‌লি সাধুর জামার পকেট থাকে না।" ইহার অর্থ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন— "আরে! জামার পকেট থাকলেই কুছু না কুছু সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি জাগে, আর কুছু না হোক দু-চার কুচি সুপারীও পকেটে থেকে যায়। সন্ন্যাসীকে তাও রাখতে নেই।"

সন্ন্যাসজীবনে দানগ্রহণরূপ ব্যাপারে তিনি কিরূপ বিচারশীল ছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন। "একদিন এণ্টেলীর জনৈক ভক্তের নিকট তিনি ভিক্ষা করিতে যান। কিন্তু সেদিন লাটু মহারাজ তাহার হাত হইতে ভিক্ষা লইতে দ্বিধা করিলেন। তাহার এই ব্যবহারে পটল বাবুর কৌতূহল জাগিতে থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মহারাজ, ভিক্ষা করতে এসে টাকা ফেরৎ দিলেন কেন?'

লাটু মহারাজ— আরে! ও এখন নেশার ঝোঁকে আছে। ও রকম অবস্থায় থাকলে কারুর দান নিতে নেই।

—কেন, মহারাজ? —আরে! এখন নেশার ঝোঁকে দিয়ে দিলে, পরে নেশা ছুটে গেলে বলবে, শালা হামায় ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন কথা যেখানে উঠতে পারে, সেখানে কোন দান নিতে নেই।

পটল বাবু—মহারাজ! আপনি এত ভেবেচিন্তে তবে অপরের কাছ থেকে টাকা নেন?

—কি জানো? শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান করে তার টাকা নিতে পারি, বাকী বেগারঠেলা দান সন্ন্যাসীকে নিতে নেই। অশ্রদ্ধার দান যে নেয় আর দেয়, উভয়েরই অকল্যাণ হয়।

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলিতেছি। একদিন গ্রন্থকার নিজে লাটু মহারাজের চরণতলে কয়েকটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। লাটু মহারাজ তাহাতে বলিলেন—"দেখো! হামার এখন টাকার দরকার নেই, এ টাকা এখন তোমার কাছে রাখো, তোমার দরকারে লাগবে। তুমি নিয়ে যাও।" গ্রন্থকার বার বার বলিলেন—"না মহারাজ! ও টাকা আর নেবো না।" লাটু মহারাজ তাহাতে বলিলেন—"দেখো! দু-চার দিনের মধ্যেই তোমার টাকার দরকার হবে, নিয়ে যাও।" আশ্চর্য্য! তিন দিনের মধ্যে গ্রন্থকার এমন একটি ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িলেন যাহাতে সেই টাকাগুলি তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

আর একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। ইহাতে তাঁহার ক্ষমা ও আশ্রিত-ভক্তপালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশীতে একদিন লাটু মহারাজের গৃহ হইতে (গৃহনির্ম্মাণ উপলক্ষে সংগৃহীত) আশ্রমের পাঁচ শত টাকা চুরি যায়। কে যে টাকা লইয়াছিল তাহা লাটু মহারাজ জানিতেন, কিন্তু তত্রাচ তাহাকে কিছু বলিলেন না। কলিকাতা হইতে জনৈক ভক্ত এই সংবাদ শুনিয়া কাশীতে গমন করেন। তিনি (গৃহভক্তটি) চোরকে

পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্ম লাটু মহারাজকে বলিতে থাকেন। তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখো! সে বেচারী লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করেছে সত্য, বাকী যাকে আশ্রয় দিয়েছি তাকে পুলিশে দেওয়া কি ভাল দেখায়?" (পটল বাবু-কথিত)

আর একটি ক্ষমার প্রসঙ্গ বলিতেছি। ইহা বলরাম মন্দিরের ঘটনা। এক মাতাল একদিন লাটু মহারাজের নিকট আসিয়া জনৈক ভক্তকে খুব গালাগালি দিতে থাকে। তাহাতে ভক্তটির সাঙ্গোপাঙ্গ উত্তেজিত হইয়া মাতালটিকে মারিতে উদ্যত হয়। তাহা দেখিয়া লাটু মহারাজ ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছো! কার শাস্তি হওয়া উচিত বলো তো। ওকে আর তোমরা কি মারবে, মদই ওকে মেরে রেখেছে, ওর বিবেকের নাশ করে দিয়েছে। দু' এক ঘা মারলেই কি মারা হোলো? আসল মারে ও তো মরে আছে! আবার কি মারবে?" (পটল বাবু-কথিত)

সন্ন্যাসের কি পরে কি পূর্ব্বে সব সময়েই লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকের সঙ্গ যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন। বলরাম মন্দিরে কোন স্ত্রীভক্তের সহিত তিনি আলাপ করিতেও চাহিতেন না। কাশীতে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। একদিন জনৈকা স্ত্রীভক্ত (শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা) বলরাম মন্দিরে আসিয়া লাটু মহারাজের নিকট হইতে ঠাকুরের কথা শুনিবার আগ্রহ দেখান। তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! বাড়ীর ভিতরে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তোমরা ঠাকুরের কথা শুনো গে।" এই কথায় স্ত্রীভক্তটি দুঃখিত মনে বলিলেন— "আপনার মুখ থেকে ঠাকুরের কথা শোনবার আগ্রহ হয়েছে; আপনি কিছু বলুন।" লাটু মহারাজ

তাহাকে পুনরায় বলেন—"মায়ের কাছে যাও। মা তোমার ইচ্ছে পূরণ করবেন।" তাহা শুনিয়াও সেই স্ত্রীভক্তটি ভক্তসঙ্গ হইতে উঠিতে চাহিলেন না। তখন লাটু মহারাজ খুব গম্ভীরভাবে পুনশ্চ তাহাকে মায়ের কাছে যাইতে বলিলেন। তিন তিন বার বলা সত্ত্বেও সেই স্ত্রীভক্তটি সেইখানে বসিয়া রহিল। তখন লাটু মহারাজ তাহাকে বলিলেন— "তুমি কেমন ভক্ত গো, তিন তিন বার তোমাকে মায়ের কাছে যেতে বলছি, তুমি উঠ্‌ছো না কেনো? যাও, মায়ের কাছে যাও।" তখন সেই স্ত্রীভক্তটি ক্ষুণ্ণমনে বলিয়া উঠিলেন—"ঠাকুরের কথা শুনবার জন্য শরৎ মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনি কিন্তু কিছু বললেন না। আমি কি এতই অধম!" লাটু মহারাজ কি বুঝিলেন জানি না। পরক্ষণেই সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"শরোট হামার কাছে কেনো পাঠালে? হাম্‌নে রাজাকে (অর্থাৎ রাখাল মহারাজের নিকট) জানাবো। রাজার হুকুম হোলে তোমায় ঠাকুরের কথা শুনাবো। বাকী তার হুকুম না পেলে হাম্‌নে কোন কথা বলবে না।"

পার্শ্বোপবিষ্ট গ্রন্থকারকে ডাকিয়া—"চলো! এখন রাখালের কাছে যাই, ও বসে থাক।" রাখাল মহারাজের কাছে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"একি লাটু ভাই! তুমি যে আজ না ডাকতেই এলে।" অন্যদিন ত ডেকেও সারা পাই না।"

লাটু মহারাজ— এই দেখো না! অমুক ঘরে গিয়ে দিক্ করছে, বললুম, যাও মায়ের কাছে, বাকী উঠ্‌লো না, তাই হাম্‌নে তোমার কাছে চলে এলুম। এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি রাখাল মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া রাখাল মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওখানে লাটুর ঘরে গিয়াছিলে কেন? শরৎ বুঝি

পাঠিয়েছিলো। শরতের কথায় ওকে এমনভাবে বিরক্ত কোরো না। ওতে তোমারই অকল্যাণ হবে।” সেই অবধি সেই স্ত্রীভক্তটি বলরাম মন্দিরে আর লাটু মহারাজের নিকট আসিতেন না। এই ঘটনার পর ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ লাটু মহারাজকে স্ত্রী-বিদ্বেষী বলিতেন! কিন্তু তিনি স্ত্রী-বিদ্বেষী ছিলেন না, যদিও স্ত্রীলোকের সঙ্গ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি লাটু মহারাজের অসীম করুণা ছিল। দু'চারটি ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার বাগবাজারে তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলেন— “আপুনারা মা বসুমতীর মতই সহ্য কোরে থাকেন— ভগবান আপুনাদের ভিতর এমন একটা অসাধারণ গুণ দিয়েছেন। আপুনারা না থাকলে সংসারের অভাব অভিযোগে পুরুষেরা পাগল হয়ে যেতো। আপুনারাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।” (গ্রন্থকারের সমক্ষে চাটুজ্জেগিন্নীকে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন)

বলরাম মন্দিরে তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— “দেখো, মেইয়া মানুষের গায়ে হাত তুলতে নেই, তারা যে কত সহে যায় তা' তোমরা বুঝতে পারো না। তার ওপোর যদি তাদের মারধর অত্যাচার করতে থাকো, তাহলে তারা যায় কোথায় বল তো! তারা দেবীর অংশ। দেবীকে সন্তুষ্ট না রাখলে ভগবান প্রসন্ন হন না। তাদের সন্তোষেই তোমাদের কল্যাণ। তাদের চোখের জলে তোমাদের অকল্যাণ হয়। এই দেখো না, সীতার চোখের জলে রাবণের সর্ব্বনাশ হোলো।”

পটল বাবুকে পথে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন— “দেখো! মেইয়া মানুষকে তোমরা যত দুব্‌লা ভাবো, মেইয়া মানুষ তত দুব্‌লা নয়। ওরা মহামায়ার অংশ, ওদের মায়ার সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে কেনো? ঐ দেখো না, একটা খেংরাকাঠির মত মেইয়া মানুষ কেমন তিন তিনটে

পালোয়ানকে নড়তে দিচ্ছে না।" (সামনেই পানের দোকানে তিনটা পালোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল। তাদের দেখাইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন)।

স্ত্রীলোক যে মায়াবিনী, সেই দিকটিও লাটু মহারাজ বিশদ করিয়া ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "সাধু সাবধান! কামিনীর মোহ বড় ভয়ানক বন্ধনের কারণ। এতে ভুললে ভগবানের পথে যাওয়া যায় না, সংসারে আটকে পড়তে হয়। ··· যেখানে মেয়েদের ব্যেপার সেইখানেই গণ্ডগোল। ··· মেয়েদের মধ্যে ছ ছটা রিপু কিল্‌কিল্ করে খেলে বেড়ায়। জীব তাই দেখে মুগ্ধ হয়। সাবধান, ওরা একবার মায়া ফেললে আর কারুর রক্ষে নেই। ওদের মায়ায় জীব ঢলে পড়ে। ··· বেশ্যারা সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে, আর কেউ কাছ দিয়ে গেলে তার উপর মায়া চেলে দিতে চেষ্টা করে। তাদের বদ-মায়া ইন্দ্রিয়গুলোকে চঞ্চল কোরে দেয়।··· তাদের মোহিনী-শক্তি আছে, তাই পুরুষকে মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। দেখো, মদ খেলে তবে নেশা হয়, রাকী মেইয়া মানুষ দেখলে নেশা হয়। তাই ওদের পানে দেখতেও নেই।"

সংসারী গৃহস্থের চেয়েও সাধু সন্ন্যাসিগণকে লাটু মহারাজ স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিতে বলিতেন। জনৈক সন্ন্যাসীকে ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিতে দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো, তিনি বলেতন— স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে অনেক বড় বড় সাধুর পতন হয়েছে। ওরা প্রথম প্রথম ভক্তি আউর ধর্ম্মভাব দেখিয়ে শেষে সাধুর সর্ব্বনাশ করে। ··· সাধু সাত সমুদ্দুর পার হোয়ে, শেষে গোষ্পদে ডুবে মরে। ··· ভক্তিমতী স্ত্রীলোক হোলেও তার সঙ্গে বেশী মেশামেশি করতে নেই।" প্রায়ই ঠাকুরের কথা তুলিয়া বলিতেন— "দেখো! সাপ দেখলে লোকে বলে থাকে— মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রাখো আর ল্যেজটি দেখাও, তেমনি

যুবতী পরস্ত্রী দেখলেই 'মা' বলে নমস্কার করবে আর তাদের মুখের দিকে না চেয়ে, পায়ের দিকে চাইবে ; তা'হলে আর মায়ায় মুগ্ধ হবার ভয় থাকবে না। জানো তো, লক্ষ্মণজী সীতাদেবীর মুখ দেখতেন না, পা দেখতেন।"

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার এই কটি উপদেশ মূল্যবান। সাধারণতঃ তাঁহাকে যাহারা স্ত্রীবিদ্বেষী বলিয়া থাকেন, মনে হয়, তাহারা অত্যুক্তি করেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব তাঁহার না থাকিলেও তিনি ভক্তগণকে স্ত্রীলোক হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে বলিতেন।

একদিন এই প্রসঙ্গ লইয়া জনৈক ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন— "মহারাজ! আপনি ত সকলকে স্ত্রীলোকের সঙ্গ করতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমাদের মত গৃহীর উপায় কি? সংসারে স্ত্রীলোক না হোলে যে চলে না।" তাহার উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "সংসারীর ধর্ম্ম আর সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম দুটো এক করছো কেনো? সংসারীদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ করায় দোষ নেই। বাকী সন্ন্যাসীর নিয়ম আরো কঠোর। তিনি বলতেন— 'সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনীকাঞ্চন যেমন সুন্দরীর পক্ষে গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য্য'··· সন্ন্যাসীর পক্ষে মেইয়া মানুষ যেন কাল সাপ। ওদের ছোবলে বহু সন্ন্যাসীর পতন হয়েছে।"

ভক্তটি— মহারাজ আপনার কথা শুনলে আমাদের গায়ে জ্বর আসে। বিবাহ করে সংসার পেতেছি বলে কি আমাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নেই। আমরা একেবারে পতিত হয়ে গেছি?

লাটু মহারাজ— তা' কেনো? তোমরা গৃহী। গৃহস্থধর্ম্ম পালন করে যাও তাহলেই তোমাদের কল্যাণ হবে। তোমাদেরকে ত তিনি বিস্তার সংসার করতে বলেছেন। সেই কথা মতো চলো না, দেখবে মেইয়া মানুষের সঙ্গে থেকেও তোমাদের বস্তুলাভ হবে।

জনৈক ভক্ত— বিদ্যার সংসার কি, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— আরে ! যে সংসারে মেয়ে ছেলে বুড়ো সবাই ভগবান-লাভের চেষ্টা করে সেই সংসার বিদ্যার সংসার। তিনি বলতেন— সংসারে বিদ্যা আর অবিদ্যা-স্ত্রী দুইই আছে। বিদ্যা-স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যা-স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। বিদ্যা-স্ত্রী আশ্রয় করো, দেখবে তোমাদের জ্ঞান ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য সব একে একে আসছে।

— চিন্‌বো কেমন করে, মহারাজ ! কে বিদ্যা-স্ত্রী আর কে অবিদ্যা-স্ত্রী ?

লাটু মহারাজ— আরে ! যে স্ত্রী বিদ্যাশক্তি তার কাম ক্রোধ এসব কম, ঘুম কম, সে স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা এসব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্যভাবে। আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয়, তার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে প্রার্থনা করে। সে বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীকে বেশী খাট্‌তে হয়। বিদ্যা-স্ত্রী হলেই দেখবে স্বামীর আহ্নিক-পূজার বন্দোবস্ত সে ঠিক করে দিচ্ছে, বাড়ীতে দেবদ্বিজের সেবা লাগাচ্ছে, আউর গোপনে স্বামীর কল্যাণের জন্য দান করছে।

জনৈক ভক্ত— এমন স্ত্রীভাগ্য ক'জনেরই বা হয়, মহারাজ !

লাটু মহারাজ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন— "যার কর্ম্মের জোর থাকে, সে-ই এমন স্ত্রী লাভ করে। বাকী যার কর্ম্ম নেই, তাকে ত ভুগতেই হবে। তারই ভাগ্যে অবিদ্যা-স্ত্রী জুটে যায়।"

জনৈক ভক্ত— মহারাজ ! অবিদ্যা-স্ত্রীর হাত এড়ান যায় কি উপায়ে ?

লাটু মহারাজ— তার হাত এড়াবার উপায় হচ্ছে ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা জানানো— হে ভগবান ! হামাদের সুমতি দিন, হামরা যেন তোমার অবিদ্যা-মায়ায় মুগ্ধ না হই। (এই কথাগুলি ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট শ্রুত)।

কাশীতে তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! তোমার স্ত্রী সতীসাধ্বী। বাকী তুমি এমন নচ্ছার যে, সেই সতীসাধ্বীকে অপমান করে এখানে এসেছো। আজই এখান থেকে চিঠি লিখে দাও। দেখো তো সে বেচারী খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কতো ভাবছে! তাদের এমন কোরে ভাবিত করতে নেই। বলেই ত আসতে পারতে, সে ত তোমায় রুখতো না।" লাটু মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই এই কথাগুলি শুনিয়া ভক্তটি বুঝিতে পারেন যে, লাটু মহারাজ অন্তর্য্যামী,— না বলিলেও সব জানিতে পারেন।

একদিন আহিরীটোলা নিবাসী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লাটু মহারাজকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহারাজ! আমাদের মতন সংসার-কীটের কি উদ্ধারের কোন আশা নেই? চিরদিনই কি এই সংসারকূপে পরে আমাদের হাবুডুবু খেতে হবে? আপনারা একটু কৃপা করুণ যাতে আমরা উদ্ধার হয়ে যাই।"

এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! মানুষ মানুষকে কৃপা করতে পারে না। কৃপা করবার মালিক দু'জন— এক গুরু সচ্চিদানন্দ আর গুরুর গুরু সচ্চিদানন্দ। তোমার ত সদ্‌গুরু মিলে গেছে, তবে আবার এতো ভাবছো কেনো? বাসা যখন পাকড়েছো তখন সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাহাতে রাজকুমার বাবু বলিলেন— "সময়ে হবে সে বিশ্বাস ত আছে, কিন্তু এ জীবনে হবে কিনা সেইখানেই যে সন্দেহ।"

— ওসব সন্দেহ আনতে নেই। সন্দেহ আউর সংশয় এলেই বিশ্বাস টলে যাবে।

রাজকুমার বাবু— সন্দেহ কি অমনি হয়েছে মহারাজ! গুরুবাক্য,

তাহাও পালন করতে পারছি নি, এমন অধম হয়ে পড়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবনটাই বৃথা গেল ; এ খোলে আর কিছু হবে না।

লাটু মহারাজ— ঘাবড়াচ্ছো কেনো ? এ জীবনের উদ্দেশ্য কি সব বুঝে ফেলছো ? ভগবানের দরবারে কোন জীবনই বৃথা যায় না, জানবে। শশীভাই বেশ বলতো। তোমার মত একজন তাকে এই কথা বলেছিলো। অমনি শশীভাই তাকে বুঝালে— দেখো মানুষ চলতে চলতে সামনে একটি খাল দেখলে। খালটা পেরুতে না পারলে সামনে এগুনো যাবে না বুঝে, লাফিয়ে পার হবে বলে লোকটা পিছু হঠে এলো। যতটা পথ হঠে এলো, ততটা আবার দৌড়ে গিয়ে লাফ মারলে, একদম খাল পার হয়ে গেলো। এখন বলো ত পিছু হঠে আসা তার দরকার হয়েছিল কিনা ? হয়েছিল ত ? তেমনি একটা জীবনে হয়তো মানুষকে পিছু হঠে যাবার খেলা খেলতে হবে ; বাকী পরের জীবনে তাকে দৌড় দিতে হবে। তাই কোন জীবনই বৃথা যায় না। শুধু মনে রেখো— ভগবানকে সামনে রেখে চলতে হবে। তিনি যখন যেমন দরকার তেমনি চালাবেন। তিনি ত জীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব জানেন ; তাই তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া সব চেয়ে ভালো।

এইরূপভাবে লাটু মহারাজ তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে সাহস দিতেন, উৎসাহ দিতেন, এমন কি, ভরসাও দিতেন। তাঁহার কথাই ছিল— "তুমি ধর আর না ধর, ভগবান তোমায় ধরে থাকবেনই। কখনো ছাড়্‌বে না ; তাঁর এতো দয়া !" তিনি এত বড় আশাবাদী সাধু। কাহাকেও কখনো তিনি নিরুৎসাহ করিতেন না। তিনি সকলকেই বলিতেন— "ভগবানকে দেখো নি বলে যদি তাঁকে ধর্‌তে না পার তবে যাদের দেখেছো, তেমন ভগবানের ভক্তদের ধরো। ভক্ত মহাপুরুষকে ধরলেই ভগবানকে ধরা হোলো।

ঠাকুর-স্বামীজীকে দেখেছো, তাঁদেরই আদর্শ সামনে রেখে চলো, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

এই কথা শুনিয়া বিহারী বাবু একদিন বলিয়াছিলেন— "ঠাকুর-স্বামীজী কি সকলকার আদর্শ হোতে পারে, মহারাজ ?"

তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "তিনি ত সকলারই আদর্শ। তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ গুরু, আদর্শ শিষ্য। সব মতের, সব পথেরই আদর্শ। তিনি শাক্তের আদর্শ— তন্ত্রশাস্ত্রে যত আছে, সব সাধন করেছিলেন আর সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ— অমন হরিভক্তি দেখতে পাওয়া যায় না; তিনি হরির দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি শৈবের আদর্শ— কেনো না, তিনি শিবের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তিনি রামভক্তের আদর্শ— কেনো না, তিনি রামসীতার দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি বেদান্ত সাধকের আদর্শ— কেনো না, তিনি বেদান্ত-সাধনার চরম (ফল) নির্ব্বিকল্প সমাধি তিন দিনে লাভ করেছিলেন। আবার তিনি খৃশ্চান মুসলমানেরও আদর্শ— কেন না, তিনি ঋষি ক্রুশ্চের (যীশুখ্রীষ্টের) আর মহম্মদের দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি সকলার আদর্শ, কারণ সকল মতের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।"

বলরাম মন্দিরে ও কাশীতে যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি এইভাবে ঠাকুরের মাহাত্ম্য সকলের নিকট প্রচার করিতেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ঠাকুরকে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ জ্ঞান করিয়াও তিনি কখনও সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামী দেখাইতেন না। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার উদার দৃষ্টি ছিল, এমন কি, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি এক্স্‌মাসের দিন যীশুখ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে পাউরুটি মাংস নিবেদন করিতেন, গুডফ্রাইডের দিন তিনি স্বহস্তে

যীশুখ্রীষ্টের ছবিতে মালা দিতেন। মুসলমানদের ঈদ্ মহরম পর্ব্বোপলক্ষে তিনি পীরের দরগায় পূজা পাঠাইতেন। মহম্মদের জন্মদিনে তিনি পয়গম্বরের উদ্দেশ্যে আপন হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। আমরা তাঁহাকে ভারতের তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত পর্ব্বদিনগুলিতেও পূজা পাঠাইতে দেখিয়াছি এবং সেই স্থানের প্রসাদ আনীত হইলে সকলের সহিত আনন্দে ভোজন করিতেও দেখিয়াছি। তিনি যে স্বহস্তে শিবপূজা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং দেওয়ালীতে লক্ষ্মীপ্রতিমা আনাইয়া তাঁহার পূজা করাইতে দেখিয়াছি। যেকোন ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেন, সেখানেই তিনি অন্ততঃ কিছু না কিছু বিগ্রহসেবার জন্য প্রণামী দিয়া আসিতেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি ঐরূপ উদার শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি আপনার ইষ্ট ও গুরু ঠাকুর পরমহংসদেবকে লইয়া জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।

গয়াতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইয়া যাইবার পর একদিন জনৈক ভক্ত বলরাম মন্দিরে তাঁহাকে বলিলেন— "মহারাজ! মুসলমানদের গোঁড়ামীর জন্য এত নরহত্যা হয়ে গেল।"

এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "গোঁড়ামী কেনো বলছো? ধর্ম্মে যেটা করতে বলেছে সেটা পালন করলে তাকে গোঁড়ামী বলে না— তাকে নিষ্ঠা বলে। ওরা ত নিজের ধর্ম্মে নিষ্ঠা রেখেছে। তিনি বলতেন— নিজের ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখবে বাকী পরের ধর্ম্মকে নিন্দা করবে না।"

ভক্তটি— ওরা ত আমাদের ধর্ম্মে আঘাত দেবার জন্যই আমাদের পল্লীতে বকরী ঈদ্ করতে চায়।

লাটু মহারাজ— আরে! কে কার ধর্ম্মে আঘাত দিতে পারে? ধর্ম্ম কি বাহিরের ব্যেপার যে, মানুষ ইচ্ছা করলেই অপরের ধর্ম্মে আঘাত দেবে? তোমরা ধর্ম্মকে বাহিরের (আনুষ্ঠানিক) ব্যাপার বলে ভাবো, তাইতো এতো গণ্ডগোল হয়।

ভক্তটি— মহারাজ! ধর্ম্ম যদি বাহিরের ব্যাপার না হয়, তাহলে যাগযজ্ঞ পূজাপার্ব্বণ বার ব্রত এসব কি? এসবই ত আনুষ্ঠানিক। এতে যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলেও কি আপনি বলবেন যে, ওরা আমাদের ধর্ম্মে আঘাত দিতে চায় না?

লাটু মহারাজ—দেখো! যতক্ষণ ধর্ম্মকে বাহিরের ব্যেপার বলে ভাববে ততক্ষণ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটবে না। এটা ঠিক জেনো যে, এখন তোমরা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভুলে ধর্ম্মের ছোবড়া নিয়ে মারামারি করছো। সেটাও ভালো, কেনো না এই থেকেই ত তেজ আউর নিষ্ঠা দুই-ই আসবে। এখন ত দেখছি সব ধর্ম্মেই তেজের অভাব ঘটেছে। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া লাটু মহারাজ পুনরায় বলিয়া গেলেন— "দেখো! মুসলমানদের ধর্ম্মের উপর একটা টান আছে— সেই টানে তারা সব কাজ ফেলে নেমাজ পড়তে যায়। একসঙ্গে কতো লোক নেমাজ পড়ে, দেখেছে তো! বাকী তোমাদের সমাজে এমন কোন ব্যেবস্থা আছে কি? মহাপ্রভু কেমন সুন্দর ব্যেবস্থা করে গেলেন, সকাল সন্ধ্যে সবাই মিলে হরিনাম করবে, বাকী কটা লোকই বা সে ব্যেবস্থা মেনে চললো। ওদের দেখো, সাত বছর না হোতে হোতে ছেলেদের সব নেমাজ পড়াতে থাকে। বাকী তোমাদের মধ্যে সেরূপ উপাসনার ব্যেবস্থা কই? এক ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে ত ছেলেবয়সে উপাসনা শিখানো হয় না। ওদের দেখো, ছেলে নেই, বুড়ো নেই, সবাই মিলে এক সাথে উপাসনা করছে, বাকী তোমাদের মধ্যে তেমন একজোটের উপাসনা কুথায়? তোমরা ধর্ম্মকে বুড়োবয়সের ব্যেপার মনে করো, বাকী তা নয়। বুড়োবয়সে ধর্ম্ম হওয়া ভারী কঠিন। কেনো না, বেশী বয়স হলে মন ছড়িয়ে পড়ে, তখন উপাসনার মধ্যে নানা ভাবনা চিন্তা এসে জোটে। ছেলেবয়সে মন নরম থাকে, সরল থাকে, তখন উপাসনার জোর

কতো! এই দেখো না, ধ্রুব পাঁচ বছরের ছেলে, ভগবানকে দেখলে। এখন ত পাঁচ বছরের ছেলেদের 'রাম' বলতেও শিখানো হয় না। সমাজের মধ্যে কত অজ্ঞান (অজ্ঞানতা) এসেছে, দেখছো তো!"

যিনি হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গাকে উপলক্ষ করিয়া এমন উদার অসাম্প্রদায়িক মত দিতে পারেন, তিনি যে জনৈক খ্রীষ্টান ভক্তকে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্যে ডুবিয়া থাকিতে বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মৈত্র মহাশয় কাশীস্থ সোনারপুরার বাড়ীর একটি ঘটনা যেভাবে লিখিয়াছেন তাহাই আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।— "একদিন সন্ধ্যাকালে ডাক্তার ডি মেলো (যিনি মায়াবতীতে থাকিতেন) তাঁহার সহিত কাশীতে দেখা করিতে আসিলেন। তখন লাটু মহারাজ নিজের খেয়ালে বলিতেছিলেন— 'আরে! নিরাকার ত তিনি আছেনই, বাকী সাকারও আছেন।' লাটু মহারাজের নিকট আসিবার পূর্ব্বে ডাক্তার ডি মেলোর মনে ঠিক ঐ সমস্যাই উঠিয়াছিল। তাই লাটু মহারাজকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ভগবান যখন সাকার আছেন, তখন তাঁকে নিশ্চয় দেখা যায়।' লাটু মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— 'হ্যাঁ! দেখা যায় বৈ কি? হামি কি মিছে কথা বলছে? তিনি বলে গেছেন— মানুষকে যেমন দেখা যায়, তেমনি ভগবানকে দেখা যায়; তাঁর সঙ্গে কথা ভি কওয়া যায়।' বিভূতি বাবু লিখিয়াছেন— 'সে কথার কি জোর! না শুনিলে বোঝা যায় না।'

কথায় কথায় ধ্যান-ধারণার কথা আসিয়া পড়িল। তখন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহারাজ! আমি যখন মায়াবতীতে ছিলেম, সেখানে যীশুখ্রীষ্টের ছবি সামনে রেখে ধ্যান করতেম। একদিন দেখি সেই ছবি নড়ছে, দেখলেম যেন জ্যান্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি চলে গেল, ঠাকুরের মূর্ত্তি এল, সে মূর্ত্তি চলে গেল, বুদ্ধমূর্ত্তি দেখলেম। সে মূর্ত্তিও চলে গেল, স্বামীজীর

মূর্ত্তি এলো ; আবার সে মূর্ত্তি চলে গেল, এক মূর্ত্তি দেখলেম— দাঁড়ি আছে, কিন্তু বুঝতে পারলেম না, কে। এসব মনের ভুল না আর কিছু ?”

সব শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন— “ভুল কেনো হবে ? এমন হোয়ে থাকে। ঠিক হচ্ছে, লেগে থাকুন, ছাড়বেন না। যার একজন মহাপুরুষ-দর্শন হয়, তার বহুৎ মহাপুরুষ-দর্শন হোতে পারে। তিনি (ঠাকুর) ত সাধনসময়ে বহু মহাপুরুষ, ঋষি, দেবতা সব দেখতেন।” তাহাতে ডি মেলো বলিলেন— “মহারাজ ! সময় সময় বড় মুশকিল হয় ; কাকে ধ্যান করবো বুঝতে পারি না।” ইহাতে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন— “কাকে তুমি ভালোবাসো ?” উত্তরে ডি মেলো বলিলেন— ‘যীশু ও ঠাকুর দুই মূর্ত্তিকেই আমি ভালবাসি।’ লাটু মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘বরাবর কাকে ভালবেসে এসেছো ?’ এই কথা শুনিয়া ডি মেলো তাহার বংশের কথা কিছু বলিতে লাগিলেন। তিন-চার পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা যে ক্রীশ্চান হইয়াছেন তাহাও জানাইয়া দিলেন। সব শুনিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন— ‘দেখো ! যীশুকেই ধরে থেকো, বিশ্বাস করে তাঁকেই উপাসনা কোরো, তাতেই তোমার সব হবে।’ লাটু মহারাজের মুখে এমন উদার কথা শুনিয়া ডি মেলো অকপটভাবে তাঁহাকে অনেক কথা বলিয়া গেলেন।

আরো একটি ঘটনা হইতে আমরা লাটু মহারাজের অসাম্প্রদায়িকতার কথা জানিতে পারি। বলরাম মন্দিরে একদিন দুইজন মেম (অনেকে বলেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বে এথিষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে ঈশ্বরবিশ্বাসী হন) আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু পরোপকারে বিশ্বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরোপকারব্রতের কথা শুনিয়া তাঁহারা বলরাম মন্দিরে আসিয়াছিলেন। তখন বলরাম মন্দিরেই মিশনের অধিবেশনাদি হইত। সেদিন গ্রন্থকার উভয়ের মধ্যে ‘ইণ্টারপ্রিটারের’ কার্য্য

করিয়াছিলেন। মেম দুটির মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরোপকারই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে আপনাদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু আপনারা পরোপকারের চেয়ে ভগবানকে বড় করেন, আমরা তা পছন্দ করি না। আমাদের ধারণা ভগবান অদৃশ্য—আছেন কি নাই তার কোন প্রমাণ নেই। এমন একটি অজ্ঞেয় পদার্থে বিশ্বাস রেখে পরোপকার করতে কেন যে আপনারা বলেন, তার কোন মানে বুঝি না।"

এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—"দেখুন! ভগবানকে বাদ দিয়ে যে লোক পরের উপকার করতে যায়, সে বেশীদিন পরের উপকার করতে পারে না। দু'চার বছরের মধ্যেই তার মনে প্রশ্ন উঠে, পরের উপকার করায় তার কি লাভ। আর এই প্রশ্ন মনে উঠলেই পরের উপকার করতে বেজার লাগে। কেনো না পরের উপকার করতে গেলেই কর্ম্মীকে কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করতেই হয়; আউর ভগবানকে না মানলে পরের জন্য ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি আসতে পারে না, জানবেন।"

এই কথা শুনিয়া মেম দুটি হাসিয়া উঠিলেন। ছোটটি ত বলিয়া উঠিলেন—'That's no argument' অর্থাৎ ইহা আদৌ যুক্তি নয়।

গ্রন্থকার যে মুহূর্ত্তে লাটু মহারাজকে শুনাইলেন যে, মেম দুটি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না, অমনি তিনি নিজেই প্রশ্নকর্ত্তা হইয়া মেম দুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বলুন ত, আপুনারা কেনো পরের উপকার করতে চান?"

ছোট মেমটি—পরের কল্যাণ হবে বলে করি।

লাটু মহারাজ—বলতে পারেন, পরের কল্যাণ কোরে হামার লাভ কি? হামি পরের জন্যে কেনো খাট্‌বে? হামার স্বার্থ কুথায়?

বড় মেমটি— যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজের প্রতি আমাদে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্য পালন করাই আমাদের ধর্ম্ম। সমাজের মধ্যে থেকে পরস্পরের দুঃখকষ্ট লাঘব করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

লাটু মহারাজ— আপুনারা যা বল্‌ছেন তার চেয়েও বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা। ভগবানলাভই হচ্ছে জীবের একমাত্র মহান্ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে চেষ্টা করে সেই ত বাহাদুর। পরের উপকার করা, এ ত সমাজ-ব্যেপারের কথা। এথানে ভগবান-লাভের ব্যেপার কৈ? আবার দেখুন, পরের উপকার যে করবেন, তাতে পরেরই লাভ হবে, নিজের লাভ কুথায়? আপুনার কল্যাণ হোলে হামার মঙ্গল হবে, এমন যুক্তি কেমন কোরে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন?

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া মেম দুটি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তথন তিনি নিজেই বলিয়া চলিলেন—"তাহলেই দেখুন! আপুনাদের যুক্তির মধ্যে একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। এইরকম সব যুক্তিতেই একটা না একটা ফাঁকি থেকে যায়, যদি না ভগবানকে মানেন। ভগবানকে মানলেই আর আপন-পর ভেদ থাকে না, তথন পরও যে আপন—এ বিশ্বাস এসে যায়। বাহিরে পরের সঙ্গে হামার ভেদ থাকলেও ভিতরে হামি আর পর দু'জনেই যে এক সচ্চিদানন্দ তা মেনে নিতে কষ্ট হয় না। তাই সেথানে কেউ কারুর উপকার করে না, যে যার সে তার উপকার করছে, দেথতে পায়। হামাদের কথা কি জানেন?— হামরা যে পরের উপকার করতে চাই, তার আস্‌লি কারণ হচ্ছে যে, হামার সঙ্গে পরের যে বাহিরের (আপাতঃ) ভেদ আছে তা ভুলবার জন্য। হামাদের কাছে পরের উপকার করা মানে নিজের উপকার করা, অন্য কারুর উপকার করা নয়। নিজের উপকার করতে কে

না চায় বলুন? তাই ভগবানকে মেনে সমাজের সেবা করলে মনে বিরক্তি আসতে পারে না।

বড় মেমটি— আপনার যুক্তির মধ্যে একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি নি, পাঁচজন কেমন করে একজনের অংশ হয়?

লাটু মহারাজ— দেখুন! এটা যুক্তি নয়, এটা সত্য। পাঁচজন যে এক সচ্চিদানন্দের অংশ এটা সত্য। কেবল নাম ও রূপে ফারাক। যেমন একই চাঁদিতে ঘট, থালি, আউর আঙ্গুটী তৈরী হয়; বাকী তৈরী হোলে তাদের ঘট, থালি, আউর আঙ্গুটী ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়; তেমনি তুমি, হামি, সে, ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে একই সচ্চিদানন্দ— একই ভগবান নামরূপে বহু হোয়ে লীলা করে যান।

বড় মেমটি— তার প্রমাণ কিছু পেয়েছেন?

লাটু মহারাজ— পেয়েছি বই কি। বাকী এ প্রমাণ ত বুঝাবার ব্যেপার নয়? এ নিজের মধ্যে আপনা আপনি বুঝে নেবার ব্যেপার। দেখুন! ভালবাসা কি কেউ অপর কাউকে বুঝাতে পারে? যে ভালবাসে সে বুঝে, আর যাকে ভালবাসে সেও বুঝতে পারে—বাহিরের লোক বুঝতে পারে কি? তেমনি ভগবানের ব্যেপার—এক ভগবান বুঝেন আর তিনি যাকে বুঝান সে-ই বুঝেন; অন্যে বুঝতে পারে না।

বড় মেমটি— Very nice argument অর্থাৎ অতি সুন্দর যুক্তি।

ছোট মেমটি— Still the question remains unsolved অর্থাৎ এতো যুক্তি দিয়েও প্রশ্নটির সমাধান হইল না, যে সমস্যা সেই সমস্যাই রইল। তাই ছোট মেমটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— "ধরুন! কেউ ভগবান মানলে না, কিন্তু পরোপকার করে গেলো, এতে তার কল্যাণ হবে ত?"

লাটু মহারাজ—দেখুন! যেকোন একটা কাজ করলেই তার কর্ম্মফলের

সৃষ্টি হতে থাকে, সেই (পরোপকারের) কর্ম্মফলে জীবের সামাজিক কল্যাণ হয়, বাকী জীবের অহঙ্কার থাকার জন্যে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় না। কেনো না, অহঙ্কারের ব্যেপারে শুভ কর্ম্মফলও বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। সকাম সেবা করে কেউ কর্ম্মচক্র হোতে রেহাই পেতে পারে না, বাকী নিষ্কাম সেবা করলে কর্ম্মের বন্ধন থাকে না—তাতে জীব মুক্তি পায়।

ছোট মেমটি— আপনাদের এই যুক্তির কোন মানে বুঝি না, এমন ত লোক এখনও দেখলুম না, যিনি নিষ্কামভাবে পরের সেবা করতে পারেন। সকলকেই ত সকামভাবে অপরের কল্যাণ করতে দেখে থাকি।

লাটু মহারাজ— পরের উপকার করতে গেলে কামনা যে একদম থাকে না, তা'ত হামরা বলি না। হামাদের কথা হচ্ছে— কামনাটাকে ভগবানের দিকে ফেলে রাখো। তাঁকে ত সকলে দেখতে পায় না, বাকী তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখলে চলবে না। বিশ্বাসই হচ্ছে ভগবান পাবার খেই। সেই বিশ্বাস বজায় রেখে তাঁর সন্তানকে ভালবাসতে হয়। এই দেখো না, কেউ একটা ভাল কাজ করলে, রাজার কানে সে খবর গেলো, রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজদর্শনের যে পুণ্য, সে ত ঐ ভাল কাজকে অবলম্বন কোরেই ঘটে গেলো। তেমনি আর কি! যে পরকে ভালবাসে সে সেই ভালবাসার সেবাকে অবলম্বন কোরেই ভগবানের কৃপা পেয়ে যায়। পরও যে ভগবানেরই সন্তান।

লাটু মহারাজের কথা শুনিয়া মেম দুটি কি যে বুঝিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু বিদায় লইবার সময় লাটু মহারাজ যখন তাঁহাদের সহিত ২৲ টাকার ভাল আম কিনিয়া দিলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতির সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোম হইতে তাঁহারা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বোঝা যায় যে, উভয়েরই মনে লাটু মহারাজের কথাগুলি দাগ ফেলিয়াছিল।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর গ্রন্থকার তাঁহাদের কথার জের টানিয়া লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "মহারাজ! ওদের ত বেশ বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু একটা কথা বড় এড়িয়ে গেলেন— ভিতরে যেখানে সব এক, বাহিরে সেখানে ভেদ কেন?"

লাটু মহারাজ— এইখানেই ত জগতের সব সমস্যা লুকিয়ে রয়েছে। এ সমস্যা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। কেন না, এখানে তোমার-হামার বুদ্ধি সব অচল হয়ে যায়। শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হোলে তবে এসব কথা বুঝা যায়। এসব সাধনার ব্যেপার। সাধনা কোরে ভগবানের দয়ায় বস্তুলাভ হোলে তবে এসব অনুভবে বুঝা যায়, বাকী বলতে পারা যায় না। এইখানেই ত ভগবানের মায়া। তাঁকে কেমন করে বলতে পারবে? বলতে গেলেই ত দুই চাই, বাকী তিনি ত দুই নন, তিনি অদ্বিতীয়। বলতে গেলেই বলার শুরু করতে হয়, বাকী তাঁর ত কোন আদি নেই, তিনি অনাদি। তেমনি বলতে গেলেই বলার শেষ করতে হয়, শেষ না করলে কোন কিছুরই মানে বোঝা যায় না, বাকী তাঁর ত কোন অন্ত নেই, তিনি যে অনন্ত। তাই ত বলতে হয়, তিনি যে কেমন কোরে বহুরূপের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে গেলেন, সে কথা তিনি না বুঝালে বুঝাবার যো নেই।

গ্রন্থকার— মহারাজ। তাঁকে যদি বহুরূপের মধ্যে ওতপ্রোতই বলেন, তাহা হইলে তাঁকেই কার্য্য, তাঁকেই কারণ দুই-ই বলতে হবে। জিজ্ঞাসা করি, কার্য্য আর কারণ কি এক হতে পারে? তার মধ্যে একটুও পার্থক্য কি নাই?

লাটু মহারাজ— "দেখো! সৃষ্টির ব্যেপারে কারণ আর কার্য্য দুই-ই আছে। তিনি (ঠাকুর) বলিতেন— 'কার্য্য কারণেরই বিকার।' বাকী

সৃষ্টির শুরুতে কি ছিলো ? সেখানে কারণ আর কার্য্য দুই এক সাথে মিশে ছিলো, তখন তাদের মধ্যে ত কোন ফারাক ছিলো না।

গ্রন্থকার— কার্য্য ও কারণের মধ্যে এই পার্থক্য তাহলে কেমন করে এলো, মহারাজ ?

লাটু মহারাজ— কেমন কোরে এলো, সে কথা বলা যায় না। বাকী এলো। কেনো যে এলো, তারও কোন জবাব নেই। শুধু বলতে পারি যে, মায়াশক্তি এই অঘটন ঘটিয়ে দিলো, কার্য্য আর কারণের মধ্যে মায়াই ফারাক করে দিলো। এই মায়া হোলো আবার তাঁরই ইচ্ছাশক্তি। তাঁরই মায়ায় জগৎ-কারণ হোয়ে গেলো— মায়াধীশ; আর জগৎকার্য্য হোলো— মায়াধীন। এদেরকেই শাস্ত্রে পুরুষ আর প্রকৃতি বলেছে। পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ কেমন জানো ?— থামা আউর চলায় যেমন ভেদ আছে তেমনি ভেদ। যে বস্তু থেমে আছে, সেই বস্তুই চলে। থামলেই পুরুষ আর চললেই প্রকৃতি। তাই প্রকৃতি আর পুরুষ আলাদা আলাদা নয়। চলছে বলে প্রকৃতির বস্তুতে ফারাক ঘটে নি, বাকী শক্তিতে ফারাক ঘটেছে। তোমরা বলবে শক্তির মধ্যে এমন ফারাকই বা ঘটলো কেনো ?— সেও মায়ার ব্যেপার। মায়ার শক্তিতেই ত দেশ আর কালের সৃষ্টি হোয়েছে। সেইখানেই ত (অর্থাৎ দেশে ও কালে) জীবের জন্ম হচ্ছে; জীব বেঁচে থাকছে আবার মরছে। সেইখানেই (অর্থাৎ দেশে ও কালে) কর্ম্মের খেলা চলছে। এই কর্ম্মকে ছাড়িয়ে যেতে না পারলে জীবের মায়ার বন্ধন কাটবে না। আবার কর্ম্মের মায়া কাটলেই যে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের মিল হয়ে যাবে তাও নয়, তখনো জীবে আর ব্রহ্মে একটা ভেদ দেখা যায়। তাকে তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ' ভেদ অর্থাৎ কিনা, আগুন আর আগুনের ফুলকির মধ্যে যে শক্তির তফাৎ থেকে

যায়, সেই তফাৎ তখনও জীবের স্বরূপে অবস্থান করে। তাই তখনো জীবের নির্মায়া মুক্তি লাভ হয় না। তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'ব্রহ্ম কার্য্যকারণের পার, বিদ্যা-অবিদ্যার পার; তিনি মায়াতীত। মায়াতীত ব্রহ্মকে অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তিনি অস্তিনাস্তির মধ্যে। তিনি একও নন, দুইও নন; তিনি এক-দুয়ের মধ্যে অদ্বিতীয়।'

গ্রন্থকার— মহারাজ! একটু সহজ করে বলুন। আমরা বুঝতে পারছি না।

লাটু মহারাজ বলিলেন, "আরে! আর বুঝে দরকার নেই, বহুত বুঝেছো। কুছু করবে না, কেবল সাধুকে বকাবে।" এই বলিয়া লাটু মহারাজ চুপ করিলেন।

কালীদাদার তখন অসুখ। লাটু মহারাজের একটি গুণ বরাবর দেখিয়াছি যে, যে-কেহ তাঁহার সহিত মেলামেশা করিত, তাহাদেরই গৃহে তিনি অযাচিতভাবে গমন করিতেন। এমন কি, অনেক সময় ভক্তগণের অসাক্ষাতেও তিনি তাহাদের বাসাবাড়ী দেখিয়া আসিতেন। কালীদাদার গৃহে গমন করিয়া লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো। হামাকে এখন মাসে মাসে টাকা না দিলেও চলবে। হামি সন্ন্যাসী মানুষ। হামাকে তুমি তিলের তেল মাখাবে, দুধ খাওয়াবে। হামার মত সাধু-সন্ন্যাসীর কি এসব ল্যাস্‌করী (luxury) করতে আছে?"

এই কথা শুনিয়া কালীদাদা বলিয়াছিলেন— "ভাই! ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমার কিছুরই অভাব নেই। তোমাদের সেবায় দু-চার টাকা লাগে, তা থেকে বঞ্চিত করলে ঠাকুর যে রাগ করবেন!" এই কথার পর লাটু মহারাজ আর কিছু বলেন নাই। যতদিন কালীদাদা বাঁচিয়াছিলেন (অর্থাৎ সন ১৩১২ আষাঢ় মাস, ইংরেজী ১৯০৫ জুন পর্য্যন্ত) ততদিন তিনি লাটু মহারাজের সেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু পাঠাইতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম মন্দিরে খবর আসিল যে, নিরঞ্জন মহারাজ হরিদ্বারে দেহরক্ষা করিয়াছেন (২৭শে বৈশাখ, ইংরেজী ৯ই মে ১৯০৫)। সেই দিন সন্ধ্যার সময় লাটু মহারাজ অনবরত নিরঞ্জন মহারাজের কথাই কহিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলিয়া দিলাম—"নিরঞ্জনভাই দক্ষিণেশ্বরে যেদিন প্রথম গিয়েছিলো, সেদিন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'ত্মাখ্! তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস্ আর একটা অপকার করিস্, তবে লোকে তোকে আর দেখতে পারবে না। বাকী ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তাহলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এতো তফাৎ, জানবি।' "

"নিরঞ্জনভাইকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে ছুঁয়ে দিলেন। তাতেই তিন দিন তিন রাত্রি তার আর চোখের পাতা পড়ে নি, কেবল জ্যোতিঃ দেখেছে আর জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছুটে যায় নি। ভারী ভূত নামাতো কিনা, তাই তিনি মস্করা করে বলেছিলেন— 'এবার আর যে-সে ভূত নামে নি। একেবারে ভগবান ভূত ঘাড়ে চেপেছে। তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাঁকে ঘাড় থেকে নামাও।' "

বলরাম মন্দিরে একদিন বিহারী বাবু লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মহারাজ! শাস্ত্রে পড়ি যে, ভগবান জীবকে চালাচ্ছেন। এমন সচ্চিদানন্দ চালক পেয়েও জীব কেন দুঃখ পায়? তাঁর মতন নিত্য-শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্তা জীবকে আশ্রয় ক'রে থাকা সত্ত্বেও জীব কেন পাপে বদ্ধ হয়?'

লাটু মহারাজ—আপুনার কুশ্চিনের জবাব (লাটু মহারাজ Question

বলিতে পারিতেন না, কুশ্চিন বলিতেন) আপুনি নিজেই ত দিয়ে দিলেন। জীবের যে সত্তা নিত্যশুদ্ধ তাতে পাপপুণ্যের আঁচড় কখনো পড়তে পারে না।

বিহারী বাবু— তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, জীবের দুটি সত্তা আছে— একটি পাপপুণ্যের দ্বারা বিদ্ধ আর একটি পাপপুণ্যের দ্বারা বিদ্ধ নয়, কিম্বা বলতে চান যে, জগতে পাপপুণ্য বলে কিছুই নাই ?

লাটু মহারাজ—দেখুন ! তিনি (ঠাকুর) বলতেন— পাপপুণ্য আছে, আবার নেই। যতদিন জীবের অহং তিনি (ভগবান) রেখে দেন, ততদিন তিনি জীবের ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, ততদিন জীবের পাপপুণ্যও রেখে দেন ! আর যখন তিনি (ভগবান) জীবের অহং মুছে দেন, তখন জীবের ভেদবুদ্ধি মুছে দেন, পাপপুণ্যও মুছে দেন। যতদিন জীবের কর্ম্ম আছে, ততদিনই পাপপুণ্য আছে ; তাঁর কৃপায় কর্ম্ম ছুটে গেলে আর পাপপুণ্য থাকতে পারে না। কেনো না— পাপপুণ্য কর্ম্মেরই ফল, আলাদা কোন ব্যেপার নয়। জীব যেমন কর্ম্ম করবে, তেমন ফল পাবে। তাঁরই ইচ্ছায় এমন নিয়ম সৃষ্টি হয়েছে। এতে জগতেরও সুবিধা হয়েছে, জীবেরও সুবিধা হয়েছে। তাঁর নিয়মে জীবের স্বাধীন ইচ্ছার (ইহাকেই লাটু মহারাজ পুরুষকার বলিতেন) জন্ম হয়েছে, আবার কর্ম্মেরও ব্যেবস্থা হোয়েছে। দু ব্যেবস্থাই রয়েছে, এখন জীব তার খুশীমত কাম বেছে নিক না। যদি এমন কাজ বেছে নেয় যাতে আনন্দের মাত্রা কম, আর দুঃখের মাত্রা বেশী, তাহলে তার জন্য জীবই দায়ী থাকবে। তিনি কেনো দায়ী হতে যাবেন ?

বিহারী বাবু— মহারাজ ! শাস্ত্রে বলছে— তিনিই জীবকে চালাচ্ছেন। তাই চালকেরই দায়িত্ব ; আমাদের আবার কি ?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! শাস্ত্র ত ঠিকই বলেছে— চালকের দায়িত্ব। বাকী বলুন ত মায়াবদ্ধ জীবের চালক কে? চালক ত মায়াই। মায়ার একটা মজা কি জানেন? সে খেলতে ভালবাসে, খেলা বন্ধ করতে ভালবাসে না। সে উঠাপড়ায় আনন্দ পায়, সুখদুঃখে আনন্দ পায়, ভাঙ্গাগড়ায় আনন্দ পায়, সে ঢেউ তুলতে ভালবাসে, বাকী ঢেউকে শান্ত করতে চায় না। আর যে জীব মায়ায় বদ্ধ নয়, তাকে চালাবার ভার ভগবান নিজে নেন। ভগবানের চালনায় একটানা সুখ, একটানা শান্তি, একটানা আনন্দ বহে যায়; সেখানে কোন ঢেউ উঠতেই পারে না; সে যে অগাধ সুমদ্দুর একেবারে শান্ত।

বিহারী বাবু— জানি মহারাজ! শাস্ত্রে ভগবানকে গভীর সমুদ্রের সঙ্গে আর মায়াকে সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তরঙ্গে আর সমুদ্রে পার্থক্য কোথায়? দুই-ই যখন জল, তখন মায়ার চালনাকে ভগবানের চালনা বলতে দোষ কি?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! একদিক দিয়ে দেখতে গেলে দুই-ই এক, বাকী আর একটা দিক আছে ত। তিনি বলতেন— 'সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়।' তেমনি ভগবানেরই মায়া, মায়া ভগবান নয়। তাই মায়ার চালনাকে ভগবানের চালনা বলতে পারেন না। বাকী এটা ঠিক জানবেন যে, মায়ার চালনার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বিহারী বাবু— কিন্তু সকলেই যে বলে মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে ভুল পথে নিয়ে যায়।

লাটু মহারাজ— সে খেলতে ভালবাসে কি না, তাই খেলা থামাতে চায় না। মায়ার খেলায় জীব পথের শেষ আর দেখতে পায় না, তাই

জীবের ধারণা হয়ে যায় যে, মায়া ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। আরে! ভুল পথে কুথায় নিয়ে যাবে? সবই ত সেই। মায়া নিজেই যে তাঁর ইচ্ছায় জেগেছে; সেও ত ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

বিহারী বাবু— মায়াও ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ করছে, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! তা না হলে সে কাজ করবে কেনো? একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ত সে কাজ শুরু করেছে।

বিহারী বাবু— শাস্ত্রে বলে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া' মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র। তার কাজ জীবকে অবিদ্যাগ্রস্ত করা।

লাটু মহারাজ—কেনো বলে বলুন ত? শাস্ত্রে মায়াকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে সবিশেষ করেছে তাই তাদের এতো কথা বলতে হয়েছে। মায়াকে যে শাস্ত্রে ভ্রান্তি বলেছে তারও একটা কারণ আছে। ভগবানই হচ্ছে আস্‌লি বস্তু, তাঁর তুলনায় মায়া নক্‌লি চিস্। আস্‌লি থেকে কম্‌তি ঘটলে তাকে কি আর আস্‌লি বলতে পারেন, নক্‌লিই বলতে হবে। মায়া সেই নক্‌লি বস্তু। তাই ভ্রান্তি বলেছে। বাকী ভগবানের তুলনায় মায়া নক্‌লি হোলেও, জীবের পক্ষে মায়া ঠিক ভ্রান্তি নয়, এমন কি, মিথ্যাও নয়। জীবের পক্ষে মায়া অবিদ্যা। না সত্য না মিথ্যা। জীবকে মায়া যে পদে পদে ভগবানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা, মায়ার কার্য্য দেখলেই বুঝতে পারবেন। মায়া একদিকে যেমন জীবকে ভোলাচ্ছে তেমনি আর একদিকে জীবের চৈতন্য এনে দিচ্ছে। একেবারে বিল্যান্স (balance) রেখে নিষ্কামভাবে কাজ করছে। দেখুন না! মায়া দু'ধারই রেখেছে, সুখ রেখেছে, দুঃখু রেখেছে, পাপ রেখেছে, পুণ্য রেখেছে। দু'ধার রাখার উদ্দেশ্য কি বলুন ত? জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই ত! মায়া যদি মানুষকে ভুল বুঝাতে চাইত তাহলে একটা দিক রাখতো, দু'ধার রাখতো

না। দু'ধার রেখেছে বলে মায়া ভুলিয়েও ভোলায় না, জান্‌বেন। তবে বড় ঘোরায়। মায়ার পথ হচ্ছে ঘোরা পথ, এতেও ভগবান মিলবে, বাকী দেরীতে। ঠকে ঠকে ভুগে ভুগে যখন মায়ার ব্যোপার বুঝতে পারবেন তখন মায়া আর আপনাকে বাধা দিতে পারবে না, তার সৎ শক্তিতে তখন আপুনি উদ্ধার হোয়ে যাবেন। এইজন্য মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে।

বিহারী বাবু—মায়ার আবার সৎ শক্তি আছে নাকি?

—আছে বই কি। তাঁর শক্তি কি কথনো অসৎ হোতে পারে, বিহারী বাবু?

বিহারী বাবু—আপনি যে ভাবে বুঝাচ্ছেন তাতে মায়াকে মহৎ বলতে হয়।

লাটু মহারাজ—হাঁ! মায়া ত মহৎ আছেই। আর মহৎই ত ভগবান! সেদিন একজন সাধু ত বেশ বুঝালেন—'জীব ভগবানকে পেয়েই রয়েছে, আবার পাবে কি? জীব ত তাঁরই লোকে বাস করছে; সালোক্য-মুক্তি তার ত মিলেই গেছে। তেমনি সারূপ্য-মুক্তিও মিলেছে, তাঁরই স্বরূপ গ্রহণ করে জীব এখানে মূর্ত্তি নিয়েছে; আবার তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই সমীপে নিত্য রয়েছে; তাই ত জীবের সামীপ্য-মুক্তিও লাভ হয়েছে। শুধু সাযুজ্য-মুক্তি পায় নি, এই যা ফারাক্।

বিহারী বাবু—তাদের কথা ছেড়ে দিন, মহারাজ! কেউ বলবেন—জীব ত মুক্তই আছে, আবার কেউ বলবেন—জগৎ ত ত্রিলোকীমে নেহি হ্যায়; অনেকেই এমন অনেক কথা বলে থাকেন। কিন্তু 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে!' তাদের কথা যাক্। এখন বলুন, সেই সুদূর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা না করে, যদি কেউ এখনই এই জীবনে ভগবান পেতে চায়, তার ব্যবস্থা মায়া করতে পারে কি?

লাটু মহারাজ—দেখুন! এসব গোলমেলে কথা, হামায় কেনো জিগ্‌গেস করছেন? হামি ত জানি, যে জীব তাঁকে চাইবে, তাঁর কৃপায় তাঁকে পাবে। তা' এখুনই চাক্, কি দশ, পনর, বিশ জনম্ বাদই চাক্। একটা না একটা জীবনে প্রাণপণ করে চাইতে হবে। তবে ভগবান মিলবে।

বিহারী বাবু—তাও স্বীকার করলুম। আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, মহারাজ! মায়াবদ্ধ জীবের অন্তস্তলে তিনি বসে থাকেন, শাস্ত্রে একথাও পাই। তার মানে কি?

লাটু মহারাজ—দেখুন! ও একটা কথার কথা। ভাষা ছুটে যায় বলে (অসম্পূর্ণতার জন্য) এমন ভাবে লিখতে হয়েছে। তিনি (ভগবান) ত সর্ব্বত্রই আছেন, তাঁর কাছে আবার ভেতর বাহির কি? তাঁর কাছে ত উঁচু-নীচু পূরব-পশ্চিম কুছু নেই। তিনি এক ওতপ্রোত্। সব ব্যেপে আছেন, বাকী কুছুতে সীমা নিচ্ছেন না; নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন না। ব্রহ্ম বলতে গেলেই এই কথা বলতে হয়, বাকী তাতেই তাঁকে পুরাপুরি বলা হোলো, বলা চলে না। তিনি যেমন সর্ব্বময়, তেমনি সর্ব্বাতীত। তিনি (ঠাকুর) একথা বলতেন। তিনি ত এমনও বলতেন—'সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বাকী ব্রহ্ম এখনো উচ্ছিষ্ট হয় নি।'

বিহারী বাবু—আপনাদের বেশ ব্যাপার। কেউ পজিটিভ (নিশ্চিত করে) কিছু বলবেন না, কেবল নেতি দিয়ে আর বিরোধ আভাস দিয়ে ব্রহ্মকে বুঝাতে চাইবেন।

এমন সময় গ্রন্থকার প্রশ্ন তুলিলেন—"আপনারা নিজে কি বুঝেছেন—সেটাই বলুন না, মহারাজ! একটা কিছু নিশ্চয়ই বুঝেছেন, তা' না হোলে এত কথাই বা বলছেন কেন?"

লাটু মহারাজ—দেখো! বুঝ্‌লেই বলা যায় না। বলতে গেলেই

ভাষা দিয়ে বলতে হয়; বাকী তাঁকে বোঝাবার মত ভাষা এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। ঠাকুর ত বলতেন—'ওরে! তোদের অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু মা যে মুখ চেপে ধরেন। কিছুতেই বলতে দেন না।' আচ্ছা! তোমরা যে এতো কথা বল্‌ছো, একবারও কি ভেবেছো এ কথাগুলো আসছে কোথা থেকে?

গ্রন্থকার—কেন? মন থেকে আসছে!

লাটু মহারাজ—আরে! মনের মধ্যে কুথায় আছে, কিভাবে আছে, আর মনই বা তখন কুথায় আছে সেটা বলতে পারো কি?

গ্রন্থকার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিহারী বাবু তার উত্তর দিলেন—"জিহ্বার সঙ্গে নার্ভের যে যোগ আছে, মন তখন সেখানে আছে।"

—কিভাবে আছে? বলতে পারেন, বিহারী বাবু?

বিহারী বাবু বলিলেন—'ভাইব্রেসানের আকারে' (অর্থাৎ কম্পনের আকারে)।

লাটু মহারাজ—আচ্ছা! সেই কাঁপুনীটা বরাবর আছে, না কুথাও থেমে গেছে?

লাটু মহারাজের এই প্রশ্নে বিহারী বাবুও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কথা ত ভেবে দেখি নি, মহারাজ!"

—ভেবে দেখে বলুন।

বিহারী বাবু—বোধ হয় থেমে যায়, পরে আবার কম্পিত হয়ে ব্রেনের নার্ভকে উত্তেজিত কোরে উত্তর এনে দেয়।

লাটু মহারাজ—যদি বলেন কম্পন থেমে যায়, তাহলে সেইখানে আবার কম্পন উঠলো কেমন করে, বলতে পারেন? তখন ত আর বাহিরের কোন কারণ নেই?

বিহারী বাবু—না মহারাজ ! আমরা সে কথা বলতে পারি না ।

লাটু মহারাজ—তবেই দেখুন, খানিকটা বলা যায়—সবটা বলা যায় না।

বিহারী বাবু গ্রন্থকারকে বলিলেন—"এর পর আর আমাদের কোন জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না ।" এই বলিয়া উভয়েই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া বিহারী বাবু বলিলেন—"এমন কথা কোন দিন শুনি নি ! এই নিরক্ষর সাধুটি এসব কথাও ভেবেছেন ! সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাই ! শিক্ষিত বলে আমাদের অভিমান আছে ; কিন্তু এনার কাছে সে অভিমানও সাজে না—শিক্ষায় ইঁনি আমাদের চেয়ে অনেক বড় ।"

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে লাটু মহারাজের কেমন খেয়াল হইল যে, জনৈক ভক্তের ঠাকুরবাড়ীতে যাইবেন। ভক্তটি ৺বৈষ্ণবদাস মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্যপূজা করিতেন। নিবারণকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন তিনি বিগ্রহ দেখিতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে ভীষণ বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া যায়। লাটু মহারাজ সেই দুর্যোগকে গ্রাহ্য না করিয়া কোমর অবধি কাপড় তুলিয়া একহাঁটু জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নিবারণের সঙ্গে সেই ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া ভিজা কাপড়েই বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। অবশেষে কাপড় ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, জনৈক ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ ! এত বৃষ্টিবাদলায় আজ না এলেই ত পারতেন ।' তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো ! তিনি বল্‌তেন— 'কলিকালে সত্যই তপস্যা। যার সত্যে আঁট্ নেই, তার ধর্ম্ম হয় না ।' একদিন রাম বাবুর বাড়ীতে তিনি বলে ফেললেন— লুচি খাবেন না। সেদিন সেখানে তিনি লুচি খেলেন না, মিষ্টি খেয়ে পেট ভরালেন।" এই দৃষ্টান্তটি শুনিয়া নিবারণ

বলিয়া উঠিল — "মহারাজ! যা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেটা পালন করলেই কি সত্যরক্ষা হোলো?"

লাটু মহারাজ— দেখো! সত্যরক্ষা বলতে অনেক কুছু বুঝায়। শুধু বাক্যরক্ষা করলেই যে সত্যরক্ষা হোলো, তা মনে কোরো না। সত্যরক্ষা মানে হচ্ছে সঙ্কল্পরক্ষা। সে-সঙ্কল্প বাক্যে হোতে পারে, চিন্তায় হোতে পারে, আবার কার্য্যে হোতে পারে।

এই কথা শুনিয়া ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন— "সঙ্কল্প বলতে কি বুঝায়, মহারাজ?"

লাটু মহারাজ— সঙ্কল্প মনের ইচ্ছা। আউর কি?

ভক্তটি— ইচ্ছা ত অনেক দিকেই যায়, মহারাজ! ভাল কাজ করতেও যায়, মন্দ কাজ করতেও যায়। মন্দ কাজ করতে ইচ্ছা গেলেও কি সেটা মেটাতে হবে? তাতেই কি সত্যরক্ষা হবে?

লাটু মহারাজ— দেখো! এখনো তোমরা নিজের নিজের ইচ্ছার কথা ঠিক ধরতে পারো নি। ইচ্ছা বলতে তোমরা এখনো খেয়ালকে বুঝে থাকো, বাকী খেয়াল ইচ্ছা নয়, ইচ্ছার বিকার। জীবের আস্‌লি ইচ্ছা কি জানো— আনন্দ পাওয়া। বাকী সচ্চিদানন্দ না মিললে ত আনন্দ পাওয়া যায় না। সচ্চিদানন্দ পাওয়ার ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা করার নাম সত্যরক্ষা। শাস্ত্রে আছে যে, এই ইচ্ছাকে সফল করবার জন্য জীব ভগবানের কাছে গর্ভবাসকালে কতো না প্রার্থনা করেছে। তারই ফলে জীবের জন্ম হয়েছে। এখন জন্ম পেয়ে সে ইচ্ছার কথা ভুলে যাচ্ছে, এই ত বড় দুঃখের বিষয়। জগতে যত শক্তি আছে তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির তেজ প্রধান, সেই শক্তি মানুষের মনে জাগলেই মানুষ কর্ম্মী হয়ে উঠে। সেই কর্ম্মকে কেউ বাধা দিতে পারে না। বাকী ইচ্ছা

বলতে যেন খেয়াল বুঝো না। খেয়াল চাপলে মানুষ কাজ করে বটে, বাকী সে কাজে সত্যের আঁট থাকে না, জানবে।

ভক্তটি— মহারাজ! ঠিক বুঝলুম না, একটু সহজ করে বলুন। আমরা দৈনন্দিন যে কাজ করি তার প্রেরণা ত মনের ইচ্ছাশক্তি থেকেই পাই, তবে কেন দৈনন্দিন কাজকর্ম্মগুলোকে খেয়ালের কোঠায় ফেলে দিচ্ছেন?

লাটু মহারাজ— দেখো! তুমি যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমার জীবনের লক্ষ্যকে পাল্টে ফেলো, তাহলে কি বলতে হয় বলো? তিনি বলতেন— 'একটা লোক পাঁচ জায়গায় কুয়ো খুড়তে লাগলো, তার ভাগ্যে কুয়োতে জল মিললো না, আর একটা লোক এক জায়গায় কুয়ো খুড়তে লাগলো— তার বরাতে পানি মিললো।' তেমনি আর কি। একটা ইচ্ছাকে নিয়ে পড়ে থাকলে তাতে জীবের বস্তুলাভ হয়, বাকী পাঁচটা খেয়ালকে নিয়ে পড়ে থাকলে বস্তুলাভ হয় না। সৎকে ধরে থাকবার ইচ্ছা জাগাও, তাহলেই সত্যরক্ষা করতে পারবে, তা না হোলে সত্যরক্ষা করতে পারবে না। সত্যই হচ্ছে ভগবানের শক্তি। সেই শক্তিতেই জীব বাস করছে। তাঁকে যে যত ধরতে পারবে, তার তত সত্যরক্ষা হয়ে যাবে। এই সত্যই হচ্ছে জীবের একমাত্র উদ্ধারের পথ।

ভক্তটি— একথা কেন বলছেন, মহারাজ? জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এতো সব পথ রয়েছে, আর বলছেন কিনা সত্যই হচ্ছে জীবের একমাত্র উদ্ধারের পথ।

লাটু মহারাজ— আরে! জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ সবই ত সত্যকে ধরবার জন্য। সত্যকে না ধরে এসব পথে চললে কোন উন্নতি হয় না, জানবে।

এইরূপ নানাবিধ প্রসঙ্গ করিয়া, সেইদিন লাটু মহারাজ সেই ঠাকুর-

বাড়ীতেই কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রসাদের আস্বাদন করিয়া ভক্তটিকে বলিলেন—"দেখছি প্রসাদে দেবদৃষ্টি পড়েছে, তা না হলে এমন সোয়াদ হয় না। এই প্রসাদে নুন নেই, লঙ্কা নেই, তবু কেমন সুন্দর সোয়াদ হয়েছে। হামাদের ত নুন-লঙ্কা-খাওয়া জিব্, বেগর নুন লঙ্কায় হামাদের কোন জিনিস ভাল লাগে না। তবু ভাল লাগছে! তাইত বলছি—তোমাদের বিগ্রহে বস্তু আছে, তাঁরই দৃষ্টিতে এমন সুন্দর সোয়াদ হয়েছে।"

লাটু মহারাজের সহিত যাঁহারা মিশিতেন তাঁহাদের মধ্যে তিন তিন জনের মৃত্যু হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তন্মধ্যে নিবারণচন্দ্র দত্ত একজন। নিবারণের সহিত লাটু মহারাজ খুব প্রাণখোলা ভাবে মিশিতেন। লাটু মহারাজ যখন আলমবাজার মঠ ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে থাকিতেন তখন একমাত্র নিবারণই মহারাজের আস্তানার সংবাদ রাখিত। অনেক সময় দেখা যাইত যে, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণও নিবারণের মারফৎ খবর পাঠাইতেছেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, তাহার গৃহে প্রতি উৎসবেই লাটু মহারাজ উপস্থিত থাকিতেন। নিবারণ প্রায়ই ঠাকুরদের গান তৈরী করে মঠের সাধুদের শুনিয়ে আসতো। ঠাকুরদের গান বাঁধতো বলে লাটু মহারাজ তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখো! ঠাকুরদের গান তৈরী করতে নেই, ওতে দারিদ্দির (দারিদ্র্য) বাড়ে।" তারপর কিছুদিন নিবারণ আর গান বাঁধে নাই। ইহাতে রাখাল মহারাজ বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন ত আমাদের সামনে তিনি (রাখাল মহারাজ) লাটু মহারাজকে বললেন—'তুমি নাকি নিবারণকে গান বাঁধতে বারণ করেছ।' ও গানের ভেতর দিয়ে ঠাকুরের নাম প্রচার করছে, তাতে নিষেধ করা কেনো? রাখাল মহারাজের এই কথা শুনিয়া

লাটু মহারাজ নিবারণকে বলিয়াছিলেন— তুমি রাখালকে খুশী করবার জন্যে গান বাঁধতে পার।' নিবারণের মৃত্যু হয় ১৩১২ সনে ইং ১৯০৫ সেপ্টেম্বর মাসে কালীপূজার দিন।

ঐ বৎসর ১৩ জ্যৈষ্ঠ হরমোহন বাবুও মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে লাটু মহারাজ কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন— "দেখো! ঠাকুরের যত ভক্ত আছে সবারই সংসারে কুছু না কুছু উন্নতি হয়েছে, শুধু হরমোহন বাবুর জীবনটা দুঃখে কেটে গেলো। বাকী, তাঁর জীবন যেমনই কাটুক তাঁর ছেলেদের এমন দুঃখু থাকবে না, দেখে নিও।" বাস্তবিকই হরমোহন বাবুর অবস্থার চেয়েও তাঁহার ছেলেদের আর্থিক অবস্থা অধিকতর ভাল।

হরমোহন বাবুর মৃত্যুর ঠিক একমাস পরেই (১৪ই আষাঢ়) ঠাকুরের ভক্ত (লাটু মহারাজের সাহায্যদানকারী) দানাকালীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া লাটু মহারাজ গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! একদিন ঠাকুর দানাকালীকে বললেন— 'তোমার কি ইচ্ছা, বল না, শুনি।' দানাকালী কুছু চাইলে না, শুধু বললে— 'শেষের দিনে আপুনি আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন এই হোলেই যথেষ্ট।' " লাটু মহারাজ দানাকালীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না, বাবুরাম মহারাজ সেই সময় সেই স্থানে ছিলেন। বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে শুনিয়া তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন।— "দেখো! শেষের দিনে সত্যি তিনি (ঠাকুর) এসেছিলেন। তার হাত ধরে পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেছিলেন। বাবুরামভাই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো। তিনি যাকে যা বলে গেছেন, সব ঠিক ফল্‌ছে।" এর পর কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন— অত্যন্ত ব্যক্তিগত হওয়ায় এখানে তাহা সন্নিবেশিত হইল না।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ভক্ত (ভক্তটি এখনো জীবিত ... আহিরীটোলা

পল্লীতে বাস করেন) লাটু মহারাজের সমক্ষে একদিন অত্যন্ত জ্যেঠামী করিতে থাকেন। তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! সাধু সন্ন্যাসীর সামনে জ্যেঠামী করতে নেই, তাদের সামনে বিনয় দেখাতে হয়।" ভক্তটি তখন পুনরায় জ্যেঠামী করিয়া বলিলেন— 'স্বামীজী বলতেন, যে শালা মুই দাস, মুই দাস বলে মেনিমুখো হোয়ে আমার সামনে বসে থাকে, সে শালাকে আমার চাবুক মারতে ইচ্ছা যায়। আর যে শালা আমাকে ভয় করে না, আমার সঙ্গে উচ্চনীচ ভাব না রেখে অবাধে মেলামেশা করে, সে শালাকে আমার মরদ বলে আদর করতে ইচ্ছা যায়।' পুনরায় লাটু মহারাজ বলিলেন—'দেখো! এসব জ্যেঠামীর কথা ছাড়ো, তোমাদের কতো তেজ তা হামাদের জানা আছে।' ভক্তটি তখনো বলিতে লাগিলেন— 'কি বললেন মহারাজ! আমাদের তেজ নেই, আমরা হচ্ছি অমৃতের পুত্র, আমাদের বায়ু নড়াতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল ভেজাতে পারে না…' এইরূপ বড় বড় কথা বলিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ তাহাতে গম্ভীর হইয়া বললেন— 'দেখো! সব সময়ে জ্যেঠামী ভাল লাগে না।' পুনশ্চ ভক্তটি যেই একটি কথা বলিতে গেলেন, অমনি লাটু মহারাজ তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন— 'আরে! থামো, থামো।' এর পরই তিনি নিজের মধ্যে বিড়্‌বিড় করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিড়্‌বিড়িনি শুনিয়া ভক্তটি খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন— 'মহারাজ! কাকে ধম্‌কাচ্ছেন?' তখন লাটু মহারাজ বলিলেন— 'তুমি এতো বকুনি খেলে. হাসতে তোমার লজ্জা করছে না, এমন বেহায়া তুমি!'

— আপনি ত আমায় ধমক দেন নি। নিজেই নিজেকে ধমক দিচ্ছেন শুনলুম, এতে কে না হাসবে?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! লাল কাপুড় পরে ভারী সাধু বনে গেছি আর কি। একটা ছোট কথা শুনলে এখনো ভিতর থেকে ফোঁস বেরোয়, ভারী সাধু হয়েছি! লাল কাপুড় পরে কার মাথা কিনিয়েছি রে বাপ! সাধু হয়ে ধমক দিচ্ছি, বেকুবি দেখো।

ভক্তটি— তাই বুঝি নিজেই নিজেকে শাসন করছেন।

লাটু মহারাজ এই কথার কোন উত্তর দেন নাই। যতদিন তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি, বরাবর তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণ আমরাও লক্ষ করিয়াছি। এমন কি কাউকে কোন উপদেশ দিবার পরও তিনি নিজেকে নিজে বলিতেন— 'ভারী সাধু হয়েছি রে, বাপ্! পরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি।' নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া, 'আরে! তুই কি উপদেশ দিবি? ওরা তোর চেয়ে কতো বড়, কতো শিক্ষিত, ওদের কাছে তুই আবার কি বলবি?' এমনি সব নানা কথা বলিয়া তিনি নিজের মনকে অভিমানশূন্য করিতে চাহিতেন।

একদিন ঐরূপ করিতেছেন, এমন সময় গ্রন্থকার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল— 'মহারাজ! এরকম বিড়্বিড়্ করেন কেন?' —'আরে! জানো না! এমনি কোরে উল্টো পাক্ দিয়ে মনের পাক্গুলোকে সব খুলতে হয়।' এই বলিয়া নিজেই নিজের হাতে উল্টো পাক দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

গ্রন্থকার—মহারাজ! যা মনে উঠবে, তার বিপরীত ভাবনা করাই কি আত্মবিচারের পথ?

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! বিচারের এও এক পথ। মনে যে ভাব উঠবে, সেই ভাবের উল্টা (বিপরীত) ভাবকে মনে মনে চিন্তা করতে হবে। ঠিক ঠিক বিচার করতে পারলে মনের এমনি অবস্থা হয় যে,

ক্রোধের সময় ক্ষমাকে মনে পড়ে, লোভের সময় দানকে মনে পড়ে, কামের সময় ভগবানকে মনে পড়ে, হিংসার সময় অহিংসাকে মনে পড়ে। এই ভাবের বিচার কুছুদিন চালাতে পারলেই মন আপনা আপনি স্থির হয়ে আসে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া যান।

১৯০৬ (?) খ্রীষ্টাব্দে একদিন লাটু মহারাজ স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত আর্য্যমিশনের (শ্রীযুত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের) গীতাব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করিতেন। সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া লাটু মহারাজ স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিয়াছিলেন—'সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা করলে।' ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জনৈক শিষ্য এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজের হাবভাব, বেশ, ভঙ্গী দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন— cracked নাকি? লাটু মহারাজ cracked মানে কি জানিতেন না, তবু আন্দাজে ধরিয়া নিলেন। পথে আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সুধীর! cracked মানে কি রে? পাগ্‌লা না!' (এই ঘটনাটি স্বামী শুদ্ধানন্দের মুখে শুনিয়াছি)।

সত্যই সেই সময় লাটু মহারাজের হাবভাব, ভঙ্গীর মধ্যে খেয়ালী খেয়ালী ভাব দেখা গিয়াছিল। জানি না—এ কিরূপ খেয়াল। তবে ঠাকুর বলিতেন— 'ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারিটি অবস্থার কথা আছে—(১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখন কখন পাগলের মত ব্যবহার করে। কখনো জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম করতে পারে না। কর্ম্মত্যাগ হয়।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লাটু মহারাজ প্রায় আড়াই বৎসর স্তব্ধভাবে ছিলেন, তারপর কিছুদিনের জন্য বালকবৎ আচরণ দেখা গিয়াছিল। খেয়ালী বলিয়া

দুর্নাম তাঁহার আজীবন ঘুচে নাই। তবে তাঁহাকে আমরা কোনদিনই পিশাচবৎ ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

১৯০৬ কি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (ঠিক বলিতে পারি না) কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যে রামকৃষ্ণ উৎসব হইয়াছিল (তখন যোগোদ্যানের নূতন মন্দিরটি সবেমাত্র হইয়াছে) তাহাতে লাটু মহারাজ যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলরাম মন্দির হইতে পায়ে হাটিয়া পটল বাবু ও গ্রন্থকারের সহিত তথায় গিয়াছিলেন। পটল বাবু গাড়ী করিতে চাহিলে বলিয়াছিলেন— 'এই ত এতটুকু পথ, আবার গাড়ী কেনো ? তাঁর (ঠাকুরের) নাম করতে করতে চলো, এখুনই গিয়ে পৌছবে, কোন কষ্ট হবে না।' সেইখানেই সেদিন তিনি নৃত্যগোপাল অবধূতের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তিনি গ্রন্থকারকে বলিলেন— 'দেখো ! কেউ হামাদের ঠাকুরকে মানলে কি না মানলে তাতে তোমার মনে কষ্ট হয় কেনো ? একজনকে মানলেই হোলো। সাধনার শুরুতে মতভেদ আছে, বাকী একটু এগুলে আর কোন মতভেদ থাকে না।'

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার সময় গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীমা কলিকাতাস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন— "গাড়ী হইতে নামিয়া স্নেহপালিত সেবক সন্তান লাটুকে নীচের ঘরে দেখিয়া শ্রীমা যেমন বলিলেন— 'কি বাবা নাটু ! কেমন আছ ?' অমনি খেয়ালী নাটু মাকে বলিলেন— 'তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদরবাটীতে হামার সঙ্গে কেনো দেখা করতে এসেছো ! যাও, এখুনি ভিতরে যাও ; এখানে হামনে তোমার সঙ্গে কথা কইবে না। হামাকে ত ডেকে পাঠালেই

পারতেন। হাম্‌নে ত আপুনার গোলাম আছে, যাইয়া দেখা করতুম।' লাটুর কথা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন।"

যতদিন মা বলরাম মন্দিরে ছিলেন, প্রত্যহ তিনি সেবক-লাটুর জন্ত প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। একদিন তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন — "দেখো ! মা বলরাম মন্দিরে মাঝে মাঝে আসতেন। হাম্‌নে বাহিরের ঘরে থাকতুম। হামাকে হামেশা লোকে জিগ্‌গেস করতো—'মশায় ! মা উপরে রয়েছেন, আপুনি এখানে কেনো ?' তাদের বলতুম— 'তাতে কি হয়েছে ?' হামার মনের ভাব কেউ বুঝতো, কেউ বুঝতো না। কেউ কেউ আবার একথা শুনে চটে যেতো। গালাগালি করতো। হাম্‌নে ত একদিন তাদের তাড়া দিলুম— 'শালারা কেউ কুছু করবে না কেবল মা-ঠাউন, মা-ঠাউন বলে হুজুগ্‌ করবে। হাম্‌নে মানে না তোদের এমন মা-ঠাউনকে।' ভক্তটি লাটু মহারাজের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া মনে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন— 'মাকে মানা কি সহজ কথা রে ! তাঁর (ঠাকুরের) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যেপার ! মা-ঠাউন যে কি, তা একমাত্র তিনি বুঝেছিলেন, আর কঞ্চিৎ (কিঞ্চিৎ বলিতে পারিতেন না) স্বামীজী বুঝেছিলো। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যার দরকার।' (শ্রীযুত বিভূতি-ভূষণ মৈত্রের নোট অবলম্বনে লিখিত)।

বলরাম মন্দির হইতে মায়ের জয়রামবাটী গমনকালীন দৃশ্যটি বৈকুণ্ঠ বাবু বড় মধুর করিয়া লিখিয়াছেন। "তখনও নাটু এক অদ্ভুত খেয়ালে ছিল। একে একে সকলেই মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া আসিলেন কিন্তু নাটু নিজের ঘরে পাইচারী করিতে করিতে বলিতে লাগিল— 'সন্ন্যাসীকো কোহ পিতা, কোহ মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।' মা যখন সিঁড়িতে তখনো

নাটু আপন খেয়ালে উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথাগুলি বলিতে লাগিল। দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া মা যেই বলিলেন— 'বাবা নাটু! তোমার আমাকে দেখে কাজ নেই, বাবা!' অমনি নাটু তড়াং করিয়া এক লাফ মারিয়া মায়ের শ্রীচরণে আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে লাটু ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেবকের কান্না দেখিয়া মায়ের চোখেও জল আসিয়া গেল। তখন লাটু নিজের উত্তরীয় দিয়া মায়ের চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল— 'বাপঘরে যাচ্ছ, মা! কাঁদতে কি আছে? আবার শরোটু তোমায় শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আস্‌বে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি?' সেবক-লাটুর এই দরদমাখানো কথায় আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়ি।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কামপাল মিশ্র নামে একজন উড়িষ্যাদেশবাসী যুবক বি-এল্ পরীক্ষা দিবার জন্য বলরাম মন্দিরে আসিয়াছিল। বি-এতে সেই যুবকটি দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিল, তাই কথায় কথায় পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্‌সার, ক্যান্ট, হেগেল প্রভৃতির মত উত্থাপন করিয়া তর্ক তুলিত। সেই সময় একদিন ৺বলরাম বাবুর পুত্র রামকৃষ্ণের সহিত তাহার ঘোরতর তর্ক লাগিয়া যায়। উভয়েই লাটু মহারাজের নিকট তর্কের মীমাংসার জন্য আসিয়াছিল। লাটু মহারাজ দুই-একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়া দেন। সেইদিন হইতে কামপাল মিশ্র লাটু মহারাজের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

লাটু মহারাজ কলেজী পড়ুয়া বা পণ্ডিতগণকে প্রায়ই বলিতেন —"দেখুন! তত্ত্বের মীমাংসা করবার সময় তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের জীবন দেখবেন। তাহলে তত্ত্বের গূঢ় অর্থ সহজে বুঝতে পারবেন। এই দেখুন না, শঙ্করাচার্য্যের জীবন। তাঁর জীবন দেখে মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধে যা বুঝবেন,

বই পড়ে তেমন বুঝতে পারবেন না। যিনি সব মায়া বললেন, তিনিই কি না দেবদেবীর স্তোত্র লিখলেন, বিশ্বনাথের পূজা করলেন, চারধামের প্রকাশ করলেন। মায়ার সম্বন্ধে তিনি যা বুঝেছিলেন, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারেন নি, বাকী আচরণের মধ্যে তা (তত্ত্বকে) বুঝিয়ে গেছেন।" কেমন করিয়া যে নিরক্ষর সাধুটির এই ধারণা আসিয়াছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি এই কথা বারে বারে আমাদের নিকট বলিয়াছেন।

ঠিক এমনি কথা বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও বলিতেন। তিনি বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলিয়া মানিতেন না। আমাদের নিকট তিনি এমনও বলিয়াছেন, "বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক পণ্ডিত ঈশ্বর সম্বন্ধে একদিন তর্ক করতে এসেছিলো! পণ্ডিত ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেলো, বাকী বুদ্ধদেব চুপ করে রইলেন। তাতেই পণ্ডিতের ধারণা হোলো যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক আর সেই কথাটাই প্রচার করে দিলো। লোকে বুদ্ধদেবকে নাস্তিক ভাবলে, বাকী তিনি তা' নন্। ভগবান সম্বন্ধে বলা যায় না বলে তিনি চুপ করেছিলেন।"

ত্যাগের কথা উঠিলেই তিনি বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, বলিতেন, — "তোরা ত্যাগ ত্যাগ বলিস্, কি ত্যাগ করেছিস শুনি? তোদের কি আছে যে, তা ত্যাগ করেছিস বলে তোরা অহঙ্কার করিস। ত্যাগী ছিলেন বুদ্ধদেব। রাজার ছেলে, কোনো অভাব ছিল না, সত্য জানবার জন্ত সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়লো।' রাজসুখের জন্ত লোকে ব্যস্ত হয়ে আছে, বাকী বুদ্ধদেব সেই সুখ ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বুঝো ব্যেপার! সাধন করবার সময় দেবতারা (মার) তাঁকে কতো প্রলোভন দেখালে, বাকী তিনি তাতে ভুললেন না। কি বলেছিলেন জানো?— 'তপস্যা না করেই ত রাজ্য আউর রাজত্ব পেয়েছিলুম; এখন কি আবার তপস্যা করে

রাজ্য আউর রাজত্ব পেতে হবে? রাজ্য পাবার লোভে আমি তপস্তা করতে বসি নি, সত্যকে জানবার জন্ত তপস্তা করতে চাই।' তাইত বুদ্ধদেবের তুরন্ত ভগবান মিলে গেলো।··· বুদ্ধদেবের বহুৎ শক্তি ছিলো, বাকী কথনো তিনি তা প্রকাশ করলেন না। তিনি ত ইচ্ছা করলে মরা ছেলে বাঁচাতে পারতেন। একদিন একটি বুড়ী তার মরা ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিতে বললে। তাকে বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন, জানো?— 'তোমার ছেলে বেঁচে উঠ্‌বে, বাকী তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। যার বাড়ীতে কেউ মরে নি, এমন বাড়ী থেকে একমুঠো তিল নিয়ে আসতে হবে।' বুড়ী ত বহু বাড়ীতে গেলো, বাকী এমন বাড়ী পেলো না, যেথানে কোন লোক মরে নি। তথন বুদ্ধদেব তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এমন অন্তায় আবদার করতে নেই। এমনি কোরে বুদ্ধদেব লোকদের সব বুঝিয়ে দিতেন। কথনো অন্তায়ভাবে তপস্তার শক্তি প্রয়োগ করতেন না।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জনৈক অবিবাহিত ভক্তের সহসা পতনের সংবাদ শুনিয়া তিনি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠান। ভক্তটি বলরাম মন্দিরে আসিলে লাটু মহারাজ তাহাকে বলেন—"দেখো! জীবনে দু-একটা ভুল করেছো বলে (জপধ্যান ছেড়ে দিয়ে) মন্‌মরা হোয়ে বসে থাকতে নেই। ভুল ত সবাই করে! তাঁকে ডাকো, তিনি তোমায় শক্তি দেবেন, তোমার মোহ ভেঙ্গে যাবে। তিনি যে দয়াময়; যতই পাপ করো না কেনো, তাঁর দয়া তুমি পাবে। তুমি আর কতটুকু পাপ করেছো; এরই জন্ত এতো মুষ্‌ড়ে পড়ছো! ভাবো দিকিনি অজামিলের কথা, বাল্মীকির কথা, তাদের তুলনায় তোমার পাপ ত তুচ্ছ নয়। বিবেকানন্দ-ভাই কি বলতো জানো— 'তারী ত এক দোয়াত কালি ছিটে লেগেছে! অমন হাজার দোয়াত কালি তাঁর দয়ার সাগরে স্নান করলেই ধুয়ে মুছে

যাবে।' তাই বলছি—'এতো দুঃখু কোরো না।' জানো তো সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা—'দুর্মতি দূর করি, শুভমতি দাও হে।' তাঁর কাছে হরঘড়ি এই প্রার্থনা জানাবে। তোমার দুর্মতি দু'দিনে কেটে যাবে।"

ভক্তটি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছে না দেখিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন—"দেখো! পাপ করবার সময় মানুষের বিবেক মানুষকে লজ্জা দিতে থাকে, সেই লজ্জাকে তখন মানুষ গ্রাহ্য করে না। পাপ করবার পর এমনি মজা যে, সেই লজ্জাই মানুষকে গ্রাস করে, তখন অপরের সামনে মুখ তুলতেও লজ্জা বোধ হয়।" এই কথাতেও ভক্তটির লজ্জা কমিল না; তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আরে! এতো লজ্জা কাকে করছো? তুমি যা করেছো তিনি ত সবই জেনেছেন, তাঁকে লুকিয়ে ত কুছু করা যায় না। তিনি যখন জেনেছেন, তখন সে কথা নিয়ে অতো ভাবাভাবি কেনো? তার চেয়ে বরং নিজের কাজ করো, জোর্‌সে সাধনভজনে লাগো, সাধুসঙ্গ করো আর মাঝে মাঝে একটু আধটু এখানে যাওয়া-আসা রেখো!" এই সব কথা শুনিয়া ভক্তটির মনে কিঞ্চিৎ জোর আসিয়াছিল, পুনরায় সে সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

এইভাবে তিনি প্রায় সকলকেই প্রবোধ দিতেন এবং সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন।

গৃহস্থ ভক্তগণকে প্রবোধ দিবার আর একটি প্রসঙ্গ পটল বাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছি। পটল বাবুর কোন এক আত্মীয়ের গৃহে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। সেইখানে নিমন্ত্রিত হইলেও অনেকেই লাটু মহারাজকে চিনিতেন না; এমন কি গৃহস্বামীও নন্। মনে হয় গেরুয়াধারী দেখিয়া পরিবেশকগণ পংক্তি হইতে পৃথক স্থানে তাঁহার আসন করিয়া দিয়াছিলেন।

পংক্তিভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বাড়ীর গৃহিণী (যিনি লাটু মহারাজকে চিনিতেন) সেইখানে আসিয়া পড়িলেন। মহারাজের পাতে দই, মিষ্টি, সন্দেশ ইত্যাদি কিছুই পড়ে নাই দেখিয়া গৃহিণী ত অনুশোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন— 'ওমা! আমি কি মনিষ্যি গো, বাবাকে খেতে বসিয়ে দেখলুম না।' পরে অনুযোগের সুরে— 'বাবা! তাই বুঝি রাগ করে কিছু খেলেন না?' (গৃহিণী সন্ন্যাসীদের পংক্তি-ভোজন প্রথা জানিতেন না তাই এই কথা বলিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ মিষ্টান্নাদি সকলদ্রব্য পরিবেশিত হইলে, নিজ নিজ ইষ্টের নিকট তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া তবে প্রসাদ পাইয়া থাকেন) লাটু মহারাজ যত বলেন— 'না মা! আপুনি ব্যস্ত হবেন না!' বাড়ীর গৃহিণী ততই কান্নার সুরে বলেন— 'ওমা! আমার কি হবে গো! সন্ন্যাসীকে খেতে বসিয়ে দেখলুম না, মহা অপরাধ হবে যে! কি করলুম আমি, ইত্যাদি।' তখন লাটু মহারাজ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত বলিলেন— 'কেন মা কাঁদছিস্। তোর কোন অকল্যাণ হবে না।' —'না বাবা, আমার মন বুঝছে না, যাতে সংসারের কোন অমঙ্গল না হয় এর একটা ব্যবস্থা করে দাও, বাবা!' তখন লাটু মহারাজ তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্ত সেইখানে বসিয়া সেই সংসারের কল্যাণের জন্ত দু-চার মিনিট জপ করিয়াছিলেন, তবে গৃহিণীর দুশ্চিন্তা দূর হয়।

ঘটনাটি সামান্ত কিন্তু ইহাতে লাটু মহারাজের নিরভিমান হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে কতদূর অদোষদর্শী ছিলেন তাহারও যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আর একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। একবার তিনি কয়েকজন ভক্তসহ গয়াধাম হইয়া কাশীতে গমন করেন। গয়াধামের মোহন্ত মহারাজ তাঁহাকে যতদূর সম্ভব খাতির, আদর ও

আপ্যায়ন করিয়াছিলেন, এমন কি, কিছুদিন থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধও করিয়াছিলেন, কিন্তু লাটু মহারাজ তিন দিনের বেশী সেইখানে রহিলেন না। সাত-আট জন ভক্তসহ কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যে, তথায় স্থানাভাব, তখনো আশ্রমগৃহের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। সহসা এতগুলি লোককে আসিতে দেখিয়া তৎকালীন অদ্বৈত আশ্রমের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পাছে তাঁহাকে বেশী চিন্তিত হইতে হয়, এই ভাবিয়া লাটু মহারাজ নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের বলিলেন— 'এখানে এখন ত পাক্ করো, পরে যা হয় একটা ব্যেবস্থা করা যাবে।' এই বলিয়া আশ্রমের একটি উন্মুক্ত স্থানে নিজেই উদ্যোগী হইয়া পাকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সহযাত্রিগণের মধ্যে দু'তিন জনকে বাজারে পাঠাইলেন, দু'তিন জনকে স্নান করিয়া গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন এবং নিজে চা বানাইতে লাগিলেন। আর একজনকে বংশী দত্তের বাড়ীতে সংবাদ দিতে বলিলেন। বৈকালের দিকে তাঁহারা সকলে মিলিয়া বংশী দত্তের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। একটি দিনের জন্যও মঠের কোন ব্যক্তিকে বিব্রত করিলেম না।

এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া কোন কোন ভক্তের ধারণা হয় যে, কাশীর মঠাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে যথাযথ অভ্যর্থনা জানান নাই। তাহাদের একজনকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখো! সন্ন্যাসীর সাথে এসেছো, এখন ত সন্ন্যাসী সমাজের অভ্যর্থনা পাবে। তোমাদের মধ্যে যেমন চলন আছে, তেমন ত পাবে না, সন্ন্যাসীর খাতির আলাদা আর গৃহীর খাতির আলাদা। তোমাদের বাড়ীতে যদি একদিনে দশ-পনের জন এসে পড়ে, তোমরা মুশকিলে পড়ো। বাকী সাধুর কাছে দশ-পনের জন সাধু এলেও সে তত মুশকিলে পড়ে না কেন জানো! সাধু

গাছতলার লোক, ভিক্ষে করে খায়। তাই সাধুদের সব সময়ে নজর রাখতে হয়— যেখানে উঠবে সেখানে যেন কোন আশ্রমপীড়া না জন্মায়। আশ্রমের কোন অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারলেই চলে আসতে হয়। মঠে এসে সাধুকে কখনো দিক্ করতে নেই, জানো।"

কাশী হইতে ফিরিবার দু'তিন মাস পরের ঘটনা। সেদিন গ্রন্থকারও উপস্থিত ছিল। একজন ব্যক্তি লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মহারাজ! সাধক ব্রহ্মকে কেমন করে ধরে?' লাটু মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— 'আপুনি ত গান বাজনা শুনেছেন, দেখেছেন ত সেতারের তারগুলো কেমন কৌশল করে গানগুলোকে ধরে নেয়। তেমনিভাবে সাধক ভগবানকে ধরে নেয়। প্রশ্নকর্ত্তা বেশীক্ষণ সেখানে ছিলেন না, চলিয়া যাইবার পর গ্রন্থকার শুনিলেন, তিনি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত গ্রন্থকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বেলুড়ে গিয়াছিল। সেইখান হইতে ফিরিয়া রাত্রে লাটু মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ওখানে কতো প্রণামী দিলে?' গ্রন্থকার নিজে যৎসামান্য যাহা দিয়াছিল তাহা বলিল। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তোমার বন্ধুরা কতো দিলে?' বন্ধুরা কিছু দেয় নি শুনিয়া লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'তোমার বন্ধুরা সব বেয়ারিং পোষ্টে ধর্ম্ম করতে চায়, দেখছি।' গ্রন্থকার প্রথমে বুঝিতে পারে নাই বেয়ারিং পোষ্টে ধর্ম্ম কাহাকে বলে। পরে যখন মহারাজ বুঝাইয়া দিলেন যে, বেয়ারিং পোষ্ট মানে বিনা পয়সায় ধর্ম্ম করা, তখন গ্রন্থকার বলিয়াছিল— 'আপনি ত বেশ কথাটা বানিয়েছেন।' কথায় কথায় সেদিন গ্রন্থকার লাটু মহারাজকে জানাইয়া

দিল যে, বেলুড়ে প্রায় হাজার পাঁচেক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিলেন—"দেখো! এতো লোক প্রসাদ পেলে, কেউ কুছু দিলে না; কুছু না দিয়ে কি প্রসাদ পেতে আছে? এইজন্যই ত তোমাদের দুঃখু ঘুচে না। ঠাকুরদেবতাকে কুছু দর্শনী দিতে হয়, না দিলে অকল্যাণ হয়। এতো লোক খেলো, সবাই যদি একটা করে সিকি, দুয়ানী দিতো তাহলেও দু-চারশো টাকা উঠে যেতো, সে টাকা ত মঠের সন্ন্যাসীরা নিজে নিতো না, ঠাকুরের ভোগে লাগাতো, সেই ভোগ আবার তাঁরই ভক্তেরা পেতো, তাতে কতো আনন্দ হোতো। দেখো! তিনি বলতেন—'দেবস্থানে অমনি প্রসাদ পেতে নেই।' একজন চাষা একদিন দক্ষিণেশ্বরে (ঠাকুরের কাছে) এক কলকে তামাক চেয়ে খেয়েছিল। সে চলে যাবার পর সেইখানে একটি পয়সা পড়ে রয়েছে দেখে তাকে তিনি ডেকে পয়সাটা দিতে গেলেন। সে পয়সা নিলে না, বললে—'ইচ্ছা করেই পয়সাটা রেখে এসেছি। মন্দিরের কাঙ্গাল গরীবদের সেবায় লাগিয়ে দেবেন। যে মন্দিরে কাঙ্গাল গরীবের সেবা হয়, সেখানকার এক ছিলিম তামাকও অমনি খেতে নেই।' দেখো! তোমাদের দেশে এমন লোকও আছে। বৃন্দাবনে ত দেখেছি যে, হিন্দুস্থানী আর পাঞ্জাবীরা রোজ রোজ নিজেদের খোরাক থেকে দু-একখানা রুটী বাঁচিয়ে সাধুদের আস্তানায় দিয়ে আসতো। সাধুরা সেই রুটী খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভজন লাগিয়ে দিতো। স্বামীজী তাই ত দুঃখু করে একবার বলেছিলেন—'এ দেশের লোকেরা খালি সাধুদের বকাতে আসে, কিন্তু সাধু যে কি খেয়ে তাদের উপদেশ দেবে তা ভেবে দেখতে চায় না। এরা সব ঠাকুর দেবতা আর সাধু সন্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে।' এদের লোক দেখানো মৌখিক ভক্তি শ্রদ্ধা খুব, বাকী এদের মধ্যে ধর্মের জন্য ত্যাগ নেই; এরা ঠাকুর বসাচ্ছে সব বিষয়

বাঁচাবার জন্তে। আরে! ঠাকুর কি বসালেই হোলো? সাধু সন্ন্যাসী আর গরীব দুঃখীরা যেখানে সাহায্য না পেলো সেখানে ঠাকুর বসিয়ে কি লাভ হবে? দান আর দরদ ঠাকুর সেবার সব চেয়ে বড় কথা।

আর একদিন শশধর গাঙ্গুলী (যাকে লাটু মহারাজ 'মালদহে মাষ্টার' বলিতেন) জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আত্মা জ্ঞানের বিষয় কি না?' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— বিষয় হচ্ছে এমন জিনিস (দৃশ্য পদার্থ) যা অপরের সাহায্য ছাড়া নিজে প্রকাশ হোতে পারে না। বাকী আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। তাই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় বলতে পারেন না।'

মালদহে মাষ্টার— তবে আমরা আত্মাকে জানতে চাই কেন?

লাটু মহারাজ— আরে! আত্মাই যে হামাদের স্বরূপ।

মালদহে মাষ্টার— আত্মাই যদি আমাদের স্বরূপ হয়, তাহলে সেই স্বরূপ-বোধ থেকে আমরা ভ্রষ্ট হই কেন?

লাটু মহারাজ— আরে! স্বরূপ থেকে কেউ কি কখনো ভ্রষ্ট হোতে পারে? ভ্রষ্টই যদি হোলো, তাহলে সে আর স্বরূপ রইল না, ভিন্নরূপ হোয়ে গেলো বলতে হবে। স্বরূপে ময়লা পড়তে পারে, তাতে তার আসলি রূপ চাপা পড়তে পারে, বাকী স্বরূপ থেকে কেউ ছুট্ হোতে পারে না।

মালদহে মাষ্টার— আপনার কথা ঠিক বুঝলুম না, মহারাজ! একটু খোলোশা করে বলুন।

লাটু মহারাজ— দেখো! একটা পিতলের ঘটি আছে, বাকী তার উপর বহুৎ ময়লা পড়েছে। বাহির থেকে দেখলে মনে হবে ওটা পিতল নয় আর কুছু। বাকী তোমার মনে হোলো বলেই কি ওটা পিতলের স্বরূপের থেকে বঞ্চিত হোলো, তা হয় না জানবে। পিতল পিতলই রয়েছে, বাকী তোমার ভুল হচ্ছে। তেমনি আর কি।

মালদহে মাষ্টার— মহারাজ! এখানে ত সে ব্যেপার নয়। পিতল নিজে কখন মনে করে না যে, সে আর পিতল নয়। কিন্তু মানুষ নিজেই যে মনে করছে তার স্বরূপ, আত্মা নয়।

লাটু মহারাজ—মানুষ কখনো এমন মনে করে না। সে বলে হামার দেহ, হামার মন, হামার বুদ্ধি, সবই ত হামার হামার করছে, কাউকে ত হাম বলছে না। সে নিজেই জানে যাকে হামার বলছি সে 'হাম' নয়। মানুষের 'হাম্'-এর বোধ হরঘড়ি রয়েছে, তা থেকে কখনো বঞ্চিত হচ্ছে না, বাকী সে বোধকে বাহিরে ফুটাতে পাচ্ছে না। তুমিই বল না— তোমার ত ক্ষুধা পায়, ঘুম পায়। বাকী তুমি কে?

মালদহে মাষ্টার— তা ত জানি না, মহারাজ! কিন্তু আমার ক্ষুধা পায়, ঘুম পায় বেশ বুঝতে পারি। — 'পার তো? তবেই ত হোল। তোমার স্বরূপের বোধ রয়েছে, বাকী ফুটাতে পারছো না।'

—কেন ফুটাতে পারি না, মহারাজ!

— আর কেনো! এখন যে তোমার মনে ময়লা পড়ে রয়েছে, তাইত নিজের স্বরূপ ফুটতে পাচ্ছে না। আরে! মেছোবাজারে যাওতো, সেখানে দেখেছো কি যে, এক একটা দোকানে পাঁচ সাতটা কাঁচের বাটীতে রং করা জল রয়েছে। একটা পিতলের জিনিস যেমনি একটা বাটীতে ডুবিয়ে দিলো, অমনি তার ময়লা সব সাফ হয়ে গেলো, ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো, তখন ঐ পিতলটাকেই আবার আর একটি বাটীতে ডুবিয়ে দিলো—সোনার মতন রঙ হয়ে গেলো। তেমনি হামাদের হাম্-এর বোধকে যে-সব ময়লা চাপা দিয়েছে তাকে আগাড়ী সাফসুফ করে নাও, তবে ত তার চেক্‌নাই দেখতে পাবে।

মালদহে মাষ্টার— কেমন করে সাফসুফ করবো, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— আরে! নামের বাটীতে মনকে ডুবিয়ে দাও, মনের ময়লা ধুয়ে যাবে; তারপর তাকে তাঁর কৃপার বাটীতে ডুবিয়ে রেখো, তাহলে তোমার আস্‌লি স্বরূপ প্রকাশ পাবে। আরে! ময়লা যে পড়েছে মনে, সেখানকে সাফ না করলে, চলবে কেনো? দেখো! জগৎসংসারে নিজেকে সোনার আংটী ভেবো, সুখ পাবে, বাকী গিলটীর আংটী ভেবো না, দুঃখু পাবে। মনে হামার-বোধ রেখো না, দুঃখু পাবে, 'হাম্‌'-এর বোধ রেখো, সুখ মিলবে। এই 'হাম'-এর বোধে মনের ময়লা সাফ হয়ে যায়; কেনো না, হামই হচ্ছে আত্মা।

মালদহে মাষ্টার— আত্মা ত সর্ব্বব্যাপী, হাম ত সীমাবদ্ধ।

লাটু মহারাজ— তাতে কি হয়েছে? দেখোনি কি জুঁই ফুল কত্তো ছোট, তারই পাপড়িতে মনে কর এক ফোঁটা শিশির পড়েছে, তখন ত সেই শিশির কণার কৃপায় অনন্ত আকাশকে সেখানে ধরে রাখছে (অর্থাৎ আকাশ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হোচ্ছে), তেমনি 'হাম'* সীমাবদ্ধ হোলে কি হোবে, সেখানে একটুকরো ভগবানের কৃপা পড়লে অনন্তকে ধরে রাখতে পারবে।

মালদহে মাষ্টার— ভগবানের কৃপাকণা কেমন করে আমাদের উপর পড়বে, মহারাজ!

লাটু মহারাজ— আরে! তলা (উপস্থ) আর নোলা (জিহ্বা) রুখে (সংযত করে) জপো (অর্থাৎ জপ করো) আর মাপো (অর্থাৎ দান করো) তাহলেই দেখবে তিনি কৃপা করছেন।

মনে হয়, এই কয়টি কথায় জগতের সাধনরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যেদিন 'উদ্বোধন অফিস' নবনির্ম্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় সেই দিন লাটু মহারাজ সেইখানে গমন করেন নাই।

ইহাতে নানা লোকে নানা কথা বলিতে থাকেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন— 'মহারাজ! আপনাকে সেখানে যেতে বললে, আপনি গেলেন না কেন?' তাহাতে লাটু মহারাজ চুপ করিয়া থাকিতেন। ...এইরূপ কথাই আর একদিন হইয়াছিল। সেদিন জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন— " 'উদ্বোধনে' মা রয়েছেন, আপনি সেখানে থাকেন না কেন?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন— 'দেখো! তিনি (শ্রীশ্রীমা) কি কেবল ওখানেই আছেন, এখানে নেই? যেখানে বসে তাঁকে ডাকবো, সেইখানেই তিনি প্রকাশ হবেন। হামি মার কাছে গেলাম না বলে, মা কি হামার পর হয়ে যাবেন?'

বলরাম বাবুর বাটীতে বাস করিবার সময় লাটু মহারাজ প্রায়ই ভক্ত গিরিশ বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে অনেকেই আসিতেন— রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি। তাঁহাদের মধ্যে নানা রহস্যালাপ হইত। দু-চার জন গৃহী ভক্তও মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। গ্রন্থকারও সেইখানে দু-চারদিন গিয়াছিল। সেইখানকার দু'একটি ঘটনা (যাহাকে রহস্যালাপ বলা যায়) বলিতেছি। এই ঘটনাগুলি হইতে লাটু মহারাজের রসিকতা করিবার ধাঁজধরণ বুঝিতে পারা যায়।

গিরিশ বাবুর বাটীতে একদিন রাখাল মহারাজ বলিলেন— 'দেহধারণ করলেই রোগ-শোকে ভুগতে হয়— এগুলো যেন শরীরধারণের ট্যাক্স; না দিয়ে নিস্তার নেই।' কিছুক্ষণ পরেই একটা বোলতা উড়িয়া আসিয়া রাখাল মহারাজের কাণের নীচে হুল ফুটাইয়া দেয়। গিরিশ বাবু পানের ডিবে হইতে সেই স্থানে চুণ লাগাইয়া দিলেন। যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে লাটু মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন— 'রাখাল! তোর ট্যাকস্ (ট্যাক্স) লিচ্চে রে, তোর ট্যাকস্ লিচ্ছে।'

শরৎ মহারাজ লাটু মহারাজের সহিত দেখা হইলেই প্রায়ই বলিতেন— 'সাধু! তোমার সেই মনতরটা আওড়াওনা—'টাকা ধর্ম্ম, টাকা কর্ম্ম, টাকা হি পরমন্তপঃ। যস্য গৃহে টাকা নাস্তি, তস্য গৃহে কুছু নেই, শুধু ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।' লাটু মহারাজ উত্তরে বলিতেন— 'সংসারীর পক্ষে টাকা রোজগার করাই ত ধর্ম্ম। সংসারী হোয়ে যে টাকা রোজগার করতে পারে না, সে আবার সংসারধর্ম্ম করবে কেমন কোরে? হাবাতে আর গরীব সংসারী হওয়া ভাল কি? এইরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত। একদিন গিরিশ বাবুর বাড়ীতে শরৎ মহারাজ কথায় কথায় তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিলেন যে, মায়ের মন্দির (উদ্বোধন) করতে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে, কি যে করি, সুদের টাকা না দিতে পারলে আর লোকের কাছে সত্য রক্ষা করা যাবে না। তখন হাসিতে হাসিতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিলেন— 'দেখেছো ত শরোট! হামার মন্তরের কেমন শক্তি। তোমার মত সাধুকেও ভাবাচ্ছে। এখনো বলো, হামার মন্তর মানো কি না।' শরৎ মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন— 'তোমার মন্তর মানলে টাকা আসবে বলতে পার?' লাটু মহারাজ বলিলেন— 'মন্তরকে মেনে নাও, নিশ্চয়ই আসবে।' শরৎ মহারাজ— 'দেখো সাধু! তোমার কথার খেলাপ হবে না ত? — 'নারে শরোট হবে না, দেখে নিস্।' এই কথা হইয়া যাইবার পর গিরিশ বাবুকে শরৎ মহারাজ বলিলেন— 'সাধু কি বলছে শুনলেন ত, আপনি সাক্ষী রইলেন।' গিরিশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'আবার সাক্ষীসাবুদ কেন? সাধুর কথাটা সফল কোরেই দিই।' এই বলিয়া নিজের ট্র্যাক হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

রহস্যালাপ সম্বন্ধে আর দু'একটি প্রসঙ্গ দিব। একদিন দুই ব্যক্তি

(উত্তরেই পণ্ডিত) গিরিশ বাবুর বাড়ীতে সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিয়া ফেলিলেন— 'শালা, বাক্য রক্ষা করতে না পারলে সত্য রক্ষা করা যায় না।' (শালা বলা তাঁহার কথার মাত্রা ছিল) তাই লাটু মহারাজ তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিলেন— 'আর কেনো? ওকে শালা বলে ফেলেছেন— ওর বোনকে বিয়ে করে সত্যরক্ষা করে ফেলুন।' সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

আর একদিন গিরিশ বাবু কি একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'মনকে ছাঁদো মনকে বাঁধো, মনকে দিও না নাই (আস্কারা)। আগুর কথা পিছু করো, হুঁশিয়ার হইও ভাই।' গিরিশ বাবু তাহাতে বলিলেন— 'বড় ঠারেঠোরে কথা হোয়ে যাচ্ছে যে সাধু!' লাটু মহারাজ— 'সেই ভাল, তা না হোলে কালাপাহাড় জমবে কেনো?' *

কাশীতে তিনি জনৈক ভক্তের সহিত এইভাবে রহস্য করিয়াছিলেন— 'তুলসী! ইয়ে সংসারমে কাঁহাসে ভক্তি ভেট। তিন বাত্‌সে লট্‌পট্‌ হ্যায়, দাম্‌ড়ি চামড়ি, পেট।' ভক্তটির তত্ত্ব কথা বুঝাইবার বাই ছিল; দু-চারজন লোক দেখিলেই তত্ত্বকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। তাই সেদিন লাটু মহারাজ তাহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

বলরাম মন্দিরে লাটু মহারাজের নিকট অনেকগুলি ডাক্তার ভক্ত আসিতেন (ডাক্তার চুনীলাল বসু, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাক্তার নিতাই হালদার প্রভৃতি)। একদিন তিনজন ডাক্তারকে এক

* গিরিশ বাবু 'কালাপাহাড়ে' লাটু মহারাজকে প্রচ্ছন্নভাবে পেণ্ট করিয়াছেন, জনৈক ভক্ত এই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তাই লাটু মহারাজ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সময়ে আসিতে দেখিয়া লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'এখন কি চিত্রগুপ্তের ছুটি নাকি? আপুনারা তিন তিনজন যে একই সময়ে এসে পড়েছেন।'

ডাক্তার কাঞ্জিলাল বলিলেন— 'এখন কলকাতায় সিজন ভাল, অসুখবিসুখ কম।'

লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে— 'তাই বুঝি তিনে মিলে হামাদের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছেন, বাকী হাম্‌নে এতে আশীর্ব্বাদ দিবে না।'

ডাক্তার কাঞ্জিলাল— না মহারাজ! সমাজের মড়ক কামনা ক'রতে এখানে আসি নি, ডাক্তারী করি বলে আমাদের এত ঘৃণ্য মনে করবেন না।

লাটু মহারাজ— আরে না না! আপুনাদের ব্যেবসাকে কি কেউ ঘৃণা করতে পারে? আপনারা রোগীর কতো কল্যাণ করেন! তাদের কতো যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে দেন! তিনি ত বলতেন— 'এখন দশমূল পাচনে চলবে না, ফিভার মিক্‌চার চাই।'

চুনী বাবু বলিলেন— 'তিনি (পরমহংসদেব) ত আরো বলতেন যে, ডাক্তারের কড়ি গু-মুতের কড়ি। শুনেছি, ডাক্তারের পয়সা তিনি খেতে পারতেন না।'

লাটু মহারাজ— দেখুন! তিনি একথা কেন বলেছেন সেটা ভাবুন। জুয়ান বয়সে রাম বাবু পয়সা খরচা করতে চাইতেন না, তাঁর কিপ্‌টেপনা ঘুচাবার জন্তে তিনি একদিন তাকে একথা বললেন। তখন রাম বাবু ভাবলেন, 'তাইতো, আমার পয়সা গুরুদেবের সেবায় লাগবে না, তবে আর এতো পয়সা কার জন্তে উপায় কচ্ছি?' কিন্তু গুরুদেবের কাছে এসে বললেন— 'আমায় কি করতে বলেন?' তিনি বললেন— 'তুমি ভক্তসেবা কর, তাহলেই আমার সেবা হবে।' দেখুন! তিনি (ঠাকুর)

নিজে রাম বাবুর দেওয়া জিনিস নিতেন, এমন কি, তাঁর আনা জিনিস খেতেন। যাতে টাকাপয়সা-সঞ্চয়ের ওপর রাম বাবুর টান না থাকে, সেই জন্যে তাঁকে তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি ত কাউকে ঘৃণা করে একথা বলেন নি।

চুনী বাবু, জ্ঞান বাবু, নিতাই বাবু সকলেই বলিলেন— 'আমরা এতটা তলিয়ে দেখি নি।' এমন সময় গিরিশ বাবুর বাড়ী হইতে একজন লোক আসিয়া জানাইল যে, গিরিশ বাবুর সেই ব্যথাটা আবার জেগে উঠেছে। ডাক্তার কাঞ্জিলাল লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া তখনি উঠিয়া গেলেন।

একদিন লাটু মহারাজের কি খেয়াল হইল, গ্রন্থকারকে বলিলেন— 'আরে! কালীকে (স্বামী অভেদানন্দ তখন আমেরিকায়) একটা চিঠি লিখে দাও ত!' —'কি লিখব মহারাজ?' —'আরে! লিখে দাও যে হামার চোখের ছানি কাটানো হবে। যেন টাকা পাঠায়।' গ্রন্থকার সেইমত লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। স্বামীজী নিজে কোন টাকা পাঠাইলেন না, কিন্তু তারই এক ভক্ত স্বামীজীর নামে কিছু পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন আমেরিকায় তখন লাটু মহারাজ একটা ঘড়ি পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে ঘড়ির পরিবর্তে একটা rattle snake-এর লেজ পাঠাইয়া দেন। Rattle Snake-এর লেজে ঝুমঝুমি থাকে। সেই সাপের লেজটি পাইয়া লাটু মহারাজ বালকের মত রাগিয়া অভেদানন্দকে লিখিয়াছিলেন— 'আমি ঘড়ি চেয়ে পাঠালাম, আর তুই কিনা সাপের লেজ পাঠালি?' এই চিঠিখানিও গ্রন্থকার লিখিয়াছিল।

গ্রন্থকারের বেশ মনে পড়ে যে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন বলরাম বাবুর

পুরোহিত বৃদ্ধ রামদয়াল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংসারের জ্বালায় তাপিত হইয়া লাটু মহারাজের নিকট আপন পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে থাকেন। সব শুনিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "ছেলে যদি বাপের কথা না শুনে, তাহলে বাপের মনে কেমন কষ্ট হয়, দেখেছেন ত। তেমনি আপুনারা যখন জগৎপিতার কথা না শুনে ভুল পথে চলেন, তখন তাঁরও মনে এমনি দুঃখু হয় না! দুঃখু করবেন কেন? তিনি দয়াময়, ছেলের ভুলচুকের মার্জ্জনা করে থাকেন। তেমনি আপুনিও আপুনার ছেলের দোষক্রুটি ধরবেন না।" তাঁহার কথায় রামদয়াল বাবু চুপ করিয়া যান।

কাশীতে রামদয়াল বাবুর সহিত সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখুন! পিঙ্গলা একটা বেশ্যা, অষ্টাবক্র মুনির ক্ষণিক সঙ্গ পেয়ে তার মন একদম ফিরে গেলো। মুনি একদিন রাতে পিঙ্গলাকে দেখলে যে, সে কেবল বাহিরে আসছে আর মুখ চুন করে চলে যাচ্ছে। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করছে, বাকী সে তার ঘরে আসছে না। তাই না দেখে মুনির বড় করুণা হোলো —আহা! বেচারী যদি এই মনটি ভগবানের উপর দিতে পারতো! মুনির এইটুকু ইচ্ছায় পিঙ্গলার মন ফিরে গেলো। পিঙ্গলা হোয়ে গেলো ভক্তপ্রধান, অবধূতেরও গুরু। তাইত বলি, সাধুসঙ্গ করবেন। 'কোন্ ভেক্‌সে হরি মিলে, কোই নেই জানে দুনিয়ায়।' কিছুতেই সাধুর সঙ্গ ছাড়বেন না। তাঁদের একটু করুণাতে জীবনের সব বাধা কেটে যায়।"

কয়েকটি ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, লাটু মহারাজের খেয়াল উঠতেও যেমন, মিটতেও তেমন। একদিন তাঁহার খেয়াল উঠিল যে, ঠাকুরের তক্তাপোশখানিকে (যাহা দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে রক্ষিত আছে) পিতল দিয়া মুড়িয়া দিবেন। তাঁহার এই খেয়াল শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ভক্ত

এই কার্য্যের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দু-চার দিনেই তিনি সে খেয়াল ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তটি যখন বলিলেন— 'মহারাজ! মিস্ত্রি লাগাবো কি?' তখন লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! তিনি (ঠাকুর) কোন ধাতুর জিনিস ছুঁতে পারতেন না, তাই মনে হচ্ছে যে, ওকে আর পিতল দিয়ে বাঁধিয়ে কাজ নেই।" (শ্রীযুত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত)।

মিশন যেদিন রেজিষ্টার্ড হয়, সেইদিন বলরাম মন্দিরে খবর আসিল যে, বুড়োগোপাল দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) পরমধামে গমন করিয়াছেন (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৯)। লাটু মহারাজ সেইদিনটি বুড়োগোপাল দাদার কথাই কেবল বলিয়াছিলেন। অনেক কথার মধ্যে এইটুকু স্মরণ আছে। "আরে! বুড়োগোপাল দাদা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারী জুটতো না। সেই ত মঠে সব্জীবাগান লাগিয়ে দিলো। সব্জীবাগান করতে বুড়োগোপাল দাদাকে কতো না খাটতে হয়েছে! ··· তাঁর মতন ধীরভাবে জপে লেগে থাকতে ক'জন পারে? অনেকেই ত দু-চার দিন জপ করে ফল না পেলে জপ ছেড়ে দেয়, বাকী গোপাল দাদা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে জপে লেগেছিলো; তাঁর ধৈর্য্যের তুলনা নেই। রাখালভাই ত সেই কথাই বলে।"

মাদ্রাজ হইতে শশী মহারাজকে কলিকাতায় আনা হইলে লাটু মহারাজ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন। অনেক সময় লোক পাঠাইয়া খবরাখবর লইতেন। এক একদিন শশী মহারাজের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন ত বলিয়াই ফেলিলেন— 'শশী মহারাজের সেবা করলেই ঠাকুরের সেবা করা হোলো।' ২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শশী মহারাজ যেদিন রামকৃষ্ণধামে চলিয়া যান, সেইদিন

কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— "শশী টাকাকে পয়সার মত জ্ঞান করতো, জানো চন্দর! রাখালভায়ের মুখে শুনেছি— সে যখন মাদ্রাজ গিয়েছিলো তখন শশী যে তাকে কুথায় রাখবে, কুথায় বসাবে, তা ঠিক করতে পারতো না, ঐ নিয়ে সদাই ভাবিত হোয়ে থাকতো। রাখালভাইকে ত সে ফাষ্টো ক্লাশ ছাড়া চড়তেই দিতো না। অনেক টাকা খরচ হচ্ছে বলে রাখালভাই তাকে কতো বোঝাতো! বাকী শশীভাই বলতো, 'তুমি হামাদের রাজা, রাজার মতন মাস্থি তোমায় নিতে হবে। স্বামীজীর পর রাখালকে সে খুব মানতো।"

শশী মহারাজের মহাপ্রস্থানের পর লাটু মহারাজ প্রায়ই কাশীবাস করিবার কথা বলিতেন। একদিন গিরিশ বাবুর নিকট লাটু মহারাজ কাশীবাস করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তাহাতে গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন — 'কি সাধু! এখান থেকে পালাবার মতলব করছো। তোমায় ছাড়ছে কে? যে কারণেই হউক, লাটু মহারাজের কাশী গমন করা তখন সম্ভব হইল না। পরে গিরিশ বাবুর দেহরক্ষার পর (১৯১২ খ্রীঃ) তিনি বলরাম মন্দির ছাড়িয়া কাশীতে গমন করিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবুর অসুস্থতার সময় লাটু মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন না। এইজন্য নানা জনে নানা কথা বলিতেন। গিরিশ বাবু ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি নিজে সেখানে যাইতেন না। একদিন জনৈক ভক্ত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন— 'দেখো! গিরিশ বাবুর কষ্ট হাম্‌নে দেখতে পারে না।' এই কথাটুকুর মধ্যে গিরিশ বাবুর উপর তাঁহার গভীর ভালবাসা সুপরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ দুইবার করিয়া গিরিশ বাবুর খবর লইতেন। যেদিন (২৫শে মাঘ, ১৩১৮ খ্রীঃ) গিরিশ বাবুর অন্তিম শ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে বিলীন হইল, সেদিন লাটু

মহারাজ কাহারো সহিত কোন কথা বলেন নাই। পরদিন সারা বেলাটাই গিরিশ বাবুর কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দু'একটি কথা দিলাম। "দেখো! ঠাকুর একদিন গিরিশ বাবুকে পা-টা টিপে দিতে বললেন। তখন তাঁর উপর গিরিশ বাবুর তত বিশ্বাস হয় নি। পরে যখন তাঁতে গভীর বিশ্বাস এলো, তখন আর তাঁর পদসেবা করবার সুযোগ মিললো না (তার আগেই ঠাকুর দেহ রেখেছিলেন); তাই গিরিশ বাবুর মনে ঐ দুঃখু থেকে যায়, শেষে তিনি কি ভেবে কামারপুকুরে একবার গেলেন। সেখানে ছ-সাত মাস রইলেন। ঠাকুরের ঘরে সন্ধ্যার পর রোজ তিনি বসে থাকতেন— এই আশা করে যে, ঠাকুর তাকে পা টিপতে বলবেন। এমন কতো দিন থাকবার পর তিনি কলকাতায় চলে আসলেন। ··· একদিন ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ, যদি কেউ মা-গঙ্গার কাছে অকপটে নিজের সব দুর্বলতার কথা জানায়, তাহলে মা তার সব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।' গিরিশ বাবুর মনে একথাটা কেমন বসে গিছিলো, সেই থেকে তিনি রোজ মা-গঙ্গার কাছে নিজের অপরাধ সব জানাতেন। যেদিন যেতে পারতেন না, সেদিন ঐ দিকে মুখ রেখে সব কথা বলতেন। তাতেই তিনি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলেন। ··· তিনি (ঠাকুর) গিরিশ বাবুকে কোন কাজ করতে নিষেধ করতেন না। এই না দেখে একজন ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন— 'আপনি বললেই গিরিশ শুনবে।' ঠাকুর সেই ভক্তটির কথা শুনে বললেন— 'না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।' ··· একদিন নন্দলাল ব্রহ্মচারীর মুখে যেই তিনি (গিরিশ বাবু) শুনলেন যে, ঠাকুর কেবল তারই বকল্‌মা নিয়েছেন আর কারুর নেন নি, অমনি গিরিশ বাবু নন্দলালকে বলেছিল— 'দ্যাখ! অমন কথা বলিস নি; তিনি সকলার ভার নিয়েছেন, শুধু একটা গিরিশের ভার

নেন নি। আমার মত লক্ষ লক্ষ গিরিশকে তিনি মুহূর্ত্তে উদ্ধার করতে পারেন।'"

কাশীতে লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! গিরিশ বাবুর ব্যেপার সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। লোকে ভাবে তাঁর গোলমেলে জীবন— ফলো (অনুকরণ) করলে অনিষ্ট হবে। বাকী লোকে ত দেখে না তাঁর মনটা— তাঁর পাঁচসিকে পাঁচ-আনা বিশ্বাস ছিলো, তেমনই বিশ্বাস রেখে লোকে চলুক দেখি, কেমন না তাদের উন্নতি হয়।" গিরিশ বাবুর দেহত্যাগের পর তিনি জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "দেখো! এখন আর অত ঘন ঘন থিয়টরে যেও না। থিয়টরে যে কুছু ভালো নেই তা' বলছি না, অনেক শিখবার জিনিস আছে, বাকী তোমাদের কি ভালমন্দ বেছে নেবার ক্ষেমতা আছে? তোমরা এতো আসক্তির সামনে লড়তে পারবে কেনো? মন বেটা বড় পাজি, যতই বুঝাও না কেনো, প্রলোভনে ভুলে বারে বারে ঠকবে, তবু চেতবে না। এখন তোমাদের যুবা বয়স, ওসব প্রলোভন হোতে দূরে থাকাই ভালো।" (সুরেশবাবুর নিকট শ্রুত)।

আর একজনকে তিনি বলরাম মন্দিরে বাস করিবার সময় বলিয়াছিলেন — "দেখো! এখন টাকার জোর আছে আউর দেহের শক্তি আছে, তাই ভগবানকে মানছো না। বাকী যখন দেহ খারাপ হবে আর টাকার জোর কমে যাবে, তখনকার কথা ভেবেছো কি? এখন ত এক একজন এক একটা ভগবান হয়ে দাঁড়িয়েছো, কারোর কথা মানছো না, বাকী তখন যে কাঁদতে হবে।" (শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শ্রুত)।

একজন বড়লোককে তিনি বলিয়াছিলেন— "দেখো! যদি সৎভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারো, তাহলে গরীব-দুঃখীর কল্যাণ করতে পারবে।

আর যদি বদ খেয়ালি করো তাহলে গরীব-দুঃখীরও কল্যাণ করতে পারবে না, আবার নিজেরও অকল্যাণ করতে থাকবে। বদখেয়ালি করলেই ভোগ আউর লাস্‌করি (luxury) বাড়তে থাকবে। ··· ভোগ যতই বাড়াবে ততই বেড়ে যাবে, ততই অশান্তিতে ভুগবে। তাই ত মহাপ্রভু বলতেন— 'শুন, শুন নিত্যানন্দ ভাই, (সংসারী) জীবের কোন কালে গতি নাই।' এতো প্রলোভন সব আছে যে, তা ছেড়ে সংসারী জীব ভগবানের পথে আসতে চায় না। তাই ত বৈষ্ণবেরা একটা কথা বলেন— 'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হোলো। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেলো॥' সেই এক কি? না, মন। মন প্রলোভনকে ছাড়তে চাইলে না, তাই ত ভগবানের কৃপা ধরতে পারলে না। (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাহার নিকট শ্রুত)।

বলরাম মন্দিরে একদিন জনৈক ভক্ত বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন— "ভিজে কাপুড়গুলো ছেড়ে ওখান থেকে শুকনো কাপুড় নিয়ে পর।" ভক্তটি দেখেন যে, শুকনো কাপড়গুলি সবই গেরুয়া। গেরুয়া কাপড় পরিতে তাঁহার দ্বিধা হইল। তাই লাটু মহারাজ নিজে উঠিয়া আসিয়া একখানা শুকনো গেরুয়া কাপড় তাঁহার হাতে দিলেন। তখনও ভক্তটি দ্বিধা করিতেছেন দেখিয়া বলিলেন— "দেখো! মার্চেন্ট আফিসে কাজ করো, কামাই করলে সেখানে মাইনে কাটা যায়, জানো। তবে ভিজে কাপুড় ছাড়তে চাইছো না কেনো? ভিজে যদি তোমার অসুখ করে তখন আফিস কামাই ভি হবে আবার মাইনে ভি পাবে না। তখন কতো লুকসানী হবে ভাবো তো!"

ভক্তটি তখনও বলিলেন— 'এখুনি শুকিয়ে যাবে, মহারাজ! কিছু ভাববেন না।'

তাহাতে লাটু মহারাজ বলিলেন— "একথানা শুকনো কাপড় দিলুম, নিলে না, কুণ্ঠিত হয়ে ভিজে কাপড়ে রইলে, এখন বুঝছো না। যখন অসুখ করবে তখন হাড়েহাড়ে বুঝবে।" তখনও ভক্তটির গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করিতে দ্বিধা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন— "এর পরে যব শরীর ছুটে যাবে তখন ভালবাসার দান ফেলে দিয়েছ বলে কতো দুঃখু করতে হবে।" লাটু মহারাজের এইরূপ কথায় ভক্তটি সেদিন গেরুয়া কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপ করুণা তিনি প্রায় সকল ভক্তকেই দেখাইতেন। যদি কেহ গোপনে কোন কুকার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন, এবং তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিতেন, অথচ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কোন ধমক দিতেন না। তাঁহার কথাই ছিল— 'মানুষ কি ম্লেচ্ছ হয় রে? কর্ম্মই মানুষকে ম্লেচ্ছ করে।'

রাত্রি এগারটার সময় এক এক দিন একজন মাতাল আসিয়া তাঁহাকে দোকান হইতে কেনা মাংস প্রসাদ করিয়া দিতে বলিতেন। লাটু মহারাজ তাহাকে মাংসের ভাড়টি সামনে রাখিয়া একখানি গান গাহিতে বলিতেন। মাতালের একখানি প্রিয় গান ছিল— 'জগৎ দেখনা চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সোনার তরণী,' ইত্যাদি। মদের ঝোঁকে সেই গানখানি গাহিয়া মাতাল পুনশ্চ বলিত— 'বাবা, প্রসাদ হয়ে গেছে ত?' লাটু মহারাজ তাহাকে বলিতেন— 'হ্যাঁ! প্রসাদ হয়ে গেছে, এখন নিয়ে যাও।' আনন্দ করিতে করিতে মাতাল চলিয়া যাইত। কেন যে তিনি মাতালের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'আহা! দরদ চায়, একটু দরদ পেলে এদের প্রাণে শান্তি আসে। দরদ দিতে হবে বৈকি! বাকী সাবধান, মাথায় না চড়ে।'

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (চৈত্র মাসে) ৺বলরাম বাবুর পৌত্র, রামকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র ঋষি সহসা কলেরারোগে মারা যায়। বাড়ীর কেহ তাঁহাকে সেই অসুখের সংবাদ দেয় নাই। এইজন্য লাটু মহারাজ বাবুরাম মহারাজের নিকট অত্যন্ত দুঃখ করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন— "ছেলেটার এতো অসুখ, হামায় একবার কেউ জানালে না। হামাদের চোখের সামনে দিয়ে জলজ্যান্ত ছেলেটা চলে গেলো, হামরা কোন কুছু করতে পারলুম না। শুনি, সাধুকে অন্ন দিলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। কি কল্যাণই করছি রে ভাই! হামাদের চোখের সামনে দিয়ে সব চলে যাচ্ছে, আর হামরা শুধু বসে বসে গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করছি।"

বাবুরাম মহারাজ তাহাতে বলিয়াছিলেন— "এতে আর তোমার কি দোষ আছে, সাধু!"

লাটু মহারাজ— না ভাই! হামনে ত কুছুতেই মনকে বুঝাতে পারছি না। খালি মনে হচ্ছে, চলে যাই বিশ্বনাথের দরবারে। আর কেনো এখানে থাকা।

বাবুরাম মহারাজ— তোমার ওসব খেয়াল ছাড়ো; এখন কিছুদিন এখানে ত থাক।

লাটু মহারাজ— পূজার পর ঠিক করেছি, এখান থেকে যাবো।

বাবুরাম মহারাজ— পূজার এখনো ছ'মাস দেরী আছে, তখন সেকথা ভেবো, এখন যেন পালিও না।

ছ'মাস পরে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার দশমীর দিন (ইং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) লাটু মহারাজ চিরদিনের জন্য বলরাম মন্দির ত্যাগ করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি সেই গৃহের দিকে তাকাইয়া তিনবার 'মায়া মায়া মায়া' উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে গাড়ীতে

উঠিয়া ষ্টেশনে গেলেন। সেদিন রাত্রে ট্রেণ ফেল হওয়ায় তাঁহারা সকলে মিলিয়া 'বসুমতী' আফিসে ফিরিয়া যান।

পরদিন ষ্টেশনে তিনি জনৈক ভক্তকে নিম্নলিখিত উপদেশটি দিয়াছিলেন। আসন্ন বিচ্ছেদে ভক্তটি অতিরিক্ত কাতর হইতেছে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন —"দেখো! এখান থেকে হামনে চলে যাচ্ছি বলে দুঃখু কোরো না। ঐ ত সামনে পতিতপাবনী মা-গঙ্গা রয়েছেন, অবসরমত ওখানে একটু বসিও। সাধুসঙ্গে মানুষের মন যেমন পবিত্র হয়, তেমনি গঙ্গাতীরে বসে ধ্যোন-জপ করলে মানুষের মন পবিত্র হোয়ে যায়। দেখো! যখনই মন বড় বেশী চঞ্চল হোয়ে উঠবে তখনই চুপ কোরে গঙ্গার তীরে বসে যাবে। গঙ্গার ঢেউ দেখতে দেখতে নিজের মনের ঢেউ কখন যে থেমে যাবে জানতেও পারবে না।"

কাশীধামে মহাপ্রস্থান

কাশীতে লাটু মহারাজ, অদ্বৈত আশ্রমে, গোধূলিয়ার বাটীতে ভক্ত-প্রসঙ্গ ও কথোপকথন, বংশী দত্তের বাড়ীতে বৎসরাধিকাল অবস্থান, পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে লাটু মহারাজ, পুনরায় ধ্যান-ধারণায় আত্মনিয়োগ, দস্যু রত্নাকারের প্রসঙ্গ, জনৈক যুবকের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-আরোগ্যকরণ, জনৈক ভক্তের পাগল ভ্রাতাকে রোগমুক্ত করা, তুকতক্তীর কথা, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা, লাটু মহারাজের অন্তর্ধ্যামিত্ব-প্রসঙ্গ, ৺বিশ্বনাথ-মাহাত্ম্যকথন, মুক্তপুরুষ-প্রসঙ্গ, সাধুর সাম্‌নে প্রশংসা করে তাকে বাড়িয়ে তুলতে নাই, গার্হস্থ্যধর্ম্মবর্ণন, ছেলের বিবাহ কখন দিতে হয়, সারদা মহারাজের (স্বামী ত্রিগুণাতীত) প্রসঙ্গ, জনৈক সন্ন্যাসীকে উপদেশ, প্রকৃত সাধুর লক্ষণ, ভেক নেওয়ার আবশ্যকতা, আরোপ করা ভাব বেশীদিন থাকে না, সংসারীর মন উঠে আর পড়ে কেন, সংসার ছেড়ে ভগবানকে ডাকবার প্রয়োজন আছে কিনা, ব্রহ্মানন্দ কিরূপ, জগতে কোন জিনিসেরই দাম নেই— দাম আছে শুধু আনন্দের, না খেটে কৃপা পাওয়া যায় কি-না, মানুষ চায় কি, জীব কি আশায় জগৎসংসারে মেতে আছে, বিরক্তি এলেও জপধ্যান ছাড়তে নাই, সংসারীর আদর্শ ভীষ্মদেব লক্ষ্মণজী আর মহাবীর, কে সন্ন্যাস নিতে পারে, সধবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কি, সাধুর কাছে কি শিখতে হয়, ছেলেকে মানুষ করতে গেলে আগে বাপ-মাকে মানুষ হতে হবে, লণ্ঠনের নীচেই অন্ধকার, জনৈক বালকের রামায়ণপাঠ ও তাহার সহিত মহারাজের ছেলেমানুষি, সাধুদের ভাণ্ডারার কথা, ভালবাসা কে জানতে পারে, পূজাপ্রসঙ্গ, গ্রন্থকারকে সাহায্য, শাস্ত্রের কথা জীবনে ফলাতে হবে, এ যুগের মহাপুরুষ কে, যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ, ভগবানই সব সেজেছেন, হারারবাগের বাটীতে লাটু মহারাজ, বাবুরাম মহারাজের মহাপ্রয়াণে, ফেলে দেওয়া আর তুলে নেওয়া প্রসঙ্গ, হরি মহারাজের পত্র, পটল বাবুর নিকট শ্রুত প্রসঙ্গ, সাউজীকে উপদেশ, শরৎ মহারাজের প্রণাম, ভাই ভূপতির কাশীবাস, 'হামার ভগবান—ভগবানের হামি— হামি ভগবান'-প্রসঙ্গ, ভগবৎদর্শনের পর জগৎকে কি মনে হয়, জগৎকে বোঝা বলে মনে হয় কিনা, লাটু মহারাজের শেষ অসুখ ও দেহে অস্ত্রোপচার, স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রে বর্ণিত লাটু মহারাজের মহাপ্রস্থান, অভেদানন্দজীকে দর্শনদান, শেষ ভাণ্ডারার কথা, পরিশিষ্ট-প্রসঙ্গ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সন ১৩১৯ আশ্বিন মাসে, ইং ১৯১২ অক্টোবরে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার দশমীতে লাটু মহারাজ বলরাম মন্দির হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কাশীর পথে যাত্রা করেন। পথে একবার বৈদ্যনাথধামে

নামিয়াছিলেন। সেখান হইতে কাশীতে আসিয়া তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে উঠিয়াছিলেন। সঙ্গে চারজন গৃহিভক্ত— পটল বাবু, ছটুলাল, পশুপতি ও প্রকাশ। প্রকাশ, ছটুলাল ও পটল বাবু সপ্তাহখানেক পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন কিন্তু মহারাজের সেবার জন্য পশুপতি কাশীতেই থাকিয়া যায়। আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, অদ্বৈত আশ্রমের চন্দ্র মহারাজ সেই সময় লাটু মহারাজের যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন; যে কয়দিন তিনি সেখানে ছিলেন, প্রত্যহ তাঁহাকে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সেই বৎসরের নভেম্বর মাসেই হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) কাশীতে আসিবেন বলিয়া পত্র দেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া এবং আশ্রমে স্থানাভাব হইবে বুঝিতে পারিয়া লাটু মহারাজ স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রী৺কালী-পূজার পূর্বেই গোধূলিয়ার টেড়িনিমে কুণ্ড মহাশয়ের বাসায় চলিয়া আসেন। টেড়িনিমের বাটীতে তিনি দেওয়ালীর দিন শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীপূজা করিতেছেন দেখিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজের ব্যবহারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যান। তাঁহাকে তিনি বলিয়াছিলেন— "লক্ষ্মী হচ্ছেন নারায়ণের শক্তি, শক্তিপূজায় সকলেরই অধিকার আছে।"

লাটু মহারাজ যখন টেড়িনিমের বাটীতে থাকিতেন তখন শ্রীশ্রীমা বিশ্বনাথ-দর্শনে কাশী গিয়াছিলেন। খোকা মহারাজ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সেই সময় মায়ের সহিত কাশী গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীযুত কিরণ দত্তের 'লক্ষ্মীনিবাসে' উঠিয়াছিলেন। 'লক্ষ্মীনিবাস' হইতে লাটু মহারাজের বাসা বেশী দূরে ছিল না, তাই তাঁহাদের সহিত মহারাজের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইত। এক দিনের কথা— সকলেই অদ্বৈত আশ্রমে

নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পংক্তিভোজনের সময় মাষ্টার মহাশয়ের সহিত খোকা মহারাজের নানাবিধ প্রসঙ্গ হইতেছিল। কথায় কথায় সমাধির কথা উঠিয়া পড়ে। তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—"দেখুন! সমাধির কথা কেউ উচ্ছিষ্ট করতে পারেন নি। এসব কথা কি খেতে খেতে কইতে আছে? তিনি বলতেন—'খাবার সময় মনকে নামিয়ে আনতে হয়, খুব উচ্চ ভাবের আলোচনা করলে হজমের গোলমাল হয়।'" তখন সকলকার কথাবার্ত্তার সুর অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। (সুরেশ বাবুর নিকট শ্রুত)।

কাশীতে বিভূতি বাবু লাটু মহারাজের সহিত সাত বৎসর সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি একটি লিখিত নোট পাঠাইয়াছেন। তাহারই একস্থানে লিখিয়াছেন—" 'তোদের মা-ঠাউন্‌কে হামি মানে না।' এই কথা শুনিয়া আমি কেন অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। আশ্চর্য্য হইবারই ত কথা! কারণ এতদিন যাঁর সেবা করিলেন, তাঁকে মানেন না—এ কেমন কথা? পরে বুঝিতে পারিলাম যে, লাটু মহারাজ তাঁহার মাতৃভক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিতেন। একদিন তিনি বিশ্বনাথের পূজা দিবার জন্য ফুল বিল্বপত্র ইত্যাদি লইয়া বাহির হইলেন। বড় সড়কে আসিয়াই তাঁহার কেমন খেয়াল হইল, আমায় বললেন—'চলো, আগে মার কাছে যাই।' আমরা সকলে ত কিরণ বাবুর বাড়ীর দিকে চললেম। দোতলায় মার ঘরের সামনে আসিয়া লাটু মহারাজ কেমন যেন হইয়া গেলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় মা তাঁর সেবকের মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। এই দৃশ্যটি অতীব মনোরম। সেদিন মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তবে বিশ্বনাথের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।"

এই টেড়িনিমের বাটীতে নারায়ণ আয়েঙ্গার (স্বামী শ্রীবাসানন্দ) আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনটি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

গোধূলিয়ার যে বাটীতে লাটু মহারাজ থাকিতেন, কোন কারণবশতঃ সেই ভক্তটিকে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। সেই কারণে লাটু মহারাজকে পুনরায় বাসা বদল করিতে হইল। এবার তিনি বাসা নিলেন সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাটীতে। এই বাটীতে ডাক্তার ভি মেলো আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনটি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বংশী দত্তের বাটীতে তিনি যথেষ্ট আদরযত্ন পাইতেন। একদিন ত জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "ওখানকার বুড়ো ম্যানেজার খুব সজ্জন লোক, সাধু-সন্ন্যাসীকে খুব যত্ন-আত্তি করে। ও-বাড়ীতে হামি ত এক বছরের উপর ছিলুম। বুড়ো রোজ হামাকে সামনে বসে খাওয়াতো ; খাওয়া শেষ হোলে তবে নিজে খেতো। হামাকে একটুও দিক্ করতো না। হামার কাছে কতো লোক আসতো, তাদেরও খুব যত্ন করতো।"

ভক্তটি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিল— 'তবে ওখান থেকে চলে এলেন কেনো, মহারাজ ?'

লাটু মহারাজ— দেখো ! ওখানে আরো পাঁচজন লোকের আসবার কথা হোলো। সবাই বাড়ীওয়ালার আত্মীয়। তাই ওখান থেকে চলে এলুম।

বংশী দত্তের বাড়ী ছাড়িয়া লাটু মহারাজ ৬৮নং পাঁড়ে হাউলির বাড়ীটি ভাড়া লইলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উঠিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া বড়দিনের সময় সেবার লাটু মহারাজের কাছে অনেকেই গিয়াছিলেন। গ্রন্থকারও সেইবার প্রথম কাশীতে লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতে যান। বাড়ীটির ভাড়া দিতেন একজন মান্দ্রাজী ভক্ত। অগ্রিম ছয় মাসের ভাড়া দিয়া তিনি মহারাজকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায় চার বছর তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন। পরে বাড়ীওয়ালার সহিত ভাড়া লইয়া গোলমাল হওয়ায় তিনি সেই বাড়ী ছাড়িয়া দেন। তারপর মহারাজের জন্য ৯৬নং হাড়ারবাগের বাড়ীখানি ভাড়া লওয়া হয়।

পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে লাটু মহারাজ এত বেশী জপধ্যান লইয়া থাকিতেন যে, সেখানেও তাঁহার আহারের কোন নির্দ্ধারিত সময় থাকিত না। বিহারী বাবু এই সময়কার একটি চিত্র 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করিয়াছেন — "তাঁহার জীবনে এমন একটা অনিয়ম অশৃঙ্খলতার ধারা বহিত যে, গৃহবাস কি অরণ্যবাস ঠিক বলা যাইত না। আজ যদি রাত্রি দশটায় খাওয়া, কাল রাত্রি একটায়, পরশ্ব রাত্রি তিনটায়। খাওয়া, দাঁড়ান, বসা কিছুরই ঠিক নেই, সবই অনিশ্চিত। কখন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিবে, তবে হুকুম হইবে, তবে উনুনে আগুন পড়িবে। তাহার উপর হয়ত রাত্রি ১টার সময় ভারী বকাবকী— অকারণ বকাবকী। অপরে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু যাহারা তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল কাটাইয়াছে, তাহারা বুঝিত যে, তাঁহার মন নীচে নামিতেছে না, তাই ঐরূপ জোর করিয়া সাংসারিক জিনিসে মন নামাইবার চেষ্টা করিতেছেন।"

কাশীতে আসিয়া পুনরায় এইরূপ কঠোর সাধনভজনে লিপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া জনৈক ভক্ত একদিন বলিয়াছিল— "মহারাজ! আপনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেছেন, মনে প্রাণে তাঁর সেবা করেছেন, তারপর গঙ্গাতীরে কতো তপস্যা করলেন, তবু এখনো এ বয়সে এতো কঠোর করেন কেন?"

তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "দ্যাখো! তাঁকে দেখলেই যদি একেবারে বস্তুলাভ হয়ে যেতো, তাহলে আর কুছু ভাবনা ছিল না। শুধু দেখলেই হবে না— কর্ম্ম চাই, তাঁর কৃপা চাই, তবে বস্তু মিলবে। কর্ম্ম না হোলে কি কৃপা মিলে? একটু কৃপার জন্য কতো

খাটতে হয়! কৃপাকে ধারণ করা কি সহজ কথা? কৃপার কি একটা মাত্র ভাব আছে যে, সেইটে পেয়েই সাধক চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে? কৃপার অনন্ত ভাব। তিনি যে কতো ভাবে কৃপা করবেন তা কে জানে?”

ভক্তটি— তাই বুঝি এখনো পর্য্যন্ত কঠোর করছেন?

লাটু মহারাজ— আরে! হামরা আর কি কঠোর করছি। কঠোর করেছে দস্যু রত্নাকর। সেকালে সাধুর রাজা দেবর্ষিকে দেখলে আবার তাঁর বাবা (পিতামহ) ব্রহ্মাকেও দেখলে। যাঁদের দেখলে জীব উদ্ধার হোয়ে যায়, তাঁদের দেখেও রত্নাকরকে ষাটি হাজার বৎসর ধরে তপস্যা করতে হোলো— এমন কঠোর কে করতে পারে? নিজের শরীরের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলো, জানো! তার চারিধারে সব উইপোকার ঢিপি হোয়ে গেছিলো, বুঝো ব্যেপার! ব্রহ্মা আর দেবর্ষির কৃপাকে ধরবার জন্যই ত দস্যু রত্নাকর এতো কঠোর করলেন। তাঁদের দয়াতে ত তার মনের গতি ফিরে গেলো, তবু তাকেই (রত্নাকরকেই) ত সাধানায় লেগে সংস্কারের দাগ তুলতে হোলো। সংস্কারের দাগ যেন পাথরের আঁক, সহজে উঠে না, জানো!

ভক্তটি— মহারাজ! ষাট হাজার বছরের কথা শুনলে যে প্রাণ শুকিয়ে যায়!

লাটু মহারাজ— তোমাদের ত প্রাণ শুকোবেই। বাকী ধৈর্য্য না থাকলে কি কেউ কোনদিন ভগবানকে পায়? তুমি ত ষাট হাজার বছর শুনে ভয় খাচ্ছ, বাকী ভাগবতে আছে যে, লক্ষ বছর পরে ভগবানলাভ হবে শুনে এক ভক্ত ত নেচেছিলো। তাতেই সে খুশী হয়ে বলেছিলো— ‘অনন্তকাল, তার তুলনায় লক্ষ বছর ত কটা দিন!’ আরো তার কি ভাব ছিল, জানো? ভগবান যখন মিলবে, তখন ঐ লক্ষ বছর তার একেবারে

বাজে যাবে না, প্রতি জন্মেই সে আরো বেশী পবিত্র হোয়ে উঠতে থাকবে—এই আনন্দেই সে নেচেছিলো। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ফলবেই ফলবে, তাঁদের কৃপায় দশ বছরের কাজটি দশ দিনে হয়ে যায়, জানো।

মহারাজ যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি উদ্দীপনায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে লাটু মহারাজ জনৈক যুবককে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। যুবকটি গরীব, মেধাবী; দুশ্চিকিৎস্য রোগে (অনেকে অনুমান করেন থাইসিসে) আক্রান্ত হওয়ায় তাহার আত্মীয়স্বজন তাহাকে স্বগৃহে রাখিতে দ্বিধা করিয়াছিল। সেই-হেন স্বাস্থ্যহীন যুবককে নিজের কাছে রাখিয়া তিনি অন্যূন ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দেন। যুবকটি এখনো জীবিত, এম-এ পাশ করিয়া কোন একটি কলেজের প্রোফেসার হইয়াছে। তাহার নিকট শুনিয়াছি যে, লাটু মহারাজ প্রত্যহ তাহাকে ভোরে গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বনাথের পূজা করিতে এবং পূজাসমাপনান্তে বিল্বপত্রাদিসমেত চরণামৃত খাইতে বলিতেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ঔষধাদির ব্যবস্থা তিনি করেন নাই।

যাহা হউক, এই যুবকটির আরোগ্য-সংবাদ শুনিয়া দু-চার জন ভক্ত মহারাজের নিকট ব্যাধিমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ তাঁহাদের প্রত্যেককেই বলিতেন— "ঐ ত বাবা বিশ্বনাথ রয়েছেন; তাঁর দরবারে পড়ে থেকে তাঁকে জানাও না, তিনি তোমাদের অসুখ ভাল করে দেবেন।"

একবার জনৈক ভক্তের কোন একটি ভাই-এর সহসা মাথা খারাপ হইয়া যায়। ডাক্তার-কবিরাজগণ তাহার পাগলামীর ভয়ে তাহাকে দেখিতে চাহিতেন না। সেই-হেন রোগীর রোগমুক্তি কামনা করিয়া ভক্তটি

মহারাজকে পত্র লিখেন। মহারাজ শুধু আশীর্ব্বাদ জানাইয়া লিখিয়াছিলেন —"বিশ্বনাথের ইচ্ছায় ভাল হয়ে যাবে।" প্রকৃতপক্ষে তারপর হইতেই রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে রোগী প্রায় বিশ দিন ধরিয়া এক মিনিটের জন্ম নিদ্রিত হইতে পারে নাই, সেই রোগী ঔষধাদির সাহায্য বিনা কেমন করিয়া যে সেদিন অঘোরে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কারণ ডাক্তার-বৈদ্য পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সেইজন্ম ভক্তটির ধারণা হইয়া যায় যে, মহারাজের অমোঘ আশীর্ব্বাদের ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে আর একটি হিন্দুস্থানী যুবক যাওয়া-আসা করিত। সে এম-এ পাশ, বিনয়ী এবং ভক্ত। সকলে তাহাকে ভকতজী বলিয়া ডাকিত। লাটু মহারাজকে প্রায়ই সে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িয়া শুনাইত। একদিন ভকতজীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়া তাহার স্ত্রী লাটু মহারাজের কাছে একখানি পত্র দেয়। তখন ভকতজী আশ্রমে ছিল না, কোথায় চাকরী করিতে গিয়াছিল। এই পত্রের মর্ম্ম শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—"দেখো! ভকতজী ত বৌটাকে খেতে দিচ্ছে, হাতখরচ দিচ্ছে, দেখাশুনা করছে। আবার কি করবে? বিয়ে করেছে বলে বৌয়ের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে নাকি? আজকালের এই এক ফ্যাসান হয়েছে —বিয়ে করলেই বৌকে কাছে কাছে রাখতে হবে। সেকালের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এরা কতো দিন আর স্বামীর কাছে থাকতে পেয়েছে? তবু এরা স্বামীকে কতো ভালবাসতো! আর এসব মেয়েরা মনে করে স্বামীর কাছে থাকতে না পারলে বুঝি সোহাগ মিললো না। ভাব সব উল্টে যাচ্ছে, তাইত এতো অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে।"

১৯১৪ খ্রীঃ শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার সময় পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে বহু ভক্ত-

সমাগম হইয়াছিল। সেইবার বিহারী বাবু ও শরৎ বাবু (চক্রবর্ত্তী) দু'জনেই কাশী গিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন ছাদে বসিয়া উভয়ের মধ্যে উপনিষদের কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিতেছিলেন উপনিষদ দ্বৈতবাদী; অপরে উপনিষদকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া সমর্থন করিতেছিলেন। শেষে উভয়েই এই মীমাংসায় উপনীত হন যে, ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনার দ্বারা তত্ত্বোপলব্ধি হইলে তবে উপনিষদের মর্ম্মকথা বুঝা যায়। নচেৎ শুধু তর্কই করা সার হয়। এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন —"যা বললেন সার কথা। এখনকার লোকের ত্যাগ-তপস্যা কুছু নেই, বাকী ঋষিদের ভুল ধরতে মজবুত। আরে! তর্কবিচার কোরে পণ্ডিতি ফলানো যায়, বাকী আস্‌লি বস্তুর নাগাল পাওয়া যায় না।"

শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন— "লাটু মহারাজ অনেককেই সৎশিক্ষা দিতেন বটে কিন্তু গুরুগিরির ধার ধারিতেন না। তাঁহার একটিও মন্ত্রশিষ্য ছিল না, কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন।" তিনি প্রায়ই বলিতেন— "একটা ফোঁসমন্তর কানে দিলেই একজন অমনি গুরু হয়ে গেলো, আর একজন অমনি তার শিষ্য হোয়ে উদ্ধার হোয়ে গেলো— তা কি কখনো হয়? গুরু অনেক উপদেশ দিতে পারেন, বাকী শেষে সব ভগবানের হাত, যেমন উকিল বলে— যা যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।"... শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়া সাধু সিদ্ধানন্দ তাঁহার 'সৎকথা'য় লিখিয়াছেন— "সাধু কি মেস্তর আছে যে, তোমার মনের ময়লা রোজ রোজ সাফ্ করে দেবে। একবার করে দিলে তার পর তুমি নিজে সাফ রাখো। তোমার যদি নিজের চেষ্টা না থাকে তাহলে সাধু কি করতে পারে? সাধু কি তোমার সংস্কারের দাগকে মুছে দিতে পারে? না, তোমাকে কাঁধে করে ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারে? সাধু

পথ দেখিয়ে দেবে, তোমায় সেই পথ ধরে যেতে হবে, তবে ভগবান মিলবে।"

শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার পর দ্বাদশীর দিন বৈকালে একজন গুজরাটী অধ্যাপক মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আশ্রমের কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আশ্রমদ্বারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও তিনি মহারাজের নিকট খবর পাঠাইতে পারেন নাই। সহসা ভক্তগণের সহিত কথা বলিতে বলিতে মহারাজ তদীয় সেবককে ডাকিয়া বলিলেন— "পশুপতি! দেখ্ তো বাহিরে কে দাঁড়িয়ে আছে? তাকে এখানে নিয়ে আয়।" উপস্থিত সকলেই ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন— দোতলার ঘরে বসিয়া মহারাজ কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাহিরে একজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। কাশীতে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই হইত।

আর একদিন কোন এক ভক্ত কাশীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ষ্টেশন হইতে মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার সেই সময় মহারাজের পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— "অমুক প্রণাম জানিয়ে গেলো, জানো? কাশীর পাশ দিয়ে গেলো তবু একবার এখানে নামলো না। বিশ্বনাথের দরবার তাঁর ভালো লাগলো না, চললো দেশ বেড়াতে। আরে! দেশ বেড়িয়ে কি হবে? পাঁচ জায়গা ঘুরে কুছু মিলে না। কাশী হচ্ছে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের স্থান। এখানকার মাহাত্ম্য কতো! এখানে মরলে জীব মুক্ত হোয়ে যায়। তিনি বলতেন— 'কাশী হচ্ছে মুক্তিক্ষেত্র।' এখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথকে মরা লোকের কানে তারকব্রহ্ম নাম দিতে আর বিশ্বেশ্বরীকে তাদের বন্ধন কেটে দিতে তিনি দেখেছিলেন।"

কাশীক্ষেত্রে বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। "বিশ্বনাথ জাগ্রত দেওতা (দেবতা)। কোটী কোটী লোক এখানে পূজো

দিতে আসে।" এই কথা শুনিয়া জনৈক ভক্ত বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! আসল বিশ্বনাথ ত ঐ জ্ঞানবাপীর মধ্যে আছেন, যেখানে পূজা হয় সেখানে ত নকল বিশ্বনাথ।'

ভক্তটির এই কথা শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন— "বিশ্বনাথ অনাদি লিঙ্গ, জানো! ঔরঙ্গজেব বাদ্‌শা তাঁকে ভেঙ্গে ফেললে কি হবে— সেখান থেকে তাঁকে ত উপড়ে ফেলতে পারেন নি। অনাদি লিঙ্গকে কে উপড়াতে পারে?"

ভক্তটি তবুও বলিলেন— "মন্দিরে ত এখন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথের পূজা হয়।"

লাটু মহারাজ— হ্যাঁ! অনাদি লিঙ্গের যেটুকু মাটীর উপরে ছিলো, সেটুকু বাদ্‌সা ভেঙ্গে দিলো; তখন লোকের বড় অসুবিধা হোতে লাগলো। মন্দিরে এসে দেওতা দেখতে পেতো না। তাই মাটীর উপরে বিশ্বনাথের চিহ্ন রাখবার জন্য যদি কেউ সেখানে বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন, তিনি ত ভালোই করেছেন। সকলকার পূজো করবার সুবিধা করে দিয়েছেন। পূজো ত সেইখানেই চলছে, বস্তুও ত সেইখানেই রয়েছে, তবে আবার তোমাদের নকল বিশ্বনাথ বলে ভাববার কি দরকার আছে?— বিশ্বনাথ চিরকালই বিশ্বনাথ, তাঁর কি কোন নকল থাকতে পারে? তাঁকে সেইখানেই ভক্তিশ্রদ্ধা করবে, পূজো করবে, তা হলেই তোমাদের কল্যাণ হবে।

বিভূতি বাবু লিখিয়াছেন— "একদিন আমি মাসীমার নিকট বিশ্বনাথকে পাথর বলেছিলেম। সেইদিন মহারাজের সঙ্গে দেখা করবো বলে গেছি, সদর দরজায় পৌঁছেই শুনতে পেলুম মহারাজ তাঁহার দোতলার ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ছেন— 'শালা! তোর কি কর্ম্ম আছে রে? শালা!

তুই পাথর দেখবি না ত কি বিশ্বনাথকে দেখবি?' আমি ত ভয়ে ভয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেম। তখন তিনি হেসে বললেন— 'আজ যে এতো সকাল সকাল এলে?' আমি বললেম— 'মহারাজ! কাল কলকাতায় যাব, তাই প্রণাম করতে এলেম।' তিনি আমায় বললেন— 'বেশ, যাবার আগে বিশ্বনাথদর্শন করে যেও। আর তাঁর প্রসাদী বেলপাতা নিয়ে যাবে, তাই রোজ রোজ একটু একটু খেও।'"

মহারাজ প্রায় সকল ভক্তকেই প্রত্যহ একটু একটু দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিতেন। তাঁহার নিকটে যাঁহারা যাইতেন, কাশী ত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদের সকলেরই সঙ্গে বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণার প্রসাদ দিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন— "প্রসাদধারণে মনের পবিত্রতা বাড়ে।"

সাত-আট বছর কাশীতে বাস করিলেও তিনি একটিবার মাত্র অন্নকূটের দিন শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার স্বর্ণ-প্রতিমা দেখিয়া তিনি কেমন ভাববিভোর হইয়া পড়িলেন! তখন অন্নপূর্ণার মোহন্ত মহারাজ ভক্তগণের সাহায্যে তাঁহাকে একটু ফাঁকা জায়গায় লইয়া যান। এই ব্যাপারের পর হইতে মোহন্ত মহারাজ লাটু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রায়ই অন্নপূর্ণার নিজ ভোগের প্রসাদ পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন, হাড়ার-বাগের বাড়ীতেও প্রসাদ পাঠাইতেন। মহারাজ সেই প্রসাদ (জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মতন) শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিতেন এবং ভক্ত-গণকে সময় সময় পার্শেল করিয়াও পাঠাইয়া দিতেন। নিত্য অন্নপূর্ণার প্রসাদধারণ করিলে জীবের ঐশ্বর্য্য হয়, একথাও তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন।

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে রাখাল মহারাজের জনৈক গৃহী শিষ্য তাঁহাকে

মুক্তপুরুষ বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন— "শালারা সব মুক্তপুরুষ দেখছে! মুক্তপুরুষ! হ্যাঁ, মুক্তপুরুষ! বাকী কোন্ মুক্তো বলো তো? বোম্বাই মুক্তো না আস্‌লি মুক্তো?"

ভক্তটি তাহাতে বলিয়াছিলেন— "বোম্বাই মুক্তো ত ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায়, মহারাজ! কিন্তু আসল মুক্তো আর কটা পাওয়া যায়? আসল মুক্তো দুর্লভই, যেমন আপনি।"

তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "হ্যাঁ! একেবারে আসল মুক্তো রে বাপ! এমন কি কাজ করেছি যে, একদম মুক্ত হয়ে গেলুম, এখানে আর জন্ম নিতে হবে না! আরে! মুক্তি ত তাঁর (ঠাকুরের) হাতে। তাঁর ইচ্ছা না হোলে এখানকার আসা-যাওয়া ঘুচায় কে? তাই ত ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যেন জন্মে জন্মে তাঁর মতন গুরুদেব আর লোরেনভায়ের মতন গুরুভাই পাই। নইলে দেহধারণ বিড়ম্বনম্।"

আর একদিনের ঘটনা— জনৈক ভক্তের সহিত তাহারই এক আত্মীয় লাটু মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। ভক্তটি বলিল— "ওরে, সাক্ষাৎ শিব, প্রণাম কর, সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে।" এই কথা শুনিবামাত্র লাটু মহারাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন— "শালারা সব কর্ত্তাভজার দল হচ্ছেরে! সবাইকে শিব দেখছে! আরে শিব কি ঝুড়ি ঝুড়ি হয়? শিব স্বয়ম্ভু, একমেবাদ্বিতীয়ম্। শালারা খোসামুদে, কর্ত্তাভজা! সাধুর সামনে তাঁর প্রশংসা করতে এসেছে। এতো শুনলে, এতো পড়লে, অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছিলো তা মনে থাকে না শালাদের। আরে! নিজের প্রশংসা নিজের কানে শুনলে অহঙ্কার বেড়ে যায়। সাধুর কি অহঙ্কার বাড়াতে আছে?" এই ভাবে সেদিন রাত্রি পর্য্যন্ত বকাবকি করিলেন, ততক্ষণ ভক্তটি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

একদিন এক হিন্দুস্থানী ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহারাজ! গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য কি?" তাহাতে লাটু মহারাজ হিন্দিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার চুম্বক দেওয়া হইল— "সংসারে থেকে পর-নিন্দা পরচর্চ্চা করতে নেই, তার চেয়েও সে সময়টা ঘুমানো ভালো। যেখানে পরনিন্দা পরচর্চ্চা হচ্ছে দেখবে, সেখান থেকে উঠে আসবে। ··· অপরের গুণগুলো সব সময়ে দেখতে চেষ্টা করবে, তাহলে আর তার দোষগুলো চোখে পড়বে না— অপরের দোষ খুঁজে বেড়ালেই সেই দোষ-গুলো তোমার ঘাড়ে চাপবে। ··· সংসারে আপনার দুঃখু যেমন বোঝো, অপরের দুঃখুও তেমনি বুঝতে হয়। ... পারতপক্ষে জীবকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, তাদের হিংসা করবে না। ··· কেউ কোন উপকার করলে তা ভুলতে নেই, তার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হয়। ··· যতই অন্যায় করুক, খেমতা থাকলে আত্মীয়দের দুটো ভাত দিতে কাতর হোতে নেই। ··· সংসারে থেকে ঋণ বাড়াতে নেই, ঋণ থাকলেই অশান্তি বাড়ে। ·· সংসারে থেকে পবিত্র হোতে চেষ্টা করতে হয়, সৎ বিচার নিয়ে থাকতে হয়। ··· বিবেকের কাছে যেসব কাজ ছোট মালুম হবে, সেসব কাজ করতে নেই। ··· সংসারে থেকে ভগবানকে ভুললে চলবে না, তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকতে হবে, সকাল-সন্ধ্যে তাঁর নামজপ করতে হবে, পার তো রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তাঁকে স্মরণ করতে চেষ্টা করবে।"

একদিন তাঁহাকে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন— "মহারাজ! অমুক খুব ভক্ত হয়েছে, দিনরাত্রি নামজপ পূজা আহ্নিক নিয়ে আছে।"

লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন— "বেশ ভাল কাজই ত সে করছে। তুমিও তার মত ভক্ত হও না, তোমাকে কে বারণ করছে? ইচ্ছে করলেই ত হোতে পার।" তারপর নিজের মধ্যে কিছুক্ষণ বিড় বিড়

করিয়া কি বলিলেন, বুঝা গেল না। শেষে বলিলেন— "দেখো! তোমাদের মত নচ্ছার লোকগুলো যতদিন আছে, ততদিন কারুর নিস্তার নেই। সে ভক্ত হয়েছে ত তোমার কি? তোমার একথা পাঁচজনের সামনে প্রকাশ করবার কি দরকার আছে? তুমি কি তার দালাল সেজেছো? সে কি তোমায় বলছে যে, তার কথাটা পাঁচজনের কাছে প্রচার করে বেড়াও। সে বেচারী নির্জ্জনে একটু ভগবানকে ডাকছে, আর তুমি কি না সেই কথাটা পাঁচজনকে বলে দিচ্ছ, দু'দশ দিন বাদেই যে তার কাছে লোকের ভিড় হতে থাকবে। তখন সে বেচারীর কতো ক্ষতি হবে, ভাবো ত। ভক্তি আউর ভক্তের কথা কাউকে জানাতে নেই, জানো।"

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের গুডফ্রাইডের ছুটিতে জনৈক ভক্ত কাশীতে গিয়াছিলেন। সেইখানে জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়। লাটু মহারাজ সেই সংবাদ কেমন করিয়া জানিতে পারেন। ভক্তটি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে বলিয়াছিলেন— "দেখো! অনেকে ছেলের বিয়ের জন্য তোমাকে টাকার লোভ দেখাবে, কেউ বলবে পাঁচশো দিব, কেউ বলবে হাজার টাকা দিব। তুমিও টাকার লোভে ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হবে, বাকী একবারও কি ভেবেছো যে, তোমার ছেলের বয়স অল্প, বেশী লিখাপড়া শিখে নি, এখনো রোজগার করতে পারছে না, এ ছাড়া অবস্থাও তোমাদের তেমন ভালো নয়। এখন যদি টাকার লোভে ছেলের বিয়ে দাও, দু-চার বছর পরে যখন তার ছেলেপুলে হবে, আর তাদের পেট পূরে খাওয়াতে পারবে না, তখন সেই ছেলেই দেখবে তোমাকে দুষবে, তখন যেন দুঃখু কোরো না। আগে ছেলে রোজগারী হোক, নিজের ভাত-কাপড়ের যোগাড় কোরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে

শিখুক, তখন তার বিয়ে দিও, তার আগে বিয়ে দিও না, দিও না, দিও না।" মহারাজকে তিন তিন বার 'দিও না' বলিতে শুনিয়া ভক্তটি তখনকার মত নিজ পুত্রের বিবাহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর কলিকাতা হইতে সংবাদ গেল যে, আমেরিকায় সারদা মহারাজকে জনৈক পাগল বোমা ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ দু-তিন দিন অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনকথা সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে কিছু কিছু শুনিয়াছি। তন্মধ্যে দু'-একটি দিলাম। "সারদাভাইয়ের ভূত দেখবার সখ ছিল, তাই সে মাঝে মাঝে পোড়ো বাড়ীতে (যেখানে ভূত দেখা গিয়াছে বলিয়া জনরব উঠিত) একা গিয়ে রাতে বাস করতো। একদিন এক বাড়ীতে ত ভূত দেখতে গিয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো, ঠিক সেই সময় সারদাভাইকে ঠাকুর দেখা দিলেন। ঠাকুরকে দেখে সারদা-ভায়ের ভয়-ডর সব ছুটে গেলো। শুনেছি, ঠাকুর তাকে এরকম দুঃসাহস দেখাতে নিষেধ করেছিলেন, সেই থেকে আর ভূতের বাড়ীতে রাত কাটাতে যেতো না। ··· সারদাভাই যেমন জপ করতে পারতো তেমনি কর্ম্মীও ছিল, কোন কাজে পেছপাও হোত না। স্বামীজীর ডানহাত ছিল, ওরই চেষ্টায় ত 'উদ্বোধন' কাগজ বের হয়েছিলো। স্বামীজীর সব কথা মানতো, শুধু আমেরিকায় যেতে চাইত না। শেষে (স্বামীজীর দেহত্যাগের পর) মঠ থেকে তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলো, তাই গেলো। যেমন খেতে পারতো, তেমনি উপোস করতেও পারতো। শরীর ভাল থাকলে খুব খাটতো, বাকী একটু অসুখ করলেই অমনি শুয়ে পড়তো। প্রথম প্রথম (শ্রীশ্রী) মাকে মানতো না, শেষে মাকে মেনেছিলো। রাখালভায়ের হুকুমে (শ্রীশ্রী) মায়ের দেখাশুনা করতো। সরকার বাই লেনের গুদামওয়ালা

বাড়ীতে যোগীনভাই না থাকলে সারদাভাই মায়ের জয়রামবাটী যাওয়া-আসার সব বন্দোবস্ত করে দিত। শুনেছি, একবার গরুর গাড়ীর চাকার তলায় বুক পেতে দিয়েছিলো, মা সে কথা জানতে পেরে সারদাভাইকে খুব ধমক দিয়েছিলেন।"

এই পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে মঠের জনৈক সন্ন্যাসী লাটু মহারাজকে প্রণাম জানাইতে আসেন। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন—"কি জন্য সন্ন্যাস নিয়েছো সেটা ভুলো না ; শুধু লাল কাপুড় পরে সাধু সেজে বেড়িও না ; তাতে বড় জোর লোকমান্যি পাবে। লোকমান্যিতে ভুললে আর বস্তুলাভ হবে না। বস্তুলাভের জন্যই ত সন্ন্যাসী হয়েছো, সেই উদ্দেশ্যে কাজ করো। নির্জ্জনে গিয়ে সাধন-ভজনে লেগে যাও, হু হু কোরে এগিয়ে যাবে। গোল্‌তানির মধ্যে থেকো না। ওতে কি সাধন-ভজন হয় রে বাপ !"

অপর একজন সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন—"লাল কাপুড় পরলেই সন্ন্যাসী হোয়ে গেলে, এমন ভাব মনে এনো না। সন্ন্যাসী হওয়া কি সহজ কথা ? হরঘড়ি যাদের প্রাণ তাঁর (ভগবানের) জন্য কাঁদে, তারাই ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হোতে পারে। আস্‌লি সাধু-সন্ন্যাসী কেবল তাঁকেই চায়, নিজের জন্য ভাবে না, শরীরের দুঃখকষ্ট গ্রাহ্য করে না।" প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ঠিক ঠিক সাধু হয়েছে, সে অদোষদর্শী, কারুর দোষ দেখবে না, কারুর উপর তার রাগদ্বেষ থাকবে না, সর্ব্বজীবে সে অভয়দান করবে আর সর্ব্বজীবের সঙ্গে প্রীতি আউর সদ্ভাব রাখবে। আস্‌লি সাধু পরের দুঃখু জানতে পারলে তা দূর করবার জন্যে চেষ্টা কোরে থাকে, বাকী দুঃখু করবার সামর্থ্য না থাকলে তাকে দুটো ভালো কথা বলে চাঙ্গা কোরে দেয়, যাতে

সে নিজে থেকে দুঃখুকষ্টের সঙ্গে লড়াই দিতে পারে। আস্‌লি সাধুর বাধবিচার কম। সে মানুষের জন্ম দেখে না, কর্ম্মই দেখে। ভগবানের যেমন জাত নেই, আস্‌লি সাধুর তেমনি জাত নেই, জানো! আস্‌লি সাধুর সঞ্চয় কম, ভগবান ছাড়া আর কুছুর উপর সে লোভ রাখে না। যে আস্‌লি সাধু হয়, তার মনে ভয় থাকে না, আচরণে কোন দ্বিধা থাকে না, বালকের মত ব্যেভার করে থাকে। সেসব লোক কাজে লাগতেও যেমন, ছাড়তেও তেমন; কখনো বলে না— 'হামি না হোলে অমুক কাজ চল্‌বে না।' "

অপর একজন ব্রহ্মচারী কাশীতে লাটু মহারাজকে ভেকধারণের উপকারিতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন— "ভেক ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভেকধারী যে ত্যাগী সন্ন্যাসী— তার যে লাস্‌করি (luxury) করতে নেই, সেই বিশ্বাস জন্মে দেয়। ভেকধারণ করে অসৎ কাজ করতে গেলে মনে হয়ে যায়— 'হামি যে সাধু, এ কি করছি?' যে সৎ, পবিত্র, তার মনে ভেক সাধুভাব জাগিয়ে রেখে দেয়— তাতেই তার উপকার হয়। বাকী যে সে দ্বিধা মানে না, তার কাছে ভেকধারণ বিড়ম্বনা। কেনো না— মনেই সাধু অসাধু সব। যে মনেতে ঠিক ঠিক সাধু আছে, সে যদি ভেকধারণ নাও করে, তাতে কুছু ক্ষতি হয় না। বাকী মনে যে অসাধু আছে, বাহিরে সাধুর ভেক তার বৃথা। ··· ভেক নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে নেই। ভেকধারী স্বেচ্ছাচারী নয়, সে ভগবদ্‌কামী। ভেক নিয়ে যে স্বেচ্ছাচার করে, তার ইহকাল পরকাল দুই-ই যায়।" বলরাম মন্দিরে তিনি কোন এক সময়ে বলিয়াছিলেন— "দেখো! আরোপ করা ভাব বেশীদিন থাকে না। তেমন তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে ওসব ধরা পড়ে যায়। একদিন ত দক্ষিণেশ্বরে এক লেংটা এসেছিলো—

তিনি (ঠাকুর) তাকে দেখে বলেছিলেন— 'লেংটা বটে, কিন্তু আনন্দ পায় নি। লেংটা হোলেই কি সবাই ত্রৈলঙ্গ স্বামী হোয়ে যায় রে? কতো খাটুনি খেটে তবে অমন অবস্থা পাওয়া যায়।' তিনি বলতেন— 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী সব্ সে পার। শরীর সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু কর্ম্ম মানুষের মত নয়। কাশীতে এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখ্ লেও ৺বিশ্বনাথ-দেখার পুণ্য হয়।' "

জনৈক ভক্তকে গেরুয়া পরিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"গেরুয়া কাপড়ের মূল্য দেওয়া বড় কঠিন, জানবেন। ভগবানের বিশেষ শক্তি আর কৃপা না পেলে কেউ যেন গেরুয়া না পরে। আধ পয়সার গেরুয়া রং কিনে গেরুয়া পরলেই হোলো ভাববেন না। গেরুয়া পরার মানে আছে। হিংসে, মান, অপমান, রাগ যাতে না হয় তার জন্যই গেরুয়া পরা। গেরুয়া পরে সাধুর ভান করলে কি হবে? ভান-করা ভাব ক'দিন রাখবেন? আসল স্বভাব একদিন না একদিন বেরিয়ে পড়বেই। তাই বলি, নিজের নিজের অন্তরের সঙ্গে জুয়াচুরী করবেন না। হাবভাব দেখিয়ে লোককে ভুলাতে পারেন, বাকী ভগবানকে ভুলাতে পারবেন না।"

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার ছুটিতে গ্রন্থকার যখন কাশীতে ছিলেন তখন বিহারী বাবু ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির সহিত লাটু মহারাজের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার চুম্বক এইখানে দেওয়া হইল। সেদিনকার প্রশ্ন ছিল— "মহারাজ! সংসারীর মন উঠে আর পড়ে কেন?" তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "সংসারী জীবের বিষয়ের দিকে টানটা বেশী কিনা, তাই জপধ্যেনে মন খানিকটা উঠলেও আবার পড়ে যায়। তিনি বলতেন— ব্যেঙ্গীর লেজে কেউ যদি একখানা আধ্ লা ইট বেঁধে দেয়, তাহলে ব্যেঙ্গীটা দেওয়াল বয়ে খানিকটা উঠে আবার ধুপ্ করে পড়ে যায়। তেমনি সংসারী

জীবের মন বিষয়বাসনার চাপে ভগবন্মুখী হোয়েও নেমে পড়ে। মনকে সর্ব্বদা ভগবানের দিকে ফেলে রাখা বড় কঠিন তপস্যা। যে এটি পারে, তার মনে আর জোয়ার-ভাটা খেলে না, জানবেন। সুতার ফেঁসো থাকলে যেমন ছুঁচে সুতো পরান যায় না, তেমনি মনে বিষয়বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবানে তন্ময় হওয়া যায় না। মনকে ভগবানে তন্ময় করতে পারলে জীব আত্মারাম হোয়ে যায়। সংসারে থেকে আত্মারাম হওয়া সহজ কথা নয়! একেই ত সংসারে রোগ, শোক, ভোগ, তৃষ্ণা জীবকে কষ্ট দিতে থাকে, তার উপর দেহের আলিস্যি আর মনের অস্থিরতা দুটো আছে, তার সঙ্গে আবার যদি ভগবানের উপর সংশয় থাকে, তাহলে জীবের উদ্ধারের আর কোন খেই পাওয়া যায় না। প্রায়ই দেখবেন যে, সংসারী জীব ছেলেপুলে নিয়ে গুয়ে-মুতে দিন কাটাচ্ছে, সেও ভাল— তবু ভগবানে মন দিতে চাইছে না। যেখানে এমন নোংরা বুদ্ধি, সেখানে মনের একটানা উন্নতি কেমন করে আশা করতে পারেন, বিহারী বাবু?”

এই কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন— “তবে কি সংসার ছেড়ে ভগবানকে ডাকতে হবে?” তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—“যাঁর সংসার, তাঁকে ডাকবেন। তাঁকে ডাকবার জন্য—সংসার ছাড়তে হবে কেনো? সংসারে থেকেই সব করতে হবে। সংসার ছেড়ে যাবেন কুথায়? যেথানে যাবেন, সেথানেই ত সংসার গড়ে উঠবে। সংসার কি বাহিরে আছে? ও সবই নিজের মনের ব্যাপার। মনে যদি ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে বনে গিয়েও ভোগের বস্তু খুঁজতে থাকবেন, আর যদি তা না থাকে, তাহলে সংসারে থেকেও ভোগের বস্তু চাইবেন না। সংসারেই থাকুন আর বনেই যান, তাঁকে ডাকতেই হবে, তা না হোলে কুছু হবে না। হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বেশ বলতো— ‘একজন সমুদ্রে আস্নান করতে

গিয়ে ভাবছে— আগে ঢেউ থামুক, তারপর আস্নান করবে।' বলুন ত, যে লোকের ভাবনা এমন, সে কেমন করে আস্নান করতে পারে? সমুদ্রে ঢেউ উঠা ত কোনকালেই থামবে না, তাই কোন কালেই তার আর আস্নান করা হবে না। তাই ত বলি, যেখানে যেভাবে থাকুন না কেনো, মনে যত ঢেউই আসুক না কেনো, তারই মাঝে ভগবানের নামে ডুবে যেতে হবে। যে পারবে, তার হবে; আর যে পারবে না— বলবে, এতো ঝঞ্ঝাটের মাঝে তাঁকে ডাকা যায় না, ঝঞ্ঝাট কমুক তারপর তাঁকে ডাক্‌বো; তার কোন কালেই আর ভগবানের নাম নেওয়া হবে না। কেনো না, শরীর থাকলেই রোগ, শোক, দুঃখুকষ্ট, বিপদ, আপদ এসব ঝঞ্ঝাট থাকবেই— 'শরীরধারণম্ বিড়ম্বনম্।' বাকী এই বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে তাঁকে (অর্থাৎ ভগবানকে) ধরতে হবে। তিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর আনন্দেই সব বিড়ম্বনা দুর হোয়ে যায়।"

মধ্যে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল— 'ব্রহ্মানন্দ কিরূপ?' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখুন! এখানকার কোনো আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের তুলনা হয় না, তাই সে আনন্দের কথা মুখে বলা যায় না। এখানকার আনন্দ সব মায়ার ব্যেপার জানবেন। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে (অবস্থাকে) ঘিরে মায়ার ব্যেপার ত চলছেই। বাকী জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পারে একটা অবস্থা আছে। সেই তুরীয় অবস্থা কি সহজ কথা, বিহারী বাবু? সে অবস্থায় পৌছান খুব কঠিন। তুরীয়ের আনন্দ একেবারে নির্মায়া ব্রহ্মানন্দ। মায়ার আনন্দ কেমন মিষ্টি দেখেছেন ত! সাধারণ জীব তাতেই মুগ্ধ হোয়ে যায়, একবারও ভাবে না— যাঁর মায়া এতো মিষ্টি, না জানি তিনি নিজে কেমন মিষ্টি!"

আরো একটি প্রশ্ন হইয়াছিল— 'মহারাজ! মায়ার আনন্দকেও

আপনি মিষ্টি বলছেন কেন ?— সে ত জ্বালায় ভরা।' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "আরে! মায়ার জ্বালাটাও জীবের মিষ্টি লাগে।"

কোন এক সময়ে গ্রন্থকারকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখো! জগতে কোন জিনিসেরই দাম নেই। দাম আছে শুধু আনন্দের; টাকা, পয়সা, স্ত্রী, পুত্র, ঘরবাড়ী এসব মানুষ চায় কেনো বলতে পারো? এদের কাছ থেকে দেহের আরাম আর মনের আনন্দ পায় বলেই ত সংসারী জীব এদের জন্য দিনরাত খাটতে রাজী হয়। যে খাটুনীটা এদের জন্য খাটতে থাকে, সেই খাটুনীটা যদি ভগবানের জন্য খাটতো, তাহলে জীব মেকি আনন্দের বদলে সচ্চিদানন্দকে পেতো।"

হরমোহন বাবুর বাড়ীতে একদিন কথা উঠিয়াছিল—'ভগবান বড় খাটিয়ে তবে কৃপা করেন।' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখুন, বিহারী বাবু! আপুনি যে এই বয়সে ২৫০৲ টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছেন, এর জন্য কতো দিন খেটেছেন বলুন ত? পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু কোরে রাত জেগে কতো একজামিন পাশ কোরে, কতো খোসামদ-বরামদ কোরে তবে এই চাকরীটা পেয়েছেন। আড়াইশো টাকা পেতে আপনাকে বিশ বরষ খাটতে হয়েছে। আপুনি এতো খেটেছেন, তাই পেয়েছেন। বাকী যে লোক এতো খাটেনি, বি-এ এম-এ পাশ করে নি, সে কি এই বয়সে এতো টাকা চাকরী কোরে রোজগার করতে পারছে? আপুনার টাকা রোজগার করবার চেষ্টা ছিল, তাই ত পেরেছেন। তেমনি যার ভগবান পাবার ইচ্ছা থাকে, সেও পাঁচ বছর থেকে খাটতে খাটতে শেষে তাঁকেই লাভ করেন। ভগবান পাবার জন্য যার আন্তরিক টান নেই, তার হোবে কেমন করে, বলুন?"

এরই সঙ্গে বলরাম মন্দিরে শশধর বাবুকে (মালদহে মাষ্টার) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিখিত হইল— "সামান্য পিঁপড়ে থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সব জীব সংসারে এসে কিসের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলুন ত? আনন্দের জন্যই ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আনন্দের আভাস পেয়ে অবিদ্যার কুহকে পড়তেও তাদের বাধছে না। সাত ঘাটের জল খাচ্ছে, তবু তাদের মোহ ছুটতে চাইছে না। একটু সুখের আশায় ভুলে সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরছে, তবু সংসার করতে ছাড়ছে না।"

সাধু সিদ্ধানন্দকে বলিয়াছেন— "জীব শুধু আনন্দই চাইছে। বাকী আনন্দ কি ছেলের হাতের মোয়া যে ভোগা দিয়ে খাবে? তাঁর কাছ থেকে ভোগা মারা যায় না। তিনি জীবকে বিড়ে নিতে জানেন। এই জন্যই তাঁর পথ বড় দুর্গম। এ পথে যেমন প্রলোভন তেমনি পরীক্ষা আছে, তাই সর্ব্বদাই হুঁশিয়ার হোয়ে চলতে হয়। এ পথ বদ্রীনারায়ণের পথ, একটু অসাবধান হোয়ে চললেই, কোথায় যে ঠিকরে পড়বে তার ঠিকানা নেই। প্রতিপদে তাঁকে স্মরণ কোরে 'ত্রাহি ত্রাহি' বলতে বলতে চলতে হবে; তাঁর দোহাই দিয়ে চলতে পারলে তবে প্রলোভনের হাত থেকে পার পাবে, তার আগে লোভমুক্ত হওয়া যাবে না। লোভ-মুক্ত পুরুষের কাছে ভগবানের দরোজা খোলা— সে ড্যাং ড্যাং করে চলে যায়। তাই ত বৈষ্ণবেরা একটা কথা বলে—'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।' সংসারে যে চালাক লোক হবে, সে ভগবানকে নিয়েই থাকবে; আর যে বোকা হবে— সে সংসারের ফাঁদে পড়ে হাবুডুবু খেতে চাইবে।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁড়ে হাউলির বাড়ীতে কোন এক ভক্তকে লাটু মহারাজ রাত্রে শয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, অত্যন্ত

গরম, ঘরের ভিতর শুইবার যো নেই, ছাদে শয়ন করিতে হইত। ছাদে যারা শয়ন করিত, তাহাদের প্রত্যেককে লাটু মহারাজ মধ্যরাত্রে জাগাইয়া দিয়া ধ্যান করিতে বলিতেন। সেই সঙ্গে ভক্তটিকেও ধ্যানে বসিতে হইত। ভক্তটির মন বড়ই চঞ্চল ছিল, তাই লাটু মহারাজ মাঝে মাঝে তাহাকে বলিতেন— 'ধ্যেনে বসে এতো বাজে কথা ভাবো কেনো? মনকে একটু শাসন করতে পারো না?' ভক্তটি লিখিয়াছেন— 'মনকে কুড়াইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতাম, কিন্তু পারিতাম না। শেষে বিরক্তি আসিয়া যাইত, ধ্যান হইতে উঠিয়া পড়িতাম।' তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "বিরক্তি এলেও জপধ্যেন ছেড়ে উঠে পড়তে নেই। বিরক্তির সময় জপধ্যেন ছেড়ে উঠলেই সারাদিনটা মন বিরক্তিতে ভরে থাকে। তখন মনে হয়— একে মারি, ওকে বকি, তাকে দুটো কড়া কথা বলি। তিনি (ঠাকুর) বলিতেন— 'জপধ্যেন ছেড়েই আসন থেকে উঠতে নেই।' আসনে বসেই দশ-পনের মিনিট ঠাকুরদের গান করতে হয়। তাহলে সারাদিনটা মন বেশ শান্তিতে থাকবে।"

একদিন কথায় কথায় পরলোকের কথা আসিয়া পড়ে। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "পরলোক যে আছে তাতে কোন সংশয় রেখো না। পরকালকে যেমন মানতে হয়, তেমনি পরলোকও মানতে হয়।" জনৈক ভক্ত এই কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন— 'স্বর্গ নরক সবই ত এখানে, পরলোক আবার কোথায়?' তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "ইথানে ত আছেই, বাকী পরলোকেও স্বর্গ-নরক আছে। শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস রেখো। পরলোকে বিশ্বাস না করলে, ইহলোকে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখতে পারবে না।"

সাধারণতঃ গ্রন্থকার গুডফ্রাইডের ছুটী:তে, পূজার ও এক্‌স্‌মাসের

ছুটীতে কাশীতে লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতে যাইতেন। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নানাবিধ সাংসারিক চাপে ও দেহের অসুস্থতানিবন্ধন একটি বারও কাশীতে যাইতে পারেন নাই। এই সময়কার (১৯১৭ খ্রীঃ) যে-সব প্রসঙ্গ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কলিকাতাস্থ ভক্তগণের— যাঁহারা কাশীতে লাটু মহারাজের সঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন— তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল।

এই বৎসরে দুইজন অনুগত গৃহিভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন— "ভীষ্মদেবকে, লক্ষ্মণজীকে আর মহাবীরকে সামনে রেখে যদি চলতে পারো, তাহলে সংসারে থেকেও তোমাদের গায়ে কালি লাগবে না। ··· স্বামীজীর জীবনও আদর্শ জীবন, তারও শিক্ষা নিবে। ··· এখনকার বৈষ্ণবদের মত কাঁচা বয়সে মধুর ভাবের সাধনা করতে যেও না। মধুর ভাবের সাধনা বড় কঠোর। মহাপ্রভু পেরেছিলেন ; তাই বলে কি সাধারণ জীব পারতে পারে ? ··· অমন যে ব্যাসদেব তাঁরও স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান ছিল, স্ত্রীলোকেরা তাঁকে দেখে গায়ে কাপুড় দিয়েছিল। বাকী তাঁর ছেলে শুকদেবের স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানও ছিল না, একদম নিস্পিয়োর— কাম-কামনাশূন্য। তাঁর মুখ থেকে ভাগবত শুনে রাজা পরীক্ষিতের মায়া কেটে গেলো, হাসতে হাসতে রাজা জীবন ছেড়ে দিলো।"

সেই বৎসরে জনৈক ভক্ত (এখন সন্ন্যাসী) মহারাজের কোন এক সেবকের উপর রাগ করিয়া 'উদ্বোধনে' শরৎ মহারাজের নিকট চলিয়া আসেন। শরৎ মহারাজ ভক্তটিকে বুঝাইয়া পড়াইয়া পুনরায় লাটু মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটি গল্প বলিয়াছিলেন— "দেখো ! একজন লোক সংসারের ভারে কাতর হোয়ে সংসার ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়লো। পথে

একজন সন্ন্যাসীকে দেখে বললে— 'হামনে আপুনার চেলা হোবে, হামাকে চেলা কোরে নিবেন ?' সন্ন্যাসী তাকে বললে— 'দেখ্ বেটা ! চেলাকো বহুত কাম ! চেলালোককো পানি উঠানে পড়েগা, লক্ড়ি ফাড় চিড়নে পড়েগা, ভিক্সা করনে পড়েগা, প্যায়স বানানে পড়েগা, বর্ত্তন মুলনে পড়েগা আউর রাত জাগকর তপস্যাভি করনে পড়েগা। কেঁও, এতনা কাম সেকোগে ? তব হামলোককো চেলা বন যাও।' তখন সেই লোকটি ভেবে দেখলে যে, চেলা হয়ে তাকে যত কাজ করতে হবে, সংসারে থেকে তাকে তত কাজ করতে হয় না, তাই সে সংসারে ফিরে গেলো।"

অন্য এক সময়ে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "আরে ! চেলা হওয়া কি সহজ কথা ? বিবেকানন্দভাই ত একজনকে (সন্ন্যাসী) চেলা করবার পর বলেছিলো— 'তোকে যদি এখন চা-বাগানের কুলী আড়কাটীদের কাছে বিক্রি কোরে দিই, আমার সেই আদেশও তুই এখন পালন করতে বাধ্য, জানিস্ !' ··· তিনি (ঠাকুর) ত বলতেন— 'লাখ লাখ গুরু মিলে, চেলা না মিলে এক।' সন্ন্যাসী চেলার সম্বন্ধে তিনি বলতেন 'যে হাত পা ছেড়ে তাল গাছ থেকে পড়তে পারে, সেই সন্ন্যাস নেবার উপযুক্ত। তারই ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরতা আছে।' "

এই বৎসরে জনৈকা স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মীয়গণের প্ররোচনায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ কেমন করিয়া এইসব ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। কাশীতে যখন সেই স্ত্রীলোকটি আত্মীয়গণের সহিত লাটু মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন— 'দেখো ! স্ত্রীলোকদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। যে মানে না, তার সংসারে খিটিমিটি লেগেই থাকবে।' এই দলের মধ্যে দুইজন বিধবা লাটু মহারাজের পায়ের

নিকট দুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। টাকা দেখিয়া লাটু মহারাজ তাহাদের বলিলেন— "হামনে কি তোমাদের গুরুগোঁসাই আছে যে টাকা দিয়ে প্রণাম করছো। ও টাকা হামনে লিবে না। তিনি বলতেন— 'গরীব আর বিধবার টাকা সন্ন্যাসীকে নিতে নেই।' তোমরা টাকা লিয়ে যাও।" লাটু মহারাজ তাহাদের টাকা লইলেন না।

জনৈক বেকার একদিন সাহায্যপ্রার্থী হইয়া লাটু মহারাজের নিকট গিয়াছিলেন। মহারাজ তাহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরদিন সেই বেকারটি পুনশ্চ লাটু মহারাজের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল— 'মহারাজ! আমায় এমন কিছু বাতলে দিন, যাতে আমার দুঃখদারিদ্র্য ঘুচে যায়।' তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— 'হামনে যে কাজ বলবে সে কাজ ত তোমার পছন্দ হবে না। তুমি চাও সোনা করা বিদ্যে। বাকী হামনে ওসব বিদ্যে জানে না। হামনে সাধু আছে! গুরুর নাম নিয়ে এখানে পড়ে থাকি। হামনে তোমাকে দু'টো সৎকথা বলতে পারি, বাকী তোমার ত তাতে মন উঠবে না। তুমি চাও সিদ্ধাই। আরে! সিদ্ধাই কি অমনি মিলে? খাটতে পারবে? দিনে লক্ষ জপ করতে পারো ত এসো, এখানে বসে যাও।' লক্ষ জপের নাম শুনিয়া বেকার ছেলেটি সেখান হইতে চলিয়া যায়। তখন লাটু মহারাজ পার্শ্বোপবিষ্ট ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন— "তিনি (ঠাকুর) কি সাধে বলতেন— 'যার কেউ নেই, সে একটা বিড়াল পুষবে, তবু ভগবানের নাম নিবে না।' বেকার, ঘু'র বেড়াচ্ছে, এখানে বসে জপ করতো আর খেতো, তা ভাল লাগলো না। পাঁচ জনের কাছে ভিক্ষা মাগবে, তবু নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করবে না। এমনি মায়া!"

সেই বৎসর কোন এক ভক্ত শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার সময় কাশীতে

গিয়াছিলেন। ভক্তটি বছর ছয়েক হয় বিবাহ করিয়াছে, দুটি ছেলে-মেয়েও হইয়াছে। কাশীতে ছোট ছেলেটির চূড়াকরণ উৎসব উপলক্ষে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে লাটু মহারাজ নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন— "দেখো! ছেলে হোলেই হয় না,— বাঁচাই হোল প্রধান। এই ত মাইনে পাও, তার উপর যদি অনেকগুলো ছেলে হয়, খেতে দেবে কি? তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'দু একটা ছেলে-মেয়ে হবার পর (স্বামী-স্ত্রীতে) ভাইবোনের মত থাকতে হয়।' অল্প ছেলেপুলে হোলে তবু দুমুটো তাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারবে, ভালমন্দ দু'একটা পরাতেও পারবে, বাকী অনেকগুলো হোলো আর ত পেরে উঠবে না। তখন ত কেবল ভাবতে হবে— কি কোরে ছেলেদের খাওয়াবে, পরাবে, মানুষ করবে, বিয়ে-থা দেবে। তাদের ভালো কোরে মানুষ করতে না পারলে তারাই তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে তুলবে, সে কথা কি ভেবেছ? দানাদৈত্যি ছেলেপুলে নিয়ে বুড়োবয়সে নিত্যি অশান্তিতে থাকবে। তার চেয়ে এখন থেকেই একটু সংযমী হও, একটু নিজের দায়িত্ববোধ আনো। দুটো ছেলে-মেয়ে হয়েছে, তাদেরই যাতে মানুষের মত কোরে গড়তে পারো, তার চেষ্টা করো। দশটা দানাদৈত্যির চেয়ে একটা মানুষের মত ছেলে ঢের ভালো। তাই ত স্বামীজী বলতেন— 'ছেলেকে মানুষ করতে গেলে বাপ-মাকে আগে মানুষ হোতে হয়। যে বাপ-মা নিজেরা মানুষ হয় নি, তাদের ছেলেপুলেরাও মানুষের মত মানুষ হোতে পারে না। বাপ-মায়ের নিজের নিজের দায়িত্বজ্ঞান থাকলে তাদের ছেলেপুলেদেরও দায়িত্বজ্ঞান আপনি এসে যায়।'"

পৌষ মাসে কাশীতে সেবার ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সেই সময় জনৈক সাধু লাটু মহারাজের আশ্রমে কয়েক দিন ছিলেন। সাধুটি কলিকাতার আশেপাশে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মঠ সম্বন্ধে কেহ কিছু

জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন— 'ভগবানের ইচ্ছা হয় ত হবে।' একদিন লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন— 'এটা ভগবানের ইচ্ছা, না তোমার ইচ্ছা ?' সাধুটি গম্ভীরভাবে বলিলেন— 'আমি উপলক্ষ মাত্র।' লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে— 'তুমিই যে উপলক্ষ সেটা বুঝলে কেমন কোরে, ভাই ?' সাধু আপনার গাম্ভীর্য্য আরো গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন— 'তাঁরই প্রেরণায় আমার প্রাণে এই মঠ করবার ইচ্ছা জেগেছিল, তা না হোলে আমার কি সাধ্য যে, আমি ভগবানের মঠ তৈরী করবার সঙ্কল্প করতে পারি ?' লাটু মহারাজ শুধু বলিলেন— "তিনি (ঠাকুর) বলতেন— যে কাজ না করলে নয়, সেই কাজই কামনাশূন্য হোয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়, তাতে ভগবানকে ভুলে যেতে হয়। যেমন কালীঘাটে দানই করতে লাগলে, কালীদর্শন আর হ'ল না।" সেই সাধুটিকে তিনি বলিয়াছিলেন— "আসলি সাধু যেদিকে যায়, সেই দিক থেকেই সে ভগবানের ডাক শুনতে পায়। বাকী তার মধ্যে যদি একটুও খাদ থাকে, তাহলে সে সংসারের ডাককে (অর্থাৎ ভোগের পথকে) ভগবানের ডাক বলে ভুল শুনে থাকে।"

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। সেই সময় লাটু মহারাজের আশ্রমে দিন দশ-বার থাকিয়া গ্রন্থকার কুম্ভস্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই দশ দিন মহারাজের আশ্রমটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। কাশীক্ষেত্রে জোর গুজব রটিয়াছিল যে, সেইবার কুম্ভে কোন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। গুজবের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইবার মানসে গ্রন্থকার লাটু মহারাজকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন — "দেখো! মহাপুরুষদের আবির্ভাব ত হয়েই আছে বাকী তোমরা চিনতে পারছো কই ? এই ত ঠাকুর এসেছিলেন, ক'জন তাঁকে চিনেছিলো ?

এখন ত অনেকেই তাঁর ভক্ত হচ্ছে, বাকী তখন ওনাকে সবাই দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন বলতো, জানো! যাই তিনি নিজে যেচে ধরা দিলেন, তাই ত সবাই তাঁকে চিনতে পারলে। ভগবান যেখানে জন্ম নেন, সেখানকার কেউ জানতে পারে না, জানো! যাকে তিনি জানিয়ে দেন, সেই জানতে পারে যে, তিনি ভগবান। তাই ত তিনি বলতেন— 'লণ্ঠনের নীচেই অন্ধকার, দূরে আলো।' যাদের কাছে ভগবান মানবরূপ ধারণ করে সদাসর্ব্বদা থাকেন, তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে, তিনি মানুষরূপ ধরে এসেছেন, মানুষরূপ ধরে তাদের কাছে রয়েছেন, তাদের সেবা নিচ্ছেন। এই দেখো না, মা যশোদা বুঝতে পারেন নি যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান; রাখালেরাও বুঝতে পারেনি যে, তাদের সখা কৃষ্ণ ভগবান; গোপিনীরাও বুঝেন নি যে, ননীচোরা তাঁদের ইষ্ট ভগবান। শুধু বুঝেছিলেন শ্রীরাধা, তাই ত তাঁকে পাবার তাঁর এতো আগ্রহ! অতো ত মুনি ঋষি ছিলো, তারাও বুঝতে পারে নি। বাকী গর্গ বুঝেছিলেন। এমনি ভগবানের মায়া।"

এই কথা শুনিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন— 'মহারাজ! জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই যখন তিনি জগতে এলেন, তখন তার এতো লুকোচুরি করা কেন?'

লাটু মহারাজ— তিনি ত লুকোচুরি করেন না। তোমরাই ধরতে পারো না। তাঁর দোষ কি? তোমাদের চিনে নেবার ক্ষমতা নেই। তিনি কি করবেন? সাধারণ লোককেই তোমরা চিনতে পারো না। দু'জন অজানা লোক যদি তোমার সামনে ঘুমাতে থাকে, তার মধ্যে একজনের গুণ যুধিষ্ঠিরের মত আর একজনের পাপ দুর্য্যোধনের মত, তুমি কি তাদের মধ্যে কে দুর্য্যোধন, কে যুধিষ্ঠির চিনে নিতে পারো? সামনে থাকলেও পারো না,

যতক্ষণ না কেউ তোমায় বলে দিচ্ছে। তেমনি তিনি সামনে থাকলেও, কেউ না বলে দিলে তোমরা ধরতে পারবে না। বাকী যদি একবার তোমাদের তপস্যার চোখ খুলে যায়, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে, কে কেমন লোক। তখন আর বুঝতে কোন কষ্ট হবে না।

সেইবার বিমল নামে একটি ৮।৯ বৎসরের বালক আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিল। বালকটি একটু খ্যাপাটে গোছের কিন্তু প্রত্যহ লাটু মহারাজের সামনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিবার অদ্ভুত আগ্রহ দেখাইত। রামায়ণ পড়িবার সময় প্রায়ই বালকটি উত্তেজিত হইয়া উঠিত, কোন কোন দিন কাঁদিয়া ফেলিত। এই সব দেখিয়া লাটু মহারাজ একদিন বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পড়তে পড়তে তোমার চোখে জল আসে কেনো, বলতে পার?' বালকটি এক গাল হাসিয়া বলিল—'আমি যে রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় ছিলুম, মহারাজ!' লাটু মহারাজ আদর করিয়া—'তুমি কে ছিলে, বাপ্‌ধন, বলো তো?' বালকটি—'আমি রামের দলে ছিলুম, মহারাজ! এই দেখুন না আমার লেজ রয়েছে।' পাশে সুরেশ বাবু বসিয়াছিলেন, বলিলেন—'এ সব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার।' লাটু মহারাজ হাসিতে লাগিলেন।

বিহারী বাবু স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, লাটু মহারাজের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বালকটির চোখ, বুক, মুখ সব লাল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। এই বালকটির বহু আবদার লাটু মহারাজ সহ্য করিতেন। অসময়ে আনীত খাদ্যদ্রব্যাদিও এই বালকের হস্ত হইতে তিনি গ্রহণ করিতেন এবং সেইসকল দ্রব্য প্রসাদ করিয়া দিয়া তাহাকে খাইতে বলিতেন।

হরিদ্বার হইতে বহু সাধু কুম্ভমেলার ফিরতি কাশীতে আসিয়াছিলেন। নিত্য নূতন নূতন আখ্‌ড়ার সাধুসন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের আগমন-সংবাদ

লইয়া বহু ভক্ত সেই সময় লাটু মহারাজের নিকট যাইতেন। ভক্তগণের মধ্যে কারুর কারুর সাধুদেখা বাই ছিল। তাদের একজনকে একদিন বলিলেন— 'জটা আর লাল কাপুড় থাকলেই সাধু হয় না, রে বাপ্! অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে সাধু হওয়া যায়। সাধু হওয়া কি সহজ কথা? কতো ত্যাগতপস্যা চাই, কতো সাধনভজন চাই, তবে সাধু হোতে পারা যায়।' লাটু মহারাজের এই কথাগুলি ভক্তটির মনোমত হয় নাই। লাটু মহারাজ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই একদিন সেই ভক্তটিকে বলিলেন— 'দেখো! এরা সব কুম্ভের ফের্‌তা সাধু! এদের একদিন একটা ভাণ্ডারা দিয়ে দাও।'

লাটু মহারাজের ইচ্ছামত ভক্তটি পরদিন সাধুদের ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন। সেই ভাণ্ডারায় সাধুদের ব্যবহার দেখিয়া ভক্তটির আজন্মসঞ্চিত সংস্কার টলিয়া যায়।

আশ্রমে আসিয়া ভক্তগণ সাধুদের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে একজনকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন — "এ সব সাধুর বস্তুলাভ হয় নি, তাই এমন ব্যোভার করেছে।" আর একজনকে বলিয়াছিলেন — "দু-চার.জন খারাপ লোক দলে আছে বলে কি সব সাধুকেই এসব কথা বলতে পারেন? গৃহস্থদের মধ্যেও ত কতো খারাপ লোক রয়েছে, তাই বলে কি গৃহস্থ-আশ্রমে যত লোক আছে, সবই খারাপ লোক, এমন কথা বলবেন না। দেখুন, ভেকেরও মান দেখাতে হয়! তাঁকে পাবার জন্যই ত ভেক নিয়েছ। পাবার চেষ্টা করছে ত? সে চেষ্টাই বা কজন করে?" আর একজনকে বলিয়াছিলেন— "আপুনারা পাঁচজনে মিলে যখন আনন্দ করতে থাকেন, তখন একজনের পাতের জিনিস আর একজন খেয়ে নেন, আবার তার পাতের জিনিস আর একজন লুটে নেন— এমনি করেই ত আপুনারা আনন্দ পান। যে বেচারী খেতে পায় না,

তাকে নিয়ে আবার কতো মস্করা করেন। এই সাধুরাও তেমনি আনন্দ করছে, জানবেন। এতে আপুনারা এত বিরক্ত হচ্ছেন কেনো?"

গ্রন্থকার যখন কাশীতে ছিলেন, তখন একজন পরমহংসদেবের ভক্ত লাটু মহারাজকে ভালবাসা জানাইয়া পত্র দেন। তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "আরে! চিঠিতে ভালবাসা জানিবেন বললেই কি ভালবাসা জানানো হোয়ে গেলো? ভালবাসা জানাতে গেলে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হয়। সামান্য জীব কি ভালবাসা জানাবে? ভালবাসতে জানেন একমাত্র ভগবান আর ভালবাসা জানাতে জানেন তাঁর ভক্ত মহাপুরুষেরা। সামান্য মানুষের সাধ্য কি যে ভালবাসতে পারে? ভালবাসা বহু সাধনার ফল।" অন্য একটি ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন— "তোমাদের ভালবাসা ত মায়ার টানের ভালবাসা। কুকুর যেমন পরস্পর একসঙ্গে খেলে বেড়ায় কিন্তু খাবার পেলে পরস্পরে ঝগড়া মারামারি করে, তেমনি ত তোমাদের ভালবাসা,— পরস্পরে কত গলাগলি হয়ে মিষ্টি কথা বলো, বাকী নিজের নিজের স্বার্থের এদিক ওদিক একটু হোলে অমনি লাঠালাঠি করতে লেগে যাও। এমন ভালবাসা দেখিও না।"

কাশীতে কয়েকজন ভক্তের সহিত পূজা সম্বন্ধে তাঁহার নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। সাধু সিদ্ধানন্দ তাঁহার 'সৎকথা'য় কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি— "পূজো কি জানো? সবই ত তাঁর, তাঁকে আবার কি দেবে? ভাল ভাল জিনিস যা দেবে, তাঁর ছাড়া ত আর কারুর নয়। তবে ঠাকুর বলতেন— 'যেমন একজন বড়লোক তার নিজের বাগানে গেছেন, বৈঠকখানায় বসে আছেন, মালীটালী সব বাগানের কাজে ব্যস্ত আছে, এমন সময় দারোয়ান এসে বললে— বাবু! আপুনার জন্য কাল থেকে একটা গাছ-পাকা পেঁপে তুলে রেখেছি, আপুনি নেন। বাবু জানে

— বাগান তার, গাছ তার, পেঁপেও তার ; কিন্তু দারোয়ান যে শ্রদ্ধা করে পেঁপে রেখেছিল, বাবু কি দারোয়ানের সেই শ্রদ্ধা দেখবেন না ? পূজো করাও যে সেই রকম।' " বিভূতি বাবু তাঁহার নোটে লিখিয়াছেন— "একবার আমি শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজার সময় পশুপতি বাবুকে একখানা আটহাতী শাড়ী আনতে বলি। আটহাতী কাপড় দেখে মহারাজ বলিয়াছিলেন— 'পশুপতি ! ও কাপুড় ফেলে দে, মায়ের পূজায় আটহাতী কাপুড় কেনো এনেছিস্ ?' শেষে আমার দিকে চেয়ে বললেন— 'এমন ছোট কাপুড় মাকে কি দিতে আছে ? মাকে শ্রদ্ধা করে ভাল জিনিস দিবেন। যা আপুনি নিজে মেয়ে-জামাইদের পরাতে পারেন, সেই রকম, কি তার চেয়ে ভালো জিনিস মাকে দিবেন। মা কি আপুনার পর যে, আটহাতী কাপুড় দিয়ে সারছেন। দেবার শক্তি না থাকলে মাকে কেঁদে বলবেন— 'মা আমার শক্তি নেই, দিতে পারলুম না।' " বলরাম মন্দিরে তিনি কোন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন— "পূজোয় কোথায় ভাল জিনিস দিবি, তা নয়, রাজ্যের খারাপ জিনিস জুটিয়ে এনেছিস। কাপুড় দিলি ত পাঁচ হাতের বেশী নয়, তাও আবার জেলে ধূতি। ফল দিলি ত— রাজ্যের খারাপ ফল। মিষ্টি দিলি ত— পচা, বাসী, দুর্গন্ধময়। এ কি রকম পূজো রে ? যদি মাকেই দিচ্ছিস তবে ভাল জিনিস দেনা। যে জিনিস তুই নিজেই খেতে ঘেন্না করিস্, তা ভগবানকে কি বলে দিতে গেলি ? যদি একান্তই পয়সার অভাব — অনেক জিনিস কিনতে না পারিস, তবে যে জিনিস তুই নিজে ব্যেভার করতে পারিস্, সেই জিনিসই কম করে দে না ! ওরকম খারাপ জিনিস দিয়ে অশ্রদ্ধা করে পূজো করার চেয়ে না করাই ভাল। তাঁর জিনিস তাঁকে দিবি, তাতেই এত কিপ্‌টেপনা করিস্, না জানি নিজের কোন কিছু দিতে হলে কি কর্‌তিস্ ! আরে ! যে হরকিত (হরষিত) হোয়ে তাঁর জিনিস

তাঁকে দেয়, সেই ভাগ্যবান। প্রীতিসে না দিলে তিনি কোন জিনিসই গ্রহণ করেন না। পর্ব্ব উপলক্ষে ভাল ভাল জিনিস ঠাকুরের ভোগে লাগাবি, জানিস্। টাকা খরচ হবে বলে মন কুক্‌ড়ে ফেলিস নি। ঠাকুর-পূজোর মত সৎকাজে দিবি, তার আবার এতো ভাবাভাবি করিস্ কেন?" কাশীতে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেবদেবীর পূজো-অর্চ্চনা করবার আগে মনে মনে সঙ্কল্প কোরে তবে পূজোর আয়োজনে লাগতে হয়। মনের সঙ্কল্পেই পূজো হয়ে যায়, বাহ্যিক মন্ত্র পড়ে সঙ্কল্প করবার দরকার নেই। মন্ত্র বললেই কি দেবী এসে পূজোর জিনিস গ্রহণ করবেন, ভাবো? দেবী তা করেন না। দেবী ভাবগ্রাহী। যেখানে শ্রদ্ধাভক্তি দেখেন, সেইখানের পূজা গ্রহণ করেন; আর যেখানে ভাব নেই, খালি মন্ত্র আছে, সেখানে দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ে না, জানো!"

এইখানে জনৈক ভক্ত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহারাজ! যিনি পূজার আয়োজন করেন আর যিনি পূজা করেন (অর্থাৎ যজমান ও পুরোহিত) ইহাদের মধ্যে কার ভাব দেবী গ্রহণ করেন?"

লাটু মহারাজ—দেবী দু'জনেরই ভাব দেখেন। যেখানে দু'জনেরই ভক্তিবিশ্বাস থাকে, সেখানে ষোল-আনা ফল পাওয়া যায়। আর যেখানে ষোল-আনা ভক্তিবিশ্বাস নেই, সেখানকার পূজো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জিনিসপত্তরের হরেক রকম আয়োজন ত ভগবান চান না, ও ত আড়ম্বর মাত্র। যার পয়সা আছে আর লোকবল আছে, সেই ওরকম আয়োজন করতে পারে।... তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'পূজা তিন রকম—সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক।' এই তিন ভাবে দেবতার পূজা করা যায়। সাত্ত্বিক পূজায় ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এসব দরকার হয়। রাজসিক পূজায় আড়ম্বর হয় খুব, বাকী মনে ভক্তিশ্রদ্ধা কম থাকে; সেখানে ঢাক-ঢোল,

লোক-লস্কর, ষোড়শোপচার সব দরকার হয়। আর তামসিক পূজায় মারণ, উচাটন প্রভৃতি হিংসাদ্বেষের মতলব নিয়ে পূজা চলতে থাকে, তাই সে-সব পূজায় মনের সন্তোষ আসতে পারে না।··· পূজা আর উপাসনায় বসে অন্য কিছু ভাবতে নেই। ভাবের ঘরে চুরি করলে কোন কালে উন্নতি হোতে পারে না। প্রাণ থেকে চাইছে একটা জিনিস আর লোকদেখান করছো পূজা, জপ, আহ্নিক, উপাসনা সব। এতে কি হবে? ও ত নোঙর ফেলে দাঁড়টানা হচ্ছে! ওতে কি এগুনো যায়? ঠাকুর বলতেন — 'ঠিক ঠিক প্রাণের ক্ষিদে চাই, তাহলে তাঁর দয়া হবেই হবে।'

সেইবার কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় গ্রন্থকারের টাকাপয়সা ফুরাইয়া যায়। লাটু মহারাজ সে কথাও জানিতে পারিয়াছিলেন। আসিবার সময় তাহার হাতে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন— 'এখন তুমি নিয়ে যাও, বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দিও।' কিন্তু গ্রন্থকার তাহা লইলেন না। ট্রেনের পথে গ্রন্থকারকে সেইবার কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। বিপদে পড়িয়া গ্রন্থকার নিজের বোকামী বুঝিতে পারে এবং মহারাজের দূরদর্শিতায় আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

কাশীতে বিহারী বাবুর সহিত মহারাজের আর একটি প্রসঙ্গ হইয়াছিল। উহা যে কোথায় হইয়াছিল— পাঁড়ে হাউলিতে কি হাড়ারবাগে— তাহা জানা না থাকায়, আমরা এইখানেই তাহা সন্নিবেশিত করিলাম। লাটু মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখুন! শাস্ত্রে অনেক কথা আছে, বাকী জীবনে ফলান বড় শক্ত। ঠাকুর বলতেন, 'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে। পাঁজি নিঙড়ুলে এক ফোঁটাও পড়ে না।' তেমনি শাস্ত্রে বড় বড় সাধনার কথা লিখা থাকলে কি হবে— করে উঠা সহজ ব্যেপার. নয়। তাই ত তিনি (ঠাকুর) বলতেন— 'কলিতে লেজামুড়া বাদ দিয়ে

নিতে হয়। কলির লোক অল্পায়ু, অন্নগতপ্রাণ— এখন ভক্তিপথই ভাল। শাস্ত্রে যেসকল কর্ম্মের কথা আছে তার সময় কৈ? যে কালের যে ধর্ম্ম, সেই কালে সেই ধর্ম্মের আশ্রয় নিতে হয়। নবাবী আমলের টাকা কি কোম্পানীর আমলে চলে? এখন দেখছেন ত কোম্পানীর মোহরই চল।' জানবেন, এ যুগের আদর্শ হচ্ছেন— ঠাকুর-স্বামীজী। এনাদের কথা না শুনে উপায় নেই। এযুগে এনাদের কথা যে শুনবে, সেই উদ্ধার হোয়ে যাবে। যে কালের যে ইঙ্গিত বুদ্ধিমানেরা তা ধরতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দু'জনকেই বিশ্বরূপ দেখালেন— অর্জ্জুনকে আউর দুর্য্যোধনকে। বিশ্বরূপ দেখে অর্জ্জুনের সংশয় নাশ হোয়ে গেলো। বাকী ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেও পাপী দুর্য্যোধনের সংশয় ঘুচলো না। দুর্য্যোধন ভাবলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভেল্কী দেখাচ্ছেন।"

আর একটি প্রসঙ্গ স্বামী সিদ্ধানন্দ দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও কোন স্থানের— পাঁড়ে হাউলি কি হাড়ারবাগ, কাশী কি বলরাম মন্দির কিছুরই উল্লেখ করেন নাই। তাই তাহাও এইখানেই সন্নিবেশিত করিলাম।— "যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। এ সংসারকে কেউ 'ধোঁকার টাটি' দেখছেন, আবার কেউ 'মজার কুটী' দেখছেন, কেউ আবার জগৎটাকে তাঁর বিরাট দেহ দেখছেন। আমরা সকলেই যে তাঁর সন্তান— এইটে ভুলে যাই বলেই ত এতো গণ্ডগোল বাধছে। কেনো এই ভুল হয় জানো? আমরা সকলেই যে মহামায়ার রাজত্বে বাস করছি। এ যে মহামায়ার এলাকা। এখানে জগৎখেলাটিকে চালু রাখবার জন্যে মহামায়া কতো রকম প্রলোভনের চুষিকাঠি দিয়ে জীবকে ভোলাচ্ছেন! বাকী যে জীব বার বার খেলে হয়রান হোয়ে চুষিকাঠি ফেলে দিয়ে ভগবানকে ত্রাহি ত্রাহি বলে ডাকে, সে-ই খেলা থেকে বেঁচে যাবার পথ পায়। যেমন

কুকুর দেউড়িতে লম্ফঝম্ফ করছে, ভয়ে কেউ গৃহস্থের কাছে যেতে পারছে না। বাকী যদি কেউ ভাবে যে, যেমন কোরেই হউক বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করবো, তাহলে সে দূর থেকেই বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। সে ডাকাডাকিতে কর্ত্তার চমক ভাঙ্গে। তখন বাড়ীর কর্ত্তাই কুকুরকে ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখে। লোকটা তখন তাড়াতাড়ি কর্ত্তার কাছে যাবার সুবিধা পায়। কুকুরও তখন বুঝতে পারে যে, লোকটা কর্ত্তার চেনা লোক। তাই ঘেউ ঘেউ ছেড়ে লোকটার পা চাটতে আসে। ঠিক তেমনি এ ব্যাপারেও (ধর্ম্মরাজ্যে) ঘটে থাকে। প্রাণের ব্যাকুলতা দেখলে জগৎকর্ত্তাই দয়া করে তাঁর কুকুরগুলোকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) চুপ করিয়ে রাখেন, তাই ত জীবজগৎ কর্ত্তার নাগাল পায়। ··· জগৎকর্ত্তার নাগাল পেলেই জীব বুঝতে পারে যে, তিনিই সব সেজে রয়েছেন। চোর, সাধু, লম্পট, মাতাল, ধনী, দরিদ্র— এই সব ভিন্ন ভিন্ন বেশে তিনিই তাঁর জগতে লীলা করছেন। তাঁর নাগাল পেলে জীব বুঝতে পারে যে, সবাই তাঁর হাতের পুতুল, যেমন নাচাচ্ছেন তেমনি নাচতে হচ্ছে। কাকে কি বলবে, কার দোষ ধরবে, সবই যে তাঁরই কারসাজি। ··· সামান্য জীব ত বুঝতেই পারে না যে, এই জগৎচক্র ভগবানের লীলা— কারসাজি। তারা ভাবে যে, তাদের চেষ্টায় জগৎ চলছে। যেমন ছোটছেলেরা ভাবে যে হাঁড়ির মধ্যে (অবশ্য উনানের উপর) আলু, পটল, বেগুন, চাল, ডাল সব জ্যান্ত— তাই লাফাচ্ছে। বাকী যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা জানে যে আলু, বেগুন, চাল এরা কেউ জ্যান্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্ছে না, হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বলছে তাই লাফাচ্ছে। কাঠ টেনে নিলে আর লাফাতে পারবে না, চুপ হয়ে যাবে। তেমনি আর কি। মহামায়ার খেলায় কারুর ধোঁকা লেগে

যাচ্ছে আবার কেউ বা আনন্দে লাফাতে থাকছে। বাকী যাই হউক না কেন, তাঁকে না ধরতে পারলে জগতের খেলা জীব বুঝতে পারবে না, জানো! জীব তাঁকে যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন জানবে যে তিনি চিনির পাহাড়, আর সে বড় জোর একটা বড় পিপড়ে, একদানা চিনিতে তার হেউ ঢেউ হোয়ে যাবে।"

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের শেষে লাটু মহারাজ পাঁড়ে হাউলির বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া ৯৬নং হাড়ারবাগের বাড়ীটা ভাড়া লন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। হাড়ারবাগের বাড়ীতে লাটু মহারাজের. অদ্ভুত অন্তর্য্যামিত্বশক্তি প্রকাশ হইতে দেখিয়াছি। সে বাড়ীতে বসিয়া কেহ অসচ্চিন্তা করিলে অথবা অন্য কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং আপন মনে বিড়বিড় করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে ভৎ'সনা করিতেন। জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন যে, তৎকালে তাঁহার আশ্রমে কেহ স্বপ্ন দেখিতে থাকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কুস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন জানিতে পারিতেন এবং ডাকাডাকি করিয়া স্বপ্নদ্রষ্টার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন। সেই সময় তাঁহার বুলি ছিল—'পবিত্র হও, পবিত্র হও, পবিত্র হও; পবিত্র না হলে ভগবানকে বুঝতে পারবে না। সৎ না হোলে, সৎ-স্বরূপকে জানতে পারবে না।' এই হাড়ারবাগের বাড়ীতে গিরিশ বাবুর পুত্র: দানী বাবুর সহিত কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি যে লাটু মহারাজের মুখশ্রীতে শ্রীশ্রীপরমহংস-দেবের প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থারম্ভে বলা হইয়াছে। এই বাড়ীতে বাস করিবার সময় বিহারী বাবুকে তিনি অদ্ভুতভাবে দর্শন দিয়াছিলেন। অত্যন্ত ব্যক্তিগত হওয়ায় আনুপূর্ব্বিক ঘটনাটি প্রকাশ করা হইল না। এই বাটীতে তিনি বলিয়াছিলেন—"মানুষের মন

অসতী হয়ে রয়েছে, তাকে পতিভক্তি (অর্থাৎ জগৎস্বামীর প্রতি ভক্তি) শিখতে হবে।"

এই সালের ৩০শে জুলাই বাবুরাম মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ তিন-চার দিন গম্ভীর হইয়াছিলেন। সেবক পশুপতির নিকট হইতে শুনিয়া আমরা এই কথা লিখিতেছি। তিন দিন তিনি কাহারো সহিত ভাল করিয়া বাক্যালাপ করেন নাই। শেষে জনৈক ভক্তের গৃহে গোষ্ঠসংকীর্ত্তন শুনিয়া মনের ভাব কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে তিনি সকলের সহিত সাধারণভাবে কথা বলিতে থাকেন।

বিভূতি বাবু লিখিয়াছেন—"লাটু মহারাজ অনেক সময় বলিতেন,—'ফেলে দিলুম অমুকের মায়া।' তাই একদিন সাহস করিয়া তাঁহাকে বললেম—'মহারাজ! ফেলে দিলুম, ফেলে দিলুম এসব কি বলেন?' উত্তরে লাটু মহারাজ জানাইয়াছিলেন—'এটা বুঝতে পারলে না! হাম্‌নে কি সারাদিনই ঐ শালাদের কথা ভাববে। ফেলে দেবার পর সেদিন আর তার কথা ভাবি না, জানো!' এই ফেলে-দেওয়া ব্যাপার বড় সহজ নয়। ইহা একপ্রকার প্রত্যাহার। ইহাতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে কথনো কোন কাজে মনের বাজে খরচা হয় না। ধ্যানধারণার পক্ষে ইহা খুব সহায়ক। লাটু মহারাজের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, গিরিশ বাবু ঐরূপ প্রত্যাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত থিয়েটার কোরে ষ্টেজেই বলতেন—'থাক্ শালা থিয়েটার, এখন বাড়ী চললুম।' আর বাড়ী এসে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতেন। থিয়েটারের কোন কুটই তখন তাঁর মনে উঠতো না।"

এই বাড়ীতে একদিন একজন বলিয়াছিলেন—'চড়ায়ের পিছনে কাক, কাকের পিছনে চিল, চিলের পিছনে মানুষ, মানুষের পিছনে বাঘ, ভাল্লুক—

এই রকম নিষ্ঠুরভাব সংসারে লেগেই আছে। এখানে দয়া কোথায়?' তাহাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "নির্দ্দয়তা যদি দেখেন তো তাঁতে অনন্ত নির্দ্দয়তা দেখবেন; আর দয়া যদি দেখেন তো অনন্ত দয়া দেখতে পাবেন, আপনার যা খুশী। জানবেন— আপ ভালা ত জগৎ ভালা, আর আপ মন্দা ত জগৎ মন্দা।"

হাড়ারবাগের বাড়ীতে আসিয়া তিনি প্রায়ই উদরাময়রোগে ভুগিতেন, কিন্তু রোগশান্তির জন্য বিশেষ কিছু চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেন না। এই সংবাদ পাইয়া হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তাঁহাকে আলমোড়া যাইবার জন্য এক পত্র লিখেন— 'কৈলাসশিখরে হরপার্ব্বতী বাস করছেন, তুমি একবার এখানে এস।' তদুত্তরে লাটু মহারাজ লিখিয়াছিলেন— 'জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানে (৺কাশীতে) বিরাজ করছেন। তাঁদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।'

দেহত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজের পায়ে একটি ফোস্কা হইয়া ঘা হয়। যথাসময়ে উহার কোন যত্ন না লওয়ায় ক্রমে উহা বিষাক্ত গ্যাংগ্রীণে পরিণত হয়। সেই সময় জনৈক ভক্ত কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া তথায় গিয়াছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁহার দেহের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া সে-যাত্রায় গ্যাংগ্রীণটি ভাল করিয়া দেন। এইসময় ভক্তটি দু'চার সপ্তাহ সেইখানে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। সেবা করিতে করিতে ভক্তটির মনে কর্ত্তৃত্বাভিমান জাগিয়া উঠে, তজ্জন্য লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "সেবা করছো বলে মনে অহং-ভাব এনো না। সাধুর সেবা করবার অধিকার পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে হয়; দীনভাবে শ্রদ্ধার সাথে ঠাকুরের সেবা, গুরুর সেবা আর রোগীর সেবা করতে হয়, জানো!" (পটল বাবুর নিকট শ্রুত)।

আর একবার কি একটা কারণে পরমহংসদেবের জনৈক শিষ্যের প্রতি সেই ভক্তটি কটূক্তি করিয়াছিল। তাহাতে লাটু মহারাজ তাহাকে বলিয়াছিলেন— "যে শালা অমুককে মানবে না, সে শালার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সাচ বলচি, সর্ব্বনাশ হবে। এখনো সময় আছে, গিয়ে তার কাছে মাফ চেয়ে আসুক।" লাটু মহারাজের এই ভৎ'সনায় ভক্তটি পরমহংসদেবের সেই শিষ্যের নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। (পটল বাবুর নিকট শ্রুত)।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রন্থকার হাড়ারবাগের বাড়ীতে গিয়া চারদিন মাত্র লাটু মহারাজের সঙ্গ করিয়াছিলেন। সেই সময় 'সাউজি' বলিয়া একজন ভক্ত লাটু মহারাজের সেবা করিতেন। একাদিক্রমে ছয়-সাত মাস রাত্রি জাগরণ করিয়া মহারাজের সেবা করিবার পর সাউজি একদিন বিনীতভাবে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন— 'মহারাজ! আর তো পারি না।' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন— "পারলে ভাল হোতো, সাউজি! কৃপা পেতে। আচ্ছা! তা যখন পারছো না, তখন তাঁতে (নামজপে) যুক্ত থেকো, তাহলেই হবে।"

হাড়ারবাগের বাড়ীতে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রায়ই লাটু মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তিনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক চুপ করিয়া তাঁহার ধ্যানস্থ মূর্ত্তিখানির দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, কোন কথা বলিতেন না। এইজন্যই গ্রন্থকার একদিন হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন— 'মহারাজ! আপনি লাটু মহারাজের সামনে চুপ করে বসে থাকেন কেন?' ইহার উত্তরে হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন— 'সদাই অন্তর্মুখ; কথা কইবে কে? তাই চুপ করে সাধুর সঙ্গ করে চলে যাই।'

শেষ অসুখের সময় হাড়ারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আসিয়াছিলেন। লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন— 'কি সাধু, কেমন আছ ?' লাটু মহারাজ শুধু বলিলেন— 'শরীর-ধারণ বিড়ম্বনম্।' অদ্বৈত আশ্রমের জনৈক সাধু শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— 'আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?' তাহাতে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন— 'সাধু (লাটু মহারাজকে শরৎ মহারাজ সাধু বলিতেন) যে আমাদের সকলকার আগে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু মহারাজই জ্যেষ্ঠ। ওকে প্রণাম করবো না, কি বলিস্ ?'

অসুখের সময় ভাই ভূপতি প্রায়ই লাটু মহারাজের নিকট আসিতেন। ভাই ভূপতি আসিলেই লাটু মহারাজ তাঁহাকে দু'একখানি গান গাহিতে বলিতেন। একখানি— 'হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে। পার করেন দয়াল হরি দুটি রাঙা চরণতরী দিয়ে।' আর একখানি — 'হৃদয়বাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হোয়ে।' ভাই ভূপতির উপস্থিতিতে অন্য কোন ভক্ত আসিলে তিনি বলিতেন— "তোদের কাশীবাস, আর ভাই ভূপতির কাশীবাস দেখ; দেখে শেখ।" অনেকে ভাই ভূপতিকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতেন, লাটু মহারাজ তাঁহাদের একজনকে বলিয়াছিলেন — "গুয়ে-মুতের সংসারে পড়ে থাকার চেয়েও, ঠাকুরের নাম নিয়ে পাগল হওয়া ভাল।"

হাড়ারবাগের বাড়ীতে রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি বলিয়াছিলেন— "হামার ভগবান, ভগবানের হামি, আর হাম্‌নেই ভগবান— এই তিন ভাবের মধ্যে ভগবানের হামিটাই ভাল। ওতে অহঙ্কার বাড়তে পারে না। গোপীগণের শুদ্ধা ভক্তি ছিল, তাইতো শ্রীকৃষ্ণকে তারা তাদের ভগবান

বলে ভাবতে পেরেছিলো, শ্রীরাধিকার ভাব আরো উঁচু— নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (আর কারুর নয়) বলে ধারণা করতে পেরেছিলেন। মহাপ্রভুরও সেই ভাব। এসব ভাবে যেসব মহাপুরুষ সিদ্ধ হন, তাঁরা জগতে বাস কোরেও ভগবানের অহৈতুকী করুণায় নিজেরা যেমন ভরপুর হোয়ে থাকেন, জীবকেও তেমনি ভরপুর কোরে দেন। ঠাকুর বলতেন— 'এনারা সব বাহাদুরী কাঠ। এনাদের আশ্রয় কোরে কত শত লোক তরে যায়।' এনাদের দেখলেই ভগবানকে দেখা হোলো, জানবে। যেমন গঙ্গার জল ছুঁলেই, গঙ্গা স্পর্শ হোয়ে যায়। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সব গঙ্গাটা ছুঁতে হয় না, তেমনি এসব মহাপুরুষদেরও জানবে। এনারা ইঞ্জিন গাড়ী—নিজেরাও চলে আবার মালগাড়ীকেও টেনে নিয়ে যায়।"

অসুখে পড়িয়া মহারাজ প্রায়ই মহাবীরের কথা বলিতেন। একদিন গ্রন্থকারকে বলিলেন— "দেখো! এতো ভক্ত থাকতে রামচন্দ্রকে ঠিক ঠিক মহাবীরই বুঝেছিলেন। একদিন রামচন্দ্র তাঁর সেবককে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই সভার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন— 'আমাকে তোমার কি মনে হয়?' তাহাতে মহাবীর বলেছিলেন— 'হামার যখন দেহবুদ্ধি থাকে তখন হামার মনে হয় হামি তোমার দাস, আর তুমি হামার প্রভু। যখন দেহবোধ চলে যায়, তখন মনে হয় তুমি পরমাত্মা আর হামি জীবাত্মা, তুমি পূর্ণ, হামি অংশ! আর যখন এরও উপরে চলে যাই তখন তোমায় হামায় ভেদ দেখতে পাই না। আত্মস্বরূপ হয়ে যাই। তুমি, হামি যে অভেদ এই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যায়।' "

শেষ অসুখের সময় রাখাল মহারাজের কোন শিষ্য লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'মহারাজ! আপনারা ভগবানকে দর্শন কোরে জগতের সম্বন্ধে কি বুঝলেন, বলুন।' তাতে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন—

"দেখো ! এইটুকু বুঝেছি যে, এক ভাঁড় জল আলাদা করে রেখে দিলে তা শুকিয়ে যায়; বাকী সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকোতে পারে না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি, তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারবে না; জগৎ আর হামাদের কাছে নিরানন্দ বোধ হবে না।" সেই ভক্তটি আর একটি প্রশ্ন করিয়াছিল— 'মহারাজ ! জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার বোঝা বলে মনে হয় ?' তাহার উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন— "দেখো ! গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার উপর হাজার মন জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসার তখন আনন্দের খেলা মনে হয়। তুলসীদাসের একটি কথা মনে রেখো— 'যো যাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখবে— 'তোম্ জ্যায়সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়সা রাম। ডাইনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।' "

১৩২৬ সালের চৈত্র মাসে ইংরেজী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে গুডফ্রাইডের সময় গ্রন্থকার লাটু মহারাজের নিকট দ্বাদশ দিন ছিলেন। সেই দ্বাদশ দিনের মধ্যে লাটু মহারাজ একদিন অন্নপূর্ণার প্রসাদ খুব পরিতোষের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইদিন রাত্রেই তাঁহার জ্বর হয়। পরদিন সকালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও মহারাজ ঔষধপথ্যাদি কিছুই খাইলেন না। অগত্যা ডাক্তারগণ লাটু মহারাজের দেহে অস্ত্রোপচার করিতে বাধ্য হইলেন। উপর্য্যুপরি চার দিন প্রত্যহ ডাক্তারগণ তাঁহার শরীরের দু-তিন স্থানে অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। এত দুর্ব্বল দেহে

কাটাকাটি করা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অস্ত্রচালনার সময় লাটু মহারাজ একটুও অস্থির হইতেন না। প্রতিদিন স্বেচ্ছায় ডাক্তারের নিকট পা বাড়াইয়া দিতেন— যেন অন্য কাহারো দেহে অস্ত্রোপচার করা হইতেছে, এইরূপ ভাব।

পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামীজী ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রখানিতে লাটু মহারাজের অন্তিম অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা পুনরুদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পত্রখানি 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রিয়বর,

… লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। তিনি ইদানীং সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন দেখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন। ভ্রূমধ্যে বদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে, আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন— কি অসুখ? ডাক্তারেরা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম,— অসুখ তেমন কিছু নয়, খালি দুর্ব্বলতা। না খেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর নড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে। তাহাতে বলিলেন— 'শরীর গেলেই ত ভাল।' আমি বলিলাম— 'তোমার ওকথা বলিতে নেই, ঠাকুর যেমন করিবেন, সেইরূপই হইবে।' তাহাতে বলিলেন— 'তা ত জানি, তবে তোমাদের কষ্ট।' ইহার পর আর তেমন কথাবার্ত্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পশুপতিকে ডাকিতেন। পশুপতির হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে পশুপতি বলিত, তবে আমিও কিছু

খাইব না। অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না, পশুপতি বলিল— 'তবে আমিও আর খাইব না।' লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, 'মৎ খা'— একেবারে মায়ানির্ম্মুক্ত উক্তি!

"পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি, খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম— নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন— শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২·৬। বেশ সজ্ঞান— তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্যদিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎ সহায়ের আসিবার কথা ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম— লাটু মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শরৎকে তার করিতে বলিয়া আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৯৬ নং হাড়ারবাগের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডান দিক চাপিয়া পাশ বালিশে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম জ্বরের সময় গা যেমন গরম ছিল, সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন— কেবল অধিক প্রশান্ত ভাবমাত্র।

মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে বসাইয়া যথারীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

"যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয়, তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা— কি প্রসন্নতা— কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত! যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী! অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমজয়ী যাত্রা অপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণই বটে! প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন-প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে ৺গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ব্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জল-সমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই

চরমকালে লাটু মহারাজের এই পরমানন্দ-মূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলের মনেই এক মহা-আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!… ”

স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন—“স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে আমি ধ্যান করিতেছি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম— কে যেন আমাকে ‘কালী! কালী! কালী!’ বলিয়া তিনবার ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দের সঙ্গে একটি অস্পষ্ট মুখও যেন ভাসিয়া উঠিতে দেখিলাম। কণ্ঠস্বর ও মুখ আমার পরিচিত বলিয়া অনুমিত হইলেও ঠিক চিনিতে পারিলাম না। (মৃত্যুকালে তাঁহার দেহের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি?) পরদিন স্বামী সারদানন্দের প্রেরিত cable-এ জানিতে পারিলাম, লাটু মহারাজ সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমার সেই পূর্ব্বদিনের ধ্যানকালে দৃষ্ট মুখ ও কণ্ঠস্বর লাটু মহারাজের বলিয়া সত্য ধারণা হইল। Cable পাবা মাত্রই আমি সারদানন্দের নামে ৩০০ শত টাকা (১০০ ডলার) ভাণ্ডারার জন্য পাঠাইয়া দিই।

“… লাটু মহারাজ বাস্তবিকই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি miracle-স্বরূপ ছিলেন। স্বামীজী বলিতেন— ‘শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেরা সব এক একটি original; যে original নয়, সে ঠাকুরের ছেলে নয়। বাস্তবিক লাটু মহারাজকে দেখিলে স্বামীজীর ঐ কথার যথার্থতা সম্যক অনুভূত হয়। তিনি যে আমাদের গুরুভাই ছিলেন, ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়।”

— স্বামী অভেদানন্দ

হরি ওঁ তৎ সৎ

——0——

পরিশিষ্ট

মহাপুরুষগণের চরিত্র এক অভিনব উপাদানে গঠিত। মহাতাপস লাটু মহারাজের সকলই অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি যেন এক অদ্ভুতের সমষ্টি, এক অদ্ভুত বস্তু! এক সময়ে যাহা বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অন্য সময়ে আবার তাহাই কুসুম হইতেও কোমলতর! শ্রীমদ্ স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবনের এই অদ্ভুত রহস্য কে বুঝিবে? অনিত্য সংসারের যে স্তরে সাধারণ জীবের মন বিচরণ করে, তাহা হইতে বহু ঊর্দ্ধে— উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থিত লাটু মহারাজের বিচিত্রভাব সহস্রবাসনার দাস মাদৃশ জনের বোধগম্য হইতে পারে কি? তবে এই মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকথার আলোচনা কেবল আত্মশোধনের প্রয়াস— চিত্তে নির্ব্বেদের ভাব জাগাইয়া পারমার্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য পরম সহায়।

দক্ষিণেশ্বরে এক সময়ে সমাধির পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ হইতে দৈববাণী— তাঁহার আশীর্ব্বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল: "ওরে লেটো! তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে!"

যাঁহার কৃপায় বোবার বোল ফোটে, সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার নিরক্ষর সেবক লাটুর কণ্ঠে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। সেই সরল শুদ্ধসত্ত্ব আধারের ভিতর দিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী-বিতরণে তিনি তত্ত্ব-পিপাসু মানবের পিপাসা মিটাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপার আঁচ লাগিয়া লাটু মহারাজের জীবনের ছাঁচ কেমন সুন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, এতদসম্বন্ধে শ্রীগিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলবাবু প্রায়ই বলিতেন, "ঠাকুরের 'miracle' (অলৌকিক শক্তি) যদি দেখতে

চাও, তবে লাটু মহারাজকে ভ্যাখ। এর চেয়ে বড় 'miracle' আমি তো আর কিছু দেখি নি!" বাস্তবিকই লাটু মহারাজের জীবন-আলোচনায় ঐ কথার মর্ম্ম সম্যক অনুভূত হয়।

আজকালকার মত পুঁথিপড়া তোতাপাখী না হইয়া লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পুঁথিগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া ভগবদ্-উপলব্ধিতে পরাবিদ্যার অধিকারী হন। এক সময়ে পণ্ডিতবর বিষ্ণু তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন, "নিরক্ষর লাটু মহারাজের মুখে ভগবদ্‌তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ হয়, এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য অবধারণ করিতে পারা যায়।" সুদীর্ঘকাল এই মহাত্মার চরণতলে থাকিলেও, তাঁহার মধ্যে কী শক্তি নিহিত তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর! সময়ে সময়ে কোনো ভাবুকের অন্তরে এইরূপ ফুট উঠিত: "অলৌকিক শক্তির খনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় উদ্‌ভাসিত কে ইনি? ইনি কি সেই নিরক্ষর হিন্দুস্থানী রাখতুরামের অপূর্ব্ব পরিণতি 'অদ্ভুতানন্দ স্বামী?' "

কি কলিকাতায়, কি ৺কাশীধামে ভক্তগণের সঙ্গে শাস্ত্রের কোনো জটিল প্রসঙ্গ উঠিলে লাটু মহারাজ তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম জলের মত পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার উচ্ছ্বসিত ভাবার ঝঙ্কারে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিত। তাঁহার চিন্তাভাণ্ডারের মণি-মঞ্জুষা কখনো নিঃশেষিতপ্রায় হইত না। সেই সব আলোচনাতে তাঁহার সরল প্রাণের সরল ভাষায় সারগর্ভ ভাব ফুটিয়া উঠিত। উহার মধ্যে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা, বহু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে, এইরূপ বোধ হইত। শ্রীলাটু মহারাজের উপদেশের ভিতরে থাকিত শক্তির ছাপ, ভাবের ছাপ! তাঁহার ভিতরে বিশ্বপ্রেমের ফল্গুধারা

প্রবাহিত হইত। তাহা শুনিতে শুনিতে মন সত্যই সংসারের গণ্ডী ছাড়াইয়া উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইত, যেন আমরা অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত কোনো এক মহান্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, আমাদের চিত্ত স্বতঃই বিমল আনন্দরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তৎকালে তাঁহার বদন-মণ্ডলের মৃদুহাস্য প্রফুল্লদীপ্তি আজো চোখের সামনে ভাসছে। এই উচ্চস্তরাবস্থিত মহাত্মার গুরুনিষ্ঠা, ভগবদবিশ্বাস ও ভক্তি, প্রেমে আত্মত্যাগ ধর্ম্মজগতের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া সংসারপথে বিভ্রান্ত মাদৃশ অশান্ত পথিককে তত্ত্বপথের— অমৃতধামের বার্ত্তা বলিয়া দিত, অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে আশার বাণীতে উৎফুল্ল, উৎসাহিত করিত। বাস্তবিকই এই নীরব কর্ম্মী তাপসটি বাহিরে নিরক্ষরতার আবরণে থাকিলেও, তাঁহার ভিতরে ছিল অগাধ জ্ঞানরাশি— গুরুকৃপালব্ধ ও তপঃপ্রসূত প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল; তাহা তিনি তত্ত্বপিপাসু রসলিপ্সু ভক্তগণকে অকাতরে বিলাইতেন, তাহার রসাস্বাদনে তাঁহাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইত।

শ্রীলাটু মহারাজ ছিলেন অদোষদর্শী। কাহারো একবিন্দু গুণ তাঁহার নিকট সিন্ধুপ্রমাণ। তাঁহার নিকট কেহ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি কোনো ধর্ম্মমতের নিন্দা তাঁহার নিকট কাহাকেও করিতে দিতেন না, বলিতেন, "ধর্ম্মের নিন্দা, গুরুর নিন্দা যে করে, তার আধার বড় অপবিত্র, সে ভগবান থেকে বহু দূরে পড়ে যায়।" লেখকের পরের ছিদ্র-অন্বেষণ ও দোষদর্শনের স্বভাবটি দেখিয়া একদিন তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অপবিত্র হোলে লোকের দোষগুলো নজরে পড়ে। পবিত্র হোলে লোকের গুণগুলো নজরে পড়ে। গুণ দেখবার চোখ তোমাদের কুথায়, কেবল লোকের দোষ ধরতে শিখেছো। হিঁসুকুটে স্বভাবের দরুন

তোমাদের উন্নতি হোচ্ছে না! মনে হিংসা পুষে রেখে বাইরে তিলক-মালা পরলে কি ধর্ম্মী হয়?" পাঠক দেখিলেন তো লাটু মহারাজের চাবুকের বহর কতখানি! তাঁহার চাব্‌কানিতে এতখানি দরদ মাখান থাকিত বলিয়া একদিন সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "মহারাজ! এইবার ভাল কোচম্যানের হাতে পড়েছি। আপনি জানেন কেমন ক'রে break (টিট) করতে হয় বেয়াড়া ঘোড়াকে, তা নইলে সে আপনার বাহন হবার যোগ্যই হোতে পারে না।" কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে মহারাজ পাল্টা জবাব দিলেন, "দেখো! শিবের বাহন ষাঁড়টা পশু হোলেও, অহো ভাগ্য তার! শিব সাক্ষাৎ জ্ঞানের মূর্ত্তি, তাঁকে কি অজ্ঞান পশু বইতে পারে? অজ্ঞান কখনো জ্ঞানকে ছুঁতেই পারে না।"

অনেক সময় দেখা যাইত লাটু মহারাজ আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছেন, কাহাকে যে উদ্দেশ করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। একদিন কান পাতিয়া শোনা গেল তিনি নিজেকে ধিক্‌কার দিয়া বলিতেছেন — "অভিমান না গেলে কিসের সাধু? নিত্যানন্দের মত অবস্থা সবার কি হয়? গেরুয়া পরলেই কি মস্ত সাধু বনিয়ে যায়? মন না রঙলে সাধুর রংকরা-কাপড় পরাই সার। লাল কাপড় প'রে কার মাথা কিনে নিয়েছি?" তারপর আমার পানে চেয়ে বলিলেন— "দেখো! সাধুকে কেউ একটা ছোট বড় কথা বললে ভেতর থেকে অভিমান ফোঁস ক'রে ওঠে। সাধুর সব ছেড়ে যায়, বাকী অভিমান ছাড়তে চায় না, সাধু ঐখানে আট্‌কে যায়। দেখেছ তো! গঙ্গাজলে কতো ফুলমালা ভেসে যায় আউর পচা মরাভি ভেসে যায়, বাকী গঙ্গাজল যে পবিত্র সেই পবিত্র থাকে, তেমনি সাধুর মনটি গঙ্গাজলের মত হোলে মান-অপমানের অভিমান কুথায় ভেসে যায়। জানো! 'মন চাঙ্গা তো কঠৌরামে গঙ্গা।'

শুকদেব জড়ভরতের মত অবস্থা কার হোয়েছে যে গালি দিলে, গায়ে ধূলি দিলেও ভ্রূক্ষেপ নেই ! আসলী সাধুর কাছে নিন্দাবান্দা তুনো সমান।"

এক সময়ে অনেক ভোগলোলুপ ভক্তের মলিন আধার দেখিয়া লাটু মহারাজ বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখো! তোমরা বিগড়ে থাকলে, তোমাদের আকেট্-বিকেট্ কর্ম্মগুলো হামাকে বড় ধাক্কা দেয়, তাই তো দুঃখু হয়। সাধুকে যদি ঠিক ঠিক ভালবাসতে, তাকে কি দুঃখু দিতে পারতে? সাধুকে কেবল মুখেই ভক্তি দেখাও, বাকী তাঁর একটা কথাও মেনে চলতে পারলে কৈ? বিয়ে করলে না, তবু থিয়েটরে গিয়ে মেয়েমানুষের নাচ দেখবার লোভটি ছাড়তে পারলে না। জানো! মেয়েমানুষের ছবির পানে, পুতুলের পানেও সাধুব্রহ্মচারীর তাকাতে নেই। ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারীর মত সংযমের রাশ টেনে রাখলে পা পেছলাবে না, তবে 'পিওর (pure, পবিত্র) জীবন গড়ে ওঠে। দেখো! ছাদে উঠবার সময় মুখ উঁচু ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে উঠতে হয়। তেমনি মুখ উঁচু ক'রে— ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে হুঁশিয়ার হোয়ে ধাপে ধাপে উঠে যেতে হয়। নীচের দিকে— কামকাঞ্চনের দিকে নজর থাকলে পা পিছলে পড়ে যাবে।"

শ্রীলাটু মহারাজের শিক্ষাদানের কায়দাই ছিল হাসিখুশীর ভিতর দিয়া, আবার মোলায়েম শাসনের ভিতর দিয়া। দোষগুণ বিচার না করিয়া নির্ব্বোধ পরানুকরণপ্রিয়তা (যাহাকে তিনি 'কাপি' copy করা বলিতেন), কাজকর্ম্ম না করিয়া অলসভাবে জীবনযাপন, পরপীড়ন— এই সকলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। তাঁহার তীব্র ভাষার কষাঘাত হৃদয়-তন্ত্রীর উপর ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের প্রসুপ্তচিত্তে তেজস্বী ভাব জাগাইয়া দিত— এক নূতন চেতনা আনিয়া দিত। এইভাবে আমাদের উন্নয়ন

করাই তাঁহার ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমাদের চিত্তমল-সংশোধনের জন্য তাঁহার অনুশাসন কত যে কল্যাণকর তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতাম, তাই একদিন বলিয়া ফেলিলাম— "মহারাজ! আপনার ধমক স্নেহমাখান, তাই বড় মধুর। বাপ কি ছেলেকে শাসনের জন্য ধমকায় না, কানটা ম'লে দেয় না? কিন্তু তার চেয়েও আপনার দরদ যে কতো বেশী তা' প্রাণে প্রাণে বুঝি। আমাদের 'মানহুঁশ' গ'ড়ে তোলবার জন্যে আপনি যে উঠে প'ড়ে লেগেছেন। তাই তো আপনার ধমকে আমাদের মত কালাপাহাড়ের চমক ভাঙ্গে— ওতে কি দিল খাট্টা হোয়ে যায়? আপনার কত যে দয়া, সে কথা কি মুখে বলা যায়? গিরিশ বাবু বলেছেন— 'সংসারে মোহের ঘোর অন্ধকারে কেবল একটি ধ্রুবতারা আছে— মহাপুরুষের দয়া।' সেই দয়ারই উজ্জ্বল শিখা আত্মহারা ক্ষিপ্তপারা মানবকে যে পথ দেখায় সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না, তবে 'মানহুঁশ' হওয়া যায়।"

অন্তর্দর্শী লাটু মহারাজ মানবচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। সাধারণ লোকের নিকট যাহারা ভক্ত বলিয়া পরিচিত অথচ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নিম্নস্তরে অবস্থিত, মহারাজ তাহাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড দৃঢ় করিবার জন্য— মনুষ্যত্বের প্রতি মর্য্যাদাবোধ জাগাইবার জন্য ত্যাগ-জীবনের মহান্ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া ভক্তগণকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। মনের মলিনভাব দূর করিবার জন্য তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিতেন, "আরে বাপু! মনটা উটকে-পাটকে দেখলে টের পাবে কতো পাঁকের গন্ধ! হরদম্ 'পবিত্রতা' মন্ত্রটি স্মরণ-মনন করতে থাক, তবে তো দিলটা সাফ থাকবে। নিজে 'সাচ্চা' হও দিকিন্, তবে বুঝতে পারবে ভগবান কি বস্তু— তাঁর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ।"

এক সময়ে অনেক ভক্তকে মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "মঠে যাচ্ছো, সৎসঙ্গ করছো, তবুও হ্যাংলাপনা-প্রবৃত্তিটা ঘুচলো না, ভেতরে ভেতরে হামাগুড়ি দিচ্ছে! ঠিক্‌সে চলতে পার না কেনো? ভাবের ঘরে চুরি করলে নিজের কাছে নিজেই যে খাটো হয়ে থাকবে। তোমরা যদি লুকিয়ে 'কুপথ্যি' কর, তাহোলে মনের রোগ কি সারবে? আরে! ডুবে ডুবে জল খেলে, শিবের বাবাও টের পায়। মানুষের চোখে ধুলো দিলেও, তাঁর চোখ এড়াবার জো নেই। যদি বাঁচতে চাও, ও সব ভিরকুটি ছেড়ে দাও। সাধুগুরুর হুকুম মেনে চললে, তার 'মার' নেই, জানো! 'খুঁটি পাক্‌ড়ে যো রহে, উস্‌কো মারে কোই।'"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ লেখককে বলিলেন, "দেখো! পশ্চিম-দেশে কোন্ যুগে একবার ভগবান রামচন্দ্রের আবির্ভাব হোয়েছিল। সেইকাল থেকে তারা তাঁকেই বরাবর ধরে রয়েছে। এ দেশটাকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে কতো মহাপুরুষকে বার বার আসতে হয়, বাকী এখানে স্বয়ং ভগবান এলেও কোলকে পাওয়া ভার! এখানকার মাটির এমনি গুণ— ধর্ম্মের খাঁটী ভাবটি বেশীদিন টিকে থাকে না। মহাপুরুষদের ভাব সব উলটে দেয় যত ধর্ম্মধ্বজী জুটে, কতো ডালপালা গজায়, আবার কালে কালে সব শুকিয়ে ঝরে প'ড়ে যায়। কামিনী আর কাঞ্চনের ঘুণ ধরলে আর রক্ষে আছে? ধর্ম্মভাব সব চাপা পড়ে যায়, শেষটা ছোব্‌ড়া নিয়ে টানাটানি। এ সবই মহামায়ার খেলা! তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে!' চোখে ফ্যাটা বেঁধে দিয়ে তিনি সবাইকে খেলায় মাতিয়ে রেখেছেন— কল্‌কাটি তাঁর হাতে। এমনি অভিমানে বদ্ধ, নিজেকেই জানতে পারে না, ভগবানকে চিনবে কেমন

কোরে? বাকী যার ওপোর সদ্‌গুরুর কৃপা হয়, তার চোখ খুলে যায়, সে-ই বড় ভাগ্যবান।"

একদিন সাংসারিক অশান্তিতে লেখককে ম্রিয়মাণ দেখিয়া লাটু মহারাজ তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "তোমরা চাও কেবল সুখভোগ করতে, বাকী সংসারে ধাক্কা খেয়ে যত দুঃখের বোঝা সাধুর কাছে নামিয়ে দিয়ে কাঁদুনী শুরু করবে— এই তো তোমাদের দশা। একথা কি জান না যে, অবিদ্যার প্যাঁচে পড়ে গেলে নানারকম দুঃখু এসে জোটে। সংসারে শান্তি কুথায়? —আনন্দ তো দূরের কথা। মনে রেখো— ভোগই দুঃখের হেতু, ত্যাগই সুখের সেতু। ত্যাগ মানে কি সব ছেড়েছুড়ে বনে চলে যাওয়া? ত্যাগ তো মনে। দুনিয়া জুড়ে মহামায়ার সংসার— সবাই সেই গণ্ডীর ভেতরে। দেখো! ভোগ থাকলে ভগবানে যোগ হয় না— 'যোগ' আর 'ভোগ' আস্‌মান-জমিন্ ফারাক। যতই ভোগ বাড়ে, ততই মন নেমে পড়ে। ভোগের পাতকোয়া থেকে মনকে তুলতে হোলে ত্যাগের দড়ি ধরে উঠতে হবে। ভোগে দুবলতা (দুর্ব্বলতা) আসে, ত্যাগে মনের জোর বাড়ে। ত্যাগের ভেতর ভগবানের শক্তি থাকে, মনকে তুলে দ্যায়। ত্যাগের জোরে মানুষ 'দেওতার' কোঠায় উঠে যায়। জানো! নিবৃত্তির পথে যে এসেছে, সে-ই জানে ত্যাগে কতো প্রাণের আরাম, কী শান্তি!"

খারাপ লোক বলিয়া যাহাদের সকলে ঘৃণা করিত, লাটু মহারাজ তাহাদের গলা ধরিয়া আদর করিতেন, কাঁধে হাত দিয়া পথে চলিতেন, সখার ন্যায় স্নিগ্ধ ভালবাসায় তাহাদের অভিষিক্ত করিতেন। সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াও তাঁর প্রাণে কী গভীর প্রেম, অথচ মায়ার লেশ নাই! ভগবানের প্রেম স্বর্গ হোতে শুদ্ধ সরল মানবহৃদয়ে

যখন নেমে আসে, তখন তাহার চিত্তকে নন্দনকাননে পরিণত করে। এই বালকস্বভাব সাধুপুরুষটির ভিতর হইতে সেই স্বর্গীয় প্রেমপারিজাতের সৌরভে কে না আকৃষ্ট হইয়াছে?

কামকাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া প্রারব্ধবশে কাহারো পদস্খলন হইলে পতিতের বন্ধু লাটু মহারাজের করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হইতে সে বঞ্চিত হইত না। সে যে অনুতপ্ত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সৎপথে— মানুষের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে স্নেহমাখা স্বরে কত বুঝাইতেন, বলিতেন, "এমন মানুষজীবনটাকে পশুজীবনের মত নষ্ট ক'রে ফেলতে নেই। দিল্লীকা লাডড্ খেলে শেষে পস্তাতে হবে।" তাঁহার এইপ্রকার করুণার স্নিগ্ধধারায় তাহার কুপ্রবৃত্তির আগুন নিভিয়া যাইত, সে পাপপথ ভুলিয়া যাইত। লেখকের জনৈক বন্ধুই এসম্বন্ধে অকুণ্ঠিতচিত্তে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি অনুতপ্তস্বরে বলিয়াছেন যে, মহারাজ কতদিন তাহার সাথে সাথে যাইয়া বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অহেতুকী ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া বন্ধুটির প্রাণের আবেগ চাপিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, উহাতে তাহার চোখের জলের পরিমাণ বাড়াইত। এমনি অনেক সামান্য ঘটনা হইতে লাটু মহারাজের অসামান্য হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবপ্রেম যাঁহার বুকে একটানা বহিয়া যায়, তিনিই মানুষকে এতখানি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারেন। সেই প্রেমসূত্রই এই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে অন্তররাজ্য হইতে টানিয়া বাহিরে আনিত— এই মহাপ্রাণের সঙ্গে মাদৃশ জনের ক্ষুদ্রপ্রাণের যোগসংস্থাপন করিয়া দিত। যাঁহার চরিত্রে এইরূপ উদার প্রেমের ভাব, তাঁহার ত্যাগের অর্থ হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বজীবকে প্রেমে গ্রহণ, প্রেমবিতরণ। এমন প্রেমিক সন্ন্যাসী দেবতারও নমস্য!

এই নিরক্ষর সাধুটির ভিতরে জাতির বা শিক্ষার ঝাঁজ ছিল না। গরীবের দুঃখে এমন 'গলাপ্রাণ' দুনিয়ার হাটে বড় বেশী দেখা যায় না। কতিপয় অশিক্ষিত হীনদশাগ্রস্ত লোককে লাটু মহারাজ আশ্রয় দেওয়াতে তাঁহার পূতসঙ্গপ্রভাবে তাহাদের অসৎ প্রবৃত্তি মন্ত্রমুগ্ধবৎ দমিত হইয়া থাকিত, সকল প্রকার ভয়-ভাবনা পলাইয়া যাইত, সাধুর সেবায় রত থাকায় তাহাদিগকে বিমল আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত। তাহাদের আপনার জন ভাবিয়া তিনি ভালবাসিতেন, আত্মরক্ষা করিয়া সৎপথে চলিতে কত উৎসাহদান করিতেন, আবার তাহাদের দুঃখদৈন্যের কাঁদুনী শুনিয়া কত দরদ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহার করুণাধারা পিতামাতার স্নেহধারা হইতেও অধিকতর শান্তিপ্রদ ছিল। যে-সব ছোট-খাট আড়ম্বরবিহীন কাজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেই-সব কাজের ভিতর দিয়াই এই মহাত্মার দরদী প্রাণের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যাইত।

পূজনীয় শ্রীবাবুরাম মহারাজ আমাদের অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন— "ওরে! এমন দয়াল লাটু মহারাজ তোদের কৃপা করেছেন, তোদের আর ভাবনা কিসের? অমন প্রেমিক সাধু খুব কম দেখা যায়। তাঁর পায়ের বাতাসে তোদের জীবন পবিত্র, সার্থক হোয়ে যাবে।"

পূজ্যপাদ শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী কোনো সন্দিগ্ধচিত্ত সংসারী ভক্তকে অভয়বাণীদানে তাহার মর্ম্মপীড়ায় এইরূপ প্রলেপ দিয়াছিলেন— "ওরে! সংসার ছেড়ে সবাই কি লেঙ্‌টি প'রে বেরুতে পারে? বৈরাগ্য কি সবার ঘাড়ে চাপে? সাধুর পায়ের বাতাসে তোর তো কপাল ফিরেছে। আগে নালানর্দ্দামায় পড়ে থাকৃতিস, বিষ্ঠার লাড্ডু খেতিস, এখন তার বদলে ভাল ভাল সন্দেশ খেতে পাচ্ছিস। এই তো সাধুসঙ্গের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেছিস্।"

পরমারাধ্য শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন— "লাটুর কাছে ঘেঁস্‌তে ভয় কিসের? অমন কঠোর-ব্রতধারী সাধু ক'জন দেখতে পাওয়া যায়? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব— সেটা লোকসঙ্গ এড়াইবার জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর। দিনকতক মেলামেশা করলে বুঝতে পারবে ওর ভেতর সাধু ব'লে একটুও অভিমানের গন্ধ নেই। বহু সুকৃতি থাকলে এমন সাধুর সঙ্গ মেলে। এই গ্যাখনা, তুমি কোথায় জন্মেছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলুম, কিন্তু ঠাকুরের কৃপার টানে তুমি আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছো! আমরা যেমন তাঁর সন্তান, লাটুও তাঁর সন্তান— সেই সম্বন্ধটাই বড়। তুমিও সেই সুবাদে এখানে এসে থাক। এই সঙ্গের ফল এক সময়ে ফলবেই। সাধুসঙ্গের ফল হাতে হাতে পেতে চাও নাকি? একি মুদী-খানার নগদ সওদা নেওয়ার মত— এক হাতে টাকা দিলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে জিনিস হাতে পেয়ে গেলে! এই যে সৎসঙ্গ করছো, সৎপ্রসঙ্গ শুনছো — এর একটা ছোপ্‌ মনে ধ'রে রইল। এর পরে বুঝতে পারবে— realise (ঠিক অনুভব) করতে পারবে কেন সাধুসঙ্গের এতো সুফল। সাধুর আঁচ্‌ যার লেগে যায়, তার নতুন ছাঁচ্‌ তৈয়ারী হোয়ে যায়। জানতো গুব্‌রেপোকা ফুলের সঙ্গগুণে দেবতার চরণে গিয়ে পড়ে, তেমনি সাধুর কৃপায় লোকে দেবতার চেয়ে উঁচিয়ে যায়।"

শ্রীলাটু মহারাজ সম্বন্ধে বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রের কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা ছিল তাহা তাঁর এই কথাতেই প্রকাশ পায়—

"আকাশের চাঁদেও কলঙ্কের কথা শোনা যায়, কিন্তু লাটু একেবারে খাঁটী সোনা। লাটুর মত বেদাগ্‌ সাধু আমি কখনো দেখি নি! লাটুর হাওয়াতে লোক পবিত্র হবে। তার আশীর্ব্বাদে কতো লোকের কল্যাণ

হবে— সাধু উচ্চ আদর্শ পাবে এবং গৃহস্থগণ সংযমের পথে চলতে শিখবে।”

কী ভাবধারায় লাটু মহারাজের পবিত্র জীবন অভিষিক্ত ছিল, হাস্যরসের আবরণে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ‘কালাপাহাড়’ নাটকে ‘লেটোর’ চরিত্রে তাহার কতকটা আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীলাটু মহারাজ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

“লাটুর ভিতরে ছিল সাধনালব্ধ শক্তি। সেই শক্তিবলেই নানাভাবে নানা উচ্চাঙ্গের তত্ত্বের কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইত, অনেকে তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইত। সেই অদ্ভুত শক্তির কাছে সবাই মাথা নোয়াইত। লাটুকে দেখিতাম— ধীরে ধীরে ভালবাসার মূর্তি হইয়া গেল! ইতর-বিশেষ আর সে প্রভেদ করিতে পারিত না। দুষ্ট লোককেও লাটু সমানভাবে ভালবাসিত, আদরযত্ন করিত। আমি লক্ষ্য করিতাম যে, সেই পুরাণো লাটু আছে, কেবলমাত্র মহাশান্তিময় পুরুষ হইয়াছে এবং ভালবাসার ‘উৎস’ হইয়া গিয়াছে।” (‘তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান’ অবলম্বনে)।

রায় বাহাদুর বিহারীলাল সরকার বলিয়াছেন—

“মহৎজীবনের সংস্পর্শে আসিলে অনেকেই অনেক কিছু লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীলাটু মহারাজের দেবদুর্লভ সঙ্গ যে করিয়াছে, সে-ই কিছু লাভ হইল জ্ঞান করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গ অপার্থিব। হাজার হাজার সাধুর মধ্যে কেবল ‘ভগবানেরই জন্য’ উৎসর্গীকৃত ত্যাগ ও তপঃ-পূত জীবনের এমন একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। রামায়ণ-মহাবাণীর পবননন্দন যেরূপ রত্ন, লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-মহাবাণীর সেইরূপ রত্ন।

"যিনি অহর্নিশ কল্যাণচিন্তা বিচ্ছুরিত করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ক্লেশনিবারণে ও উন্নয়নে সতত সচেষ্ট থাকিতেন, সেই চিরশুভানুধ্যায়ী লাটু মহারাজ আমাদের পরম সুহৃদ নিত্যশরণ। বহির্দৃষ্টিপরায়ণ স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাঁহাকে ধরিতে না পারিলেও তিনি বরাবর আমাদের ধরিয়া রহিয়াছেন, কখনো হাতছাড়া করেন নাই। আমাদের ঐহিক পারত্রিক অভাবমোচনের জন্য তিনি বিলিয়ে গেছেন তাঁর তপঃপ্রসূত ফলটি। এত বড় স্বার্থত্যাগ সাধারণ মানুষে সম্ভব নয়, কেবল প্রেমিক সাধুই পারেন—যাঁর তপস্যা কেবল 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং' নয়, 'বহুজনহিতায় চ'। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসি-শিষ্য মহাত্মাগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিরাট হৃদয়। এইরূপ হৃদয়মাহাত্ম্যই লাটু মহারাজের মহত্ত্ব।

"সাঁচ্চা বাৎ অনেকেই বলিতে জানেন এবং পারেন, কিন্তু একেবারে বেদাগ সাঁচ্চা জীবনের নমুনা খুব কমই মেলে। ভগবানলাভের জন্য লাটু মহারাজের ত্যাগ ও কঠোর সাধনার দিকটা আমাদের নজরে আসে না, তাঁহার সাধনসিদ্ধির পরিণত মহোচ্চ রূপটির দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। তাঁহার তাপস জীবনতরুর অমৃতময় ফলদর্শনে আমরা কেবল মুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু সাধনে চিত্ত প্রলুব্ধ হয় না। তমোগুণের প্রাবল্যে আমরা ভুলিয়া যাই যে 'সত্যবস্তু' কাহারো নিকট হইতে ভিক্ষা মাগিয়া পাইবার জো নেই। শ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন তাহা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়া আরামে ভোগ করিতে পারা যায়, তাহা নিজের সাধন-শক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হয়, তাহা মূল শ্রীগুরুর কৃপা। শ্রীলাটু মহারাজ পুনঃ পুনঃ বলিতেন, 'ভগবান খাটিয়ে তবে দেন, বিনা খাটুনীতে কুছু মেলে না, ভিক্ষাতে দুঃখু ঘোচে-না, আত্মার পেটও ভরে না।'

"এই চির-বিরাগী তাপসটি গৃহি-ভক্তগণের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেশামেশা

করিলেও হংসের মত তাঁহার 'পাখা' কখনো ভিজিত না, কারণ কাহারো সঙ্গে তিনি মায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই—সংসারের গন্ধ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অথচ সকলের প্রতি প্রীতি ও মৈত্রী এই সমদর্শী সাধুর চরিত্রের প্রধান কথা।"

এই অনন্যসাধারণ মহাত্মার সংসর্গ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, যাঁহারা তাঁহার স্নেহাদর পাইয়াছেন, তাঁহারা এই সদানন্দ সাধুপুরুষ ও তাঁহার কথা লইয়া তাঁহাকে একটু নাড়াচাড়া করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। মঠের প্রবীণ সাধু সন্ন্যাসী মহারাজগণের মধ্যে কাহারো গাম্ভীর্য্যভাব দেখিলে যে-সকল ভক্ত খুব সম্ভ্রমের সহিত ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহারাই প্রফুল্লবদন লাটু মহারাজকে ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে হাস্যালাপে মাতিয়া যাইতেন। তিনিও সরল বালকের ন্যায় এক একবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেন, আবার পরক্ষণেই সরস কথাবার্ত্তায় গঙ্গাজলের মত ঢল ঢল তাঁহার অমিয় হাসির ফোয়ারা ছুটিত। সদালাপের ভিতর সুমধুর ভাবরস নিঙ্‌ড়াইয়া ভক্তগণকে পান করাইতে করাইতে তিনি স্ফূর্ত্তির সুতা এমনিভাবে ছাড়িয়া দিতেন যাহা দ্বারা রহস্যপ্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহাকে আপনার জনের মত ভাবিয়া অবাধে নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে লইয়া একটি আনন্দের মধুচক্র গড়িয়া তুলতেন এবং তাহাতে একটা অজানা সুখ উপভোগ করিতেন। এইখানেই লাটু মহারাজের বিশেষত্ব—ইহাতেই বিক্ষুব্ধ ভক্তচিত্তের পরমসুখের স্নিগ্ধ সহায়ক হইত এবং ইহারই সুবর্ণ ছাপটি তাঁহাদের অন্তরে চিরতরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ লাটু মহারাজের এরূপ ব্যক্তিত্বই তাঁহার মহত্ত্বের মহৎ নিদর্শন।

কি পরিচিত, কি অপরিচিত, কি ভক্ত, কি অভক্ত—সকলেরই

প্রতি এই দরদী সাধু হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া নিজেকে কতখানি বিলাইয়া দিতেন তাহা তাঁহারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার স্নেহাদর নিজ নিজ জীবনে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সেই সব পুরাতন কথার মধুর স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া এখনো অনেকেই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে নতশির।

ভজন

(১) ভজ মন রামচরণ দিনরাতি।

শ্রীরামচরণ কর রে ধেয়ান মে,

হোয়েগা দুখ নিপাতি

(শ্রীরামচরণ দিনরাতি)

যব্ যম আওয়েগা তলব্ লাগাওয়েগা,

চড়্কে বৈঠেগা ছাতি।

মাতাপিতা কুটুম্কা বোলে না,

কোই নেহি হোয়েগা সাথী।

(শ্রীরামচরণ দিনরাতি)

(২) রামচরণ বিনা কো নেকো ভেইয়া

এ ভবসাগরপার,

(আরে এ ভবসাগরপার।

এ দুনিয়ামে কোই নেহি আপ্না—

রামচরণ সুখসার

(আরে) রামচরণ সুখসার।

জগকি পালন সো হি ভগয়ান্

সো হি জগতকো প্রাণ—

ভজ দিনরয়না তাঁকো চরণ

রামপ্রভুজী হামার—

(আরে) শ্রীরামপ্রভুজী হামার ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।